গল্পসংগ্রহ

অগস্ট ১৮৬৮ - ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

উৎসর্গ

কালীপ্রসাদ চৌধুরী

জন্ম
১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫

মৃত্যু
১৭ই জুন ১৯৪১
বিমানযুদ্ধে নিহত

তোমার বয়স যখন আড়াই বৎসর, তখন
তোমার নামে এই trioletটি লিখি—

ছোট কালীবাবু

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়স তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে' চলে যবে, সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায়, তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়স তার আড়াই বছর॥

১৮ই জুন ১৯১৮

আর আজ?—

"স্ত্রিয়ো হি বিষয়ঃ শুচাম্। তথাপি কিং করোমি।
স্বভাবস্থ বেয়ং কাপুরুষতা বা স্ত্রৈণং বা যদেবমাস্পদং
পুত্রশোকহতভুজো জাতোঽস্মি।"

তোমার ন-কাকা
প্রমথ চৌধুরী

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার এই নিভৃত কক্ষের মধ্যে সংবাদ এসে পৌঁছল যে প্রমথর জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ চলেছে— দেশের যশস্বীরা তাতে যোগ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্তৃত্বপদ নেবার অধিকার স্বভাবতই আমারই ছিল। যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।

প্রমথর গল্পগুলিকে একত্র বার করা হচ্ছে এতে আমি বিশেষ আনন্দিত, কেননা গল্পসাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে। বাংলা দেশে তাঁর গল্প সমাদর পেয়েছে, এই সংগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে সহায়তা করবে।

অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের দেশ তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে যথোচিত গৌরব দেয় নি সেজন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি।

আজ ক্রমশ যখন দেশের দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর কীর্তির অবরোধ উন্মোচিত হল তখন আমি নিস্তেজ এবং জরার অন্তরালে তাঁর সঙ্গ থেকে দূরে পড়ে গেছি। তাই তাঁর সম্মাননা-সভায় দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করতে পারলেম না। বাহির থেকে তার কোনো প্রয়োজন নেই অন্তরেই অভিনন্দনের আসন প্রসারিত করে রাখলুম, দলপুষ্টির জন্য নয় আমার মালা এতকাল একাকী তাঁর কাছে সর্বলোকের অগোচরে অর্পিত হয়েছে আজও একাকীই হবে। আজ বিরলেই না হয় তাঁকে আশীর্বাদ করে বন্ধুকৃত্য সমাপন করে যাব।

[১৯৪১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পসংগ্রহ

প্রবাসস্মৃতি

তখন আমি অক্সফোর্ডে। শীতাপগমে নববসন্তের সঞ্চার হইয়াছে। অভিভাবকেরা রাগ করিতে পারেন, কিন্তু বসন্তকাল পড়াশুনার জন্য হয় নাই। পৃথিবীতে বরাবর যে ছয়টা করিয়া ঋতুপরিবর্তন প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহার কি প্রয়োজন ছিল, যদি সকল ঋতুতেই কর্তব্য পালন করিতে হইবে!

ফাঁকি দেবার একটা সময় আছে, ভালো ছেলেরা সেটা বোঝে না। তাহারা শীতবসন্ত মানিয়া চলে না, এমনি কাণ্ডজ্ঞানবিহীন। একদিন পূর্ণিমারাত্রে শেক্সপীয়রের নাটকে কোনো-এক নরনারীযুগল বলিয়াছিল, এমন রাত্রি নিদ্রার জন্য হয় নাই। কিন্তু কবির নাটকে স্থান পায় নাই এমন অনেক নরনারীযুগল আছে যাহারা প্রতিরাত্রেই ঘুমায়। তাহাদের শরীর দিব্য সুস্থ থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহাদের কাছে পূর্ণিমা-অমাবস্যা চিরদিন সমান রহিয়া গেল, অত্যন্ত সুস্থ শরীরটাকে সুদীর্ঘকাল বহন করিয়া তাহাদের লাভ কি?

যাহাই হউক, ভালোমন্দ বিচারের বয়স এখনো আমাদের হয় নাই; যখন কর্তব্য-অকর্তব্য দুটোই একরকম সমাধা হইয়া যাইবে তখন বেকার বসিয়া বিচারের সময় পাওয়া যাইবে। আপাতত সেদিন প্রবাসে যখন রুদ্ধ বোতলের মতো মেঘান্ধকার শীতের কালো ছিপিটা ছুটাইয়া সূর্যকিরণ স্বর্ণবর্ণ সুরাস্রোতের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সমস্ত আকাশভরা একটি অনির্বচনীয় উত্তাপ ও গন্ধ কোনো-এক অনির্দিষ্ট অথচ অন্তরতম সজীব পরিবেষ্টনের মতো চতুর্দিককে নিবিড় করিয়া রাখিয়াছিল সেদিন আমরা কিছুকাল পুরা ছুটি লইয়াছিলাম।

আমরা দুই বন্ধুতে অক্সফোর্ড পার্কে বেড়াইতে গিয়াছি। কোনো উদ্দেশ্য বা সাধনা লইয়া বাহির হই নাই। কিন্তু পদে পদে সিদ্ধিলাভ করিব এমন বিশ্বাস ছিল। অর্থাৎ যাহাই হাতের কাছে আসিবে তাহাই প্রচুর হইয়া উঠিবে, সেদিনকার জলের স্থলের ভাবখানা এমনিতর ছিল।

পার্কে সেদিন সৌন্দর্যসত্র বসিয়াছিল। সে সৌন্দর্য কেবল লতাপাতার নহে। সত্য কথা বলিতে কি, যে-কোনো ঋতুতেই হউক উদ্ভিজ্জ পদার্থের দিকে আমাদের তেমন আসক্তি নাই; তৃণগুল্মের সর্বপ্রকার স্বত্ব আমরা কবিজাতি বা যে-কোনো জাতির জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ছাড়িয়া দিতে পারি।

আমরা তখন অবোধ ছাত্র ছিলাম, এবং স্ত্রীসৌন্দর্যের প্রতি আমাদের কিছু পক্ষপাত ছিল। হায়! এখন বুদ্ধি বাড়িতেছে তবু তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

সেদিন পুরনারীরা পার্কে বাহির হইয়াছিলেন। কেবল যে মেঘমুক্ত সূর্যকিরণের প্রলোভনে তাহা বোধ হয় না। আমাদের মতো পক্ষপাতীদের নেত্রপাতও সূর্যকিরণের মতো আতপ্ত এবং সুখসেব্য। তাঁহারা বসন্তের বনপথে নিজের সমস্ত বর্ণচ্ছটা উন্মীলিত করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে কি শুদ্ধমাত্র লতাপাতা এবং রৌদ্রবায়ুর অনুরাগে? আশা করি তাহা নহে।

আমাদের চক্ষের দুটি কালো তারা কালো ভৃঙ্গের মতো এক মুখ হইতে আর-এক মুখের দিকে উড়িতেছিল। তাহার কোনো শৃঙ্খলা, কোনো নিয়ম, কোনো দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানমাত্র ছিল না।

এমন সময় আমার পার্শ্বস্থ বন্ধু অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, দিব্য দেখিতে!" বসন্তের একটা আচমকা নিশ্বাস ঠিক যেমন একেবারে ফুলের উপরে গিয়া পড়ে, তাহার বৃন্তটি অল্প একটু দোলা পায়, তাহার গন্ধ অমনি একটু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি আমার বন্ধুর আত্মবিস্মৃত বাহবাটুকু ঠিক জায়গায় ঠিক পরিমাণে আঘাত দিয়াছিল। তরুণী পান্থনারী চকিত বিচলিত গ্রীবা হেলাইয়া স্মিতহাস্যে আমার সৌভাগ্যবান বন্ধুর প্রতি তাহার উজ্জ্বল নীল নেত্রের একটুখানি প্রসাদবৃষ্টি করিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "এ তো মন্দ নহে। সময়ের সদ্‌ব্যবহার করিবার একটা উপায় পাওয়া গেল। আজ নারীহৃদয়ের, স্পেকৃট্রম অ্যানালিসিস, রশ্মিবিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। কাহার মধ্য হইতে কি রঙের ছটা বাহির হয় সেটা কৌতুকাবহ পরীক্ষার বিষয় বটে।"

পরীক্ষা শুরু হইল এবং ছটা নানা রকমের বাহির হইতে লাগিল। চলিতে চলিতে যাহাকে চোখে ধরে— বলিয়া উঠি, "বাঃ দিব্য!"

অমনি কেহ-বা চট্ করিয়া খুশি হইয়া উঠে; প্রগল্‌ভ আনন্দের প্রকাশ্য হাসি একেবারে এক নিমেষে মুখচক্ষুর সমস্ত কোণ-উপকোণ হইতে ঠিকরিয়া বাহির হয়। কাহারো-বা লজ্জায় গ্রীবামূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠে; দ্রুত চকিত হৃৎপিণ্ড খামকা অনাবশ্যক উদ্‌বেগে দুটি কর্ণপ্রান্ত এবং শুভ্র কপোলকে উত্তপ্ত উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে— লজ্জাবতী নম্রশিরে, তরুণ হরিণীর মতো, মুগ্ধদৃষ্টির

তীক্ষ্ণ লক্ষ হইতে আপনাকে কোনোমতে বাঁচাইয়া চলিয়া যায়। কাহারো-বা মুখে এককালে দুইভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, ভালোও লাগে অথচ ভালো লাগা উচিত নয় এটাও মনে হয়; দুই বিপরীত তরঙ্গ পরস্পরকে ব্যর্থ করিয়া দেয়; খুশিও ফোটে না, বিরক্তিকেও যথোচিত অকৃত্রিম দেখিতে হয় না। কিন্তু কোনো কোনো মহীয়সী মহিলা অপমানদংশিত দ্রুতবেগে দৃঢ় পদক্ষেপে পথের অপর পার্শ্বে চলিয়া গেছেন, তাঁহাদের জলত্তড়িৎ রোষকটাক্ষপাত হইতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। আবার কোনো কোনো তেজস্বিনীর দুইটি দীপ্ত কালো চক্ষু, ভুল বানানের উপর প্রচণ্ড পরীক্ষকের কালো পেন্সিলের মতো আমাদের দুজনার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সজোরে দুইটা কালো লাঞ্ছনার দাগ টানিয়া দিয়াছে, ক্ষণকালের জন্য আমাদের মনে হইয়াছে যেন বিধাতার রচনা হইতে আমরা এক দমে কাটা পড়িলাম।

শেষকালে আমরা দুই উন্মত্ত জ্যোতির্বিদের মতো নীল কৃষ্ণ ধূসর পিঙ্গল পাটল চক্ষুতারকার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে স্নিগ্ধ তীব্র রুষ্ট তুষ্ট স্থির চঞ্চল বিচিত্র রশ্মিজালে একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলাম। যে-সকল নব নব রহস্য আবিষ্কার করিতেছিলাম, তাহা কোনো চক্ষুতত্ত্বে কোনো অপটিক্স্ শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই।

আমরা পাঠিকাদের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করি। আমাদের রচনার অক্ষর পঙ্‌ক্তি ভেদ করিয়া তাঁহাদের বিচিত্র নেত্রের বিচিত্র অদৃশ্য আঘাত আমরা অনুভব করিতেছি। স্বীকার করি, তাঁহাদের চক্ষুতারা বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিষয় নহে, দর্শনশাস্ত্রও সেখানে অন্ধ হইয়া যায়; পণ্ডিত অ্যাবেলার্ড তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা অল্পবয়সের দুঃসাহসে যাহা করিয়াছি তাহা অদ্য স্মরণ হইলে হৃৎকম্প হয়। কেন যে হৃৎকম্প হয় নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি, তরুণ বয়স এবং বসন্ত কালের গতিকে সবসুদ্ধ অত্যন্ত হালকা বোধ করিতেছিলাম। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে যাহারা অভ্যস্ত তাহারা যদি হঠাৎ একটা ক্ষুদ্র গ্রহে গিয়া ওঠে, সেখানে যেমন পা ফেলিতে গেলে হঠাৎ প্রাচীর ডিঙাইয়া যায়, পদে পদে তেতালার ছাদে এবং মনুমেণ্টের চূড়ার উপরে উঠিয়া পড়ে আমাদের সেই দশা হইয়াছিল। শিষ্ট সমাজের মাধ্যাকর্ষণ-বন্ধন হইতে আমরা ছুটি লইয়াছিলাম, সেইজন্য একটু পা তুলিতে গিয়া একেবারে প্রাচীর ডিঙাইয়া পড়িতেছিলাম।

এখন সুন্দর মুখ দেখিবামাত্র বিনা চিন্তায়, বিনা চেষ্টায় মুখ দিয়া আপনি বাহির হইয়া পড়ে— "বাঃ দিব্য!" এইরূপে নিজের অজ্ঞাতসারে টপ্‌ করিয়া শিষ্টাচারের ওপারে গিয়া উপনীত হইতাম। ওপারে যে সর্বত্র নিরাপদ নহে একদিন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

সেদিন আমরা একটু অসময়ে পার্কে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, যাহা একের পক্ষে অসময় তাহা অন্যের পক্ষে উপযুক্ত সময়। জনসাধারণ পার্কে যায় জনসাধারণের আকর্ষণে; কিন্তু জনবিশেষ পার্কে যায় জনবিশেষের প্রলোভনে। উভয়ের মধ্যে স্বভাবতই একটা সময়ের ভাগাভাগি হইয়া গেছে।

সেদিন তখনো জনসমাগমের সময় হয় নাই। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা সমাজপ্রিয় নহে; বহুজনতা অপেক্ষা একজনতা তাহারা পছন্দ করে; এবং সেইরূপ পছন্দমত একজন লইয়া তাহারা যুগলরূপে নিকুঞ্জছায়ায় সঞ্চরণ করিতেছিল।

আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি একটি যুগলমূর্তির কাছে গিয়া পড়িয়াছিলাম। বোধ হইল তাহারা নবপরিণীত, পরস্পরের দ্বারা এমনি আবিষ্ট যে অনুচর কুকুরটি প্রভুদম্পতির সোহাগের মধ্য হইতে নিজের অতি তুচ্ছ অংশটুকু দাবি করিবার অবকাশমাত্র পাইতেছে না।

পুরুষটি পুরুষ বটে। তাহার শরীরগঠনে প্রকৃতির কৃপণতামাত্রই ছিল না। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বক্ষ বাহু রক্ত মাংস অস্থি ও পেশী অত্যন্ত অধিক। আর তাহার সঙ্গিনীটিতে শরীরাংশ একান্ত কম করিয়া তাহাকে কেবল নীলে লালে শুভ্রে, কেবল বর্ণে এবং গঠনে, ভাবে এবং ভঙ্গিতে, কেবল চলা এবং ফেরায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। তাহার গ্রীবার ডৌলটুকু, কপোলের টোলটুকু, চিবুকের গোলটুকু, কর্ণরেখার অতি সুকুমার আবর্তনটুকু, তাহার মুখশ্রীর যেখানে সরল রেখা অতি ধীরে বক্রতায় এবং বক্ররেখা অতি যত্নে গোলত্বে পরিণত হইয়াছে সেই রেখাভঙ্গের মধ্যে প্রকৃতির একটি উচ্ছ্বসিত বিস্ময় যেন সম্পূর্ণ অবাক হইয়া আছে।

আমাদেরও উচিত ছিল প্রকৃতির সেই পথ অবলম্বন করা। পুরুষটির প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ রাখিলেই তাহার সঙ্গিনীর প্রতি বিস্ময়োচ্ছ্বাস আপনি নির্বাক হইয়া আসে, কিন্তু আমাদের অভ্যাস খারাপ হইয়াছিল— মুহূর্ত-মধ্যে বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ, দিব্য দেখিতে!" দেখিলাম দ্রুত লজ্জায় কন্যাটির শুভ্র ললাট

অরুণবর্ণ হইয়া উঠিল, চকিতের মধ্যে একবার আমার দিকে ত্রস্ত বিস্মিত নেত্রপাত করিয়াই আয়ত নেত্রদুটি সে অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল। আমরাও এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া মৃদু পদচারণায় হাওয়া খাইতে লাগিলাম।

এমন সময় পেট ভরিয়া হাওয়া খাইবার আসন্ন ব্যাঘাত সম্ভাবনা দেখা গেল। কিয়দ্দূরে গিয়া সেই দম্পতি-যুগলের মধ্যে একটা কি কথাবার্তা হইল; মেয়েটি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার অপরিমিত স্বামীটি প্রকাণ্ড ক্রুদ্ধ বৃষভের মতো মাথা নিচু করিয়া গস্‌গস্‌ করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার তপ্ত অঙ্গারের মতো মুখ দেখিয়া আমার বন্ধু সহসা নিকটস্থ তরুলতার মধ্যে কোনো-এক জায়গায় দুর্লভ হইয়া উঠিলেন।

দেখিলাম মেয়েটিও উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে— এই বঙ্গসন্তানের প্রতি তাহার স্বামীটিকে চালনা করা ঠিক উপযুক্ত হয় নাই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু শক্তিশেল একবার যখন মারমূর্তি ধরিয়া ছোটে তখন তাহাকে প্রত্যাহার করিবে কে?

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। জনপুঙ্গব আমার সম্মুখে আসিয়া গুরুগর্জনে বলিলেন, "কি মহাশয়!" ক্রোধে তাহার বাক্যস্ফূর্তি দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি গম্ভীর স্থির স্বরে কহিলাম, "কেন মহাশয়!"

ইংরাজ কহিল, "আপনি যে বলিলেন, 'দিব্য দেখিতে', তাহার মানে কি?"

আমি তাহার তপ্ত তাম্রবর্ণ মুখের প্রতি শান্ত কটাক্ষপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "তাহার মানে আপনার কুকুরটি দিব্য দেখিতে।"

বন্ধুবর নিকটস্থ তরুকুঞ্জের মধ্য হইতে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অদূরে উৎস-উচ্ছ্বাসের মতো সুমিষ্ট একটি হাস্যকাকলি শুনিতে পাইলাম; আর সেই অকস্মাৎ প্রতিহতরোষ ইংরাজের সুগভীর বক্ষঃকুহর হইতে একটা বিপুল হাস্যধ্বনি সজলগম্ভীর মেঘস্তনিতের মতো ভাঙিয়া পড়িল।

দ্বিতীয়বার আর এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

কার্তিক ১৩০৫

চার-ইয়ারি কথা

আমরা সেদিন ক্লাবে তাস খেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাত্তির যে কত হয়েছে সে দিকে আমাদের কারো খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এরকম গলাভাঙা ঘড়ি কলকাতা শহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙা কাঁসির চাইতেও তার আওয়াজ বেশি বাজখাঁই এবং সে আওয়াজের রেশ কানে থেকেই যায়— আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্বপরিচিত, কিন্তু সেদিন কেন জানি নে তার খ্যান-খ্যানানিটে যেন নূতন করে, বিশেষ করে, আমাদের কানে বাজল।

হাতের তাস হাতেই রেখে কি করব ভাবছি— এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুয়োরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "Boy, গাড়ি যোত্‌নে বোলো।"

পাশের ঘর থেকে উত্তর এল— "যো হুকুম!"

সেন বললেন, "এত তাড়া কেন? এ হাতটা খেলেই যাও-না।"

সীতেশ। বেশ! দেখছ-না কত রাত হয়েছে! আমি আর এক মিনিটও থাকব না। এমনিই তো বাড়ি গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সোমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "কার কাছে?"

সীতেশ। স্ত্রীর—

সোমনাথ উত্তর করলেন, "ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারো নেই?"

সীতেশ। তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে তোমরা কখন আস যাও, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

সেন বললেন, "সে কথা ঠিক। তবে একদিন একটু দেরি হয়েছে, তার জন্য—"

সীতেশ। একটু দেরি! আমার মেয়াদ আটটা পর্যন্ত— আর এখন দশটা। আর এ তো একদিন নয়, প্রায় রোজই বাড়ি ফিরতে তোপ পড়ে যায়।

"আর রোজই বকুনি খাও?"

"খাই নে?"

"তা হলে সে বকুনি তো আর গায়ে লাগবার কথা নয়। এত দিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায় নি ?"

সীতেশ। এখন ইয়ারকি রাখো, আমি চললুম— Good night !

এই কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, এমন সময় Boy এসে খবর দিলে যে— "কোচমান-লোগ আবি গাড়ি যোৎনে নেই মাঙ্‌তা। ও লোগ সমজ্‌তা দো-দশ মিন্‌ট্‌মে জোর পানি আয়েগা, সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করেগা। ঘোড়ালোগ আস্তাবল্‌মে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়। রাস্তামে নিকালনেসে জরুর ভড়কেগা, সায়েৎ উখড় যায়েগা। কোই আধা ঘণ্টা দেখ্‌কে তব্ সোয়ারি দেনা ঠিক হ্যায়।"

এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠলুম, কেননা একা সীতেশের নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ি যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কি না তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এ দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি; কিন্তু এ যেন আর-এক পৃথিবীর আর-এক আকাশ— দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথাও ঘনঘটা করে নেই; আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই; মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যেরকম আলো দেখা যায়, সেইরকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনো দেখি নি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। চার পাশে তাকিয়ে দেখি, গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর-দোর, সব যেন কোনো আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মতো দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে। মড়ার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যেরকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক, দুই একসঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক, বৃষ্টি নামুক, বিদ্যুৎ চমকাক, বজ্র

পড়ুক, নয় আরও ঘোর করে আসুক— সব অন্ধকারে ডুবে যাক। কেননা প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্তের পর মুহূর্তে অসহ্য হতে অসহ্যতর হয়ে উঠেছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলুম না; অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য ছিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার তিনটি বন্ধুই যিনি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি তেমনিই দাঁড়িয়ে আছেন; সকলের মুখই গম্ভীর, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি এই দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করে বললুম, “Boy, চারঠো আধা পেগ লাও!”

এই কথা শুনে সকলেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোমনাথ বললেন, “আমার জন্য পেগ নয়, ভারমুথ।” তার পর আমরা যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগ্‌রেট ধরালুম। আবার সব চুপ। যখন Boy পেগ নিয়ে এসে হাজির হল, তখন সীতেশ বলে উঠলেন, “মেরা ওয়াস্তে আধা নেই— পুরা।”

আমি হেসে বললুম, “I beg your pardon, স্থূল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, সে কথা ভুলে গিয়েছিলুম।”

সীতেশ একটু বিরক্ত স্বরে উত্তর করলেন, “তোমাদের মতো আমি বামন-অবতারের বংশধর নই।”

“না, অগস্ত্যমুনির। একচুমুকে তুমি সুরা-সমুদ্র পান করতে পার!”

এ কথা শুনে তিনি মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, “দেখো রায়, ও-সব বাজে রসিকতা এখন ভালো লাগছে না।”

আমি কোনো উত্তর করলুম না, কেননা বুঝলুম যে, কথাটা ঠিক। বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্তমধ্যে আমরা নতুন ভাবের মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। যে-সকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে-সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে, তার বদলে দিনের আলোয় যা-কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে, তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।

সেন বললেন, “যেরকম আকাশের গতিক দেখছি, তাতে বোধ হয় এখানেই রাত কাটাতে হবে।”

সোমনাথ বললেন, "ঘণ্টাখানেক না দেখে তো আর যাওয়া যায় না।"

তার পর সকলে নীরবে ধূমপান করতে লাগলুম।

খানিক পরে সেন আকাশের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন, আমরা একমনে তাই শুনতে লাগলুম।

সেনের কথা

দেখতে পাচ্ছ বাইরে যা-কিছু আছে, চোখের পলকে সব কিরকম নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; যা জীবন্ত তাও মৃতের মতো দেখাচ্ছে; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাক্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে, রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে— এর পর আর কিছুই নেই। তুমি আমি সকলেই জানি যে, এ কথা সত্য নয়। এই দুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোর মায়াতে আমাদের অভিভূত করে রেখেছে বলেই এখন আমাদের চোখে যা সত্য তাও মিছে ঠেকছে। আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের কাছে বিশ্বের মানে বদলে যায়। এর প্রমাণ আমি পূর্বেও পেয়েছি। আমি আর-এক দিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম, যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপূর হয়ে উঠেছিল, যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।

সে বহুদিনের কথা। তখন আমি সবে এম. এ. পাস করে বাড়িতে বসে আছি; কিছু করি নে, কিছু করবার কথা মনেও করি নে। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা রোজগার করবার আবশ্যকও ছিল না, অভিপ্রায়ও ছিল না। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল; তা ছাড়া আমি তখনো বিবাহ করি নি এবং কখনো যে করব এ কথা আমার মনে স্বপ্নেও স্থান পায় নি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে চাকরি কিম্বা বিবাহ করবার জন্য কোনোরূপ উৎপাত করতেন না। সুতরাং কিছু না করবার স্বাধীনতা আমার সম্পূর্ণ ছিল। এক কথায় আমি জীবনে ছুটি পেয়েছিলুম এবং সে ছুটি আমি যত খুশি তত দীর্ঘ করতে পারতুম। তোমরা হয়তো মনে করছ যে, এরকম আরাম, এরকম সুখের অবস্থা তোমাদের কপালে ঘটলে তোমরা আর তার বদল করতে চাইতে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ অবস্থা সুখের তো নয়ই— আরামেরও ছিল না। প্রথমত, আমার শরীর তেমন ভালো ছিল না। কোনো

বিশেষ অসুখ ছিল না, অথচ একটা প্রচ্ছন্ন জড়তা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র দেহটি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শরীরের ইচ্ছাশক্তি যেন দিন-দিন লোপ পেয়ে আসছিল, প্রতি অঙ্গে আমি একটি অকারণ একটি অসাধারণ শ্রান্তি বোধ করতুম। এখন বুঝি, সে হচ্ছে কিছু না করবার শ্রান্তি। সে যাই হোক, ডাক্তাররা আমার বুক পিঠ ঠুকে আবিষ্কার করলেন যে আমার যা রোগ তা শরীরের নয়, মনের। কথাটি ঠিক। তবে মনের অসুখটা যে কি তা কোনো ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে ধরা অসম্ভব ছিল— কেননা যার মন, সেই তা ঠিক ধরতে পারত না। লোকে যাকে বলে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ সংসারের ভাবনা, তা আমার ছিল না— এবং কোনো স্ত্রীলোক আমার হৃদয় চুরি করে পালায় নি। হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবে না, অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে যদিচ তখন আমার পূর্ণযৌবন, তবুও কোনো বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, সে মনে কোনো অবলা সরলা ননীবালার প্রবেশাধিকার ছিল না।

আমার মনে যে সুখ ছিল না সোয়াস্তি ছিল না তার কারণই তো এই যে, আমার মন সংসার থেকে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে, আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল ; অবস্থা ঠিক তার উল্টো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক অনুরাগ বশতই আমার মন চারপাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই ; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা— সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মাণ এবং মৃতকল্প। আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটি বিরাট পুতুল-নাচের মতো দেখাত। নিজে পুতুল সেজে, আর-একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে এই পুতুল-সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হত। জানতুম তার চাইতে মরাও শ্রেয় ; কিন্তু আমি মরতে চাই নি; আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে— শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে— ফুটে উঠতে, জ্বলে উঠতে। এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর-মনকে জীর্ণ করে ফেলছিল, কেননা এই আকাঙ্ক্ষার কোনো স্পষ্ট বিষয় ছিল না, কোনো নির্দিষ্ট অবলম্বন ছিল না। তখন আমার মনের ভিতরে যা ছিল, তা একটি ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই নয় ; এবং সেই ব্যাকুলতা একটি

কাল্পনিক, একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। ভাবতুম যে, জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই আমি সজীব হয়ে উঠব। কিন্তু জানতুম এই মরার দেশে সে জীবন্ত রমণীর সাক্ষাৎ কখনো পাব না।

এরকম মনের অবস্থায় আমার অবশ্য চার পাশের কাজকর্ম আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভালো লাগত না, তাই আমি লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয় নাটক-নভেলের রাজ্যে বাস করতুম।— এই রাজ্যের নায়ক-নায়িকারাই আমার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এই কাল্পনিক স্ত্রী-পুরুষেরাই আমার কাছে শরীরী হয়ে উঠেছিল ; আর রক্তমাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার চার পাশে সব ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যতই অস্বাভাবিক হোক, আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাই নি। আমার এ জ্ঞান ছিল যে, মনের এ বিকার থেকে উদ্ধার না পেলে, আমি দেহ-মনে অমানুষ হয়ে পড়ব। সুতরাং যাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় সে বিষয়ে আমার পুরো নজর ছিল। আমি জানতুম যে, শরীর সুস্থ রাখতে পারলে মন সময়ে আপনিই প্রকৃতিস্থ হয়ে আসবে। তাই আমি রোজ চার-পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতুম। আমার বেড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যার পর ; কোনো দিন খাবার আগে, কোনো দিন খাবার পরে। যেদিন খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরোতুম সেদিন বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যেত। এক রাত্তিরের একটি ঘটনা আমি আজও বিস্মৃত হই নি, বোধ হয় কখনো হতে পারব না— কেননা আজ পর্যন্ত আমার মনে তা সমান টাটকা রয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমা। আমি একলা বেড়াতে বেড়াতে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছলুম, তখন রাত প্রায় এগারোটা। রাস্তায় জনমানব ছিল না, তবু আমার বাড়ি ফিরতে মন সরছিল না, কেননা সেদিন যেরকম জ্যোৎস্না ফুটেছিল সেরকম জ্যোৎস্না কলকাতায় বোধ হয় দু-দশ বৎসরে এক-আধ দিন দেখা যায়। চাঁদের আলোর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় একটা ঘুমন্ত ভাব আছে ; সে আলো মাটিতে জলেতে, ছাদের উপর, গাছের উপর, যেখানে পড়ে সেইখানেই মনে হয় ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু সে রাত্তিরে আকাশে আলোর বান ডেকেছিল। চন্দ্রলোক হতে অসংখ্য অবিরত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন একটির-পর-একটি, তারপর আর-একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ পৃথিবীর উপর এসে ভেঙে পড়ছিল। এই ঢেউ-খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল— সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মতো

আপন হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তার পরে হাসির আকারে চারি-দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে এ আলোর নেশা ধরেছিল, আমি তাই নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, মনের ভিতর একটি অস্পষ্ট আনন্দ ছাড়া আর কোনো ভাব, কোনো চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ নদীর দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখি, সারি-সারি জাহাজ এই আলোয় ভাসছে। জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর, তা আমি পূর্বে কখনো লক্ষ্য করি নি। তাদের ঐ লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতিরেখায় একটি একটানা গতির চেহারা সাকার হয়ে উঠেছিল— যে গতির মুখ অসীমের দিকে, আর যার শক্তি অদম্য এবং অপ্রতিহত। মনে হল, যেন কোনো সাগর-পারের রূপকথার রাজ্যের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে, এখন পাখা গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে— এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার পাখা মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। সে দেশ ইউরোপ— যে ইউরোপ তুমি-আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়— কিন্তু সেই কবিকল্পিত রাজ্য, যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। এই জাহাজের ইঙ্গিতে সেই রূপকথার রাজ্য, সেই রূপের রাজ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে এল। আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি, আকাশ জুড়ে হাজার-হাজার জ্যাস্‌মিন্ হথর্‌ন্ প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়ছে, চারি দিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সে ফুল, গাছপালা সব ঢেকে ফেলেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপরে পড়েছে, রাস্তাঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। তার পর আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোনো মিরাণ্ডা কি ডেস্‌ডিমনা, বিয়াট্রিস কি টেসার দেখা পাব— এবং তার স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত eternal feminine সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্ম প্রতীক্ষা করছে।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন সোজা এক দিকে চলে যায়, আমি তেমনি ভাবে চলতে চলতে যখন লাল রাস্তার পাশে এসে পড়লুম, তখন দেখি দূরে যেন একটি ছায়া পায়চারি করছে। আমি সেই দিকে এগোতে লাগলুম। ক্রমে সেই ছায়া শরীরী হয়ে উঠতে লাগল; সে যে মানুষ, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছি, তখন সে পথের ধারে একটি বেঞ্চিতে বসল। আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে

যে বসে আছে সে একটি ইংরাজ-রমণী— পূর্ণযৌবনা— অপূর্বসুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না— সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে, নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়ল তখন দেখি তার চোখদুটি আলোয় জল্‌জল্‌ করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়— বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরো উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর সেদিন একমুহূর্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ জড়জগৎ সেই মুহূর্তে প্রাণময়, মনোময় হয়ে উঠেছিল। আমি সেদিন ঈশ্বরের স্পন্দন চর্মচক্ষে দেখেছি; আর দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছি যে, আমার আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে একসুরে, একতানে স্পন্দিত হচ্ছে। এ সবই সেই রাত্তিরের সেই আলোর মায়া। এই মায়ার প্রভাবে শুধু বহির্জগতের নয়, আমার অন্তর-জগতেরও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহমন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মূর্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল, এবং সে হচ্ছে ভালোবাসবার ও ভালোবাসা পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান বুদ্ধি, এমন-কি, চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চেয়ে, আমি অচেতন পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে আছি দেখে, একটু হাসলে। সেই হাসি দেখে আমার মনে সাহস এল, আমি সেই বেঞ্চিতে তার পাশে বসলুম— গা ঘেঁষে নয়, একটু দূরে। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলুম। বলা বাহুল্য তখন আমি চোখ চেয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম; সে স্বপ্ন যে-রাজ্যের, সে-রাজ্যে শব্দ নেই— যা আছে তা শুধু নীরব অনুভূতি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলুম, তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সে সময় আমার কাছে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কলকাতা শহরে কোনো বাঙালি রোমিয়োর ভাগ্যে কোনো বিলাতি জুলিয়েট যে জুটতে পারে না— এ জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল যে, এ স্ত্রীলোকেরও হয়তো আমারই মতো মনে সুখ ছিল না— এবং সে একই কারণে। এর মনও হয়তো এর চার পাশের বণিকসমাজ হতে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল এবং এও সেই অপরিচিতের আশায়,

প্রতীক্ষায়, দিনের পর দিন বিষাদে অবসাদে কাটাচ্ছিল, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে এর জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর আজকের এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব সৌন্দর্যের ডাকে আমরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের এ মিলনের মধ্যে বিধাতার হাত আছে। অনাদিকালে এ মিলনের সূচনা হয়েছিল, এবং অনন্তকালেও তার সমাধা হবে না। এই সত্য আবিষ্কার করবামাত্র আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মতো জ্বলছিল, এখন তা নীলার মতো সুকোমল হয়ে গেছে; একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে, এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনো দেখি নি। সে চাহনিতে আমার হৃদয়মন একেবারে গলে উথলে উঠল; আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম; সে হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।

হঠাৎ সে তার হাত আমার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে সে দক্ষিণ দিকে দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করলে। আমি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি ছ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা একটি ইংরেজ, চার-পাঁচজন চাকর সঙ্গে করে মেয়েটির দিকে জোরে হেঁটে চলছে। মেয়েটি দু পা এগোচ্ছে, আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে; আবার এগোচ্ছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। এমনি করতে করতে ইংরেজটি যখন তার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হল, অমনি সে দৌড়তে আরম্ভ করলে। পিছনে পিছনে এরা সকলেও দৌড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটি চীৎকার শুনতে পেলুম। সে চীৎকার-ধ্বনি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বিকট। সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল; আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম, আমার নড়বার-চড়বার শক্তি রইল না। তার পর দেখি চার-পাঁচ জনে চেপে ধরে তাকে আমার দিকে টেনে আনছে; ইংরেজটি সঙ্গে সঙ্গে আসছে। মনে হল, এ অত্যাচারের হাত থেকে একে উদ্ধার করতেই হবে— এই পশুদের

হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে। এই মনে করে আমি যেমন সেই দিকে এগোতে যাচ্ছি, অমনি মেয়েটি হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলে। সে অট্টহাস্য চারি দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; সে হাসি তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশি বিকট, দশগুণ বেশি মর্মভেদী। আমি বুঝলুম যে মেয়েটি পাগল— একেবারে উন্মাদ পাগল; পাগলা-গারদ থেকে কোনো সুযোগে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই আমার প্রথম ভালোবাসা, আর এই আমার শেষ ভালোবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের মতো কোমল, কত তারার মতো উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি— ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্টও হয়েছি, কিন্তু যে মুহূর্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে সেই মুহূর্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেইদিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminineকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

এই বলে সেন তাঁর কথা শেষ করলেন। আমরা সকলে চুপ করে রইলুম। এতক্ষণ সীতেশ চোখ বুজে একখানি আরামচৌকির উপর তাঁর ছ ফুট দেহটি বিস্তার করে লম্বা হয়ে শুয়েছিলেন, তাঁর হস্তচ্যুত আধহাত লম্বা ম্যানিলা চুরুটটি মেজের উপর পড়ে সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে তার অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছিল; আমি মনে করেছিলুম সীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ জলের ভিতর থেকে একটা বড়ো মাছ যেমন ঘাই মেরে ওঠে, তেমনি সীতেশ এই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসলেন। সেদিনকার সেই রাত্তিরের ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে-গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। তার পর সেই মূর্তি অতি মিহি মেয়েলি গলায় কথা হইতে আরম্ভ করলেন; ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কিংকর্তব্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সীতেশের কথা ঠিক তার পুনরাবৃত্তি নয়।

সীতেশের কথা

তোমরা সকলেই জান, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উল্টো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে আমি তার একটি জল্‌জ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার করে নূতন করে ভালোবাসায় পড়তুম; তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বলতে তা ঠিক। আমি যে সেকালে দিনে একবার করে ভালোবাসায় পড়ি নি, এতেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন-একটি শক্তি আছে যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি কারো-বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারো-বা মুখের হাসিতে, কারো-বা গলার স্বরে, কারো-বা দেহের গঠনে। এমন-কি, শ্রীঅঙ্গের কাপড়ের রঙে গহনার ঝংকারেও, আমার বিশ্বাস, জাদু আছে। মনে আছে, একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল— তার পরে তাকে আর-একদিন আঁশমানি-রঙের কাপড়-পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারে নি। আজও আমি মলের শব্দ শুনলে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোনো বন্ধ গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সেদিকে যায়; গ্রীক Statueর মতো গড়নের কোনো হিন্দুস্থানী রমণীকে পথে-ঘাটে পিছন থেকে দেখলে আমি ঘাড় বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া, সেকালে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেইজাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতই অনুরক্ত হয়। এ সত্ত্বেও যে আমি নিজের কিম্বা পরের সর্বনাশ করি নি, তার কারণ Don Juan হবার মতো সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই, কখনো ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাঁচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে— অর্থাৎ তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা কাঁচও ভাঙি নি তার কারণ ও বস্তু ভাঙলে প্রথমত বড়ো আওয়াজ হয়— তার ঝন্‌ঝনানি পাড়া মাথায় করে তোলে; দ্বিতীয়ত তাতে হাত-পা কাটবার

ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন eternal feminine একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন— আর আমি অনেকের ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পান নি, আমিও পাই নি। তবে দুজনের ভিতর তফাত এই যে, সেনের মতো কঠিন মন কোনো স্ত্রীলোকের হাতে পড়লে সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম খুদে রেখে যায়; কিন্তু আমার মতো তরল মনে, স্ত্রীলোকমাত্রেই তার আঙুল ডুবিয়ে যা-খুশি হিজিবিজি করে দাঁড়ি টানতে পারে, সেই সঙ্গে সে-মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করেও তুলতে পারে— কিন্তু কোনো দাগ রেখে যেতে পারে না; সে অঙ্গুলিও সরে যায়— তার রেখাও মিলিয়ে যায়। তাই আজ দেখতে পাই আমার স্মৃতিপটে একটি ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুলতে পারি নি, কেননা এক জীবনে এমন ঘটনা দু বার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধ হয় অক্টোবরের শেষ, কিম্বা নভেম্বরের প্রথম। কেননা এইটুকু মনে আছে যে, তখন চিমনিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সন্ধে হয়েছে— যেন সূর্যের আলো নিভে গেছে, অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয় নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানালার কাছে গিয়ে দেখি, রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলেরই মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যাঁরা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে হন্‌হন্ করে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডানহাতে ছাতা ধরে বাঁহাতে গাউন হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরে কাদাখোঁচার মতো লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক। এই থেকে আন্দাজ করলুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে; কেননা এ বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে কানে শোনা যায় না।

ভালো কথা, এ জিনিস কখনো নজর করে দেখেছ কি যে— বর্ষার দিনে বিলেতে কখনো মেঘ করে না, আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায় এবং তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট সব কাদায় প্যাচ্‌প্যাচ্ করে? মনে হয় যে, এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে, আর-আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী

অস্পৃশ্য নোঙরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মন-মরা হয়ে গেলুম সে কথা বলা বাহুল্য। এরকম দিনে, ইংরাজরা বলেন, তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

আমার একজনের সঙ্গে Richmondএ যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দিনে ঘর থেকে বেরোবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেক্‌ফাস্ট খেয়ে TIMES নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও-কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্যন্ত পড়লুম; এক কথাও বাদ দেই নি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, TIMESএর শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশি মুখরোচক। তার আর্টিকেল পড়লে মনে যা হয়, তার নাম রাগ; আর তার অ্যাডভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে যা হয়, তার নাম লোভ। সে যাই হোক, কাগজ-পড়া শেষ হতে-না-হতেই দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসেছিলুম সেইখানে বসেই তা শেষ করলুম। তখন দুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনো বদল হয় নি, কেননা এই বিলাতি বৃষ্টি ভালো করে পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না। তফাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে বাতি না জ্বেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার জো নেই।

আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে শুরু করলুম, খানিক ক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে এল। ঘরের গ্যাস জ্বেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই— Ansonএর *Contract*। এক কথা দশ বার করে পড়লুম, অথচ offer এবং acceptanceএর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিজ্ঞেস করলুম 'তুমি এতে রাজি?' তুমি উত্তর করলে 'আমি ওতে রাজি।'— এই সোজা জিনিসটেকে মানুষ কি জটিল করে তুলেছে, তা দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লুম। মানুষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখত, তা হলে এইসব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তাঁর খুরে দণ্ডবৎ করে Ansonকে শেল্‌ফের সর্বোচ্চ থাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল সুমুখে একখানা পুরনো PUNCH পড়ে রয়েছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন PUNCH পড়ে হাসি পাওয়া দূরে থাক্ রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরি রসিকতাও যে

মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে, এই ভেবে অবাক হলুম। দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম যে পৃথিবীর এমন দিনও আসবে, যখন Made in Garmany এই ছাপমারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে, এ দেশের আকাশের মতো এ দেশের মনেও বিদ্যুৎ কালে-ভদ্রে এক-আধবার দেখা দেয়— তাও আবার যেমন ফ্যাকাসে, তেমনি এলো। যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি PUNCHখানি চিমনির ভিতর গুঁজে দিলুম, তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড়পদার্থ PUNCHএর মান রাখল দেখে খুশি হলুম।

তার পর চিমনির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তার পর আবার একখানি বই নিয়ে পড়তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের ওপর সারি সারি রুপোর বাতিদান, গাদা গাদা রুপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মতো পল-কাটা চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কাঁচের গেলাস। আর সেইসব গেলাসের ভিতর, স্পেনের ফ্রান্সের জর্মানির মদ— তার কোনোটির রঙ চুনির, কোনোটির পান্নার, কোনোটির পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম Algernon, নায়িকার Millicent। একজন Dukeএর ছেলে আর একজন millionaireএর মেয়ে; রূপে Algernon বিদ্যাধর, Millicent বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন এবং সে প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে Algernon বিবাহের offer করবেন, Millicent তা accept করবেন— contract পাকা হয়ে যাবে।

সেকালে কোনো বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘে চড়ে অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াশায় ভর করে এই নভেল-বর্ণিত রুপোর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম, সেখানে একটি যুবতী, বিরহিণী যক্ষপত্নীর মতো আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরেমানিক দিয়ে সাজানো সোনার প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে, চার চক্ষুর মিলন হবামাত্রই আমার মনে ভালোবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তার হাতে সমর্পণ করলুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ করলে। ফলে, যা পেলুম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেই সঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময় ঘড়িতে

টং টং করে চারটে বাজল— অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জলকাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানই তো, জলই হোক ঝড়ই হোক লণ্ডনের রাস্তায় লোকচলাচল কখনো বন্ধ হয় না, সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি, শুধু মানুষের স্রোত চলেছে— সকলেরই পরনে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখতে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য Daguerrotypeএর ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর, ঘরের চাইতে আমার বেশি একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি; অথচ সেই মুহূর্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক, তা এইরকম দিনে এইরকম অবস্থায় পুরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি Holborn Circusএর কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। সুমুখে দেখি একটি ছোটো পুরনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নীচে বসে আছে। তার গায়ের ফ্রককোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়েস-কালে কালো ছিল, এখন তা হলদে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটি শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে, আমার মতো শৌখিন পোশাক-পরা খদ্দের ইতিপূর্বে তার দোকানের ছায়া কখনোই মাড়ায় নি। এ বই ও বই সে বইয়ের ধুলো ঝেড়ে সে আমার সুমুখে নিয়ে এসে ধরতে লাগল। আমি তাকে স্থির থাকতে বলে নিজেই এখান থেকে সেখান থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করলুম। কোনো বইয়ের বা পাঁচমিনিট ধরে ছবি দেখলুম, কোনো বইয়ের বা দু-চার লাইন পড়েও ফেললুম। পুরনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে তা তোমরা সবাই জান। আমি এক-মনে সেই আনন্দ উপভোগ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি-জানি কোথা থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ

বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মতো ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ— এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা করে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেননা ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়; তার কোনো মুখ নেই। কিন্তু এ সেই-জাতীয় গন্ধ, যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মতো বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির— অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্তভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোক, লেজে ভর দিয়ে সাপের মতো ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রয়েছি দেখে সে চোখ ফেরালে না। পূর্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যেরকম করে হাসে, সেইরকম মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। অথচ আমি হলপ করে বলতে পারি যে, এ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিন্‌কালেও দেখা হয় নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার একছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ দুটি যেন ছুরির মতো আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এতো অসোয়াস্তি করতে লাগল যে আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভালো করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়— চোখের। ইস্পাতের মতো নীল, ইস্পাতের মতো কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মতো চিক্‌মিক্ করছে। আমি সে দৃষ্টি এড়াবার যত বার চেষ্টা করলুম আমার চোখ তত বার ফিরে ফিরে সেইদিকেই গেল। শুনতে পাই, কোনো কোনো সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখি মাটিতে নেমে আসে, হাজার পাখা-ঝাপটা দিয়েও উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থা ঐ পাখির মতোই হয়েছিল।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল— ঐ পাচুলির গন্ধ আর ঐ চোখের আলো, এই দুইয়ে মিশে আমার শরীরমন দুইই উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না, সুতরাং তখন যে কী

করছিলুম তা আমি জানি নে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ে ধাক্কা লাগল। আমি মাপ চাইলুম; সে হাসিমুখে উত্তর করলে, "আমার দোষ, তোমার নয়।" তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্তা আরম্ভ করলুম যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু! আমি তাকে এ বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি তা পড়েছি কি না। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানি নে। তার কথাবার্তায় বুঝলুম যে, তার পড়াশুনা আমার চাইতে ঢের বেশি। জর্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান— তিন ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম, তাই নিজের বিদ্যে দেখাবার জন্য একখানি ফরাসী কেতাব তুলে নিয়ে ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে, আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, আমি কি পড়ছি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল; কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীরমনে আগুন ধরিয়ে দিলে।

ফরাসি বইখানির যা পড়ছিলুম, তা হচ্ছে একটি কবিতা—

Si vous n'avez rien á me dire,
Pourquoi venir auprés de moi ?
Ponrquoi me faire ce sourire
Qui tournerait la tete au roi ?

এর মোটামুটি অর্থ এই— "যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে তো আমার কাছে এলেই-বা কেন, আর অমন করে হাসলেই-বা কেন, যাতে রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়!"

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক্ করে হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপ্‌টা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখতে লাগলুম। আমার পড়া আর এগোল না। ছোটো ছেলেতে যেমন কোনো অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়লে শুধু হেলে-দোলে ব্যাঁকে-চোরে, অপ্রতিভভাবে এদিক-

ওদিক চায়, আর-কোনো কথা বলতে পারে না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে, এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে একটি মরক্কোর পকেট-কেস্ বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি; একটিও শিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথায়ও একটি শিলিং পেলুম না। এই সময়ে আমার নবপরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি শিলিং বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বললে, "তোমার আর গিনি ভাঙাতে হবে না, ও বইখানি আমি নেব।" আমি বললুম, "তা হবে না।" তাতে সে হেসে বললে, "আজ থাক্, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিন তুমি টাকাটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।"

এর পরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসে আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে, "এখন তোমার বিশেষ করে কোথাও যাবার আছে?"

আমি বললুম, "না।"

"তবে চলো, Oxford Circus পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চলতে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হয়।"

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

"তার কারণ, পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনো মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপযৌবন থাকে, তা হলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচ শো জন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশ জন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচ জন গায়ে পড়ে আলাপ করবার চেষ্টা করবে, আর অন্তত এক জন এসে বলবে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'।"

"এই যদি আমাদের স্বভাব হয় তো কি ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?"

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমাকে আমি ভয় করি নে।"

"কেন?"

"বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে যারা আমাদের রক্ষক।"

"সে জাতটি কি ?"

"যদি রাগ না কর তো বলি। কারণ কথাটা সত্য হলেও প্রিয় নয়।"

"তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার, কেননা তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

"সে হচ্ছে পোষা কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর-কোনো পুরুষকে আমাদের কাছে আসতে দেয় না। বাইরের লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে, তার পর দাঁত বার করে— তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয়, তা হলে তাকে কামড়ায়।"

আমি কি উত্তর করব না ভেবে পেয়ে বললুম, "তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশি !"

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে, "ভক্তি না থাক্, ভালোবাসা আছে।"

আমার মনে হল তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা Oxford Circusএর দিকে চলেছিলুম, কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারি নি, কেননা দুজনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ কথাগুলি শুনে আমি খানিক ক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পর যা জিজ্ঞেস করলুম তার থেকে বুঝতে পারবে যে তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি। "তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে ?"

"কখনোই না।"

"এই যে একটু আগে বললে যে আবার যেদিন দেখা হবে—"

"সে তুমি শিলিংটে নিতে ইতস্তত করছিলে বলে।"

এই বলে সে আমার দিকে চাইলে। দেখি তার মুখে সেই হাসি— যে হাসির অর্থ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারি নি।

আমি তখন নিশিতে-পাওয়া লোকের মতো জ্ঞানহারা হয়ে চলছিলুম। তার সকল কথা আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢুকছিল না।

তাই আমি তার হাসির উত্তরে বললুম, "তুমি না চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।"

"কেন ? আমার সঙ্গে তোমার কোনো কাজ আছে ?"

"শুধু দেখা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।— আসল কথা এই যে, তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারব না।"

"এ কথা যে-বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেল ?"

"পরের বই থেকে বলছি নে, নিজের মন থেকে। যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

"তোমার বয়সের লোক নিজের মন জানে না ; মনের সত্য-মিথ্যা চিনতেও সময় লাগে। ছোটো ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়সের ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালোবাসা হয়। ওসব হচ্ছে যৌবনের দুষ্টু ক্ষিধে।"

"তুমি যা বলছ তা হয় তো সত্য। কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মতো এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে।"

"ও হচ্ছে যৌবনের season flower, দু দণ্ডেই ঝরে যায়, ও ফুলে কোনো ফল ধরে না।"

"যদি তাই হয় তো যে ফুল তুমি ফুটিয়েছ তার দিকে মুখ ফেরাচ্ছ কেন ? ওর প্রাণ দু দণ্ডের, কি চিরদিনের তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যৎই দিতে পারে।"

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে বললে, "তুমি কি ভাবছ যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু-পিছু চিরকাল চলতে পারবে ?"

"আমার বিশ্বাস পারব।"

"আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে ?"

"তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"আমি যদি আলেয়া হই! তা হলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে।"

আমার মনে এ কথার কোনো উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বললে, "তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে, আমি বুঝতে পাচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে তোমার মনের কথাই বলছ। সেই

জন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাই নে। তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি, সে কষ্ট আমি তোমাকে দিতে চাই নে; প্রথমত তুমি বিদেশী, তার পর তুমি নিতান্ত অর্বাচীন।"

এতক্ষণে আমরা Oxford Circusএ এসে পৌঁছলুম। আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বললুম, "আমি নিজের মন দিয়ে জানছি যে, তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশি কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও, তা হলে বলো আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সম্ভবত আমার কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যা তার মনকে স্পর্শ করলে। তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে, তার মনে আমার প্রতি একটু মায়া জন্মেছে। সে বললে, "আচ্ছা, তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।"

আমি অমনি আমার পকেট-কেস্ থেকে একখানি কার্ড বার করে তার হাতে দিলুম। তার পর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে, "সঙ্গে নেই।" আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলুম, সে কিছুতেই বলতে রাজি হল না। শেষটা অনেক কাকুতি-মিনতি করবার পর বললে, "তোমার একখানি কার্ড দাও, তায় গায়ে লিখে দিচ্ছি; কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখবে না।"

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য ধরে থাকতে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেস্‌টি আমার হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে, একখানি কার্ড বার করে তার উপর পেন্সিল দিয়ে কি লিখে, আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে, কেস্‌টি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই, পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর লাফিয়ে উঠে সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বললে। দেখতে-না-দেখতে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি Regent Streetএ ঢুকে, প্রথম যে restaurant চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে, এক পাইণ্ট শ্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখতে লাগলুম। দশ মিনিট দশ ঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছটা বাজা, অমনি আমি পকেট-কেস্ খুলে যা দেখলুম, তাতে আমার ভালোবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে

গেল। দেখি কার্ডখানি রয়েছে, গিনি কটি নেই! কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই কটি কথা লেখা ছিল—

"পুরুষমানুষের ভালোবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনো খোঁজ না কর, তা হলে যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করি নি, পুলিস দিয়েও করাই নি। শুনে আশ্চর্য হবে, সেদিন আমার মনে রাগ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল— তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

সোমনাথ এতক্ষণ, যেমন তাঁর অভ্যাস, একটির পর আর একটি সিগারেট অনবরত খেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের সুমুখে ধোঁয়ার একটি ছোটোখাটো মেঘ জমে গিয়েছিল। তিনি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে ছিলেন— এমন ভাবে, যেন সেই ধোঁয়ার ভিতর তিনি কোনো নূতন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। পূর্ব পরিচয়ে আমাদের জানা ছিল যে, সোমনাথকে যখন সবচেয়ে অন্যমনস্ক দেখায় ঠিক তখনি তাঁর মন সব চেয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকে— সে সময়ে একটি কথাও তাঁর কান এড়িয়ে যায় না, একটি জিনিসও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। সোমনাথের চাঁচাছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির dialএর মতো, অর্থাৎ তার ভিতরকার কলটি যখন পুরোদমে চলছে তখনো সে মুখের তিলমাত্র বদল হত না, তার একটি রেখাও বিকৃত হত না। তাঁর এই আত্মসংযমের ভিতর অবশ্য আর্ট ছিল। সীতেশ তাঁর কথা শেষ করতে না করতেই সোমনাথ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। আমরা বুঝলুম সোমনাথ তাঁর মনের ধনুকে ছিলে চড়ালেন, এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে। আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। তিনি ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে বদলি করে দিয়ে অতি মোলায়েম অথচ অতি দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ করলেন। লোকে যেমন করে গানের গলা তৈরি করে, সোমনাথ তেমনি করে কথার গলা তৈরি করেছিলেন— সে কণ্ঠস্বরে কর্কশতা কিম্বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে তাঁর মুখের কথার প্রতি অক্ষর গুণে নেওয়া যেত। আমাদের এ বন্ধুটি সহজ মানুষের মতো সহজভাবে কথাবার্তা কইবার অভ্যাস অতি অল্প বয়সেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গোঁফ না উঠতেই চুল পেকেছিল;

তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন। তাঁর অল্পকথা তিনি বলতেন শানিয়ে, আর বেশি কথা সাজিয়ে। সোমনাথের ভাবগতিক দেখে আমরা একটি লম্বা বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম। অমনি আমাদের চোখ সোমনাথের মুখ থেকে নেমে তাঁর হাতের উপর গিয়ে পড়ল। আমরা জানতুম যে তিনি তাঁর আঙুল কটিকেও তাঁর কথার সঙ্গৎ করতে শিখিয়েছিলেন।

সোমনাথের কথা

তোমরা আমাকে বরাবর ফিলজফার বলে ঠাট্টা করে এসেছ, আমিও অদ্যাবধি সে অপবাদ বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নিয়েছি। রমণী যদি কবিত্বের একমাত্র আধার হয়, আর যে কবি নয় সেই যদি ফিলজফার হয়, তা হলে আমি অবশ্য ফিলজফার হয়েই জন্মগ্রহণ করি। কি কৈশোরে, কি যৌবনে, স্ত্রীজাতির প্রতি আমার মনের কোনোরূপ টান ছিল না। ও জাতি আমার মন কিংবা ইন্দ্রিয় কোনোটিই স্পর্শ করতে পারত না। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন নরমও হত না, শক্তও হত না। আমি ও জাতীয় জীবদের ভালোও বাসতুম না, ভয়ও করতুম না— এক কথায়, ওদের সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান আমাকে পৃথিবীতে আর যে কাজের জন্যই পাঠান, নায়িকা-সাধন করবার জন্য পাঠান নি। কিন্তু নারীর প্রভাব যে সাধারণ লোকের মনের উপর কত বেশি, কত বিস্তৃত, আর কত স্থায়ী, সে বিষয়ে আমার চোখ কান দুই সমান খোলা ছিল। দুনিয়ার লোকের এই স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে ছোটাটা আমার কাছে যেমন লজ্জাকর মনে হত, দুনিয়ার কাব্যের নারীপূজাটাও আমার কাছে তেমনি হাস্যকর মনে হত। যে প্রবৃত্তি পশুপক্ষী গাছপালা ইত্যাদি প্রাণীমাত্রেরই আছে, সেই প্রবৃত্তিটিকে যদি কবিরা সুরে জড়িয়ে উপমায় সাজিয়ে ছন্দে নাচিয়ে, তার মোহিনীশক্তিকে এত বাড়িয়ে না তুলতেন, তা হলে মানুষে তার এত দাস হয়ে পড়ত না। নিজের হাতে-গড়া দেবতার পায়ে মানুষে যখন মাথা ঠেকায়, তখন অভক্ত দর্শকের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। এই eternal feminineএর উপাসনাই তো মানুষের জীবনকে একটা tragi-comedy করে তুলেছে। একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল, এ কথা অবশ্য তোমরা কখনো স্বীকার কর নি। তোমাদের মতে যে

জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালার ভিতর নেই, শুধু মানুষের মনে আছে— অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞান— তাই হচ্ছে এ পূজার যথার্থ মূল। এবং জ্ঞান জিনিসটে অবশ্য মনের ধর্ম, শরীরের নয়। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কখনো একমত হতে পারি নি, তার কারণ রূপ সম্বন্ধে হয় আমি অন্ধ ছিলুম, নয় তোমরা অন্ধ ছিলে।

আমার ধারণা, প্রকৃতির হাতে-গড়া— কি জড় কি প্রাণী, কোনো পদার্থেরই যথার্থ রূপ নেই। প্রকৃতি যে কত বড়ো কারিকর, তাঁর সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ড থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী এমন-কি, উল্কা পর্যন্ত সব এক ছাঁচে ঢালা, সব গোলাকার— তাও আবার পুরোপুরি গোল নয়, সবই ঈষৎ তেড়া-বাঁকা, এখানে-ওখানে চাপা ও চেপ্টা। এ পৃথিবীতে যা-কিছু সর্বাঙ্গসুন্দর, তা মানুষের হাতেই গড়ে উঠেছে। Athensএর Parthenon থেকে আগ্রার তাজমহল পর্যন্ত এই সত্যেরই পরিচয় দেয়। কবিরা বলে থাকেন যে, বিধাতা তাঁদের প্রিয়াদের নির্জনে বসে নির্মাণ করেন। কিন্তু বিধাতা-কর্তৃক এই নির্জনে-নির্মিত কোনো প্রিয়াই রূপে গ্রীকশিল্পীর বাটালিতে-কাটা পাষাণ-মূর্তির সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল বলে, কোনো মর্ত নারীর রূপ দেখে আমার অন্তরে কখনো হৃদ্‌রোগ জন্মায় নি। এ স্বভাব, এ বুদ্ধি নিয়েও আমি জীবনের পথে eternal feminineকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। আমি তাঁকে খুঁজি নি— একেও নয়, অনেকেও নয়— কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁর হাতে আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে, স্ত্রীপুরুষের এই ভালোবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে তা হচ্ছে একটি বিরাট রহস্য— ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাঙলা অর্থেও বটে— অর্থাৎ ভালোবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke।

একবার লণ্ডনে আমি মাসখানেক ধরে ভয়ানক অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন Ilfracombe যেতে। শুনলুম ইংলণ্ডের পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া লোকের চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দেয়, চুলের ভিতর বিলি কেটে দেয়; সে হাওয়ার স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন— ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেই দিনই Ilfracombe যাত্রা করলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনের একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।

আমি যে হোটেলে গিয়ে উঠি, সেটি Ilfracombeএর সব চাইতে বড়ো, সব চাইতে শৌখিন হোটেল। সাহেব-মেমের ভিড়ে সেখানে নড়বার জায়গা ছিল না, পা বাড়ালেই কারো না কারো পা মাড়িয়ে দিতে হত। এ অবস্থায় আমি দিনটে বাইরেই কাটাতুম— তাতে আমার কোনো দুঃখ ছিল না, কেননা তখন বসন্তকাল। প্রাণের স্পর্শে জড়জগৎ যেন হঠাৎ শিহরিত পুলকিত উদ্‌বেজিত হয়ে উঠেছিল। এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্যের ও সৌন্দর্যের কোনো সীমা ছিল না। মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হিরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের-জহরৎ-খচিত গাছপালা— সে পুষ্পরত্নের কোনোটি-বা সাদা, কোনোটি-বা লাল, কোনোটি-বা গোলাপি, কোনোটি-বা বেগুনি। বিলেতে দেখেছি বসন্তের রঙ শুধু জল-স্থল-আকাশের নয়, বাতাসের গায়েও ধরে। প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্ঠবের, রেখার-সুষমার যে অভাব আছে, তা সে এই রঙের বাহারে পুষিয়ে নেয়। এই খোলা আকাশের মধ্যে এই রঙীন প্রকৃতির সঙ্গে আমি দুদিনেই ভাব করে নিলুম। তার সঙ্গই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, মুহূর্তের জন্য কোনো মানব-সঙ্গীর অভাব বোধ করি নি। তিন চার দিন বোধ হয় আমি কোনো মানুষের সঙ্গে একটি কথাও কই নি, কেননা সেখানে আমি জনপ্রাণীকেও চিনতুম না, আর কারো সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করা আমার ধাতে ছিল না।

তার পর একদিন রাত্তিরে ডিনার খেতে যাচ্ছি, এমন সময় বারাণ্ডায় কে একজন আমাকে Good evening বলে সম্বোধন করলে। আমি তাকিয়ে দেখি সুমুখে একটি ভদ্রমহিলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, তার উপর তিনি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। সেই সঙ্গে নজরে পড়ল যে, তাঁর পরনে চক্‌চকে কালো সাটিনের পোশাক, আঙুলে রঙ-বেরঙের নানা আকারের পাথরের আংটি। বুঝলুম যে এঁর আর যে বস্তুরই অভাব থাক্, পয়সার অভাব নেই। ছোটোলোকি বড়োমানুষির এমন চোখে-আঙুল-দেওয়া চেহারা বিলেতে বড়ো-একটা দেখা যায় না। তিনি দু কথায় আমার পরিচয় নিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে অনুরোধ করলেন, আমি ভদ্রতার খাতিরে স্বীকৃত হলুম।

আমরা খানা-কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী

গজেন্দ্রগমনে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম, কেননা হাতে-বহরে স্ত্রীজাতির এ হেন নমুনা সে দেশেও অতি বিরল। মাথায় তিনি সীতেশের সমান উঁচু, শুধু বর্ণে সীতেশ যেমন শ্যাম, তিনি তেমনি শ্বেত— সে সাদার ভিতরে অন্য কোনো রঙের চিহ্নও ছিল না— না গালে, না ঠোঁটে, না চুলে, না ভুরুতে। তাঁর পরনের সাদা কাপড়ের সঙ্গে তাঁর চামড়ার কোনো তফাত করবার জো ছিল না। এই চুনকাম-করা মূর্তিটির গলায় যে একটি মোটা সোনার শিকলি-হার আর দু হাতে তদনুরূপ chain-bracelet ছিল, আমার চোখ ঈষৎ ইতস্তত করে তার উপরে গিয়েই বসে পড়ল। মনে হল যেন ব্রহ্মদেশের কোনো রাজ-অন্তঃপুর থেকে একটি শ্বেতহস্তিনী তার স্বর্ণশৃঙ্খল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে! আমি এই ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে তাঁর অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠতে ভুলে গিয়ে, যেমন বসে ছিলুম তেমনি বসে রইলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাবে থাকতে হল না। আমার নবপরিচিতা প্রৌঢ়া সঙ্গিনীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে, সেই রক্তমাংসের মনুমেণ্টের সঙ্গে এই বলে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন—

"আমার কন্যা Miss Hildesheimer। মিস্টার— ?"

"সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"মিস্টার গ্যাঁগো— গ্যাঁগো— গ্যাঁগো— "

আমার নামের উচ্চারণ ওর চাইতে আর বেশি এগোলো না। আমি শ্রীমতীর করমর্দন করে বসে পড়লুম। এক তাল জেলির উপর হাত পড়লে গা যেমন করে ওঠে, আমার তেমনি করতে লাগল। তার পর ম্যাডাম্ আমার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন, মিস্ চুপ করেই রইলেন। তাঁর কথা বন্ধ ছিল বলে যে তাঁর মুখ বন্ধ ছিল, অবশ্য তা নয়। চর্বণ চোষণ লেহন পান প্রভৃতি দন্ত ওষ্ঠ রসনা কণ্ঠ তালুর আসল কাজ সব সজোরেই চলছিল। মাছ মাংস ফল মিষ্টান্ন, সব জিনিসেই দেখি তাঁর সমান রুচি। যে বিষয়ে আলাপ শুরু হল তাতে যোগদান করবার, আশা করি, তাঁর অধিকার ছিল না।

এই অবসরে আমি যুবতীটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলুম। তাঁর মতো বড়ো চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না— সে চোখ যেমন বড়ো, তেমনি জ'লো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালোবাসায় পড়ে যেত, আর সেন কবিতা লিখতে বসত।

তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ, প্রশান্ত। তোমরা এরকম চোখে মায়া মমতা স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও— কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্ছে পোষা জানোয়ারের ভাব ; গোরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ— তাতে অন্তরের দীপ্তিও নেই, প্রাণের স্ফূর্তিও নেই। এঁর পাশে বসে আমার সমস্ত শরীরের ভিতরে যে অসোয়াস্তি করছিল, তাঁর মার কথা শুনে আমার মনের ভিতর তার চাইতেও বেশি অসোয়াস্তি করতে লাগল। জানো, তিনি আমাকে কেন পাকড়াও করেছিলেন ?— সংস্কৃত-শাস্ত্র ও বেদান্ত-দর্শন আলোচনা করবার জন্য। আমার অপরাধের মধ্যে, আমি যে সংস্কৃত খুব কম জানি, আর বেদান্তের বে দূরে থাক্ আলেফ পর্যন্ত জানি নে— এ কথা একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। ফলে তিনি যখন আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন, তখন আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করলুম। 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ শ্রুতি কি না, গীতার ব্রহ্মনির্বাণ ও বৌদ্ধনির্বাণ এ দুই এক জিনিস কি না— এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নিতান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এ-সব বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত-সমাজে যে বহু এবং বিষম মতভেদ আছে, আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সেই কথাটাই বলছিলুম। আমি যে কি মুশকিলে পড়েছি, তা আমার প্রশ্নকর্ত্রী বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমার পাশের টেবিলের একটি রমণী তা বিলক্ষণ বুঝছিলেন।

সে টেবিলে এই স্ত্রীলোকটি একটি জাঁদরেলি-চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন। সে ভদ্রলোকের মুখের রঙ এত লাল যে দেখলে মনে হয় কে যেন তার সদ্য ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। পুরুষটি যা বলছিলেন, সে-সব কথা তাঁর গোঁফেই আটকে যাচ্ছিল, আমাদের কানে পৌঁছচ্ছিল না। তাঁর সঙ্গিনীও তা কানে তুলছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেননা, স্ত্রীলোকটি যদিচ আমাদের দিকে একবারও মুখ ফেরান নি, তবু তাঁর মুখের ভাব থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আমাদের কথাই কান পেতে শুনছিলেন। যখন আমি কোনো প্রশ্ন শুনে কি উত্তর দেব ভাবছি, তখন দেখি তিনি আহার বন্ধ করে তাঁর সুমুখের প্লেটের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রয়েছেন— আর যেই আমি একটু গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছি, তখনি দেখি তাঁর চোখের কোণে একটু সকৌতুক হাসি দেখা দিচ্ছে। আসলে আমাদের এই আলোচনা শুনে তাঁর

খুব মজা লাগছিল। কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলুম এই ডিনার-ভোগরূপ কর্মভোগ থেকে কখন উদ্ধার পাব। অতঃপর যখন টেবিল ছেড়ে সকলেই উঠলেন, সেই সঙ্গে আমিও উঠে পালাবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে এই বিলাতি ব্রহ্মবাদিনী গার্গী আমাকে বললেন, "তোমার সঙ্গে হিন্দুদর্শনের আলোচনা করে আমি এত আনন্দ আর এত শিক্ষা লাভ করেছি যে তোমাকে আর আমি ছাড়ছি নে। জান, উপনিষদ্ই হচ্ছে আমার মনের ওষুধ ও পথ্য।" আমি মনে মনে বললুম, 'তোমার-যে কোনো ওষুধ-পথ্যির দরকার আছে তা তো তোমার চেহারা দেখে মনে হয় না! সে যাই হোক, তোমার যত খুশি তুমি তত জর্মনীর লেবরেটরিতে তৈরি বেদান্তভস্ম সেবন কর, কিন্তু আমাকে যে কেন তার অনুপান জোগাতে হবে, তা বুঝতে পারছি নে।' তাঁর মুখ চলতেই লাগল। তিনি বললেন, "আমি জর্মনীতে Duessenএর কাছে বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু তুমি যত পণ্ডিতের নাম জান ও যত বিভিন্ন মতের সন্ধান জান, আমার গুরু তার সিকির সিকিও জানেন না। বেদান্ত পড়া তো চিন্তা-রাজ্যের হিমালয়ে চড়া, শংকর তো জ্ঞানের গৌরীশংকর! সেখানে কি শান্তি, কি শৈত্য, কি শুভ্রতা কি উচ্চতা— মনে করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুদর্শন যে যেমন উচ্চ তেমনি বিস্তৃত, এ কথা আমি জানতুম না। চলো, তোমার কাছ থেকে আমি এইসব অচেনা পণ্ডিত, অজানা বইয়ের নাম লিখে নেব।"

এ কথা শুনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হল, কেননা শাস্ত্রে বলে, মিথ্যে কথা— 'শতং বদ মা লিখ'। বলা বাহুল্য যে আমি যত বইয়ের নাম করি তার একটিও নেই, আর যত পণ্ডিতের নাম করি তাঁরা সবাই সশরীরে বর্তমান থাকলেও তার একজনও শাস্ত্রী নন। আমার পরিচিত যত গুরু পুরোহিত দৈবজ্ঞ কুলজ্ঞ আচার্য অগ্রদানী এমন-কি, রাঁধুনি-বামুন পর্যন্ত— আমার প্রসাদে সব মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন! এ অবস্থায় আমি কি করব না ভেবে পেয়ে, ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে অবস্থিতি করছি, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে সেই স্ত্রীলোকটি উঠে, এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "বা! তুমি এখানে! ভালো আছ তো? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। চলো আমার সঙ্গে ড্রয়িং-রুমে, তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। প্রথমেই আমার চোখে

পড়ল যে, এই রমণীটির শরীরের গড়ন ও চলবার ভঙ্গিতে শিকারী-চিতার মতো একটা লিকলিকে ভাব আছে। ইতিমধ্যে আড়-চোখে একবার দেখে নিলুম যে, গার্গী এবং তাঁর কন্যা হাঁ করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন, যেন তাদের মুখের গ্রাস কে কেড়ে নিয়েছে— এবং সে এত ক্ষিপ্রহস্তে যে তাঁরা মুখ বন্ধ করবার অবসর পান নি।

ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করবামাত্র, আমার এই বিপদতারিণী আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বল্‌লেন, "ঘণ্টাখানেক ধরে তোমার উপর যে উৎপীড়ন হচ্ছিল আমার আর তা সহ্য হল না, তাই তোমাকে ঐ জর্মন পশু-দুটির হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। তোমার যে কি বিপদ কেটে গেছে, তা তুমি জান না। মা'র দর্শনের পালা শেষ হলেই মেয়ের কবিত্বের পালা আরম্ভ হত। তুমি ঐসব নেক্‌ড়ার পুতুলদের চেন না। ঐসব স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন তেন প্রকারেণ পুরুষের গললগ্ন হওয়া। পুরুষমানুষ দেখলে ওদের মুখে জল আসে, চোখে তেল আসে— বিশেষত সে যদি দেখতে সুন্দর হয়।"

আমি বললুম, "অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি শেষে যে বিপদের কথা বললে, এ ক্ষেত্রে তার কোনো আশঙ্কা ছিল না।"

"কেন?"

"শুধু ও জাতি নয়, আমি সমগ্র স্ত্রীজাতির হাতের বাইরে।"

"তোমার বয়স কত?"

"চব্বিশ।"

"তুমি বলতে চাও যে, আজ পর্যন্ত কোনো স্ত্রীলোক তোমার চোখে পড়ে নি, তোমার মনে ধরে নি?"

"তাই।"

"মিথ্যে কথা বলাটা যে তুমি একটা আর্ট করে তুলেছ তার প্রমাণ তো এতক্ষণ ধরে পেয়েছি।"

"সে বিপদে প'ড়ে।"

"তবে এই সত্যি যে, একদিনের জন্যেও কেউ তোমার নয়নমন আকর্ষণ করতে পারে নি?"

"হাঁ, এই সত্যি। কেননা, সে নয়ন সে মন একজন চিরদিনের জন্য মুগ্ধ করে রেখেছে।"

"সুন্দরী ?"

"জগতে তার আর তুলনা নেই।"

"তোমার চোখে ?"

"না, যার চোখ আছে, তারই চোখে।"

"তুমি তাকে ভালোবাস ?"

"বাসি।"

"সে তোমাকে ভালোবাসে ?"

"না।"

"কি করে জানলে ?"

"তার ভালোবাসবার ক্ষমতা নেই।"

"কেন ?"

"তার হৃদয় নেই।"

"এ সত্ত্বেও তুমি তাকে ভালোবাস ?"

"এ সত্ত্বেও নয়, এই জন্যেই আমি তাকে ভালোবাসি। অন্যের ভালোবাসাটা একটা উপদ্রব বিশেষ—"

"তার নামধাম জানতে পারি ?"

"অবশ্য। তার ধাম প্যারিস্, আর নাম Venus de Milo."

এই উত্তর শুনে আমার নবসখী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল, তার পরেই হেসে বললে, "তোমাকে কথা কইতে কে শিখিয়েছে ?"

"আমার মন।"

"এ মন কোথা থেকে পেলে ?"

"জন্ম থেকে।"

"এবং তোমার বিশ্বাস, এ মনের আর কোনো বদল হবে না ?"

"এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার আজ পর্যন্ত তো কোনো কারণ ঘটে নি।"

"যদি Venus de Milo বেঁচে ওঠে ?"

"তা হলে আমার মোহ ভেঙে যাবে।"

"আর আমাদের কারো ভিতরটা যদি পাথর হয়ে যায় ?"

এ কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখলুম। আমার statue-দেখা চোখ তাতে পীড়িত বা ব্যথিত হল না। আমি তার

মুখ থেকে আমার চোখ তুলে নিয়ে উত্তর করলুম, "তাহলে হয়তো তার পূজা করব।"

"পূজা নয়, দাসত্ব।"

"আচ্ছা তাই।"

"আগে যদি জানতুম যে তুমি এত বাজেও বকতে পার, তা হলে আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতুম না। যার জীবনের কোনো জ্ঞান নেই, তার দর্শন বকাই উচিত। এখন এসো, মুখ বন্ধ করে আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বসে দাবা খেল।"

এ প্রস্তাব শুনে আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে সে বলল, "আমি যে পথের মধ্যে থেকে তোমাকে লুফে নিয়ে এসেছি, সে মোটেই তোমার উপকারের জন্য নয়। ওর ভিতর আমার স্বার্থ আছে। দাবা খেলা হচ্ছে আমার বাতিক। ও যখন তোমার দেশের খেলা, তখন তুমি নিশ্চয়ই ভালো খেলতে জান, এই মনে করে তোমাকে গ্রেপ্তার করে আনবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।"

আমি উত্তর করলুম, "এর পরেই হয়তো আর-একজন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে, 'এসো আমাকে ভানুমতীর বাজি দেখাও, তুমি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন অবশ্য জাদু জান!'"

সে এ কথার উত্তরে একটু হেসে বললে, "তুমি এমন-কিছু লোভনীয় বস্তু নও যে তোমাকে হস্তগত করবার জন্য হোটেল-সুদ্ধ স্ত্রীলোক উতলা হয়ে উঠেছে! সে যাই হোক, আমার হাত থেকে তোমাকে যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে ভয় তোমার পাবার দরকার নেই। আর যদি তুমি জাদু জান তাহলে ভয় তো আমাদেরই পাবার কথা।"

একবার হিন্দুদর্শন জানি বলে বিষম বিপদে পড়েছিলুম, তাই এবার স্পষ্ট করে বললুম, "দাবা খেলতে আমি জানি নে।"

"শুধু দাবা কেন?— দেখছি পৃথিবীর অনেক খেলাই তুমি জান না। আমি যখন তোমাকে হাতে নিয়েছি, তখন আমি তোমাকে ও-সব শেখাব ও খেলাব।"

এর পর আমরা দুজনে দাবা নিয়ে বসে গেলুম। আমার শিক্ষয়িত্রী কোন্ বলের কি নাম, কার কি চাল, এ-সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিতে শুরু

করলেন। আমি অবশ্য সেসবই জানতুম, তবু অজ্ঞতার ভান করছিলুম, কেননা তাঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার মন্দ লাগছিল না। আমি ইতিপূর্বে এমন একটি রমণীও দেখি নি যিনি পুরুষমানুষের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথাবার্তা কইতে পারেন, যাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের ভিতর কতকটা কৃত্রিমতার আবরণ না থাকে। সাধারণত স্ত্রীলোক— সে যে দেশেরই হোক— আমাদের জাতের সুমুখে মন বে-আব্রু করতে পারে না। এই আমি প্রথম স্ত্রীলোক দেখলুম, যে পুরুষ-বন্ধুর মতো সহজ ও খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে পারে। এর সঙ্গে যে পর্দার আড়াল থেকে আলাপ করতে হচ্ছে না, এতেই আমি খুশি হয়েছিলুম। সুতরাং এই শিক্ষা-ব্যাপারটি একটু লম্বা হওয়াতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না।

মাথা নিচু করে অনর্গল বকে গেলেও আমার সঙ্গিনীটি যে ক্রমান্বয়ে বারান্দার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিল, তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। আমি সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে, তার ডিনারের সাথিটি ঘন ঘন পায়চারি করছেন এবং তাঁর মুখে জলছে চুরোট, আর চোখে রাগ। আমার বন্ধুটিও যে তা লক্ষ্য করছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই— কেননা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে ঐ ভদ্রলোকটি তার মনের উপর একটি চাপের মতো বিরাজ করছেন। সকল বলের গতিবিধির পরিচয় দিতে তার বোধ হয় আধ ঘণ্টা লেগেছিল। তার পরে খেলা শুরু হল। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝলুম যে দাবার বিদ্যে আমাদের দুজনেরই সমান— এক বাজি উঠতে রাত কেটে যাবে। প্রতি চাল দেবার আগে যদি পাঁচ মিনিট করে ভাবতে হয়, তার পর আবার চাল ফিরিয়ে নিতে হয়, তা হলে খেলা যে কতটা এগোয় তা তো বুঝতেই পার। সে যাই হোক, ঘণ্টা-আধেক বাদে সেই জাঁদরেলি-চেহারার সাহেবটি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাদের খেলার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে অতি বিরক্তির স্বরে আমার খেলার সাথিকে সম্বোধন করে বললেন, "তা হলে আমি এখন চললুম।"

সে কথা শুনে স্ত্রীলোকটি দাবার ছকের দিকে চেয়ে, নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করলেন, "এত শিগগির ?"

"শিগগির কি রকম ? রাত এগারোটা বেজে গেছে।"

"তাই নাকি ! তবে যাও, আর দেরি কোরো না— তোমাকে ছ মাইল ঘোড়ায় যেতে হবে।"

"কাল আসছ ?"

"অবশ্য। সে তো কথাই আছে। বেলা দশটার ভিতর গিয়ে পৌছব।"

"কথা ঠিক রাখবে তো ?"

"আমি বাইবেল হাতে করে তোমার কথার জবাব দিতে পারি নে !"

"Goodnight."

"Goodnight."

পুরুষটি চলে গেলেন, আবার কি মনে করে ফিরে এলেন। একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "কবে থেকে তুমি দাবা খেলার এত ভক্ত হলে ?" উত্তর এল "আজ থেকে।" এর পরে সেই সাহেবপুঙ্গবটি "হু" এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে ঘর থেকে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

আমার সঙ্গিনী অমনি দাবার ঘরটি উল্টে ফেলে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন। মনে হল পিয়ানোর সব চাইতে উঁচু সপ্তকের উপর কে যেন অতি হালকাভাবে আঙুল বুলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার মুখ-চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার ভিতর থেকে যেন একটি প্রাণের ফোয়ারা উছলে পড়ে আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাতির আলো সব হেসে উঠল। ফুলদানের কাটা-ফুল সব টাটকা হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমার মনের যন্ত্রও এক সুর চড়ে গেল।

"তোমার সঙ্গে দাবা খেলবার অর্থ এখন বুঝলে ?"

"না।"

"ঐ ব্যক্তির হাত এড়াবার জন্য। নইলে আমি দাবা খেলতে বসি ? ওর মতো নির্বুদ্ধির খেলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। Georgeএর মতো লোকের সঙ্গে সকাল-সন্ধে একত্র থাকলে শরীর-মন একদম ঝিমিয়ে পড়ে। ওদের কথা শোনা আর আফিং খাওয়া, একই কথা।"

"কেন ?"

"ওদের সব বিষয়ে মত আছে, অথচ কোনো বিষয়ে মন নেই। ও জাতের লোকের ভিতর সার আছে, কিন্তু রস নেই। ওরা স্ত্রীলোকের স্বামী হবার যেমন উপযুক্ত, সঙ্গী হবার তেমনি অনুপযুক্ত।"

"কথাটা ঠিক বুঝলুম না। স্বামীই তো স্ত্রীর চিরদিনের সঙ্গী।"

"চিরদিনের হলেও একদিনেরও নয়— এমন হতে পারে এবং হয়েও থাকে।"

"তবে কি গুণে তারা স্বামী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে?"

"ওদের শরীর ও চরিত্র দুয়েরই ভিতর এতটা জোর আছে যে, ওরা জীবনের ভার অবলীলাক্রমে বহন করতে পারে। ওদের প্রকৃতি ঠিক তোমাদের উল্টো। ওরা ভাবে না— কাজ করে। এক কথায় ওরা হচ্ছে সমাজের স্তম্ভ, তোমাদের মতো ঘর সাজাবার ছবি কি পুতুল নয়।"

"হতে পারে এক দলের লোকের বাইরেটা পাথর আর ভিতরটা সীসে দিয়ে গড়া, আর তারাই হচ্ছে আসল মানুষ— কিন্তু তুমি এই দুদণ্ডের পরিচয়ে আমার স্বভাব চিনে নিয়েছ?"

"অবশ্য আমার চোখের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ তো দেখতে পাবে যে তার ভিতর এমন একটি আলো আছে যাতে মানুষের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়।"

আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, সে চোখ দুটি লউসনিয়া দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জান? একরকম রত্ন ইংরেজিতে যাকে বলে cat's eye— তার উপর আলোর 'সুত' পড়ে, আর প্রতিমুহূর্তে তার রঙ বদলে যায়। আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম। ভয় হল সে আলো পাছে সত্যি সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে বুকের ভিতর প্রবেশ করে।

"এখন বিশ্বাস করছ যে আমার দৃষ্টি মর্মভেদী?"

"বিশ্বাস করি আর না করি, স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই।"

"শুনতে চাও তোমার সঙ্গে Georgeএর আসল তফাতটা কোথায়?"

"পরের মনের আয়নায় নিজের মনের ছবি কি রকম দেখায় তা বোধ হয় মানুষমাত্রেই জানতে চায়।"

"একটি উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। George হচ্ছে দাবার নৌকা, আর তুমি গজ। ও একরোখে সিধে পথেই চলতে চায়, আর তুমি কোণাকুণি।"

"এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি তোমাদের হাতে খেলে ভালো?"

"আমাদের কাছে ও দুইই সমান। আমরা স্কন্ধে ভর করলে দুয়েরই চাল বদলে যায়। উভয়েই এঁকেবেঁকে আড়াই পায়ে চলতে বাধ্য হয়।"

"পুরুষমানুষকে ওরকম ব্যতিব্যস্ত করে তোমরা কী সুখ পাও।"

এ কথা শুনে সে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললে, "তুমি তো আমার Father

Confessor নও যে মন খুলে তোমার কাছে আমার সব সুখদুঃখের কথা বলতে হবে! তুমি যদি আমাকে ও ভাবে জেরা করতে শুরু কর, তা হলে এখনই আমি উঠে চলে যাব।" এই বলে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে।

আমার রূঢ় কথা শোনা অভ্যাস ছিল না, তাই আমি অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করলুম, "তুমি যদি চলে যেতে চাও তো আমি তোমাকে থাকতে অনুরোধ করব না। ভুলে যেও না যে আমি তোমাকে ধরে রাখি নি।"

এ কথার পর মিনিটখানেক চুপ করে থেকে সে অতি বিনীত ও নম্র -ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার উপর রাগ করেছ?"

আমি একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করলুম, "না। রাগ করবার তো কোনো কারণ নেই।"

"তবে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?"

"এতক্ষণ এই বন্ধ ঘরে গ্যাসের বাতির নীচে বসে আমার মাথা ধরেছে"— এই মিথ্যে কথা আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে গেল।

এর উত্তরে "দেখি তোমার জ্বর হয়েছে কি না" এই কথা বলে সে আমার কপালে হাত দিলে। সে স্পর্শের ভিতর তার আঙুলের ডগার একটু সসংকোচ আদরের ইশারা ছিল। মিনিটখানেক পরে সে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, "তোমার মাথা একটু গরম হয়েছে, কিন্তু ও জ্বর নয়। চলো বাইরে গিয়ে বসবে, তা হলেই ভালো হয়ে যাবে।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। তোমরা যদি বল যে সে আমাকে mesmerise করেছিল, তা হলে আমি সে কথার প্রতিবাদ করব না।

বাইরে গিয়ে দেখি সেখানে জনমানব নেই— যদিও রাত তখন সাড়ে এগারোটা, তবু সকলে শুতে গিয়েছে। বুঝলুম Ilfracombe সত্যসত্যই ঘুমের রাজ্য। আমরা দুজনে দুখানি বেতের চেয়ারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দেখি, আকাশ আর সমুদ্র দুই এক হয়ে গেছে— দুইই স্লেটের রঙ। আর আকাশে যেমন তারা জ্বলছে, সমুদ্রের গায়ে তেমনি যেখানে যেখানে আলো পড়ছে সেখানেই তারা ফুটে উঠছে, এখানে ওখানে সব জলের টুকরো টাকার মতো চক্‌চক্ করছে, পারার মতো টল্‌মল্ করছে। গাছপালার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন স্থানে স্থানে অন্ধকার

জমাট হয়ে গিয়েছে। তখন সসাগরা বসুন্ধরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছিল। এই নিস্তব্ধ নিশীথের নিবিড় শান্তি আমার সঙ্গিনীটির হৃদয়মন স্পর্শ করেছিল— কেননা সে কতক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্নভাবে বসে রইল। আমিও চুপ করে রইলুম। তার পর সে চোখ বুজে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার দেশে যোগী বলে একদল লোক আছে যারা কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করে না, আর সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যায়?"

"বনে যায়, এ কথা সত্য।"

"আর সেখানে আহারনিদ্রা ত্যাগ করে অহর্নিশি জপতপ করে?"

"এই রকম তো শুনতে পাই।"

"আর তার ফলে যত তাদের দেহের ক্ষয় হয়, তত তাদের মনের শক্তি বাড়ে— যত তাদের বাইরেটা স্থির শান্ত হয়ে আসে, তত তাদের অন্তরের তেজ ফুটে ওঠে?"

"তা হলেও হতে পারে।"

"হতে পারে বলছ কেন? শুনেছি তোমরা বিশ্বাস কর যে, এদের দেহমনে এমন অলৌকিক শক্তি জন্মায় যে, এইসব মুক্ত জীবের স্পর্শে এবং কথায় মানুষের শরীরমনের সকল অসুখ সেরে যায়।"

"ওসব মেয়েলি বিশ্বাস।"

"তোমার নয় কেন?"

"আমি যা জানি নে তা বিশ্বাস করি নে। আমি এর সত্যি-মিথ্যে কি করে জানব? আমি তো আর যোগ অভ্যাস করি নি।"

"আমি ভেবেছিলুম তুমি করেছ।"

"এ অদ্ভুত ধারণা তোমার কিসের থেকে হল?"

"ঐ জিতেন্দ্রিয় পুরুষদের মতো তোমার মুখে একটা শীর্ণ ও চোখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব আছে।"

"তার কারণ অনিদ্রা।"

"আর অনাহার। তোমার চোখে মনের অনিদ্রা ও হৃদয়ের উপবাস— এ দুয়েরই লক্ষণ আছে। তোমার মুখের ঐ ছাইচাপা আগুনের চেহারা প্রথমেই আমার চোখে পড়ে। একটা অদ্ভুত কিছু দেখলে মানুষের চোখ সহজেই তার দিকে যায়, তার বিষয় সবিশেষ জানবার জন্য মন লালায়িত হয়ে ওঠে।

Georgeএর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য যে তোমার আশ্রয় নিই, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ; তোমাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখবার জন্যই আমি তোমার কাছে আসি।"

"আমার তপোভঙ্গ করবার জন্য ?"

"তুমি যেদিন St. Anthony হয়ে উঠবে, আমিও সেদিন স্বর্গের অপ্সরা হয়ে দাঁড়াব। ইতিমধ্যে তোমার ঐ গেরুয়া রঙের মিনে-করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে, তাই জানবার জন্য আমার কৌতূহল হয়েছিল।"

"কি ধাতু আবিষ্কার করলে শুনতে পারি ?"

"আমি জানি তুমি কি শুনতে চাও।"

"তা হলে তুমি আমার মনের সেই কথা জান, যা আমি জানি নে।"

"অবশ্য। তুমি চাও আমি বলি চুম্বক।"

কথাটি শোনবামাত্র আমার জ্ঞান হল যে, এ উত্তর শুনলে আমি খুশি হতুম, যদি তা বিশ্বাস করতুম। এই নব আকাঙ্ক্ষা সে আমার মনের ভিতর আবিষ্কার করলে, কি নির্মাণ করলে, তা আমি আজও জানি নে। আমি মনে মনে উত্তর খুঁজছি, এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কটা বেজেছে ?"

আমি ঘড়ি দেখে বললুম, "বারোটা।"

বারোটা শুনে সে লাফিয়ে উঠে বললে, "উঃ! এত রাত হয়ে গেছে! তুমি মানুষকে এত বকাতেও পার! যাই, শুতে যাই। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, তাও আবার দশটার ভিতর পৌঁছতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"একটা শিকারে। কেন, তুমি কি জান না? তোমার সুমুখেই তো Georgeএর সঙ্গে কথা হল।"

"তা হলে সে কথা তুমি রাখবে ?"

"তোমার কিসে মনে হল যে রাখব না ?"

"তুমি যে ভাবে তার উত্তর দিলে।"

"সে শুধু Georgeকে একটু নিগ্রহ করবার জন্য। আজ রাত্তিরে ওর ঘুম হবে না, আর জানই তো ওদের পক্ষে জেগে থাকা কত কষ্ট !"

"তোমার দেখছি বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনুগ্রহ অতি বেশি।"

"অবশ্য। Georgeএর মতো পুরুষমানুষের মনকে মাঝে মাঝে একটু

উস্‌কে না দিলে তা সহজেই নিভে যায়। আর, তা ছাড়া ওদের মনে খোঁচা মায়ার ভিতর বেশি কিছু নিষ্টুরতাও নেই। ওদের মনে কেউ বেশি কষ্ট দিতে পারে না, ওরাও এক প্রহার দেওয়া ছাড়া স্ত্রীলোককে অন্য কোনো কষ্ট দিতে পারে না। সেই জন্যেই তো ওরা আদর্শ স্বামী হয়। মন নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি, সে তোমার মতো লোকেই করে।"

"তোমার কথা আমার হেঁয়ালির মতো লাগছে—"

"যদি হেঁয়ালি হয় তো তাই হোক। তোমার জন্যে আমি আর তার ব্যাখ্যা করতে পারি নে। আমার যেমন শ্রান্ত মনে হচ্ছে, তেমনি ঘুম পাচ্ছে। তোমার ঘর উপরে?"

"হাঁ।"

"তবে এখন ওঠো, উপরে যাওয়া যাক।"

আমরা দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলুম।

করিডোরে পৌছবামাত্র সে বললে, "ভালো কথা, তোমার একখানা কার্ড আমাকে দেও।"

আমি কার্ডখানি দিলুম। সে আমার নাম পড়ে বললে, "তোমাকে আমি 'সু' বলে ডাকব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব?"

উত্তর— "যা খুশি একটা-কিছু বানিয়ে নেও-না। ভালো কথা, আজ তোমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি, তাতে তোমার আমাকে saviour বলে ডাকা উচিত।"

"তথাস্তু।"

"তোমার ভাষায় ওর নাম কি?"

"আমার দেশে বিপন্নকে যিনি উদ্ধার করেন, তিনি দেব নন— দেবী। তাঁর নাম 'তারিণী'।"

"বাঃ, দিব্যি নাম তো! ওর 'তা'টি বাদ দিয়ে আমাকে 'রিণী' বলে ডেকো।"

এই কথাবার্তা কইতে কইতে আমরা সিঁড়িতে উঠছিলুম। একটা গ্যাসের বাতির কাছে আসবামাত্র সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার হাতের দিকে চেয়ে বললে, "দেখি, দেখি তোমার হাতে কি হয়েছে?"

অমনি নিজের হাতের দিকে আমার চোখ পড়ল, দেখি হাতটি লাল টক্ টক্ করছে, যেন কে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। সে আমার ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কার বুকের রক্তে হাত ছুপিয়েছ— অবশ্য Venus de Milo-র নয় ?"

"না, নিজের।"

"এতক্ষণ পরে একটি সত্য কথা বলেছ, আশা করি এ রঙ পাকা। কেননা যেদিন এ রঙ ছুটে যাবে সেদিন জেনো তোমার সঙ্গে আমার ভাবও চটে যাবে। যাও, এখন শোও-গে। ভালো করে ঘুমিয়ো, আর আমার বিষয় স্বপ্ন দেখো।"

এই কথা বলে সে দু লাফে অন্তর্ধান হল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে আরসিতে নিজের চেহারা দেখে চমকে গেলুম। এক বোতল শ্যাম্পেন খেলে মানুষের যেরকম চেহারা হয়, আমার ঠিক সেই রকম হয়েছিল। দেখি দুই-গালে রক্ত দেখা দিয়েছে, আর চোখের তারা দুটি শুধু জ্বল জ্বল করছে— বাকি অংশ ছল্ ছল্ করছে। সে সময় আমার নিজের চেহারা আমার চোখে বড়ো সুন্দর লেগেছিল। আমি অবশ্য তাকে স্বপ্নে দেখি নি— কেননা সে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় নি।

২

সে রাত্তিরে আমরা দুজনে যে জীবন-নাটকের অভিনয় শুরু করি, বছরখানেক পরে আর-এক রাত্তিরে তার শেষ হয়। আমি প্রথম দিনের সব ঘটনা তোমাদের বলেছি, আর শেষ দিনের বলব— কেননা এ দুদিনের সকল কথা আমার মনে আজও গাঁথা রয়েছে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যা ঘটেছিল সেসব আমার মনের ভিতর-- বাইরে নয়। যে ব্যাপারে বাহ্যঘটনার বৈচিত্র্য নেই, তার কাহিনী বলা যায় না। আমার মনের সে বৎসরের ডাক্তারি-ডায়ারি যখন আমি নিজেই পড়তে ভয় পাই তখন তোমাদের তা পড়ে শোনাবার আমার তিলমাত্রও অভিপ্রায় নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার মনের অদৃশ্য তারগুলি মিনী তার দশ আঙুলে এমনি করে ধরে সে-মনকে পুতুল নাচিয়েছিল। আমার অন্তরে সে যে-প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল তাকে ভালোবাসা বলে কি না জানি নে ;

এইমাত্র জানি যে, সে মনোভাবের ভিতর অহংকার ছিল, অভিমান ছিল, রাগ ছিল, জেদ ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল করুণ, মধুর, দাস্য ও সখ্য এই চারটি হৃদয়রস।— এর মধ্যে যা লেশমাত্রও ছিল না, সে হচ্ছে দেহের নাম কি গন্ধ। আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দাগুলির উপর সে তার আঙুল চালিয়ে যখন যেমন ইচ্ছে তখন তেমনি সুর বার করতে পারত। তার আঙুলের টিপে সে সুর কখনো-বা অতি-কোমল, কখনও-বা অতি-তীব্র হত।

একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া। তাকে ধরতে যাও সে পালিয়ে যাবে, আর তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। আমি বারো মাস ধরে এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশি লুকোচুরি খেলেছিলুম। এ খেলার ভিতর কোনো সুখ ছিল না। অথচ এ খেলা সাঙ্গ করবার শক্তিও আমার ছিল না। অনিদ্রাগ্রস্ত লোক যেমন যত বেশি ঘুমোতে চেষ্টা করে তত বেশি জেগে ওঠে— আমিও তেমনি যত বেশি এই খেলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতুম তত বেশি জড়িয়ে পড়তুম। সত্য কথা বলতে গেলে, এ খেলা বন্ধ করবার জন্য আমার আগ্রহও ছিল না— কেননা আমার মনের এই নব অশান্তির মধ্যে নবজীবনের তীব্র স্বাদ ছিল।

আমি যে শত চেষ্টাতেও রিণীর মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারি নি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই— কেননা আকাশ-বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতরে চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতোই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ; কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি, আর-এক দিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু বালিকা যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোটো ছেলের মতো ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টানত, চুল ধরে টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত। আবার কখনো-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, যেন আপন মনে, নিজের ছেলেবেলাকার গল্প করে যেত। তাকে কে কবে বকেছে, কে কবে আদর করেছে, সে কবে কি পড়েছে, কবে কি প্রাইজ পেয়েছে, কবে বনভোজন করেছে, কবে ঘোড়া থেকে পড়েছে; যখন সে এইসকলের খুঁটিয়ে বর্ণনা করত তখন একটি বালিকা-মনের স্পষ্ট ছবি দেখতে পেতুম। সে ছবির

রেখাগুলি যেমন সরল, তার বর্ণও তেমনি উজ্জ্বল। তার পর সে ছিল গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিক। একটি আব্‌লুশকাঠের ক্রুশে-আঁটা রুপোর ক্রাইস্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুল্‌ত, এক মুহূর্তের জন্যও সে তা স্থানান্তরিত করে নি। সে যখন তার ধর্মের বিষয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করত তখন মনে হত তার বয়েস আশি বৎসর। সে সময়ে তার সরল বিশ্বাসের সুমুখে আমার দার্শনিক বুদ্ধি মাথা হেঁট করে থাকত। কিন্তু আসলে সে ছিল পূর্ণ যুবতী— যদি যৌবনের অর্থ হয় প্রাণের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। তার সকল মনোভাব, সকল ব্যবহার, সকল কথার ভিতর এমন-একটি প্রাণের জোয়ার বইত যার তোড়ে আমার অন্তরাত্মা অবিশ্রান্ত তোলপাড় করত। আমরা মাসে দশ বার করে ঝগড়া করতুম, আর ঈশ্বরসাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করতুম যে, জীবনে আর কখনো পরস্পরের মুখ দেখব না। কিন্তু দুদিন না যেতেই, হয় আমি তার কাছে ছুটে যেতুম, নয় সে আমার কাছে ছুটে আসত। তখন আমরা আগের কথা সব ভুলে যেতুম— সেই পুনর্মিলন আবার আমাদের প্রথম-মিলন হয়ে উঠত। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছিল। আমাদের শেষ ঝগড়াটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছিল। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম যে, সে আমার মনের সর্বপ্রধান দুর্বলতাটি আবিষ্কার করেছিল··· তার নাম jealousy। যে মনের আগুনে মানুষ জলে-পুড়ে মরে, রিণী সে আগুন জ্বালাবার মন্ত্র জানত। আমি পৃথিবীতে বহুলোককে অবজ্ঞা করে এসেছি, কিন্তু ইতিপূর্বে কাউকে কখনো হিংসা করি নি। বিশেষত Georgeএর মতো লোককে হিংসা করার চাইতে আমার মতো লোকের পক্ষে বেশি কি হীনতা হতে পারে? কারণ, আমার যা ছিল তা হচ্ছে টাকার জোর আর গায়ের জোর। কিন্তু রিণী আমাকে এ হীনতাও স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। তার শেষবারের ব্যবহার আমার কাছে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অপমানজনক মনে হয়েছিল। নিজের মনের দুর্বলতার স্পষ্ট পরিচয় পাবার মতো কষ্টকর জিনিস মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।

ভয় যেমন মানুষকে দুঃসাহসিক করে তোলে, আমার ঐ দুর্বলতাই তেমনি আমার মনকে এত শক্ত করে তুলেছিল যে, আমি আর কখনো তার মুখদর্শন করতুম না— যদি না সে আমাকে চিঠি লিখত। সে চিঠির প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে, সে চিঠি এই—

"তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয় তখন দেখেছিলুম যে তোমার শরীর ভেঙে পড়ছে— আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একটা change নিতান্ত আবশ্যক। আমি যেখানে আছি সেখানকার হাওয়া মরা মনুষকে বাঁচিয়ে তোলে। এ জায়গাটা একটি অতি ছোটো পল্লীগ্রাম। এখানে তোমার থাকবার মতো কোনো স্থান নেই। কিন্তু এর ঠিক পরের স্টেশনটিতে অনেক ভালো ভালো হোটেল আছে। আমার ইচ্ছে তুমি কালই লণ্ডন ছেড়ে সেখানে যাও। এখন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি— আর দেরি করলে এমন চমৎকার সময় আর পাবে না। যদি হাতে টাকা না থাকে, আমাকে টেলিগ্রাম কোরো, আমি পাঠিয়ে দেব। পরে সুদসুদ্ধ তা শুধে দিয়ো।"

আমি চিঠির কোনো উত্তর দিলুম না, কিন্তু পরদিন সকালের ট্রেনেই লণ্ডন ছাড়লুম। আমি কোনো কারণে তোমাদের কাছে সে জায়গার নাম করব না। এই পর্যন্ত বলে রাখি, রিণী যেখানে ছিল তার নামের প্রথম অক্ষর B, এবং তার পরের স্টেশনের নামের প্রথম অক্ষর W।

ট্রেন যখন B স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দুটো। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম রিণী প্লাটফর্মে নেই। তার পর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, প্লাটফর্মের রেলিংয়ের ওপারে রাস্তার ধারে একটি গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে যে কেন আমি তাকে দেখতে পাই নি তাই ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেলুম, কেননা সে যে রঙের কাপড় পরেছিল তা আধক্রোশ দূর থেকে মানুষের চোখে পড়ে— একটি মিস্‌মিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগ্‌ডগে হলদে জ্যাকেট। সেদিনকে রিণী এক অপ্রত্যাশিত নতুন মূর্তিতে— আমাদের দেশের নববধূর মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। এই বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে গড়া রমণীর মুখে আমি পূর্বে কখনো লজ্জার চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই নি; কিন্তু সেদিন তার মুখে যে হাসি ঈষৎ ফুটে উঠেছিল সে লজ্জার রক্তিম হাসি। সে চোখ তুলে আমার দিকে ভালো করে চাইতে পারছিল না। তার মুখখানি এত মিষ্টি দেখাচ্ছিল যে আমি চোখ ভরে প্রাণ ভরে তাই দেখতে লাগলুম। আমি যদি কখনো তাকে ভালোবেসে থাকি তো সেইদিন সেই মুহূর্তে। মানুষের সমস্ত মনটা যে এক মুহূর্তে এমন রঙ ধরে উঠতে পারে, এ সত্যের পরিচয় আমি সেইদিন প্রথম পাই।

ট্রেন B স্টেশনে বোধ হয় মিনিটখানেকের বেশি থামে নি, কিন্তু সেই এক

মিনিট আমার কাছে অনন্তকাল হয়েছিল। তার মিনিট-পাঁচেক পরে ট্রেন W স্টেশনে পৌঁছল। আমি সমুদ্রের ধারে একটি বড়ো হোটেলে গিয়ে উঠলুম। কেন জানি নে হোটেলে পৌঁছেই আমার অগাধ শ্রান্তি বোধ হতে লাগল। আমি কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। এই একটি মাত্র দিন যখন আমি বিলেতে দিবানিদ্রা দিয়েছি, আর এমন ঘুম আমি জীবনে কখনো ঘুমোই নি। জেগে উঠে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নীচে এসে চা খেয়ে পদব্রজে Bর অভিমুখে যাত্রা করলুম। যখন সে গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলুম তখন প্রায় সাতটা বাজে ; তখনো আকাশে যথেষ্ট আলো ছিল। বিলেতে, জানই তো, গ্রীষ্মকালের রাত্তির দিনের জের টেনে নিয়ে আসে ; সূর্য অস্ত গেলেও, তার পশ্চিম-আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত্তিরের গায়ে জড়িয়ে থাকে। রিণী কোন্ পাড়ায় কোন্ বাড়িতে থাকে তা আমি জানতুম না, কিন্তু আমি এটা জানতুম যে, W থেকে B যাবার রাস্তায় কোথায়ও তার দেখা পাব।

Bর সীমাতে পা দেবামাত্রই দেখি একটি স্ত্রীলোক একটু উতলাভাবে রাস্তায় পায়চারি করছে। দূর থেকে তাকে চিনতে পারি নি, কেননা ইতিমধ্যে রিণী তার পোশাক বদলে ফেলেছিল। সে কাপড়ের রঙের নাম জানি নে, এই পর্যন্ত বলতে পারি যে সেই সন্ধের আলোর সঙ্গে সে এক হয়ে গিয়েছিল— সে রঙ যেন গোধূলিতে ছোপানো।

আমাকে দেখবামাত্র রিণী আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে সেই দিকে এগোতে লাগলুম। আমি জানতুম যে, সে এই গাছপালার ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে— সহজে ধরা দেবে না। একটু খুঁজে-পেতে তাকে বার করতে হবে। আমি অবশ্য তার এ ব্যবহারে আশ্চর্য হয়ে যাই নি, কেননা এতদিনে আমার শিক্ষা হয়েছিল যে, কখন কি ব্যবহার করবে তা অপরের জানা দূরে থাক্ সে নিজেই জানত না। আমি একটু এগিয়ে দেখি ডান দিকে বনের ভিতর একটি গলি-রাস্তার ধারে একটি ওক গাছের আড়ালে রিণী দাঁড়িয়ে আছে— এমন ভাবে যাতে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরা আলো তার মুখের উপর এসে পড়ে। আমি অতি সন্তর্পণে তার দিকে এগোতে লাগলুম, সে চিত্রপুত্তলিকার মতো দাঁড়িয়েই রইল। তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণী-

মূর্তির মতো দেখাচ্ছিল— সে মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন। আমি কাছে যাবামাত্র সে দুহাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলে। আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। দুজনের কারো মুখে কথা নেই।

কতক্ষণ এ ভাবে গেল জানি নে। তার পর প্রথমে কথা অবশ্য রিণীই কইলে— কেননা সে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারত না— বিশেষত আমার কাছে। তার কথার স্বরে ঝগড়ার পূর্বাভাস ছিল। প্রথম সম্ভাষণ হল এই— "তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই নে, তোমার মুখ দেখতে চাই নে।"

"আমার অপরাধ ?"

"তুমি এখানে কেন এলে ?"

"তুমি আসতে লিখেছ বলে।"

"সেদিন আমার বড়ো মন খারাপ ছিল। বড়ো একা একা মনে হচ্ছিল বলে ঐ চিঠি লিখি। কিন্তু কখনো মনে করি নি তুমি চিঠি পাবামাত্র ছুটে এখানে চলে আসবে। তুমি জান যে, মা যদি টের পান যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই, তা হলে আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে ?"

ইয়ারকি শব্দটি আমার কানে খট্ করে লাগল, আমি ঈষৎ বিরক্তভাবে বললুম, "তোমার মুখেই তা শুনেছি। তার সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও তুমি ভাব নি যে আমি আসব ?"

"স্বপ্নেও না।"

"তা হলে ট্রেন আসবার সময় কার খোঁজে স্টেশনে গিয়েছিলে ?"

"কারো খোঁজে নয়। চিঠি ডাকে দিতে।"

"তা হলে ওরকম কাপড় পরেছিলে কেন, যা আধক্রোশ দূর থেকে কানা লোকেরও চোখে পড়ে ?"

"তোমার সুনজরে পড়বার জন্য।"

"সু হোক, কু হোক, আমার নজরেই পড়বার জন্য।"

"তোমার বিশ্বাস তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি নে ?"

"তা কি করে বলব ! এই তো এতক্ষণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছ।"

"সে চোখে আলো সইছে না বলে। আমার চোখে অসুখ করেছে।"

"দেখি কি হয়েছে", এই বলে আমি আমার হাত দিয়ে তার মুখ থেকে তার হাত-দুখানি তুলে নেবার চেষ্টা করলুম। রিণী বললে, "তুমি হাত সরিয়ে নেও, নইলে আমি চোখ খুলব না। আর তুমি জানো যে জোরে তুমি আমার সঙ্গে পারবে না।"

"আমি জানি যে আমি George নই। গায়ের জোরে আমি কারো চোখ খোলাতে পারব না।"

এ কথা শুনে রিণী মুখ থেকে হাত নামিয়ে 'নিয়ে মহা উত্তেজিত ভাবে বললে, "আমার চোখ খোলাবার জন্য কারো ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমি তো আর তোমার মতো অন্ধ নই! তোমার যদি কারো ভিতরটা দেখবার শক্তি থাকত তা হলে তুমি আমাকে যখন-তখন এত অস্থির করে তুলতে না। জানো, আমি কেন রাগ করেছিলুম? তোমার ঐ কাপড় দেখে। তোমাকে ও কাপড়ে আজ দেখব না বলে আমি চোখ বন্ধ করেছিলুম।"

"কেন, এ কাপড়ের কি দোষ হয়েছে? এটি তো আমার সব চাইতে সুন্দর পোশাক।"

"দোষ এই যে, এ সে কাপড় নয় যে কাপড়ে আমি তোমাকে প্রথম দেখি।"

এ কথা শোনবামাত্র আমার মনে পড়ে গেল যে রিণী সেই কাপড় পরে আছে, যে কাপড়ে আমি প্রথম তাকে Ilfracombeএ দেখি। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বললুম, "এ কথা আমার মনে হয় নি যে, আমরা পুরুষমানুষ কি পরি না পরি তাতে তোমাদের কিছু যায় আসে।"

"না, আমরা তো আর মানুষ নই, আমাদের তো আর চোখ নেই! তোমার হয়তো বিশ্বাস যে তোমরা সুন্দর হও, কুৎসিত হও, তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না।"

"আমার তো তাই বিশ্বাস।"

"তবে কিসের টানে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াও?"

"রূপের?"

"অবশ্য। তুমি হয়তো ভাব, তোমার কথা শুনে আমি মোহিত হয়েছি। স্বীকার করি তোমার কথা শুনতে আমার অত্যন্ত ভালো লাগে— শুধু তা নয়, নেশাও ধরে। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শোনবার আগে যে কুক্ষণে আমি তোমাকে দেখি, সেই ক্ষণে আমি বুঝেছিলুম যে, আমার জীবনে একটি নূতন

জ্বালার সৃষ্টি হল— আমি চাই আর না-চাই, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের চিরসংঘর্ষ থেকেই যাবে।”

“এসব কথা তো এর আগে তুমি কখনো বল নি।”

“ও কানে শোনবার কথা নয়, চোখে দেখবার জিনিস। সাধে কি তোমাকে আমি অন্ধ বলি? এখন শুনলে তো? এসো সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। আজকে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।”

যে পথ ধরে চললুম সে পথটি যেমন সরু, দুপাশের বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় তেমনি অন্ধকার। আমি পদে পদে হোঁচট খেতে লাগলুম। রিণী বললে, “আমি পথ চিনি, তুমি আমার হাত ধরো, আমি তোমাকে নিরাপদে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে দেব।”

আমি তার হাত ধরে নীরবে সেই অন্ধকার পথে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমি অনুমানে বুঝলুম যে, এই নির্জন অন্ধকারের প্রভাব তার মনকে শান্ত বশীভূত করে আনছে। কিছুক্ষণ পর প্রমাণ পেলুম যে আমার অনুমান ঠিক।

মিনিট-দশেক পরে রিণী বললে, “সু, তুমি জান যে তোমার হাত তোমার মুখের চাইতে ঢের বেশি সত্যবাদী?”

“তার অর্থ?”

“তার অর্থ, তুমি মুখে যা চেপে রাখ, তোমার হাতে তা ধরা পড়ে।”

“সে বস্তু কি?”

“তোমার হৃদয়।”

“তার পর?”

“তার পর, তোমার রক্তের ভিতর যে বিদ্যুৎ আছে, তোমার আঙুলের মুখ দিয়ে তা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। তার স্পর্শে সে বিদ্যুৎ সমস্ত শরীরে চারিয়ে যায়, শিরের ভিতর গিয়ে রি রি করে।”

“রিণী, তুমি আমাকে আজ এসব কথা এত করে বলছ কেন? এতে আমার মন ভুলবে না, শুধু অহংকার বাড়বে।— আমার অহংকারের নেশা এমনি যথেষ্ট আছে, তার আর মাত্রা চড়িয়ে তোমার কি লাভ?”

“সু, যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে তা তোমার দেহের কি মনের আমি জানি নে। তোমার মন ও চরিত্রের কতক অংশ অতি স্পষ্ট, আর কতক অংশ অতি অস্পষ্ট। তোমার মুখের উপর তোমার ঐ মনের ছাপ

আছে। এই আলো-ছায়ায়-আঁকা ছবিই আমার চোখে এত সুন্দর লাগে, আমার মনকে এত টানে। সে যাই হোক, আজ আমি তোমাকে শুধু সত্য কথা বলছি ও বলব, যদিও তোমার অহংকারের মাত্রা বাড়ানোতে আমার ক্ষতি বৈ লাভ নেই।"

"কি ক্ষতি?"

"তুমি জান আর না-জান, আমি জানি যে তুমি আমার উপর যত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ, তার মূলে তোমার অহং ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"

"নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করেছি!"

"হাঁ তুমি। আগের কথা ছেড়ে দাও— এই এক মাস তুমি জান যে আমার কি কষ্টে কেটেছে। প্রতিদিন যখন ডাকপিয়ন এসে দুয়োরে knock করেছে, আমি অমনি ছুটে গিয়েছি দেখতে— তোমার চিঠি এল কি না। দিনের ভিতর দশ বার করে তুমি আমার আশা ভঙ্গ করেছ। শেষটা এই অপমান আর সহ্য করতে না পেরে আমি লণ্ডন থেকে এখানে পালিয়ে আসি।"

"যদি সত্যই এত কষ্ট পেয়ে থাক, তবে সে কষ্ট তুমি ইচ্ছে করে ভোগ করেছ—"

"কেন?"

"আমাকে লিখলেই তো তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।"

"ঐ কথাতেই তো নিজেকে ধরা দিলে। তুমি তোমার অহংকার ছাড়তে পার না, কিন্তু আমাকে তোমার জন্য তা ছাড়তে হবে! শেষে হলও তাই। আমার অহংকার চূর্ণ করে তোমার পায়ে ধরে দিয়েছি, তাই আজ তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে দেখা দিতে এসেছ!"

এ কথার উত্তরে আমি বললুম, "কষ্ট তুমি পেয়েছ? তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে অবধি আমার দিন যে কি আরামে কেটেছে, তা ভগবানই জানেন।"

"এ পৃথিবীতে এক জড়পদার্থ ছাড়া আর কারো আরামে থাকবার অধিকার নেই। আমি তোমার জড় হৃদয়কে জীবন্ত করে তুলেছি, এই তো আমার অপরাধ? তোমার বুকের তারে মীড় টেনে কোমল সুর বার করতে হয়। একে যদি তুমি পীড়ন করা বল তা হলে আমার কিছু বলবার নেই।"

এই সময় আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সুমুখে দিগন্ত-

বিস্তৃত গোধূলি-ধূসর জলের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। তখনো আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখলুম রিণীর মুখ গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে, সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু সে দৃষ্টির কোনো লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল, তা ঐ সমুদ্রের মতোই একটা অসীম উদাস ভাব।

রিণী আমার হাত ছেড়ে দিলে, আমরা দুজনে বালির উপরে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললুম, "রিণী, তুমি কি আমাকে সত্যই ভালোবাস?"

"বাসি।"

"কবে থেকে?"

"যেদিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, সেই দিন থেকে। আমার মনের এ প্রকৃতি নয় যে তা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জলে উঠবে। এ মন এক মুহূর্তে দপ্ করে জলে ওঠে, কিন্তু এ জীবনে সে আগুন আর নেভে না। আর তুমি?"

"তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বহুরূপী যে তার কোনো-একটি নাম দেওয়া যায় না। যার পরিচয় আমি নিজেই ভালো করে জানি নে, তোমাকে তা কি বলে জানাব?"

"তোমার মনের কথা তুমি জান আর না-জান, আমি জানতুম।"

"আমি যে জানতুম না, সে কথা সত্য— কিন্তু তুমি জানতে কি না বলতে পারি নে।"

"আমি যে জানতুম, তা প্রমাণ করে দিচ্ছি। তুমি ভাবতে যে আমার সঙ্গে তুমি শুধু মন নিয়ে খেলা করছ।"

"তা ঠিক।"

"আর এ খেলায় তোমার জেতবার এতটা জেদ ছিল যে তার জন্য তুমি প্রাণ পণ করেছিলে।"

"এ কথাও ঠিক।"

"কবে বুঝলে যে এ শুধু খেলা নয়?"

"আজ।"

"কি করে?"

"যখন তোমাকে স্টেশনে দেখলুম, তখন তোমার মুখে আমি নিজের মনের চেহারা দেখতে পেলুম।"

"এতদিন তা দেখতে পাও নি কেন ?"

"তোমার মন আর আমার মনের ভিতর তোমার অহংকার আর আমার অহংকারের জোড়া পর্দা ছিল। তোমার মনের পর্দার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দাও উঠে গেছে।"

"তুমি যে আমাকে কত ভালোবাস সে কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না।"

"কেন ?"

"তাও আমি জানি।"

"কতটা"

"জীবনের চাইতে বেশি। যখন তোমার মনে হয় যে আমি তোমাকে ভালোবাসি নে তখন তোমার কাছে বিশ্ব খালি হয়ে যায়, জীবনের কোনো অর্থ থাকে না।"

"এ সত্য কি করে জানলে ?"

"নিজের মন থেকে।"

এই কথার পর রিণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "রাত হয়ে গেছে, আমার বাড়ি যেতে হবে ; চলো তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

রিণী পথ দেখাবার জন্য আগে আগে চলতে লাগল, আমি নীরবে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করলুম।

মিনিট-দশেক পরে রিণী বললে, "আমরা এতদিন ধরে যে নাটকের অভিনয় করছি, আজ তার শেষ হওয়া উচিত।"

"মিলনান্ত না বিয়োগান্ত ?"

"সে তোমার হাতে।"

আমি বললুম, "যারা এক মাস পরস্পরকে ছেড়ে থাকতে পারে না তাদের পক্ষে সমস্ত জীবন পরস্পরকে ছেড়ে থাকা কি সম্ভব ?"

"তা হলে একত্র থাকবার জন্য তাদের কি করতে হবে ?"

"বিবাহ।"

"তুমি কি সকল দিক ভেবেচিন্তে এ প্রস্তাব করছ ?"

"আমার আর কোনো দিক ভাববার-চিন্তবার ক্ষমতা নেই। এই মাত্র আমি জানি যে, তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদিনও থাকতে পারব না।"

"তুমি রোমান ক্যাথলিক হতে রাজি আছ ?"

এ কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি নিরুত্তর রইলুম।

"এর উত্তর ভেবে তুমি কাল দিয়ো। এখন আর সময় নেই, ঐ দেখো তোমার ট্রেন আসছে— শিগগির টিকেট কিনে নিয়ে এসো, আমি তোমার জন্য প্ল্যাটফরমে অপেক্ষা করব।"

আমি তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে নিয়ে এসে দেখি রিণী অদৃশ্য হয়েছে। আমি একটি ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় সেখান থেকে George নামলেন। আমি ট্রেনে চড়তে-না-চড়তে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি রিণী আর George পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

সে রাত্তিরে বিকারের রোগীর মাথার যে অবস্থা হয়, আমার তাই হয়েছিল —অর্থাৎ আমি ঘুমোইও নি, জেগেও ছিলুম না।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র চাকরে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। শিরোনামায় দেখি রিণীর হস্তাক্ষর।

খুলে যা পড়লুম তা এই—

"এখন রাত বারোটা। কিন্তু এমন একটা সুখবর আছে যা তোমাকে এখনই না দিয়ে থাকতে পারছি নে। আমি এক বৎসর ধরে যা চেয়েছিলুম, আজ তা হয়েছে। George আজ আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছে, আমি অবশ্য তাতে রাজি হয়েছি। এর জন্য ধন্যবাদটা বিশেষ করে তোমারই প্রাপ্য। কারণ Georgeএর মতো পুরুষমানুষের মনে আমার মতো রমণীকে পেতেও যেমন লোভ হয়, নিতেও তেমনি ভয় হয়। তাতেই ওদের মন স্থির করতে এত দেরি লাগে যে আমরা একটু সাহায্য না করলে সে মন আর কখনোই স্থির হয় না। ওদের কাছে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে jealousy; ওদের মনে যত jealousy বাড়ে, ওরা ভাবে ওরা তত বেশি ভালোবাসে। স্টেশনে তোমাকে দেখেই George উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার পর যখন শুনলে যে তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে, তখন সে আর কালবিলম্ব না করে আমাদের বিয়ে ঠিক করে ফেললে। এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইব, এবং তুমিও আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থেকো। কেননা,

তুমি যে কি পাগলামি করতে বসেছিলে, তা পরে বুঝবে। আমি বাস্তবিকই আজ তোমার saviour হয়েছি। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ এই যে, তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা করবার চেষ্টা কোরো না। আমি জানি যে, আমি আমার নতুন জীবন আরম্ভ করলে দু দিনেই তোমাকে ভুলে যাব, আর তুমি যদি আমাকে শিগগির ভুলতে চাও তা হলে Miss Hildesheimerকে খুঁজে বার করে তাকে বিবাহ করো। সে যে আদর্শ স্ত্রী হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আমি যদি Georgeকে বিয়ে করে সুখে থাকতে পারি, তা হলে তুমি যে Miss Hildesheimerকে নিয়ে কেন সুখে থাকতে পারবে না, তা বুঝতে পারি নে। ভয়ানক মাথা ধরেছে, আর লিখতে পারি নে। Adieu।"

এ ব্যাপারে আমি কি George, কে বেশি কৃপার পাত্র, তা আমি আজও বুঝতে পারি নি।

এ কথা শুনে সেন হেসে বললেন, "দেখো সোমনাথ, তোমার অহংকারই এবিষয়ে তোমাকে নির্বোধ করে রেখেছে; এর ভিতর আর বোঝবার কি আছে? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তোমার রিণী তোমাকে বাঁদর নাচিয়েছে এবং ঠকিয়েছে— সীতেশের তিনি যেমন তাকে করেছিলেন। সীতেশের মোহ ছিল শুধু এক ঘণ্টা, তোমার তা আজও কাটে নি। যে কথা স্বীকার করবার সাহস সীতেশের আছে, তোমার তা নেই। ও তোমার অহংকারে বাধে।"

সোমনাথ উত্তর করলেন, "ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ, তত নয়। তা হলে আর একটু বলি। আমি রিণীর পত্রপাঠে প্যারিসে যাই। মনস্থির করেছিলুম যে যতদিন না আমার প্রবাসের মেয়াদ ফুরোয় ততদিন সেখানেই থাকব, এবং লণ্ডনে শুধু Innএর term রাখতে বছরে চার বার করে যাব, এবং প্রতি ক্ষেপে ছ দিন করে থাকব। মাসখানেক পরে, একদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলে বসে আছি এমন সময়ে হঠাৎ দেখি রিণী এসে উপস্থিত! আমি তাকে দেখে চমকে উঠে বললুম যে, "তবে তুমি Georgeকে বিয়ে কর নি, আমাকে শুধু ভোগা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলে—?"

সে হেসে উত্তর করলে, "বিয়ে না করলে প্যারিসে honeymoonকরতে

এলুম কি করে? তোমার খোঁজ নিয়ে তুমি এখানে আছ জেনে আমি Georgeকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে এখানে এনেছি। আজ তিনি তাঁর একটি বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছেন, আর আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সে সন্ধেটা রিণী আমার সঙ্গে গল্প করে কাটালে। সে গল্প হচ্ছে তার বিয়ের রিপোর্ট। আমাকে বসে বসে ও-ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা শুনতে হল। চলে যাবার সময়ে সে বললে, "সেদিন তোমার কাছে ভালো করে বিদায় নেওয়া হয় নি। পাছে তুমি আমার উপর রাগ করে থাক এই মনে করে আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।"

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতে, সীতেশ ঈষৎ অধীর ভাবে বললেন, "দেখো, এ-সব কথা তুমি এইমাত্র বানিয়ে বলছ। তুমি ভুলে গেছ যে খানিক আগে তুমি বলেছ যে, সেই Bতে রিণীর সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। তোমার মিথ্যে কথা হাতে-হাতে ধরা পড়েছে।"

সোমনাথ তিলমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিলেন, "আগে যা বলেছিলুম সেই কথাটাই মিথ্যে— আর এখন যা বলছি তাই সত্যি। গল্পের একটা শেষ হওয়া চাই বলে আমি ঐ জায়গায় শেষ করেছিলুম। কিন্তু প্রকৃত জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা অমন করে শেষ হয় না। সে প্যারিসের দেখাও শেষ দেখা নয়, তার পর লণ্ডনে রিণীর সঙ্গে আমার বহুবার অমন শেষ দেখা হয়েছে।"

সীতেশ বললেন, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে। এর একটা শেষ হয়েছে না হয় নি?"

"হয়েছে।"

"কি করে?"

"বিয়ের বছরখানেক পরেই Georgeএর সঙ্গে রিণীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আদালতে প্রমাণ হয় যে, George রিণীকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন— তাও আবার মদের ঝোঁকে নয়, ভালোবাসার বিকারে। তার পর রিণী Spainএর একটি conventএ চিরজীবনের মতো আশ্রয় নিয়েছে।"

সীতেশ মহা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "George তার প্রতি ঠিক ব্যবহারই করেছিল। আমি হলেও তাই করতুম।"

সোমনাথ বললেন, "সম্ভবত ও অবস্থায় আমিও তাই করতুম। ও ধর্মজ্ঞান, ও বলবীর্য আমাদের সকলেরই আছে! এই জন্যই তো দুর্বলের পক্ষে—O crux! ave unica spera[১] এই হচ্ছে মানবমনের শেষ কথা।"

সীতেশ উত্তর করলেন, "তোমার বিশ্বাস তোমার রিণী একটি অবলা—জান সে কি? একসঙ্গে চোর আর পাগল!"

"তাই যদি হয় তা হলে তো তোমরা দুজনে চাঁদা করে এক-সঙ্গে এক-মনে এক-প্রাণে তাকে ভালোবাসতে পারতে।"

সেন এ কথার উত্তরে বললেন, "চাঁদা করে নয়, পালা করে। আমাদের দুজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে একা করতে হয়েছে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুমি যথার্থ ই অনুকম্পার পাত্র।"

সোমনাথ ইতিমধ্যে একটি সিগরেট ধরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বললেন, "আমি যে বিশেষ অনুকম্পার পাত্র এমন তো আমার মনে হয় না। কেননা পৃথিবীতে যে ভালোবাসা খাঁটি, তার ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুইই থাকে, ঐটুকুই তো ওর রহস্য।"

সীতেশের কানে এ কথা এতই অদ্ভুত এতই নিষ্ঠুর ঠেকল যে তা শুনে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কি উত্তর করবেন ভেবে না পেয়ে অবাক হয়ে রইলেন।

সেন বললেন, "বাঃ, সোমনাথ বাঃ! এতক্ষণ পরে একটা কথার মতো কথা বলেছ— এর মধ্যে যেমন নূতনত্ব আছে, তেমনি বুদ্ধির খেলা আছে। আমাদের মধ্যে তুমিই কেবল মনোজগতে নিত্য নতুন সত্যের আবিষ্কার করতে পার।"

সীতেশ আর ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, "অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি— এ কথা যে কতদূর সত্য, তোমাদের এইসব প্রলাপ শুনলে তা বোঝা যায়।"

সোমনাথ তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না, অর্থাৎ কেউ তাঁর লেজে পা দিলে তিনি তখনি উল্টে তাকে ছোবল মারতেন, আর সেই

---

১ ক্রশ্! তুমিই জীবনের একমাত্র ভরসা।

সঙ্গে বিষ ঢেলে দিতেন। যে কথা তিনি শানিয়ে বলতেন, সে কথা প্রায়ই বিষদিগ্ধ বাণের মতো লোকের বুকে গিয়ে বিঁধত।

সোমনাথের মতের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ কোনো মিল ছিল না তার প্রামাণ তো তাঁর প্রণয়কাহিনী থেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। গরল তাঁর কণ্ঠে থাকলেও, তাঁর হৃদয়ে ছিল না। হাড়ের মতো কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মতো কোমল দেহ থাকে, সোমনাথেরও তেমনি অতি কঠিন মতামতের ভিতর অতি কোমল মনোভাব লুকিয়ে থাকত। তাই তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত না, যা হত তা হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য— কেননা তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হোক তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত— যে সত্য আমরা দেখতে চাই নে বলে দেখতে পাই নে।

এতক্ষণ আমরা গল্প বলতে ও শুনতে এতই নিবিষ্ট ছিলুম যে বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর আমাদের কারো হয় নি। সকলে যখন চুপ করলেন, সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারি দিক ভরে গেছে, আর সে আলো এতই নির্মল, এতই কোমল যে, আমার মনে হল যেন বিশ্ব তার বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয় কত মধুর আর কত করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখতে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন-রাত্তিরের মতো পালায়-পালায় নিত্য যায় আর আসে।

অতঃপর আমি আমার কথা শুরু করলুম।

আমার কথা

সোমনাথ বলেছেন, "Love is both a mystery and a joke।" এ কথা যে এক হিসেবে সত্য তা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য ; কেননা এই ভালোবাসা নিয়ে মানুষে কবিত্বও করে, রসিকতাও করে। সে কবিত্ব যদি অপার্থিব হয়, আর সে রসিকতা যদি অশ্লীল হয়, তাতেও সমাজ কোনো আপত্তি করে না। Dante এবং Boccaccio উভয়েই এক যুগের লেখক— শুধু তাই নয়, এর-এক জন হচ্ছেন গুরু, আর একজন শিষ্য। Don Juan এবং Epipsychidion, দুই কবিবন্ধুতে এক ঘরে পাশাপাশি বসে লিখেছিলেন।

সাহিত্য-সমাজে এই-সব পৃথকপন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে, তা তো তোমরা সকলেই জান।

এ কথা শুনে সেন বললেন, "Byron এবং Shelley ও-দুটি কাব্য যে এক সময়ে এক সঙ্গে বসে লিখেছিলেন, এ কথা আমি আজ এই প্রথম শুনলুম।"

আমি উত্তর করলুম, "যদি না করে থাকেন, তা হলে তাঁদের তা করা উচিত ছিল।"

সে যাই হোক, তোমরা যে-সব ঘটনা বললে তা নিয়ে আমি তিনটি দিব্যি হাসির গল্প রচনা করতে পারতুম, যা পড়ে মানুষ খুশি হত। সেন কবিতায় যা পড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানবজীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবনযাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিন জনই সমান আহাম্মক বনে গেছেন। কোনো বৈষ্ণব কবি বলেছেন যে, জীবনের পথ 'প্রেমে পিচ্ছিল'— কিন্তু সেই পথে কাউকে পা পিছলে পড়তে দেখলে মানুষের যেমন আমোদ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমরা, যে-ভালোবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিস, তার ভিতর দু-চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে ও-বস্তুকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছ যে সমাজের চোখে তা কলুষিত ঠেকতে পারে। কেননা সমাজের চোখ, মানুষের মনকে হয় সূর্যের আলোয় নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো। সে আলোর মায়া এখন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে সরে গিয়েছে। সুতরাং আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি তার ভিতর আর যাই থাক্ আর না-থাক্, কোনো হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।

এ গল্পের ভূমিকাস্বরূপে আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই, কেননা তোমাদের যা বলতে যাচ্ছি তা আমার মনের কথা নয়, আর-এক জনের— একটি স্ত্রীলোকের। এবং সে রমণী আর যাই হোক— চোরও নয়, পাগলও নয়।

গত জুন মাসে আমি কলকাতায় একা ছিলুম। আমার বাড়ি তো তোমরা সকলেই জান; ঐ প্রকাণ্ড পুরীতে রাত্তিরে খালি দুটি লোক শুত—

আমি আর আমার চাকর। বহুকাল থেকে একা থাকবার অভ্যেস নেই, তাই রাত্তিরে ভালো ঘুম হত না। একটু-কিছু শব্দ শুনলে মনে হত যেন ঘরের ভিতর কে আসছে, অমনি গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠত; আর রাত্তিরে জানই তো কত রকম শব্দ হয়— কখনো ছাদের উপর, কখনো দরজা-জানালায়, কখনো রাস্তায়, কখনো-বা গাছপালায়। একদিন এই-সব নিশাচর ধ্বনির উপদ্রবে রাত একটা পর্যন্ত জেগে ছিলুম, তার পর ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন কে টেলিফোনে ঘণ্টা দিচ্ছে। অমনি ঘুম ভেঙে গেল। সেই সঙ্গে ঘড়িতে দুটো বাজল। তার পর শুনি যে, টেলিফোনের ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। আমি ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। মনে হল যে আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারো হয়তো হঠাৎ কোনো বিশেষ বিপদ ঘটেছে, তাই এত রাত্তিরে আমাকে খবর দিচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দেখি আমার ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙিয়ে টেলিফোনের মুখ-নলটি নিজেই তুলে নিয়ে কানে ধরে বললুম, "Hallo!"

উত্তরে পাওয়া গেল শুধু ঘণ্টার সেই ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। তার পর দু-চার বার 'হ্যালো' 'হ্যালো' করবার পর একটি অতি মৃদু অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। জান সে কি রকম স্বর? গির্জার অরগানের সুর যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, আর মনে হয় যে সে সুর লক্ষ যোজন দূর থেকে আসছে— ঠিক সেই রকম।

ক্রমে সেই স্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আমি শুনলুম কে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করছে—"তুমি কি মিস্টার রায়?"

"হাঁ, আমি একজন মিস্টার রায়।"

"S. D.?"

"হাঁ, কাকে চাও?"

"তোমাকেই।"

গলার স্বর ও কথার উচ্চারণে বুঝলুম যিনি কথা কচ্ছেন তিনি একটি ইংরাজ রমণী।

আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি কে?"

"চিনতে পারছ না?"

"না।"

"একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো তো এ কণ্ঠস্বর তোমার পরিচিত কি না।"

"মনে হচ্ছে এ স্বর পূর্বে শুনেছি, তবে কোথায় আর কবে তা কিছুতেই মনে করতে পারছি নে।"

"আমি যদি আমার নাম বলি তা হলে কি মনে পড়বে?"

"খুব সম্ভব পড়বে।"

"আমি 'আনি'।"

"কোন্ 'আনি'?"

"বিলেতে যাকে চিনতে।"

"বিলেতে তো আমি অনেক 'আনি'কে চিনতুম। সে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের তো ঐ একই নাম।"

"মনে পড়ে তুমি Gordon Squareএ একটি বাড়িতে দুটি ঘর ভাড়া করে ছিলে?"

"তা আর মনে নেই! আমি যে একাদিক্রমে দুই বৎসর সেই বাড়িতে থাকি।"

"শেষ বৎসরের কথা মনে পড়ে?"

"অবশ্য। সে তো সে-দিনকের কথা; বছর-দশেক হল সেখান থেকে চলে এসেছি।"

"সেই বৎসর সে-বাড়িতে 'আনি' বলে একটি দাসী ছিল, মনে আছে?"

এই কথা বলবামাত্র আমার মনে পূর্বস্মৃতি সব ফিরে এল। 'আনি'র ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল।

আমি বললুম, "খুব মনে আছে। দাসীর মধ্যে তোমার মতো সুন্দরী বিলেতে কখনো দেখি নি।"

"আমি সুন্দরী ছিলুম তা জানি, কিন্তু আমার রূপ তোমার চোখে যে কখনো পড়েছে, তা জানতুম না।"

"কি করে জানবে? আমার পক্ষে ও কথা তোমাকে বলা অভদ্রতা হত।"

"সে কথা ঠিক। তোমার-আমার ভিতর সামাজিক অবস্থার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল।"

আমি এ কথার কোনো উত্তর দিলুম না। একটু পরে সে আবার বললে, "আমিও আজ তোমাকে এমন একটি কথা বলব যা তুমি জানতে না।"

"কি বলো তো ?"

"আমি তোমাকে ভালোবাসতুম।"

"সত্যি ?"

"এমন সত্য যে, দশ বৎসরের পরীক্ষাতেও তা উত্তীর্ণ হয়েছে।"

"এ কথা কি করে জানব? তুমি তো আমাকে কখনো বলো নি।"

"তোমাকে ও কথা বলা যে আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তা ছাড়া ও জিনিস তো ব্যবহারে, চেহারায় ধরা পড়ে। ও কথা অন্তত স্ত্রীলোকে মুখ ফুটে বলে না।"

"কই, আমি তো কখনো কিছু লক্ষ্য করি নি।"

"কি করে করবে, তুমি কি কখনো মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখেছ ? আমি প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ধরে তোমার বসবার ঘরে টেবিল সাজিয়েছি, তুমি সে সময় হয় খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে, নয় মাথা নিচু করে ছুরি দিয়ে নখ চাঁচতে।"

"এ কথা ঠিক— তার কারণ, তোমার দিকে বিশেষ করে নজর দেওয়াটাও আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তবে সময়ে সময়ে এটুকু অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, আমার ঘরে এলে তোমার মুখ লাল হয়ে উঠত, আর তুমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে। আমি ভাবতুম, সে ভয়ে।"

"সে ভয়ে নয় লজ্জায়। কিন্তু তুমি যে কিছু লক্ষ্য কর নি সেইটেই আমার পক্ষে অতি সুখের হয়েছিল।"

"কেন ?"

"তুমি যদি আমার মনের কথা জানতে পারতে তা হলে আমি আর লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারতুম না। ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতুম। তা হলে আমিও আর তোমাকে নিত্য দেখতে পেতুম না, তোমার জন্যে কিছু করতেও পারতুম না।"

"আমার জন্য তুমি কি করেছ ?"

"সেই শেষ বৎসর তোমার একদিনও কোনো জিনিসের অভাব হয়েছে ? একদিনও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে ?"

"না।"

"তার কারণ, আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি। জান, তোমাকে যে ভালো না বাসে, সে কখনো তোমার সেবা করতে পারে না?"

"কেন বলো দেখি?"

"এই জন্যে যে তুমি নিজের জন্য কিছু করতে পার না, অথচ তোমার জন্য কাউকে কিছু করতেও বল না।"

"তুমি যে আমার জন্যে সব করে দিতে, আমি তো তা জানতুম না। আমি ভাবতুম Mrs. Smith। তাইতে আসবার সময় তোমাকে কিছু না বলে Mrs. Smithকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।"

"আমি তোমার ধন্যবাদ চাই নি। তুমি যে আমাকে কখনো ধমকাও নি, সেই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট পুরস্কার।"

"সে কি কথা! স্ত্রীলোককে কোনো ভদ্রলোক কি কখনো ধমকায়?"

"স্ত্রীলোককে কেউ না ধমকালেও, দাসীকে অনেকেই ধমকায়।"

"দাসী কি স্ত্রীলোক নয়?"

"দাসীরা জানে তারা স্ত্রীলোক, কিন্তু ভদ্রলোকে সে কথা দু বেলা ভুলে যায়।"

কথাটা এতই সত্য যে, আমি তার কোনো জবাব দিলুম না। একটু পরে সে বললে, "কিন্তু একদিন তুমি একটি অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে।"

"তোমাকে?"

"আমাকে নয়, তোমার একটি বন্ধুকে, কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে।"

"তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো বন্ধুকে কখনো কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

"তোমার কাছে সে এত তুচ্ছ কথা যে, তোমার তা মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে তা চিরদিন কাঁটার মতো বিঁধে ছিল।"

"শুনলে হয়তো মনে পড়বে।"

"তুমি একদিন একটি মুক্তোর tie-pin নিয়ে এস, তার পর দিন সেটি আর পাওয়া গেল না।"

"হতে পারে।"

"আমি সেটি সারা রাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোমার একটি বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তুমি তাঁকে হেসে বললে যে, আনি ওটি

চুরি করে ঠকেছে, কেননা মুক্তোটি হচ্ছে ঝুটো, আর পিনটি পিতলের ; আনি বেচতে গিয়ে দেখতে পাবে যে ওর দাম এক পেনি। তার পর তোমরা দুজনেই হাসতে লাগলে। কিন্তু ঐ কথায় তুমি ঐ পিতলের পিনটি আমার বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিয়েছিলে।"

"আমরা না ভেবেচিন্তে অমন অন্যায় কথা অনেক সময় বলি।"

"তা আমি জানতুম, তাই তোমার উপর আমার রাগ হয় নি— যা হয়েছিল সে শুধু যন্ত্রণা। দারিদ্র্যের কষ্টের চাইতে তার অপমান যে বেশি, সেদিন আমি মর্মে মর্মে তা অনুভব করেছিলুম। তুমি কি করে জানবে যে, আমি তোমার এক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডারও কখনো চুরি করি নি!"

"এর উত্তরে আমার আর কিছুই বলবার নেই। না জেনে হয়তো ঐরকম কথায় কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছি।"

"তোমার মুক্তোর পিন কে চুরি করেছিল, পরে আমি তা আবিষ্কার করি।"

"কে বলো তো?"

"তোমার ল্যাণ্ডলেডি Mrs. Smith।"

"বল কি! সে তো আমাকে মায়ের মতো ভালোবাসত! আমি চলে আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।"

"সে তার ব্যাঙ্ক ফেল হল বলে।— তোমাকে সে এক টাকার জিনিস দিয়ে দু টাকা নিত।"

"আমি কি তা হলে অতদিন চোখ বুজে ছিলুম?"

"তোমাদের চোখ তোমাদের দলের বাইরে যায় না, তাই বাইরের ভালোমন্দ কিছুই দেখতে পায় না। সে যাই হোক, আমি তোমার একটি জিনিস না বলে নিতুম— বই; আবার তা পড়ে ফেরত দিতুম।"

"তুমি কি পড়তে জানতে?"

"ভুলে যাচ্ছ, আমরা সকলেই Board Schoolএ লেখাপড়া শিখি।"

"হাঁ, তা তো সত্যি।"

"জান কেন চুরি করে বই পড়তুম?"

"না।"

"ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছিলেন, আমি তা যত্ন করে মেজে-ঘষে রাখতুম।"

"তা জামি জানি। তোমার মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দাসী আমি বিলেতে দেখি নি।"

"তুমি যা জানতে না তা হচ্ছে এই, ভগবান আমাকে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন, তাও আমি মেজে-ঘষে রাখতে চেষ্টা করতুম; এবং এ দুই-ই করতুম তোমারই জন্যে।

"আমার জন্যে?"

"পরিষ্কার থাকতুম এই জন্যে, যাতে তুমি আমাকে দেখে নাক না সেঁটকাও; আর বই পড়তুম এই জন্যে, যাতে তোমার কথা ভালো করে বুঝতে পারি।"

"আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো কথা কইতুম না।"

"আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে তখন আমার তা শুনতে বড়ো ভালো লাগত। সে তো কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি! আমি অবাক হয়ে শুনতুম, কিন্তু সব ভালো বুঝতে পারতুম না। কেননা তোমরা যে ভাষা বলতে, তা বইয়ের ইংরাজি। সেই ইংরাজি ভালো করে শেখবার জন্য আমি চুরি করে বই পড়তুম।"

"সে-সব বই বুঝতে পারতে?"

"আমি পড়তুম শুধু গল্পের বই। প্রথমে জায়গায় জায়গায় শক্ত লাগত, তার পর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বাধত না।"

"কি রকম গল্পের বই তোমার ভালো লাগত? যাতে চোর-ডাকাত খুন-জখমের কথা আছে?"

"না, যাতে ভালোবাসার কথা আছে। সে যাই হোক, তোমাকে ভালোবেসে তোমার দাসীর এই উপকার হয়েছিল যে সে শরীরে-মনে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল— তার ফলেই তার ভবিষ্যৎ জীবন এত সুখের হয়েছিল।"

"আমি শুনে সুখী হলুম।"

"কিন্তু প্রথমে আমাকে ওর জন্য অনেক ভুগতে হয়েছিল।"

"কেন?"

"তোমার মনে আছে তুমি চলে আসবার সময় বলেছিলে যে এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরে আসবে?"

"সে ভদ্রতা করে; Mrs. Smith দুঃখ করছিল বলে তাকে স্তোক দেবার জন্যে।"

"কিন্তু আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলুম।"

"তুমি কি এত ছেলেমানুষ ছিলে ?"

"আমার মন আমাকে ছেলেমানুষ করে ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়ে দিলে জীবনে যে আর-কিছু ধরে থাকবার মতো আমার ছিল না।"

"তার পর ?"

"তুমি যেদিন চলে গেলে তার পরদিনই আমি Mrs. Smithএর কাছ থেকে বিদায় হই।"

"Mrs. Smith তোমাকে বিনা নোটিসে ছাড়িয়ে দিলে ?"

"না, আমি বিনা নোটিসে তাকে ছেড়ে গেলুম। ও শ্মশানপুরীতে আমি আর-এক দিনও থাকতে পারলুম না।"

"তার পর কি করলে ?"

"তার পর এক বৎসর ধরে যেখানে যেখানে তোমার দেশের লোকেরা থাকে সেই-সব বাড়িতে চাকরি করেছি— এই আশায় যে, তুমি ফিরে এলে সে খবর পাব। কিন্তু কোথাও এক মাসের বেশি থাকতে পারি নি।"

"কেন, তারা কি তোমাকে বকত, গাল দিত ?"

"না, কটু কথা নয়, মিষ্টি কথা বলত বলে। তুমি যা করেছিলে— অর্থাৎ উপেক্ষা— এরা কেউ আমাকে তা করে নি। আমার প্রতি এদের বিশেষ মনোযোগটাই আমার কাছে বিশেষ অসহ্য হত।"

"মিষ্টি কথা যে মেয়েদের তিতো লাগে, এ তো আমি আগে জানতুম না।"

"আমি মনে আর দাসী ছিলুম না— তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্র কথার পিছনে যে মনোভাব আছে তা মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ-যৌবন-দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি। জান কিসের সাহায্যে ?"

"না।"

"আমি আমার শরীরে এমন-একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম যার গুণে কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।"

"সেটি কি Cross ?"

"বিশেষ করে আমার পক্ষেই তা Cross ছিল— অন্য কারো পক্ষে নয়।

তুমি যাবার সময় আমাকে যে-গিনিটি বকশিস দেও সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালোবাসা ছিল আমার বুকের উপরে ঐ স্বর্ণমুদ্রা ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করি নি, যদিচ আমার এমন দিন গেছে যখন আমি খেতে পাই নি।"

"এমন এক দিনও তোমার গেছে যখন তোমাকে উপবাস করতে হয়েছে?"

"এক দিন নয়, বহু দিন। যখন আমার চাকরি থাকত না তখন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে উপবাস করতে হত।"

"কেন, তোমার বাপ-মা ভাই-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজন কি কেউ ছিল না?"

"না, আমি জন্মাবধি একটি Foundling Hospitalএ মানুষ হই।"

"কত বৎসর ধরে তোমাকে এ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে?"

"এক বৎসরও নয়। তুমি চলে যাবার মাস-দশেক পরে আমার এমন ব্যারাম হল যে আমাকে হাসপাতালে যেতে হল। সেইখানেই আমি এ-সব কষ্ট হতে মুক্তি লাভ করলুম।"

"তোমার কি হয়েছিল?"

"যক্ষ্মা।"

"রোগেরও তো একটা যন্ত্রণা আছে?"

"যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোনোই কষ্ট থাকে না, বরং যদি কিছু থাকে তো সে আরাম। তাই যে ক'মাস আমি হাসপাতালে ছিলুম, তা আমার অতি সুখেই কেটে গিয়েছিল।"

"মরণাপন্ন অসুখ নিয়ে হাসপাতালে একা পড়ে থাকা যে সুখের হতে পারে, এ আজ নতুন শুনলুম।"

"এ ব্যারামের প্রথম অবস্থায় মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মনে হয় এতে প্রাণ হঠাৎ এক দিনে নিভে যাবে না। সে প্রাণ দিনের পর দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অলক্ষিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যু কতকটা ঘুমিয়ে পড়ার মতো। তা ছাড়া, শরীরের ও অবস্থায় শরীরের কোনো কাজ থাকে না বলে সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখা যায়— আমি তাই শুধু সুখস্বপ্ন দেখতুম।

"কিসের?"

"তোমার। আমার মনে হত যে একদিন হয়তো তুমি এই হাসপাতালে

আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি নিত্য তোমার প্রতীক্ষা করতুম।"

"তার যে কোনোই সম্ভাবনা ছিল না, তা কি জানতে না?"

"যক্ষ্মা হলে লোকের আশা অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। সে যাই হোক, তুমি যদি আসতে তা হলে আমাকে দেখে খুশি হতে।"

"তোমার ঐ রুগ্‌ণ চেহারা দেখে আমি খুশি হতুম, এরূপ অদ্ভুত কথা তোমার মনে কি করে হল?"

"সেই ইটালিয়ান পেণ্টারের নাম কি, যার ছবি তুমি এত ভালোবাসতে যে সমস্ত দেয়ালময় টাঙিয়ে রেখেছিলে?"

"Botticelli।"

"হাঁ, তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticelliর ছবির মতো হয়েছিল। হাত-পাগুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড়ো বড়ো। আর তারা দুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রঙ হাতির দাঁতের রঙের মতো হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত। আমি জানি যে তোমার চোখে সে চেহারা বড়ো সুন্দর লাগত।"

"তুমি কতদিন হাসপাতালে ছিলে?"

"বেশি দিন নয়। যে ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করতেন তিনি মাসখানেক পরে আবিষ্কার করলেন যে আমার ঠিক যক্ষ্মা হয় নি, শীতে আর অনাহারে শরীর ভেঙে পড়েছিল। তাঁর যত্নে ও সুচিকিৎসায় আমি তিন মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলুম।"

"তার পর?"

"তার পর আমার যখন হাসপাতাল থেকে বেরোবার সময় হল তখন ডাক্তারটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি বেরিয়ে কি করব? আমি উত্তর করলুম— দাসীগিরি। তিনি বললেন যে, তোমার শরীর যখন একবার ভেঙে পড়েছে, তখন জীবনে ওরকম পরিশ্রম করা তোমার দ্বারা আর চলবে না। আমি বললুম, উপায়ান্তর নেই। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমি যদি nurse হতে রাজি হই তো তার জন্য যা দরকার সমস্ত খরচা তিনি দেবেন। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল— কেননা জীবনে এই আমি সব-প্রথম একটি

সহৃদয় কথা শুনি। আমি সে প্রস্তাবে রাজি হলুম। এত শিগগির রাজি হবার আরো একটি কারণ ছিল।"

"কি ?"

"আমি মনে করলুম nurse হয়ে আমি কলকাতায় যাব। তা হলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমার অসুখ হলে তোমার শুশ্রূষা করব।"

"আমার অসুখ হবে, এমন কথা তোমার মনে হল কেন ?"

"শুনেছিলুম তোমাদের দেশ বড়োই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে নাকি সব সময়েই সকলের অসুখ করে।"

"তার পরে সত্য সত্যই nurse হলে ?"

"হাঁ। তার পরে সেই ডাক্তারটি আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন। আমি আমার মন ও প্রাণ, আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাতে সমর্পণ করলুম।"

"তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে ?"

"পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আমার স্বামীর কাছে আমি যা পেয়েছি সে হচ্ছে পদ ও সম্পদ, ধন ও মান, অসীম যত্ন এবং অকৃত্রিম স্নেহ; একটি দিনের জন্যও তিনি আমাকে তিলমাত্র অনাদর করেন নি, একটি কথাতেও কখনো মনে ব্যথা দেন নি।"

"আর তুমি ?"

"আমার বিশ্বাস, আমিও তাঁকে মুহূর্তের জন্যও অসুখী করি নি। তিনি তো আমার কাছে কিছু চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু আমাকে ভালোবাসতে ও আমার সেবা করতে। বাপ চিররুগ্‌ণ মেয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, তিনি আমার সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছিলেন। আমি সেরে উঠলেও আর আগের শরীর ফিরে পাই নি, বরাবর সেই Botticelliর ছবিই থেকে গিয়েছিলুম— আর আমার স্বামী আমার বাপের বয়সীই ছিলেন। তাঁকে আমি আমার সকল মন দিয়ে দেবতার মতো পুজো করেছি।"

"আশা করি তোমাদের বিবাহিত জীবনের উপর আমার স্মৃতির ছায়া পড়ে নি ?"

"তোমার স্মৃতি আমার জীবন-মন কোমল করে রেখেছিল।"

“তা হলে তুমি আমাকে ভুলে যাও নি ?”

“না। সেই কথাটা বলবার জন্যই তো আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার প্রতি আমার মনোভাব বরাবর একই ছিল।”

“বলতে চাও, তুমি তোমার স্বামীকে ও আমাকে দুজনকে একসঙ্গে ভালোবাসতে ?”

“অবশ্য। মানুষের মনে অনেক রকম ভালোবাসা আছে যা পরস্পর বিরোধ না করে একসঙ্গে থাকতে পারে। এই দেখো-না কেন লোকে বলে যে, শত্রুকে ভালোবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত ; কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে শত্রু-মিত্র-নির্বিচারে যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, সমান ভালোবাসা হতে পারে।”

“এ সত্য কোথায় আবিষ্কার করেছ ?”

“ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে।”

“তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে ?”

“বলছি। এই যুদ্ধে আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলুম, তিনি ডাক্তার হিসেবে, আমি nurse হিসেবে। সেইখান থেকে এই তোমার কাছে আসছি— যে কথা আগে বলবার সুযোগ পাই নি, সেই কথাটি বলবার জন্য।”

“তোমার কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি নে।”

“এর ভিতর হেঁয়ালি কিছু নেই। এই ঘণ্টাখানেক আগে তোমার সেই Botticelliর ছবি একটি জর্মান গোলার আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে— অমনি আমি তোমার কাছে চলে এসেছি।”

“তা হলে এখন তুমি— ?”

“পরলোকে।”

এর পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে চলে এলুম। মুহূর্তে আমার শরীর-মন একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি শোবামাত্র ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। তার পরদিন সকালে চোখ খুলে দেখি বেলা দশটা বেজে গেছে।

কথা শেষ করে বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি, রূপকথা শোনবার সময় ছোটো ছেলেদের মুখের যেমন ভাব হয়, সীতেশের মুখে ঠিক সেই ভাব। সোমনাথের

মুখ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলুম তিনি নিজের মনের উদ্‌বেগ জোর করে চেপে রাখছেন। আর সেনের চোখ ঢুলে আসছে— ঘুমে কি ভাবে, বলা কঠিন। কেউ 'হুঁ'-'না'ও করলেন না। মিনিটখানেক পরে বাইরে গির্জের ঘণ্টায় বারোটা বাজলে আমরা সকলে একসঙ্গে উঠে পড়ে 'boy' 'boy' বলে চিৎকার করলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে দেখি চাকরগুলো সব মেজেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে। চাকরগুলোকে টেনে তুলে গাড়ি জুততে বলতে নীচে পাঠিয়ে দিলুম।

হঠাৎ সীতেশ বলে উঠলেন, "দেখো রায়, তুমি একজন লেখক, দেখো এ-সব গল্প যেন কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো না, তা হলে আমি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না।"

আমি উত্তর করলুম, "সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না— তাতে তোমরা আমার উপর খুশিই হও, আর রাগই কর।"

সেন বললেন, "আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি যা বললুম তা আগাগোড়া সত্য, কিন্তু সকলে ভাববে যে তা আগাগোড়া বানানো।"

সোমনাথ বললেন, "আমারও কোনো আপত্তি নেই, আমি যা বললুম তা আগাগোড়া বানানো, কিন্তু লোকে ভাববে যে তা আগাগোড়া সত্যি।"

আমি বললুম, "আমি যা বললুম তা ঘটেছিল কি আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, তা আমি নিজেও জানি নে। সেইজন্যই তো এ-সব গল্প লিখে ছাপাব। পৃথিবীতে দুরকম কথা আছে যা বলা অন্যায়— এক হচ্ছে মিথ্যা, আর-এক হচ্ছে সত্য! যা সত্যও নয় মিথ্যাও নয়, আর নাহয় তো একই সঙ্গে দুই— তা বলায় বিপদ নেই।"

সীতেশ বললেন, "তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের একজন কবি, একজন ফিলজফার, আর-একজন সাহিত্যিক— সুতরাং তোমাদের কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যে তা কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি হচ্ছি সহজ মানুষ, হাজারে ন শো নিরানব্বই জন যেমন হয়ে থাকে তেমনি। আমার কথা যে খাঁটি সত্য, পাঠকমাত্রেই তা নিজের মন দিয়েই যাচাই করে নিতে পারবে।"

আমি বললুম, "যদি সকলের মনের সঙ্গে তোমার মনের মিল থাকে

তা হলে তোমার মনের কথা প্রকাশ করায় তো তোমার লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই।”

সীতেশ বললেন, “বাঃ, তুমি তো বেশ বললে! আর-পাঁচজন যে আমার মতো— এ কথা সকলে মনে মনে জানলেও কেউ মুখে তা স্বীকার করবে না, মাঝ থেকে আমি শুধু বিদ্রূপের ভাগী হব।”

এ কথা শুনে সোমনাথ বললেন, “দেখো রায়, তা হলে এক কাজ করো— সীতেশের গল্পটা আমার নামে চালিয়ে দেও, আর আমার গল্পটা সীতেশের নামে।”

এ প্রস্তাবে সীতেশ অতিশয় ভীত হয়ে বললেন, “না না, আমার গল্প আমারই থাক্। এতে নয় লোকে দুটো ঠাট্টা করবে, কিন্তু সোমনাথের পাপ আমার ঘাড়ে চাপলে আমাকে ঘর ছাড়তে হবে।”

এর পরে আমরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলুম।

চৈত্র ১৩২২ - জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

আহুতি

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কাজেই কলকাতা থেকে বাড়ি যেতে অদ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয়; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকাযোগেই বাড়ি যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনোই পরিচয় ছিল না। তার পর যে বৎসর আমি বি. এ. পাস করি, সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনো বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয়; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেব।

আমি সকাল ছটায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি আমার জন্য স্টেশনে পাল্কি-বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারি নে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তার পর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্মসার মানুষ অন্য কোনো দেশে বোধ হয় হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাত-পায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ— উদর— অস্বাভাবিক রকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও অনুমানে বুঝলুম যে তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃত পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের 'যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা' পীলে ও যকৃত নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসংগত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন শক্তিহীন হতে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের

হিন্দুর বীরত্ব এই-সব দেহ আশ্রয় করেই টিঁকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু— শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা শিকার এদের জাতব্যাবসা। এরা বর্শা দিয়ে শুয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বাঘ বার করে; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

এই-সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল। মনে হল, এই-সব জীর্ণশীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে বাড়ি থেকে যে মুসলমান সর্দারটি এসেছিল, সে হেসে বললে, "হুজুর, উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারবেন না।"

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা' বলে হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেননা তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা ধনীলোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই তো জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত— এই তো 'পলিটিকাল ইকনমির' শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে শুরু করল।

সর্দারজি আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনোই কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে 'দিলাশা' মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। কেননা হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্বে কখনো এতটা ব্যতিব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে

অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙে বীরাসন ত্যাগ করে পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একস্থানে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন না, কেননা পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মতো আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্বে কখনো পাই নি ; কিন্তু অভ্যাসদোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করে নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়ি নি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম তখনো হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বলতে গেলে, নিজ দেহের এই-সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গি দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে পূর্ব দিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল ; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন-মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারি দিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই দোর নেই, গাছ নেই পালা নেই, শুধু মাঠ— অফুরন্ত মাঠ— আগা-গোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মতো বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝরে গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মতো নির্বিকার ও প্রসন্ন রূপ ধারণ করলে— তার মধ্যে যা ছিল, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, কেননা দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মতো বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ-বাতাসের উত্তাপ দেখতে দেখতে একশো পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে গেল। যখন বেলা প্রায় নটা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না ; আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা-কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অন্বেষণ করে এখানে-ওখানে দুটি-একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ

লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটল না, কেননা এ গাছের আর যে গুণই থাক্, এর গায়ে শ্যামল শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন পত্রহীন ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্তি ফুটে উঠল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হল না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredithএর *Egoist* এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকি ছিল। একটানা দু-চার পাতা পড়ে দেখি তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে— অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। বুঝলুম পাল্কির অবিশ্রাম ঝাঁকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ করে পাল্কি-বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেইসঙ্গে বকশিশের লোভ দেখালুম। এতে ফল হল। অর্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে, গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা-সমান উঁচু পাড়ের উপর খান-দশবারো খোড়ো ঘর, আর-এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে ভিজে কাপড়েই চিড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসল। পাল্কি দেখে গ্রামবধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেননা এদের আর যাই থাক্— রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি-বা কারো রূপ থাকে তো তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি-বা কারো যৌবন থাকে তো তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরনের কাপড় এত ময়লা যে তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রুপোর গহনা। এক জোড়া চুড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন এ কালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য না থাক্, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা-আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম। পাল্কি অতি ধীরে-

সুস্থে চলতে লাগল, কেননা ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্ত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি সব এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আমি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুর এবং পাল্কির দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এল ; সে তন্দ্রা কিন্তু নিদ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় ঘণ্টা-দুয়েক কেটে গেল। তার পর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম, সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে তা আমার দেহের ষট্‌চক্র ভেদ করে একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। জেগে দেখি ব্যাপার আর কিছুই নয়— বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ করে একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সর্দারজি বললেন, "ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে।"

যাত্রা করে অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়ল যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশো ; চারি দিকে সারি সারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতা এত ঘনবিন্যস্ত যে সূর্যরশ্মি তা ভেদ করে আসতে পারছে না। মনে হল, প্রকৃতি তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার-থামের পান্থশালা সস্নেহে স্বহস্তে রচনা করে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এত নিবিড় যে সন্ধে হয়েছে বলে আমার ভুল হল, কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে হাত-পা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। দেহটিকে সোজা করে খাড়া করতে প্রায় মিনিট-পনেরো লাগল ; কেননা ইতিমধ্যে আমার সর্বাঙ্গে খিল ধরে এসেছিল, তার উপর আবার কোনো অঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল ; কোনো অঙ্গে ঝিনঝিনি ধরেছিল, কোনো অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনো অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এল, তখন মনে ভাবলুম গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করে আসি। খানিকটে দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলো সব পাঁড়েজিকে ঘিরে বসে আছে, আর সকলে মিলে একটা মহা-জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমার ভয় হল যে, এরা হয়তো আমার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করবার চক্রান্ত করছে ;

কেননা সকলে একসঙ্গে মহা-উৎসাহে বক্তৃতা করছিল। কিন্তু তার পরেই বুঝলুম যে, এই বকাবকি চেচাঁমেচির অন্য কারণ আছে। এরা যে-বস্তুর ধূমপান করছিল, তা যে তামাক নয়— 'বড়ো তামাক', তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল। এদের স্ফূর্তি এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্প দেখে গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পেলুম। এক-এক জন কল্কেয় এক-এক টান দিচ্ছে, আর 'ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালি' বলে হুংকার ছাড়ছে। গাঁজার কল্কের গড়ন যে এত সুডৌল তা আমি পূর্বে জানতুম না। গড়নে কল্কে-ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধার যে সুন্দর হওয়া দরকার— এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও আছে।

প্রথমে এদের এই ধূমপানোৎসব দেখতে আমার আমোদ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে লাগল। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথচ দেখি কারো ওঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজা খাওয়া কখন শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারজি উত্তর করলেন, "হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজায় দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে।"

আমি বললুম, "কি ভয় ?"

সে জবাব দিলে, "হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই। একটু পরে সব চোখেই দেখতে পাবেন।"

এ কথা শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মাল যে বেহারাগুলোকে টেনে তোলবার জন্যে স্বয়ং তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি যে-সব চোখ ইতিপূর্বে যকৃতের প্রভাবে হলুদের মতো হলদে ছিল, এখন সে-সব গঞ্জিকার প্রসাদে চুন-হলুদের মতো লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হল, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হল; সে ধোঁয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করে আমার মাথায় গিয়ে চড়ে বসল। অমনি আমার গা পাক দিয়ে উঠল, হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল, চোখ টেনে আসতে লাগল, আমি তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে শুরু করল। এবার আমি পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করলুম না, কেননা আমার মনে হল যে শরীরটে যেন আমার নয়— অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর— কতক্ষণ পর তা বলতে পারি নে— বেহারাগুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি তার প্রমাণ পূর্বেই পেয়েছিলুম, কিন্তু সে জোর যে এত অধিক তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল— সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজিটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'রামনাম সৎ হ্যয়' 'রামনাম সৎ হ্যয়' এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হল যে আমার মৃত্যু হয়েছে; আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনো প্রভাব ছিল কি না জানি নে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ— আকাশ-জোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ— শুনতে পেলুম না। চারি দিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পর পাল্কি আর-একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে আছে তা একটি মরুভূমি— বালির নয়, পোড়ামাটির, সে মাটি পাতখোলার মতো, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিল তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও-বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও-বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে, দেখতে মনে হয় টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে; এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ। কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথায়ও-বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায়ও-বা দু-একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ মাটি আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আমারই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই

নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু এত করুণ এত কাতর যে, মনে হল সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে গেল, আমি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্ব-মানবের ব্যথায় ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠল, চার দিক থেকে এলোমেলো ভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারি দিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তার পর দেখি সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিল্‌বিল্‌ করছে, ছট্‌ফট্‌ করছে। এই ব্যাপার দেখে উনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চিৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই-সব শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হল— সে হাসির নির্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে— সে স্মৃতি ইহজন্মের কি পূর্বজন্মের তা আমি বলতে পারি নে। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে দিলে যে, সে গ্রামের ইতিহাস এই—

২

এই ইটকাঠের মরুভূমি হচ্ছে রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষ। রুদ্রপুরের রায়বাবুরা এককালে এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায়বংশের আদিপুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারে চাকরি করে রায়-রাইয়ান খেতাব পান, এবং সেইসঙ্গে তিন পরগনার মালিকী স্বত্ব লাভ করেন। লোকে বলে এঁদের ঘরে দিল্লির বাদশার স্বহস্তে-স্বাক্ষরিত সনদ ছিল, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল-কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সনদের বলে হোক আর না হোক, এঁরা যে কোতল-কচ্ছল করতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তী এই যে, এমন দুর্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্বাপর কখনো হয় নি। এঁদের প্রবল প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেত। কেননা, যার উপর এঁরা নারাজ,

হতেন, তাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করতেন। এঁরা কত লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। রায়বাবুদের দোহাই অমান্য করে এত বড়ো বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনো লোকেরই ছিল না। তাঁদের কড়া শাসনে পরগনার মধ্যে চুরি-ডাকাতি দাঙ্গা-হাঙ্গামার নামগন্ধও ছিল না, তার একটি কারণ ও অঞ্চলের লাঠিয়াল সড়কিয়াল তীরন্দাজ প্রভৃতি যত ক্রূরকর্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক-সর্দারের দলে ভর্তি হত। এক দিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিল না, অপর দিকে তেমনি অনুগ্রহেরও সীমা ছিল না। দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র, আতুরকে ঔষধপথ্য দান এঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। এঁদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাজোখা ছিল না। এঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরুপুরোহিতের দল সব জোতদার হয়ে উঠেছিলেন। তার পর পূজা-আর্চা দোল-দুর্গোৎসবে তাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন। রুদ্রপুরে দোলের সময় আকাশ আবীরে ও পুজোর সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠত। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য এক শত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকত। পিতৃদায় মাতৃদায় কন্যাদায়-গ্রস্ত কোনো ব্রাহ্মণ রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনো রিক্তহস্তে ফিরে যায় নি। এঁরা বলতেন— ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়, সৎকার্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনো অভাব হত, তা হলে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনদের ঘর লুঠে নিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এঁরা ভালো কাজ মন্দ কাজ সব নিজের খেয়াল ও মর্জি-অনুসারে করতেন; কেননা নবাবের আমলে তাঁদের কোনো শাসনকর্তা ছিল না। ফলে, জনসাধারণে তাঁদের যেমন ভয় করত তেমনি ভক্তিও করত, তার কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও করতেন না, ভয়ও করতেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাঁদের মনে যা ছিল, সে হচ্ছে জাতির অহংকার, ধনের অহংকার, বলের অহংকার, রূপের অহংকার। রায়-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই-সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এঁদের পক্ষে এক-রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে ইংরেজ আসবার পূর্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তার পর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুন যে-সকল শরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হল; কেননা নিজের চেষ্টায় নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য বলে গণ্য ছিল। তার পর শরিকানা বিবাদ। রায়-পরিবার ছিল শাক্ত— এত ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে-বুড়োতে মদ্যপান করত। এমন-কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোনো আপত্তি করত না, কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল মদ্যপান করা একটি পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই-সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মতো দুই চোখ— এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রিনেত্রের মতো দেখাত। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য নেই যা তাঁদের দ্বারা না হত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-শরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-শরিকের প্রজার বৌ-ঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুন তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তার পর এঁদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিল তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজনা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মতো গৃহত্যাগ করবেন, এ জ্ঞান এঁদের মনে কখনো জন্মাল না। পূর্ব আমলে নবাব-সরকারে নিয়মিত শালিয়ানা মাল-খাজনা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এই অনভ্যাসবশত কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব এঁরা সময়মত দিয়ে উঠতে পারতেন না। কাজেই এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। যে গ্রামে এঁরা প্রায় একশো ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশো বৎসর পূর্বে ছ ঘর মাত্র জমিদার ছিল।

এই ছ ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হল। এর কারণ ধনঞ্জয় সরকার ইংরেজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরেজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে অর্থোপার্জন

করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিল। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে দু-চার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তার পর তেজারতিতে সেই টাকা সুদের সুদ তস্য সুদে হুহু করে বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর-দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এত না হোক, তিনি যে দু-চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল, এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায়বাবুদের সম্পত্তি-সকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন ; কেননা এ জমিদারির প্রতি কাঠা জমি তাঁর নখদর্পণে ছিল। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দপুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্প বয়সে রুদ্রপুরের বড়ো শরিক ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ-সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল শরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটী খরিদ করলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিল না, কেননা তাঁর মনিবপুত্র উগ্রনারায়ণ তখনো জীবিত ছিলেন। উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তা হলে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা তিনি জানতেন যে, উগ্রনারায়ণের মতো দুর্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ রায়বংশেও কখনো জন্মগ্রহণ করে নি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃক ভিটা দখল করে বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্তমান ছিল না, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে সকল শরিকের বাড়ি নিজ-দখলে আনতে পারতেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটী থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার কোনো চেষ্টা করেন নি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠানপাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটীতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এরা গ্রামসুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যাবসা করে এসেছে ; সুতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করলে, খুন জখম হওয়া অনিবার্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর মতো

নিরীহ ব্যক্তি বাঙলা দেশে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তার দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্ব-সংস্কারবশত কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিল। এই-সব কারণে ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদ্‌বাড়ির বাদবাকি অংশ অধিকার করে বসলেন, সেও নামমাত্র। কেননা, ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধ্যে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিণী দাসী, আর তাঁর গৃহজামাতা এবং রঙ্গিণীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়িতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটল। অর্থ উপার্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনো ভাবের স্থান ছিল না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনো উদয় হয় নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হল যে, তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন, আর কোনো কারণে নয়, আর কারো জন্য নয়। কেননা তাঁর স্মরণ হল যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনো তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন নি, একদিনের জন্যও অর্থোপার্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর চিরজীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ এই বৃদ্ধবয়েসে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হল। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হত না। অতুল ঐশ্বর্যও যে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই তো তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, মানুষে নিজ চেষ্টায় ধনলাভ করতে পারে, কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরেজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্বরতা কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিংবা নিয়মিত হয় নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্রবুদ্ধিজাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণশিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে যক্ষ হয়ে সেই টাকা চিরকাল রক্ষা

করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এত অদম্য হয়ে উঠল যে, তিনি যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হলেন। যেখানে ধনঞ্জয়ের কোনো মায়ামমতা ছিল না, সেখানে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের কার্য উদ্ধার করবার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হল। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণশিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে, রঙ্গিণী আহারনিদ্রা ত্যাগ করলে। ফলে, ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভালোবাসতেন তো সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চুনসুরখির গাঁথনির ভিতর এক-একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোনো একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনি ভাবে শিকড় গেড়েছিল। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হল।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিল। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটি নিয়ে দিবারাত্র ঐ বাড়িতে একা বাস করতেন, জনমানবের সঙ্গে দেখা করতেন না, তাঁর অন্তঃপুরে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্রপুরে লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যেত, যদি না তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে পিছে পাঠানপাড়ার দুজন লাঠিয়াল তাঁর রক্ষক হিসেবে থাকত। রত্নময়ীর বয়েস তখন বিশ কিংবা একুশ। তাঁর মতো অপূর্বসুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মতো ছিল, এবং সেই প্রতিমার মতোই উপরের দিকে কোণতোলা তাঁর চোখ দুটি— দেবতার চোখের মতোই স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনো পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতরে যা জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চার পাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা। রত্নময়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের তিন শত বৎসরের সঞ্চিত অহংকার উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহংকার ছিল। কেননা তাঁর কাছে সে রূপ ছিল তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়— তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে দাঁড়াত,

কেননা তাঁর সকল অঙ্গ, তাঁর বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলত, "দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।" বলা বাহুল্য, তিনি কোনো দিকে দৃক্‌পাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সকল পথ রূপে আলো করে সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেই ভাবে বাড়ি ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত, এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠত— যেহেতু রঙ্গিণীর আর যাই থাক্, রূপ ছিল না। আর, তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেননা তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালোবাসত— অর্থাৎ এ ভালোবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতোই অন্ধ ও নির্মম। এ ভালোবাসার সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিল বলা কঠিন, কেননা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মতো জীবদের মন, দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূত বস্তু। তার পর ধনঞ্জয় যে ভাবে টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেই ভাবে তার স্বামীকে ভালোবাসত— অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি হিসেবে। সে সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে— এ কথা মনে হলে সে একেবারে মায়ামমতাশূন্য হয়ে পড়ত, এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই যা রঙ্গিণী না করতে পারত।

রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে; ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চয়তায় পরিণত হল। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে, রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্রনারায়ণের বাড়ি যায়, এবং যতক্ষণ পারে ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে, রতিলাল, রত্নময়ীর বাড়ীতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিল তার কাছে ভাঙ খেতে যেত। তার পর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া পড়ে গিয়েছিল যে সে কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনো চার চক্ষুর মিলন হয় নি, কেননা পাঠানপাড়ার প্রজারা তার অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করত। কিন্তু রঙ্গিণীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ

নেবার জন্য— তার মজ্জাগত হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেবার জন্য কৃতসংকল্প হল। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে যখ্ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনো আপত্তি নেই, শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে মেয়েতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ্ দেওয়া হবে। দু-চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার জানালা ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হল। তার পর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যত সোনা রুপোর টাকা ছিল সব বড়ো বড়ো তামার ঘড়াতে পুরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হল। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরীজাত হল, তখন রঙ্গিণী একদিন রতিলালকে বললে যে, রত্নময়ীর ছেলেটি এত সুন্দর যে তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায়; সুতরাং যে উপায়েই হোক তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আনতেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব, রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এত নাছোড় হয়ে তাকে ধরে বসল যে রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এল। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কত আদর করলে, কত মিষ্টি কথা বললে। তার পর সে কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির জোড়, তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু গাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখমুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার পর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণশিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পুরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজার গা-চাবি বন্ধ করে চলে গেল। রতিলাল এ দোর ও দোর ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিণী তাকেও তার শোবার ঘরে বন্দী করে চলে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুসো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙবার চেষ্টা করে দেখলে সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এত ভারী আর এত শক্ত যে কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদতে লাগলে, তার পর রতিলালকে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকতে লাগলে। দু-তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না।

রতিলাল বুঝলে সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পর তিন দিন তিন রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রতিলাল কখনো শোনে যে কিরীটচন্দ্র দুয়োরে মাথা ঠুকছে, কখনো শোনে সে কাঁদছে, আবার কখনো-বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিন দিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিনের ভিতর হাজার বার পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙতে চেষ্টা করেছে অথচ সে দরজা একচুলও নাড়াতে পারে নি। যখন কান্নার আওয়াজ তার কানে আসত তখন রতিলাল দুয়োরের কাছে ছুটে গিয়ে বলত, "দাদা দাদা, অমন করে কেঁদো না, কোনো ভয় নেই, আমি এখানে আছি।" রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরো জোরে কেঁদে উঠত, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকত ; রতিলাল তখন দুই কানে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেত ও চিৎকার করে কখনো রঙ্গিণীকে কখনো ধনঞ্জয়কে ডাকত, এবং যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিত। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনো উপায় হতে পারে, এ কথা মুহূর্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি, তার সকল মন ঐ কান্নার টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল।

তিন দিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে, কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানালার লোহার গরাদে দু হাতে ফাঁক করে নীচে লাফিয়ে পড়ে একদৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। সেদিন দেখলে অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠানপাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানা দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিশ্বাসে জানালে। আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠলে, দেখতে দেখতে মনে হল সে যেন হেসে উঠলে। এ দৃশ্য রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত বোধ হল যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার পর, সেই দিন দুপুর রাত্তিরে যখন সকলে শুতে গিয়েছে— রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। সকল শরিকের বাড়ি সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মতো ব্যাপ্ত হয়ে

ধনঞ্জয়ের বাড়ি আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশো প্রজা ঢাল সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল। তার সঙ্গীরা বুঝলে যে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

তার পর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে গেল। তারা ধনঞ্জয়ের চাকর দাসী, আমলা ফয়লা, দারোয়ান বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায়বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। তার পর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হতে লাগল। যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রুদ্রপুরের সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে।

আষাঢ় ১৩২৩

বড়োবাবুর বড়োদিন

বড়োদিনের ছুটিতে বড়োবাবু যে কেন থিয়েটার দেখতে যান, যে কাজ তিনি ইতিপূর্বে এবং অতঃপর কখনো করেন নি, সেই একদিনের জন্য সে কাজ তিনি যে কেন করেন, তার ভিতর অবশ্য একটু রহস্য আছে। তিনি যে আমোদপ্রিয় নন, এ সত্য এতই স্পষ্ট যে, তাঁর শত্রুরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত। তিনি বাঁধাবাঁধি নিয়মের অতিশয় ভক্ত ছিলেন, এবং নিজের জীবনকে বাঁধা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করে নিয়ে এসেছিলেন। পনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি একদিনও আপিস কামাই করেন নি, একদিনও ছুটি নেন নি, এবং প্রতিদিন দশটা-পাঁচটা ঘাড় গুঁজে একমনে খাতা লিখে এসেছেন। আপিসের বড়োসাহেব Mr. Schleiermacher বলতেন, "'ফবানী' মানুষ নয়— কলের মানুষ; ও দেহে বাঙালি হলেও মনে খাঁটি জর্মান।" বলা বাহুল্য যে, 'ফবানী' হচ্ছে ভবানীরই জর্মান সংস্করণ। এই গুণেই, এই যন্ত্রের মতো নিয়মে চলার দরুনই তিনি অল্পবয়সে আপিসের বড়োবাবু হয়ে ওঠেন। সে সময়ে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি ছিল না, যদিচ দেখতে মনে হত যে তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। চোখের এরকম ভুল হবার কারণ এই যে, অপর্যাপ্ত এবং অতিপ্রবৃদ্ধ দাড়িগোঁফে তাঁর মুখে বয়সের অঙ্ক সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। বড়োবাবু যে সকলপ্রকার শখ-সাধ আমোদ-আহ্লাদের প্রতি শুধু বীতরাগ নয়, বীতশ্রদ্ধও ছিলেন, তার কারণ আমোদ জিনিসটে কোনোরূপ নিয়মের ভিতর পড়ে না। বরং, ও বস্তুর ধর্মই হচ্ছে সকলপ্রকারের নিয়ম ভঙ্গ করা। 'রুটিন' করে আমোদ করা যে কাজ করারই শামিল, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য। উৎসব ব্যাপারটি অবশ্য নিত্যকর্মের মধ্যে নয়, এবং যে কর্ম নিত্যকর্ম নয় এবং হতে পারে না, তাকে বড়োবাবু ভালোবাসতেন না— ভয় করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুচারুরূপে জীবনযাত্রানির্বাহ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনটাকে দৈনন্দিন করে তোলা; অর্থাৎ সেই জীবন— যার দিনগুলো কলে-তৈরি জিনিসের মতো— একটি ঠিক আর-একটির মতো।

বৈচিত্র্য না থাকলেও, বড়োবাবুর জীবন যে নিরানন্দ ছিল, তা নয়। তাঁর গৃহের কৌটায় এমন-একটি অমূল্য রত্ন ছিল, যার উপর তাঁর হৃদয় মন দিবারাত্র পড়ে থাকত। তাঁর স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী। বাপ-মা তার নাম

রেখেছিলেন পটেশ্বরী। এ নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তার পিতৃকুলের, তার মাতৃকুলের কেউ কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন নি ; তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলতেন, এ হেন রূপ পটের ছবিতেই দেখা যায়, রক্তমাংসের শরীরে দেখা যায় না। এমন-কি, চাকর-দাসীরাও পটেশ্বরীকে আরমানি বিবির সঙ্গে তুলনা করত। বড়োবাবুর তাদৃশ সৌন্দর্যবোধ না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী— শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী— এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর রূপবর্ণনা করতে পারতেন না, কেননা বড়োবাবু আর যাই হন— কবিও নন, চিত্রকরও নন। তা ছাড়া বড়োবাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনো ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেন নি। একটি প্রাকৃত কবি বলেছেন যে, তাঁর প্রিয়ার সমগ্ররূপ কেউ কখনো দেখতে পায় নি ; কেননা যার চোখ তার যে অঙ্গে প্রথম পড়েছে, সেখান থেকে তার চোখ আর উঠতে পারে নি। সম্ভবত ঐ কারণে বড়োবাবুর মুগ্ধনেত্র পটেশ্বরীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কখনো আয়ত্ত করতে পারে নি। বড়োবাবু জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো আর তার চোখদুটি সাত-রাজার-ধন কালো মানিকের মতো। এই রূপের অলৌকিক আলোতেই তাঁর সমস্ত নয়ন-মন পূর্ণ করে রেখেছিল। বড়োবাবুর বিশ্বাস ছিল যে, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই তিনি এহেন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন। এই শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা যে পথ ভুলে তাঁর হাতে এসে পড়েছে এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়েছে, এ মনে করে তাঁর আনন্দের আর অবধি ছিল না।

কিন্তু মানুষের যা অত্যন্ত সুখের কারণ, প্রায়ই তাই তার নিতান্ত অসুখের কারণ হয়ে ওঠে। এ স্ত্রী নিয়ে বড়োবাবুর মনে সুখ থাকলেও সোয়াস্তি ছিল না। দরিদ্রের ঘরে কোহিনুর থাকলে তার রাত্তিরে ঘুম হওয়া অসম্ভব। বড়োবাবুর অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিল। এ রত্ন হারাবার ভয় মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনকে ছেড়ে যেত না, তাই তিনি সকালসন্ধ্যা কিসে তা রক্ষা করা যায় সেই ভাবনা সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। আপিসের কাজে তন্ময় থাকাতে, কেবলমাত্র দশটা-পাঁচটা তিনি এই দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। বড়োবাবুর যদি আপিস না থাকত তা হলে বোধ হয় তিনি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতেন।

বড়োবাবুর মনে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের উদয় হত। অথচ

সে সন্দেহের কোনো স্পষ্ট কারণ ছিল না। কিন্তু তার থেকে তিনি কোনোরূপ সান্ত্বনা পেতেন না।— কেননা অস্পষ্ট ভয় অস্পষ্ট ভাবনাই আমাদের মনকে সব চাইতে বেশি পেয়ে বসে এবং বেশি চেপে ধরে। তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করবার কোনোরূপ বৈধ কারণ না থাকলেও বড়োবাবুর মনে তার সপক্ষে অনেকগুলি ছোটোখাটো কারণ ছিল। প্রথমত, সাধারণত স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল। 'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ', এ বাক্যের প্রথম অংশ তিনি বেদবাক্য স্বরূপে মানতেন। তার পর তাঁর ধারণা ছিল যে, রূপ আর চরিত্র প্রায় একাধারে পাওয়া যায় না। তাঁর শ্বশুরপরিবারের অন্তত পুরুষদের চরিত্রবিষয়ে তেমন সুনাম ছিল না। পাটের কারবারে হঠাৎ অগাধ পয়সা করায় সে পরিবারের মাথা অনেকটা বিগড়ে গিয়েছিল ; ফলে, তাঁর শ্বশুরবাড়ির হালচাল অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্যালক তিনটি যে আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই দিন কাটাতেন এ কথা তো শহরসুদ্ধ লোক জানত, এবং এদের ভাইবোনের ভিতর যে পরস্পরের অত্যন্ত মিল ছিল, সে সত্য বড়োবাবুর নিকট অবিদিত ছিল না। ভাইদের সঙ্গে দেখা হলে পটেশ্বরীর মুখ হাসিতে ভরে উঠত, তাদের সঙ্গে তার কথা আর ফুরত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অনর্গল বকে যেত, আর হেসে কুটিকুটি হত। এ-সব সময়ে বড়োবাবু অবশ্য উপস্থিত থাকতেন না, তাই এদের কি যে কথা হত তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তিনি ধরে রেখেছিলেন যে, তখন যা বলা-কওয়া হত সে-সব নেহাত বাজে কথা। ভাইদের সঙ্গে এই হাসি-তামাসা, তিনি পটেশ্বরীর চরিত্রের আমোদপ্রিয়তার লক্ষণ বলেই মনে করতেন। এ অবশ্য তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। বড়োবাবুর স্বভাবটি যেমন চাপা, পটেশ্বরীর স্বভাব ছিল তেমনি খোলা। তার চালচলন কথাবার্তার ভিতর প্রাণের যে সহজ সরল স্ফূর্তি ছিল, বড়োবাবু তাকে চঞ্চলতা বলতেন, এবং এই চঞ্চলতাকে তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তার পর পটেশ্বরীর কোনো সন্তানাদি হয় নি, সুতরাং তার যৌবনের কোনো ক্ষয় হয় নি। যদিচ তখন তার বয়স চব্বিশ বৎসর, তবুও দেখতে তাকে ষোলোর বেশি দেখাত না, এবং তার স্বভাব ও মনোভাবও ঐ ষোলো বৎসরের অনুরূপই ছিল। বড়োবাবুর পক্ষে বিশেষ কষ্টের বিষয় এই ছিল যে, এই-সব ভয়-ভাবনা তাঁকে নিজের মনেই চেপে রাখতে হত। পটেশ্বরীর কোনো কাজে বাধা

দেওয়া কিংবা তাকে কোনো কথা বলা, বড়োবাবুর সাহসে কখনো কুলোয় নি। এমন-কি, বাঙালি ঘরের মেয়ের পক্ষে, বিশেষত ভদ্রমহিলার পক্ষে শিশ্‌ দেওয়াটা যে দেখতেও ভালো দেখায় না, শুনতেও ভালো শোনায় না— এই সহজ কথাটাও বড়োবাবু্‌ তাঁর স্ত্রীকে কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেন নি। তার প্রথম কারণ, পটেশ্বরী বড়োমানুষের মেয়ে। শুধু তাই নয়, একমাত্র কন্যা। বাপ-মা-ভাইদের আদর পেয়ে পেয়ে সে অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠেছিল, একটি রূঢ় কথাও তার গায়ে সইত না, অনাদরের ঈষৎ স্পর্শে তার চোখ জলে ভরে আসত। আর পটেশ্বরীর চোখের জল দেখবার শক্তি আর যারই থাক্‌ বড়োবাবুর দেহে ছিল না। তা ছাড়া দেবতার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে মানুষমাত্রেরই সংকোচ হয়, ভয় হয়; এবং, তাঁর শ্যালকদের বিশ্বাস অন্যরূপ হলেও, তিনি মনুষ্যত্ববর্জিত ছিলেন না। সে যাই হোক, বড়োবাবুর মনে শান্তি ছিল না বলে যে সুখ ছিল না, এ কথা সত্য নয়। বিপদের ভয় না থাকলে মানুষে সম্পদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই-সব ভয়-ভাবনাই বড়োবাবুর স্বভাবত-ঝিমন্ত মনকে সজাগ সচেতন ও সতর্ক করে রেখেছিল। তা পটেশ্বরী সম্বন্ধে তাঁর ভয় যে অলীক এবং তাঁর সন্দেহ যে অকারণ, এ জ্ঞান অন্তত দিনে একবার করেও তাঁর মনে উদয় হত এবং তখন তাঁর মন কোজাগর পূর্ণিমার রাতের মতো প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়ে উঠত।

বড়োবাবুর মনে শুধু দুটি ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাগ। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অবশ্য তাঁর কোনোরূপ বিদ্বেষ ছিল না, কেননা ধর্ম নিয়ে কখনো মিছে মাথা বকান নি। দেবতা এক কি বহু, ঈশ্বর আছেন কি নেই, যদি থাকেন তা হলে তিনি সাকার কি নিরাকার, ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোনো পদার্থ আছে কি না, থাকলেও তার স্বরূপ কি— এ-সকল সমস্যা তাঁর মনকে কখনো ব্যতিব্যস্ত করে নি, তাঁর নিদ্রার এক রাত্তিরের জন্যও ব্যাঘাত ঘটায় নি। তিনি জানতেন যে, বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান করবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তবে এর থেকে অনুমান করা অসংগত হবে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। আমাদের অধিকাংশ লোকের ভূতপ্রেত সম্বন্ধে যে মনোভাব, ঠাকুরদেবতা সম্বন্ধে বড়োবাবুর ঠিক সেইরূপ মনোভাব ছিল— অর্থাৎ তিনি তাদের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও পুরো ভয় করতেন। আপিসের

হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হলে তিনি কালীঘাটে আগে পুজো দিয়ে পরে আদালতে আসতেন— এই উদ্দেশ্যে যে, মা-কালী তাঁকে জেরার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত নয়, সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধেই তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা যৌবন-বিবাহ বিধবা-বিবাহ— এ-সকল কথা শুনে তিনি কানে হাত দিতেন। এ-সব মত যারা প্রচার করে তারা যে সমাজের ঘোর শত্রু, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাঁর নিজের পক্ষে কি ভালোমন্দ, তারই হিসেব থেকেই তিনি সমাজের পক্ষে কি ভালোমন্দ তাই স্থির করতেন। স্ত্রীস্বাধীনতা?— তাঁর স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলে কি প্রলয় কাণ্ড হবে, সে কথা মনে করতেও তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হত। যিনি নিজের স্ত্রীরত্নকে সামলে রাখবার জন্য ছাদের উপরে ছ হাত উঁচু দরমার বেড়ার ঘের দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর বাড়ির ভিতর পাড়াপড়শীর নজর না পড়ে— তাঁর কাছে অবশ্য স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া আর ঘরভাঙা— দুই-ই এক কথা। তার পর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। স্ত্রীজাতির শরীরের অপেক্ষা মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যে কম বিপজ্জনক, এ ভুল ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি এই সার বুঝেছিলেন যে, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখানোর অর্থ হচ্ছে, বাইরের লোকের এবং বাজে লোকের মনের সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পটেশ্বরী যে সামান্য লেখাপড়া জানত তার কুফল তো তিনি নিত্যই চোখে দেখতে পেতেন। তিনি তাকে যত ভালো ভালো বই কিনে দিতেন— যাতে নানারূপ সদুপদেশ আছে— পটেশ্বরী তার দুই-এক পাতা পড়ে ফেলে দিত; আর সে বাপের বাড়ি থেকে যে-সব বাজে গল্পের বই নিয়ে আসত, দিনমান বসে বসে তাই গিলত। সে-সব কেতাবে কি লেখা আছে তা না জানলেও বড়োবাবু এটা নিশ্চিত জানতেন যে, তাতে যা আছে তা কোনো বইয়ে থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের অল্প লেখাপড়ার ভোগ যদি মানুষকে এইরকম ভুগতে হয় তা হলে তাদের বেশি লেখাপড়ার ফলে যে সর্বনাশ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি। তার পর যৌবন-বিবাহের প্রচলনের সঙ্গে যে স্বেচ্ছাবিবাহের প্রবর্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এ জ্ঞান বড়োবাবুর ছিল। আমাদের সমাজে যদি স্বেচ্ছাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকত তা হলে বড়োবাবুর দশা কি হত! পটেশ্বরী যে স্বয়ম্বর-

সভায় তাঁর গলায় মালা দিতেন না, এ বিষয়ে বড়োবাবু নিঃসন্দেহ ছিলেন। বড়োবাবুর যে রূপ নেই, সে জ্ঞান তাঁর ছিল— কেননা তাঁর সর্বাঙ্গ সেই অভাবের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত; এবং পটেশ্বরী যে মনুষ্যত্বের মর্যাদা বোঝে না, এ সত্যের পরিচয় তিনি বিবাহাবধি পেয়ে এসেছেন। পটেশ্বরী যে মানুষের চাইতে কুকুর বিড়াল, লাল মাছ, সাদা ইঁদুর, ছাই রঙের কাকাতুয়া, নীল রঙের পায়রা বেশি ভালোবাসত, তার প্রমাণ তো তাঁর গৃহাভ্যন্তরেই ছিল। বাপের পয়সায় তাঁর স্ত্রী তাঁর অন্দরমহলটি একটি ছোটোখাটো চিড়িয়াখানায় পরিণত করেছিল। তার পর বিধবাবিবাহের কথা মনে করতে বড়োবাবুর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ করলে পটেশ্বরী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে, আর সে সংবাদ যদি স্বর্গে পৌঁছয়, তা হলে সেই মুহূর্তে স্বর্গ নরক হয়ে উঠবে।

২

বড়োবাবুর মনের এই দুটি প্রধান প্রবৃত্তি, এই অনুরাগ আর এই বিরাগ, একজোট হয়ে তাঁকে বড়োদিনে থিয়েটারে নিয়ে যায়; নচেৎ শখ করে তিনি অর্থ এবং সময়ের ওরূপ অপব্যয় কখনো করতেন না।

বড়োদিনের ছুটিতে পটেশ্বরী তার বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আপিসের কাজ নেই, ঘরে স্ত্রী নেই— অর্থাৎ বড়োবাবুর জীবনের যে দুটি প্রধান অবলম্বন, দুই একসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে পৃথিবী খালি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী ঘরে থাকলেও ছুটির দিনে বড়োবাবু অবশ্য বাড়ির ভিতর বসে থাকতেন না। তবে এক ঘরে ফুল থাকলে তার পাশের ঘরটিকে তার সৌরভে যেমন পূর্ণ করে রাখে, তেমনি পটেশ্বরী অন্তঃপুরে থাকলেও অদৃশ্য ফুলের গন্ধের মতো তার অদৃশ্য দেহের রূপে বড়োবাবুর গৃহের ভিতর-বার পূর্ণ করে রাখত। প্রতিমা অন্তর্হিত হলে মন্দিরের যে অবস্থা হয়, পটেশ্বরীর অভাবে তাঁর গৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

বড়োবাবু এই শূন্য মন্দিরে কি করে দিন কাটাবেন তা আর ভেবে পেতেন না। প্রথমত, তাঁর কোনো বন্ধুবান্ধব ছিল না, তিনি কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালোবাসতেন না। গল্প করা কিংবা তাস-পাশা খেলা, এ-সব তাঁর ধাতে ছিল না। তার পর তাঁর বাড়িতে কোনো ভদ্রলোক আসা তিনি

নিতান্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রীর স্বভাবে কৌতূহল জিনিসটে কিঞ্চিৎ বেশিমাত্রায় ছিল; তার স্বামীর কাছে কোনো লোক এলে পটেশ্বরী খড়খড়ের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পারত না।

তার পর সময় কাটাবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়— বই পড়া— তাঁর কোনো-কালেই অভ্যাস ছিল না। তাঁর বাড়িতেও এমন কেউ ছিল না যার সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করতে পারতেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল, তাঁর স্ত্রী আর তিনি। তিনি গাঁ-সম্পর্কের যে মাসিটিকে পটেশ্বরীর প্রহরীস্বরূপে বাড়িতে এনে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কথা কইতে বড়োবাবু ভয় পেতেন। কেননা ঐ ধার-করা মাসিমাটি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই দুঃখের কান্না কাঁদতে বসতেন, এবং সর্বশেষে টাকা চাইতেন। বড়োবাবু টাকা কাউকেও দিতে ভালোবাসতেন না, আর উক্ত মাসিমাটিকে তো নয়ই; কারণ তিনি জানতেন যে, সে টাকা মাসির গুণধর ছেলেটির মদের খরচে লাগবে। এই-সব কারণে বড়োবাবু নিরুপায় হয়ে দুটি গোটা দিন খবরের কাগজ পড়ে কাটিয়েছিলেন। ওরই মধ্যে একখানিতে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ল। তাতে তিনি দেখলেন যে, সাবিত্রী থিয়েটারে খৃস্ট্‌মাস রজনীতে 'সংস্কারের কেলেঙ্কার' নামক প্রহসনের অভিনয় হবে। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রহসনের নাম শুনেই সেটির প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে উঠল; তার পর তিনি সেই বিজ্ঞাপন হতে এই জ্ঞানসঞ্চয় করলেন যে, উক্ত প্রহসনে সংস্কারকদের উপর বেশ এক হাত নেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তাঁর মন 'সংস্কারের কেলেঙ্কার'এর অভিনয় দেখবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু থিয়েটারে যাওয়া সম্বন্ধে তিনি সহসা মনস্থির করে উঠতে পারলেন না।

তার প্রধান কারণ, তিনি ইতিপূর্বে কখনো থিয়েটারে যান নি; শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর সুমুখে তিনি বহুবার থিয়েটারের বহু নিন্দা করেছেন। থিয়েটারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের কারণ এই ছিল যে, সেখানে ভদ্রঘরের মেয়েরাও যাতায়াত করে। তাঁর মতে অন্তঃপুরবাসিনীদের থিয়েটারে যেতে দেওয়াও যা, আর পত্র-আবডাল দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়াও তাই। ওর চাইতে মেয়েদের গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে দেওয়া শতগুণে শ্রেয়। আর তিনি যে সময়ে-অসময়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এ বিষয়ে তাঁর কড়াকড়া মতামত সব প্রকাশ করতেন, তার কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, থিয়েটার দেখা তাঁর

খ্যালাজগণের নিত্যকর্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল। পাছে তাঁর স্ত্রী, তার বৌদিদিদের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই ভয়ে তিনি পটেশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে থিয়েটারের বিরুদ্ধে যত কটু কথা প্রয়োগ করতেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল, শ্বশুরকুলের বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো। এর ফলে পটেশ্বরীর মনে থিয়েটার সম্বন্ধে এমনি একটি বিশ্রী ধারণা জন্মেছিল যে, তার বৌদিদিদের হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে কখনো কোনো থিয়েটারের চৌকাঠ ডিঙয় নি। অন্তত সে তো তার স্বামীকে তাই বুঝিয়েছিল। বড়োবাবু তাঁর স্ত্রীর এ কথা বিশ্বাস করতেন ; কেননা তা না করলে তিনি জানতেন যে তাঁর মুখের ভাত গলা দিয়ে নামবে না, রাত্তিরে চোখের পাতা পড়বে না, আপিসের খাতায় ঠিক নামাতে ভুল হবে— এক কথায় তাঁর বেঁচে আর কোনো সুখ থাকবে না। এর পর তিনি নিজে যদি সেই পাপ থিয়েটার দেখতে যান, তা হলে তাঁর স্ত্রী কি আর তাঁকে ভক্তি করবে ? বলা বাহুল্য, তাঁর স্ত্রীর স্বামীভক্তির উপরে তিনি তাঁর জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন।

এক দিকে স্বচক্ষে সংস্কারকদের লাঞ্ছনা দেখবার অদম্য কৌতূহল, অপর দিকে স্ত্রীর ভক্তি হারাবার ভয়— এই দুটি মনোভাবের মধ্যে তিনি এতদূর দোলাচলচিত্তবৃত্তি হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁর আর মনস্থির করা হল না। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি উভয়েরই বল সমান ছিল বলে এর একটি অপরটিকে পরাস্ত করতে পারছিল না।

অতঃপর সূর্য যখন অস্ত গেল তখন 'সংস্কারের কেলেঙ্কার'এর অভিনয় দেখাটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য, এই ধারণাটি হঠাৎ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। একা বাড়িতে দিনটা বড়োবাবু কোনো প্রকারে কাটালেও ও অবস্থায় সন্ধেটা কাটানো তাঁর পক্ষে বড়োই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেই গোধূলিলগ্নে পটেশ্বরী সম্বন্ধে যতরকম দুশ্চিন্তা সংশয় ভয় ইত্যাদি চামচিকে-বাদুড়ের মতো এসে তাঁর সমস্ত মনটাকে অধিকার করে বসত। তিনি দুদিন এ উপদ্রব সহ্য করেছিলেন, তৃতীয় দিন সহ্য করবার মতো ধৈর্য ও বীর্য বড়োবাবুর দেহে থাকলেও, মনে ছিল না। তিনি স্থির করলেন থিয়েটারে যাবেন, এবং সে কথা পটেশ্বরীর কাছে চেপে যাবেন। তিনি না বললে পটেশ্বরী কি করে জানবে যে তিনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন, সে তো আর ও-সব

জায়গায় যায় না। এক ধরা পড়বার ভয় ছিল তাঁর শ্যালাজদের কাছে। যদি তারাও সে রাত্তিরে ঐ একই থিয়েটারে যায়, এবং সেখানে বড়োবাবুকে দেখতে পায়, তা হলে সে খবর নিশ্চয়ই পটেশ্বরীর কানে পৌছবে। যদি তা হয়, তা হলে তিনি অম্লানবদনে সে কথা অস্বীকার করবেন, এইরূপ মনস্থ করলেন ; চিকের আড়াল থেকে দেখলে যে লোক চিনতে ভুল হওয়া সম্ভব— এ সত্য তাঁর স্ত্রীও অস্বীকার করতে পারবেন না।

৩

সে রাত্তিরে বড়োবাবু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে— অর্থাৎ এক-রকম না খেয়েই— গায়ে আল্‌স্টার চড়িয়ে, গলায় কম্‌ফর্টার জড়িয়ে, মাথা মুখে শাল ঢাকা দিয়ে, সাবিত্রী থিয়েটারের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। পাছে পাড়ার লোক তাঁকে দেখতে পায়, পাছে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সুনাম একদিনে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি নীলনিচোলাবৃত অভিসারিকার মতো ভীতচকিত চিত্তে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পথ চলতে লাগলেন।

এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে তাঁর আল্‌স্টারের বর্ণ ছিল ঘোর নীল, আর নিচোল-পদার্থটি শাড়ি নয়— ওভারকোট। অনাবশ্যক রকম শীতবস্ত্রের ভার বহন করাটা অবশ্য তাঁর পক্ষে মোটেই আরামজনক হয় নি ; বিশেষত কম্‌ফর্টার নামক গলকম্বলটি তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল, তার শোভা সে পরিমাণে বৃদ্ধি করে নি। পাঁচ হাত লম্বা উরু পশমের গলাবন্ধটি কণ্ঠে ধারণ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর হলেও প্রাণ ধরে তিনি সেটি ত্যাগ করতে পারতেন না ; তার কারণ পটেশ্বরী সেটি নিজ হাতে বুনে দিয়েছিল। বড়োবাবুর বিশ্বাস ছিল, পাঁচরঙা উলে-বোনা ঐ বস্তুটির তুল্য সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কারুকার্যের ঐ হচ্ছে চরম ফল। সৌন্দর্যে, আকাশের ইন্দ্রধনুর সঙ্গে শুধু তার তুলনা হতে পারত। স্ত্রীহস্ত-রচিত এই গলবস্ত্রটি ধারণ করে তাঁর দেহের যতই অসোয়াস্তি হোক, তাঁর মনের সুখের আর সীমা ছিল না। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন যে, পটেশ্বরীর অন্তরের ভালোবাসা যেন সাকার হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

অবশেষে বড়োবাবু থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সে জায়গা প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই লোকারণ্যে প্রবেশ করবামাত্র তিনি এতটা ভেবড়ে

গেলেন যে নিজের সীটে যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন, আর-এক ব্যক্তির পা মাড়িয়ে দিলেন। তার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে যে-সব কথা বলা হয়েছিল তাকে ঠিক স্বাগত-সম্ভাষণ বলা যায় না।

তখনো drop-scene ওঠে নি, সবে কন্‌সার্ট শুরু হয়েছিল ; বেহালাগুলো সব সমস্বরে চিঁ চিঁ করছিল, cello গ্যাঙরাচ্ছিল, bass viola থেকে হুংকার ছাড়ছিল, এবং double bass দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁকাহোঁকা করছিল। তবে ঐ ঐকতান সংগীতের প্রতি বড়ো কেউ যে কান দিচ্ছিলেন না তার প্রমাণ, দর্শকবৃন্দের আলাপের গুঞ্জনে ও হাসির ঝংকারে রঙ্গভূমি একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তার পর drop-scene যখন পাক খেয়ে খেয়ে শূন্যে উঠে গেল তখন ডজন-দুয়েক অভিনেত্রী লালপরী নীলপরী সবজাপরী জরদাপরী প্রভৃতি রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে খামকা অকারণ নৃত্যগীত শুরু করে দিলে। বড়োবাবুর মনে হল, তাঁর চোখের স্তবকে স্তবকে সব পারিজাত ফুটে উঠল, আর এই-সব স্বর্গের ফুল যেন নন্দনবনের মন্দ পবনের স্পর্শে কখনো জড়িয়ে কখনো ছড়িয়ে, ঈষৎ হেলতে-দুলতে লাগল। ক্রমে এই-সকল নর্তকীদের কম্পিত ও আন্দোলিত দেহ ও কণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত নৃত্য ও গীতের হিল্লোল সমগ্র রঙ্গালয়ের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত হল, সে হিল্লোলের স্পর্শে দর্শকমণ্ডলী শিহরিত পুলকিত হয়ে উঠল। মিনিট-পাঁচেকের জন্য অর্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করে এই পরীর দল যখন সবেগে চক্রাকারে ভ্রমণ করতে লাগল, তখন চারি দিক থেকে সকলে মহা উল্লাসে 'encore' 'encore' বলে চিৎকার করতে লাগল। এত আলো এত রঙ এত সুরের সংস্পর্শে বড়োবাবুর ইন্দ্রিয় প্রথম থেকেই ঈষৎ সচকিত উত্তেজিত হয়েছিল, তার পর সমবেত দর্শকমণ্ডলীর এই তরঙ্গিত আনন্দ তাঁর দেহমনকে একটি সংক্রামক ব্যাধির মতো আক্রমণ করলে। পান করা অভ্যাস না থাকলে একপাত্র মদও যেমন মানুষের মাথায় চড়ে যায় আর তাকে বিহ্বল করে ফেলে, এই নাচ-গান বাজনাও তেমনি বড়োবাবুর মাথায় চড়ে গেল এবং তাঁকে বিহ্বল করে ফেললে। আমোদের নেশায় তাঁর ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়ে পড়ল ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অতঃপর নেচে নেচে শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত -কলেবর হয়ে নর্তকীর দল যখন নৃত্যে ক্ষান্ত দিলে, তখন একটি স্থূলাঙ্গী বয়স্কা গায়িকা অতি-মিহি অতি-নাকী এবং অতি-টানা সুরে একটি

গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সে তো গান নয়, ইনিয়ে-বিনিয়ে নাকে-কান্না। বড়োবাবু যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ সেই গান যেমনি থামা অমনি তিনি বড়োগলায় 'encore' 'encore' বলে দু-তিন বার চিৎকার করলেন। তাই শুনে তাঁর এপাশে ওপাশে যে-সব ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তাঁরা বড়োবাবুর দিকে কট্‌মট্ করে চাইতে লাগলেন।

এ গানের যে সুরতালের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না সে জ্ঞান অবশ্য বড়োবাবুর ছিল না; তাই উক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটি রসিক ব্যক্তি যখন তাঁকে এই প্রশ্ন করলেন যে, "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে, এ কথা কি মহাশয় কখনো শোনেন নি? আর এটাও কি মালুম হল না যে উনি যে পুরিয়া উদ্গার করলেন, সেটি সরপুরিয়া নয়— ক্যালমেলের পুরিয়া?"— তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন ও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

নৃত্যগীত সমাধা হবার পর আবার drop-scene পড়ল, আবার কন্‌সার্ট বেজে উঠল। তাঁতের ছোটো বড়ো মাঝারি বিলিতি যন্ত্রগুলো বাদকদের ছড়ির তাড়নায় গ্যাঁ গোঁ কোঁ প্রভৃতি নানারূপ কাতর ধ্বনি করতে লাগল; ক্লারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্ঞাতি-শত্রুতার ঝগড়া শুরু করে দিলে এবং অতি কর্কশ আর অতি তীব্র কণ্ঠে, যা মুখে আসে তাই বললে; তার পর ঢোলকের মুখ দিয়ে ঝড় বয়ে গেল; শেষটা করতাল যখন কড় কড় কড়াৎ করে উঠলে তখন কন্‌সার্টের দম ফুরিয়ে গেল। বড়োবাবু ইতিমধ্যে এ-সব গোলমালে কতকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলেন, সুতরাং ঐকতান সংগীতের বিলিতি মদ তাঁর অন্তরাত্মাকে এ দফা ততটা ব্যতিব্যস্ত করতে পারলে না।

এর পর নলদময়ন্তী অভিনয় শুরু হল। বড়োবাবু হাঁ করে দেখতে লাগলেন। এ যে অভিনয়, এ জ্ঞান দু মিনিটেই তাঁর লোপ পেয়ে এল, তাঁর মনে হল নল দময়ন্তী প্রভৃতি সত্যসত্যই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে সাবিত্রী থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার পর রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবর-সভার আবির্ভাব হল তখন থিয়েটারের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা মহা-গোলযোগ উপস্থিত হল। পুরুষদের মাথার উপরে চিকের অপর পারে, রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেয়েরা অধিকার করে বসেছিলেন, সেই অঞ্চল থেকে একটা ঝড় উঠল। কোনো অজ্ঞাত কারণে সমবেত স্ত্রীমণ্ডলী ঐকতানে কলরব করতে শুরু করলেন। ফলে আকাশে স্ত্রী-কণ্ঠের কন্‌সার্ট বেজে উঠল,

তার ভিতর ক্লারিওনেট করনেট প্রভৃতি সব রকমেরই যন্ত্র ছিল, এবং তাদের পরস্পরের ভিতর কারো সঙ্গে কারো সুরের মিল ছিল না। তার পর সেই কন্‌সার্ট যখন তুন্‌ থেকে পরতুনে গিয়ে পৌঁছল, তখন অভিনয় অগত্যা বন্ধ হল। এই কলহ শুনে দময়ন্তীর বড়ো মজা লাগল, তিনি ফিক্‌ করে হেসে দর্শকমণ্ডলীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সখীরা সব অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি অভ্যাগত দেবতাগণ তটস্থ হয়ে রইলেন। অমনি silence ! silence ! শব্দে চতুর্দিক ধ্বনিত হতে লাগল, তাতে গোলযোগের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। অতঃপর দর্শকের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে, আকাশের দিকে মুখ করে, গলবস্ত্রে জোড়করে উক্ত স্ত্রী-সমাজকে সম্বোধন করে 'মা-লক্ষ্মীরা চুপ করুন' এই প্রার্থনা করতে লাগলেন; তাতে মা-লক্ষ্মীদের চুপ করা দূরে থাকুক, তাঁদের কোলের ছেলেরা জেগে উঠে ককিয়ে কাঁদতে শুরু করলে। তখন দর্শকদের মধ্যে দু-চার জন ইয়ারগোছের লোক, অতি সাদা বাঙলায় ছেলেদের মুখবন্ধ করবার এমন-একটা সহজ উপায় বাত্‌লে দিলে যা শুনে দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা অন্তররুদ্ধ হাসির বেগে ধুঁকতে লাগলেন। বড়োবাবু যদিচ জীবনে কখনো কারো প্রতি কোনোরূপ অভদ্র কথা ব্যবহার করেন নি, তথাচ তিনি ভদ্রমহিলাদের এই অপমানে খুশি হলেন। কেননা, তাঁর মতে যারা থিয়েটারে আসতে পারে, সে-সব স্ত্রীলোকের মানই-বা কি আর অপমানই-বা কি ! মিনিট-দশেক পরে, এই গোলযোগ বৈশাখী ঝড়ের মতো যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।

অভিনয় যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেইখান থেকে আবার চলতে শুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বড়োবাবু সেই অভিনয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন। এই অভিনয়-দর্শনে তিনি এতটা মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর মনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হল, তাঁর কাছে রঙ্গালয় তীর্থস্থান হয়ে উঠল। তার পর নলদময়ন্তীর বিপদ যখন ঘনিয়ে এল তখন তাঁর মন নায়ক-নায়িকার দুঃখে একেবারে অভিভূত দ্রবীভূত হয়ে পড়ল। নলের দুঃখই অবশ্য তিনি বেশি করে অনুভব করছিলেন, কেননা পুরুষমানুষের মন পুরুষমানুষেই বেশি বুঝতে পারে। নলের প্রতি তাঁর এতটা সহানুভূতির আর-একটি কারণ ছিল। তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে ঐ রঙ্গমঞ্চের নলের যথেষ্ট আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পটেশ্বরীর সঙ্গে দময়ন্তীর কোনো সাদৃশ্যই ছিল না। নলরাজ বেশ

পরিত্যাগ করবার সময় সে সাদৃশ্য এতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, মধ্যে মধ্যে বড়োবাবুর মনে ভুল হচ্ছিল যে উক্ত নল তিনি ছাড়া আর কেউ নয়, সুতরাং নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীর অঞ্চলপাশ মোচন করে, 'হা হতোঽস্মি হা দগ্ধোঽস্মি' বলে রঙ্গমঞ্চ হতে সবেগে নিষ্ক্রমণ করলেন তখন বড়োবাবু আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না; তাঁর চোখ দিয়ে, তাঁর নাক দিয়ে দরবিগলিতধারে জল তাঁর দাড়ি চুঁইয়ে তাঁর কম্‌ফর্টারের অন্তরে প্রবেশ করলে। ফলে সেই গলকম্বলটি ভিজে স্যাতা হয়ে তাঁর গলায় নেপটে ধরলে। বড়োবাবুর ভ্রম হল যে, কলি তাঁর গলায় গামছা দিয়ে— শুধু গামছা নয়— ভিজে গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

৪

ঠিক এই সময়ে একটি জেনানা-বক্স থেকে একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কানে এল। সে তো হাসি নয়, হাসির গিটকারি; জলতরঙ্গের তানের মতো সে হাসি থিয়েটারের এক কোণ থেকে আর-এক কোণ পর্যন্ত সাত সুরের বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল। অভিনয়ের দোষে নলের সজোরে পলায়নটি যে ঈষৎ হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছিল তা যাঁর চোখ আছে তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য, কিন্তু সেই হাসিতে বড়োবাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হল। তাঁর কানে সে হাসি চিরপরিচিত বলে ঠেকল— এ যে পটেশ্বরীর হাসি! যে অঞ্চল থেকে এই হাসির তরঙ্গ ছুটে এসেছিল, সেই অঞ্চলে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় উঁচু করে নিরীক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে, চিকের গায়ে মুখ দিয়ে যে বসে আছে, তার দেহের গড়ন ও বসবার ভঙ্গি ঠিক পটেশ্বরীর মতো। অবশ্য চিকের আড়াল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল, সে হচ্ছে একটি রমণীদেহের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র, কারণ সে বক্সের ভিতরে কোনো আলো ছিল না। তাই নিজের মনের সন্দেহ ঘোচাবার জন্য, তাকে একবার ভালো করে দেখে নেবার জন্য বড়োবাবু দাঁড়িয়ে উঠে সেই বক্সের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। এবারও তিনি সে স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পান নি, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু কালো কস্তাপেড়ে একখানি সাদা সুতোর শাড়ি। বড়োবাবু জানতেন যে, ওরকম শাড়ি তাঁর স্ত্রীরও আছে। এর থেকে তাঁর ধারণা হল যে, ও শাড়ি যার গায়ে আছে সে নির্ঘাত পটেশ্বরী। তার পর তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ও শাড়ির 'আঁচড়ে

উজ্জোর সোনা' লুকানো আছে। সেই তপ্তকাঞ্চনের আভায় তাঁর চোখ ঝলসে গেল, তার আঁচে তাঁর চোখের তারা দুটি যেন পুড়ে গেল, তিনি চোখ চেয়ে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

ও ভাবে দণ্ডায়মান বড়োবাবুকে সম্বোধন করে চার দিক থেকে লোকে 'sit down' 'sit down' বলে চিৎকার করতে লাগল। তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি বললেন, "মশায়, থিয়েটার দেখতে এসেছেন, থিয়েটার দেখুন, মেয়েদের দিকে অমন করে চেয়ে রয়েছেন কেন? আপনি দেখছি অতিশয় অভদ্র লোক!" এই ধমক খেয়ে তিনি বসে পড়লেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পক্ষে অভিনয়ে মনোনিবেশ করা আর সম্ভব হল না। তাঁর চোখের উপরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাচ্ছিল, আর বুকের ভিতর কত কি তোলপাড় করছিল, ছটফট করছিল। এক কথায় তাঁর হৃদয়মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় শুরু হয়েছিল।

তার পর অভিনয়ের টুকরো-টাকরা যা তাঁর চোখে পড়ছিল, তাতে তিনি আরো কাতর হয়ে পড়লেন, এই মনে করে— কোথায় দময়ন্তী, আর কোথায় পটেশ্বরী! তার পর তাঁর মনে হল যে পটেশ্বরী যদি তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারে, বিশ্বাসঘাতিনী হতে পারে, তা হলে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের কোন্ স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যে বিশ্বাস করা যেতে পারে? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, নলদময়ন্তীর কথা মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, নীতি মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা!— মানুষের কষ্টই হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র সত্য বস্তু। তখন তাঁর কাছে ঐ অভিনয় একটা বীভৎস কাণ্ড হয়ে দাঁড়াল।

এ দিকে তাঁর হাত-পা সব হিম হয়ে এসেছিল, তাঁর মাথা ঘুরছিল, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে অনবরত ঘাম পড়ছিল— অর্থাৎ তাঁর দেহে মূর্ছার পূর্বলক্ষণ সব দেখা দিয়েছিল। তিনি আর ভিতরে থাকতে পারলেন না— থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালেন। বড়োবাবু উপরে চেয়ে দেখলেন যে, অনন্ত আকাশ জুড়ে অগণ্য নক্ষত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে সব চোখ টিপে হাসছে। এ বিশ্ব যে কতদূর নির্মম, কতদূর নিষ্ঠুর, এই প্রথম তিনি তার সাক্ষাৎপরিচয় পেলেন। তার পর এই আকাশদেশের অসীমতা তাঁর কাছে হঠাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, এই নীরব নিস্তব্ধ মহাশূন্যের ভিতর দাঁড়িয়ে তাঁর বড়ো একা একা ঠেকতে লাগল; তাঁর মনে হল, এই বিরাট বিশ্বের কি ভিতরে কি বাইরে কোথাও প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, দেবতা নেই— যা আছে তা

হচ্ছে আগাগোড়া ফাঁকা, আগাগোড়া ফাঁকি। সেইসঙ্গে তিনি যেন দিব্য-চক্ষে দেখতে পেলেন যে, ঐ-সব গ্রহ চন্দ্র তারা প্রভৃতি আকাশপ্রদীপগুলো ঐ থিয়েটারের বাতির মতো দুদণ্ড জ্বলে যখন নিবে যাবে তখন সংসার-নাটকের অভিনয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে, আর থাকবে শুধু অসীম অনন্ত অখণ্ড অন্ধকার! অমনি ভয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলে, তিনি এই অনন্ত বিভীষিকার মূর্তি চোখের আড়াল করবার জন্য থিয়েটারে পুনঃপ্রবেশ করবার সংকল্প করলেন। অমনি তাঁর মনশ্চক্ষু হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরে গেল, আর তার জায়গায় পটেশ্বরী এসে দাঁড়ালে। অসংখ্য অপরিচিত অসভ্য ও আমোদপ্রিয় লোকের মধ্যে তাঁর স্ত্রী একা বসে রয়েছে— এই মনে করে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, চিকের আবরণ ভেদ করে শত শত লোলুপনেত্রের আরক্তদৃষ্টি পটেশ্বরীর দেহকে স্পর্শ করছে, অঙ্কিত করছে, কলঙ্কিত করছে।

এর পর বড়োবাবুর পক্ষে আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকা সম্ভব হল না, তিনি পাগলের মতো ছুটে গিয়ে আবার থিয়েটারের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এবার তাঁর আর অভিনয় দেখা হল না; তাঁর চোখের সুমুখে কোত্থেকে যেন একটি ঘন কুয়াশা উঠে এসে চার দিক ঝাপসা করে দিলে। দেখতে না দেখতেই অভিনয় ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়াল। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কতক কথা তাঁর কানে ঢুকলেও, তার একটি কথাও তাঁর মনে ঢুকল না। কেননা, সে মনের ভিতর শুধু একটি কথা জাগছিল, উঠছিল, পড়ছিল। যে স্ত্রীলোক খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল— সে পটেশ্বরী, কি পটেশ্বরী নয়? এই ভাবনা, এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে বসেছিল। তিনি বারবার সেই জেনানা-বক্সের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, এবং প্রতিবার তাঁর মনে হল যে, এ পটেশ্বরী না হয়ে আর যায় না। শুধু তাই নয়, তিনি রঙ্গালয়ের অন্দরমহলের যে দিকে দৃষ্টিপাত করলেন— সেই দিকেই দেখলেন পটেশ্বরী বসে আছে। ক্রমে এই দৃশ্য তাঁর কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠল যে, তিনি চোখ বুজলেন। তাতেও কোনো ফল হল না। তাঁর বোজা চোখের সুমুখেও পটেশ্বরী এসে উপস্থিত হল; পরনে সেই কালা কস্তাপেড়ে শাড়ি, আর মুখ সেই চিকে ঢাকা। তখন তাঁর জ্ঞান হল যে, তাঁর মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে তা দূর করতে না পারলে তিনি সত্য সত্যই

পাগল হয়ে যাবেন। তাই তিনি শেষটা মন স্থির করলেন যে, থিয়েটার ভাঙবার মুখে, যে দরজা দিয়ে মেয়েরা বেরোয়, সেই দরজার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কেননা একবার সামনাসামনি স্বচক্ষে না দেখলে তাঁর মনের এ সন্দেহ আর কিছুতেই দূর হবে না।

তার পর যা ঘটেছিল তা দু কথায় বলা যায়। থিয়েটার ভাঙবার মিনিট-দশেক পরে থিয়েটারের খিড়কিদরজায় একখানি জুড়িগাড়ি এসে দাঁড়াল। বড়োবাবুর মনে হল, এ তাঁর শ্বশুরবাড়ির গাড়ি— যদিচ কেন যে তা মনে হল, তা তিনি ঠিক বলতে পারতেন না। তার পর তিনটি ভদ্রমহিলা আর একটি দাসী অতি দ্রুতপদে এসে সেই গাড়িতে চড়লে, অমনি সহিস তার কপাট বন্ধ করে দিলে। বড়োবাবু এঁদের কারো মুখ দেখতে পান নি, কেননা সকলেরই মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় পটেশ্বরীর সমান উঁচু; তাই দেখে বড়োবাবু বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে পা-দানের উপর লাফিয়ে উঠে দু হাত দিয়ে জোর করে গাড়ির দরজা ফাঁক করলেন। মেয়েরা সব ভয়ে হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, আর রাস্তার লোকে সব 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করতে লাগল। বড়োবাবু অমনি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ করলেন, আর পিছনে অন্তত পঞ্চাশ জন লোক 'পাহারাওয়ালা' 'পাহারাওয়ালা' বলে হাঁক দিতে দিতে ছুটতে লাগল।

এই ঘোর বিপদে পড়ে বড়োবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। তিনি যেন বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পেলেন যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতলামির ভান করা। তাতে নয় দুশো টাকা জরিমানা হবে, কিন্তু গাড়ি চড়াও করে ভদ্রমহিলাকে বে-ইজ্জত করবার চার্জে জেল নিশ্চিত। মদ না খেয়ে মাতলামির অভিনয় করা— যখন দেহের কলকব্জাগুলো সব ঠিক ভাবে গাঁথা থাকে তখন সে দেহকে বাঁকানো চোরানো দোমড়ানো কোঁকড়ানো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে এক মুহূর্তে জড়ো করা, আর তার পরমুহূর্তে ছড়িয়ে দেওয়া অতিশয় কঠিন এবং কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু হাজার কষ্টকর হলেও আত্মরক্ষার্থে, যতক্ষণ না তিনি পাহারাওয়ালা কর্তৃক ধৃত হন, ততক্ষণ বড়োবাবুকে এই কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। তার পর অজস্র চড়-চাপড় রুলের গুঁতো খেতে খেতে তিনি যখন গারদে গিয়ে হাজির হলেন, তখন রাত প্রায় চারটে বাজে। সেখানে থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি

শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাঠাতে বাধ্য হলেন। ভোর হতে না হতেই তাঁর বড়ো শ্যালক তথায় উপস্থিত হয়ে বেশ দু পয়সা খরচ করে তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

রাস্তায় তিনি বড়োবাবুকে নানারূপ গঞ্জনা দিলেন। তিনি বললেন, "এতদিন শুনে আসছিলুম আমরাই খারাপ লোক, আর তুমি ভালো লোক। ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না, কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, ডুবে ডুবে মদ খেলে পুলিসে টের পায়!"

তার পর তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্বশুর কোনো কথা কইলেন না। শুধু তাঁর ছোটো শ্যালক বললেন, "Beauty and the Beastএর কথা লোকে বইয়ে পড়ে; পটেশ্বরীর কপাল-দোষে আমরা তা বরাবর চোখেই দেখে আসছি। তুমি চরিত্রেও যে beast, এ কথা এতদিন জানতুম না; আমরা ভাবতুম পটের ঘাড়ে বাবা একটা জড়-পদার্থ চাপিয়ে দিয়েছেন।"

তার পর তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখেন, পটেশ্বরী মেজেয় শুয়ে আছে। তার গায়ে একখানিও গহনা নেই, সব মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। তার পরনে শুধু একখানা কালো কস্তাপেড়ে সাদা সুতোর শাড়ি। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটি যেমন লাল হয়েছে, তেমনি ফুলে উঠেছে। সে স্বামীকে দেখে নড়লও না চড়লও না, কথাও কইলে না; মড়ার মতো পড়ে রইল। তাঁর সোনার প্রতিমা ভুঁয়ে লোটাচ্ছে দেখে, সে থিয়েটারে গিয়েছিল কি যায় নি— এ কথা জিজ্ঞাসা করতে বড়োবাবুর আর সাহস হল না। তার পর তিনি যে কোনো দোষে দোষী নন, এবং তাঁর নির্মল চরিত্রে যে কোনোরূপ কলঙ্ক ধরে নি— এই সত্য কথাটাও তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন যে, আসল ঘটনাটি যে কি, ইহজবীনে তিনিও তা জানতে পারবেন না, তাঁর স্ত্রীও তা জানতে পারবে না— মধ্যে থেকে তিনি শুধু চিরজীবনের জন্য মিছা অপরাধী হয়ে থাকলেন। ফলে, তিনি মহা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এ গল্পের moral এই যে, পৃথিবীতে ভালো লোকেরই যত মন্দ হয়— এই হচ্ছে ভগবানের বিচার!

ভাদ্র ১৩২৩

একটি সাদা গল্প

আমরা পাঁচজনে গল্প লেখার আর্ট নিয়ে মহা তর্ক করছিলুম, এমন সময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। তাতে অবশ্য তর্ক বন্ধ হল না, বরং আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে তা চালাতে লাগলুম— এই আশায় যে, তিনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন ; কেননা আমরা সকলেই জানতুম যে, এই বন্ধুটি হচ্ছেন একজন ঘোর তার্কিক। এম. এ. পাস করবার পর থেকে অদ্যাবধি এক তর্ক ছাড়া তিনি আর-কিছু করেছেন বলে আমরা জানি নে। কিন্তু তিনি, কেন জানি নে, সেদিন একেবারে চুপ করে রইলেন। শেষটা আমরা সকলে এক-বাক্যে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমি একটি গল্প বলছি শোনো, তার পর সারা রাত ধরে তর্ক করো। তখন সে তর্ক ফাঁকা তর্ক হবে না।"

সদানন্দের কথা

আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, তা অতি সাদাসিধে। তার ভিতর কোনো নীতিকথা কিংবা ধর্মকথা নেই, কোনো সামাজিক সমস্যা নেই— অতএব তার মীমাংসাও নেই, এমন-কি, সত্য কথা বলতে গেলে কোনো ঘটনাও নেই। ঘটনা নেই বলছি এইজন্যে যে, যে ঘটনা আছে তা বাঙলা দেশে নিত্য ঘটে থাকে— অর্থাৎ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। আর হাজারে নশো নিরেনব্বইটি মেয়ের যে ভাবে বিয়ে হয়ে থাকে এ বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়েছিল— অর্থাৎ এ ব্যাপারের মধ্যে পূর্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি গল্পের খোরাক কিছুই ছিল না। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার যে, যে ঘটনার ভিতর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য কিংবা নূতনত্ব নেই তার বিষয় বলবার কি আছে ? এ কথার আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি নে। তবে এই পর্যন্ত জানি যে, যে ঘটনা নিত্য ঘটে এবং বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, হঠাৎ এক-এক দিন তা যেন অপূর্ব অদ্ভুত বলে মনে হয় ; কিন্তু কেন যে হয়, তাও আমরা বুঝতে পারি নে। যে বিয়েটির কথা তোমাদের আমি বলতে যাচ্ছি তা মামুলি হলেও আমার কাছে একেবারে নূতন ঠেকেছিল। তাই চাইকি তোমাদের কাছেও তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, সেই ভরসায় এ গল্প বলা।

এ গল্প হচ্ছে শ্যামবাবুর মেয়ের বিয়ের গল্প। শ্যামবাবুর পুরো নাম শ্যামলাল চাটুজ্যে, এবং তিনি আমার গ্রামের লোক।

শ্যামলাল যে বৎসর হিস্টরির এম. এ. তে ফার্স্ট হন, তার পরের বৎসর যখন তিনি ফার্স্ট ডিভিসনে বি. এল. পাস করে কলেজ থেকে বেরোলেন, তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে হাইকোর্টের উকিল হবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করেন। শ্যামলাল যে দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টের একজন হয় বড়ো উকিল, নয় অন্তত জজ হবেন, সে বিষয়ে তাঁর আপনার লোকের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা যা যা থাকলে মানুষ জীবনে কৃতী হয়, শ্যামলালের তা সবই ছিল— সুস্থ শরীর, ভদ্র চেহারা, নিরীহ প্রকৃতি, স্থির বুদ্ধি, কাজে গা ও কাজে মন। কিন্তু শ্যামলাল তাঁর আত্মীয়স্বজনের কথা রাখলেন না। উকিল হতে তাঁর এমন অপ্রবৃত্তি হল যে কেউ তাঁকে তাতে রাজি করাতে পারলেন না; এ অনিচ্ছার কারণও কেউ বুঝতে পারলেন না। তাঁর আত্মীয়েরা শুধু দেখতে পেলেন যে, উকিল হবার কথা শুনলেই একটা অস্পষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাই তাঁরা ধরে নিলেন যে এ হচ্ছে সেই জাতের ভয় যা থাকার দরুন কোনো কোনো মেয়ে ছুড়্‌কো হয়; ও একটা ব্যারামের মধ্যে; সুতরাং কি বকে-ঝকে, কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, কোনোমতে ও রোগ সারানো যাবে না। অতঃপর তাঁরা হার মেনে শ্যামলালকে ছেড়ে দিলেন; তিনিও অমনি মুন্সেফি চাকরি নিলেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা যাই ভাবুন, শ্যামলাল কিন্তু নিজের পথ ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেই অবাধ্য প্রবৃত্তি কিংবা অপ্রবৃত্তিগুলোই মানুষের প্রধান সুহৃৎ। শ্যামলাল হাইকোর্টে ঢুকলে উপরে ওঠা দূরে থাক্, একেবারে নীচে তলিয়ে যেতেন। তাঁর ঘাড়ে কেউ কোনো কাজ চাপিয়ে দিলে এবং তা করবার বাঁধাবাঁধি পদ্ধতি দেখিয়ে দিলে শ্যামলাল সে কাজ পুরোপুরি এবং আগাগোড়া নিখুঁত ভাবে করতে পারতেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় জীবনে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে যাবার সাহস কি শক্তি তাঁর শরীরে লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীতে কেউ জন্মায় চরে খাবার জন্য, কেউ জন্মায় বাঁধা খাবার জন্য। শ্যামলাল শেষোক্ত শ্রেণীর জীব ছিলেন।

পৃথিবীতে যত রকম চাকরি আছে, তার মধ্যে এই মুন্সেফিই ছিল তাঁর

একটি সাদা গল্প

আমরা পাঁচজনে গল্প লেখার আর্ট নিয়ে মহা তর্ক করছিলুম, এমন সময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। তাতে অবশ্য তর্ক বন্ধ হল না, বরং আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে তা চালাতে লাগলুম— এই আশায় যে, তিনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন; কেননা আমরা সকলেই জানতুম যে, এই বন্ধুটি হচ্ছেন একজন ঘোর তার্কিক। এম. এ. পাস করবার পর থেকে অদ্যাবধি এক তর্ক ছাড়া তিনি আর-কিছু করেছেন বলে আমরা জানি নে। কিন্তু তিনি, কেন জানি নে, সেদিন একেবারে চুপ করে রইলেন। শেষটা আমরা সকলে এক-বাক্যে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমি একটি গল্প বলছি শোনো, তার পর সারা রাত ধরে তর্ক করো। তখন সে তর্ক ফাঁকা তর্ক হবে না।"

সদানন্দের কথা

আমি যে গল্প বলতে যাচ্ছি, তা অতি সাদাসিধে। তার ভিতর কোনো নীতিকথা কিংবা ধর্মকথা নেই, কোনো সামাজিক সমস্যা নেই— অতএব তার মীমাংসাও নেই, এমন-কি, সত্য কথা বলতে গেলে কোনো ঘটনাও নেই। ঘটনা নেই বলছি এইজন্যে যে, যে ঘটনা আছে তা বাঙলা দেশে নিত্য ঘটে থাকে— অর্থাৎ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। আর হাজারে নশো নিরেনব্বইটি মেয়ের যে ভাবে বিয়ে হয়ে থাকে এ বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়েছিল— অর্থাৎ এ ব্যাপারের মধ্যে পূর্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি গল্পের খোরাক কিছুই ছিল না। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার যে, যে ঘটনার ভিতর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য কিংবা নূতনত্ব নেই তার বিষয় বলবার কি আছে? এ কথার আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি নে। তবে এই পর্যন্ত জানি যে, যে ঘটনা নিত্য ঘটে এবং বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, হঠাৎ এক-এক দিন তা যেন অপূর্ব অদ্ভুত বলে মনে হয়; কিন্তু কেন যে হয়, তাও আমরা বুঝতে পারি নে। যে বিয়েটির কথা তোমাদের আমি বলতে যাচ্ছি তা মামুলি হলেও আমার কাছে একেবারে নূতন ঠেকেছিল। তাই চাইকি তোমাদের কাছেও তা অদ্ভুত মনে হতে পারে, সেই ভরসায় এ গল্প বলা।

এ গল্প হচ্ছে শ্যামবাবুর মেয়ের বিয়ের গল্প। শ্যামবাবুর পুরো নাম শ্যামলাল চাটুজ্যে, এবং তিনি আমার গ্রামের লোক।

শ্যামলাল যে বৎসর হিস্টরির এম. এ. তে ফার্স্ট হন, তার পরের বৎসর যখন তিনি ফার্স্ট ডিভিসনে বি. এল. পাস করে কলেজ থেকে বেরোলেন, তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে হাইকোর্টের উকিল হবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করেন। শ্যামলাল যে দশ-পনেরো বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টের একজন হয় বড়ো উকিল, নয় অন্তত জজ হবেন, সে বিষয়ে তাঁর আপনার লোকের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা যা যা থাকলে মানুষ জীবনে কৃতী হয়, শ্যামলালের তা সবই ছিল— সুস্থ শরীর, ভদ্র চেহারা, নিরীহ প্রকৃতি, স্থির বুদ্ধি, কাজে গা ও কাজে মন। কিন্তু শ্যামলাল তাঁর আত্মীয়স্বজনের কথা রাখলেন না। উকিল হতে তাঁর এমন অপ্রবৃত্তি হল যে কেউ তাঁকে তাতে রাজি করাতে পারলেন না; এ অনিচ্ছার কারণও কেউ বুঝতে পারলেন না। তাঁর আত্মীয়েরা শুধু দেখতে পেলেন যে, উকিল হবার কথা শুনলেই একটা অস্পষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাই তাঁরা ধরে নিলেন যে এ হচ্ছে সেই জাতের ভয় যা থাকার দরুন কোনো কোনো মেয়ে ছুড়্কো হয়; ও একটা ব্যারামের মধ্যে; সুতরাং কি বকে-ঝকে, কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, কোনোমতে ও রোগ সারানো যাবে না। অতঃপর তাঁরা হার মেনে শ্যামলালকে ছেড়ে দিলেন; তিনিও অমনি মুন্সেফি চাকরি নিলেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা যাই ভাবুন, শ্যামলাল কিন্তু নিজের পথ ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেই অবাধ্য প্রবৃত্তি কিংবা অপ্রবৃত্তিগুলোই মানুষের প্রধান সুহৃৎ। শ্যামলাল হাইকোর্টে ঢুকলে উপরে ওঠা দূরে থাক্, একেবারে নীচে তলিয়ে যেতেন। তাঁর ঘাড়ে কেউ কোনো কাজ চাপিয়ে দিলে এবং তা করবার বাঁধাবাঁধি পদ্ধতি দেখিয়ে দিলে শ্যামলাল সে কাজ পুরোপুরি এবং আগাগোড়া নিখুঁত ভাবে করতে পারতেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় জীবনে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে যাবার সাহস কি শক্তি তাঁর শরীরে লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীতে কেউ জন্মায় চরে খাবার জন্য, কেউ জন্মায় বাঁধা খাবার জন্য। শ্যামলাল শেষোক্ত শ্রেণীর জীব ছিলেন।

পৃথিবীতে যত রকম চাকরি আছে, তার মধ্যে এই মুন্সেফিই ছিল তাঁর

পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত কাজ। এ কাজে ঢোকার অর্থ কর্মজীবনে প্রবেশ করা নয়, ছাত্রজীবনেরই মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অন্তত শ্যামলালের বিশ্বাস তাই ছিল, এবং সেই সাহসেই তিনি ঐ কাজে ভর্তি হন। এতে চাই শুধু আইন পড়া আর রায় লেখা। পড়ার তো তাঁর আশৈশব অভ্যাস ছিল, আর রায় লেখাকে তিনি এগজামিনে প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হিসেবে দেখতেন। ইউনিভারসিটির এগজামিনের চাইতে এ এগজামিন দেওয়া তাঁর পক্ষে ঢের সহজ ছিল, কারণ এতে বই দেখে উত্তর লেখা যায়।

২

চাকরির প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি চৌকিতে চৌকিতে ঘুরে বেড়ান। সে-সব এমন জায়গা যেখানে কোনো ভদ্রলোকের বসতি নেই, কাজেই কোনো ভদ্রলোক তাদের নাম জানে না। শ্যামলালের মনে কিন্তু সুখ সন্তোষ দুইই ছিল। জীবনে যে দুটি কাজ তিনি করতে পারতেন— পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষা দেওয়া— এ ক্ষেত্রে সে-দুটির চর্চা করবার তিনি সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে Tenancy Act, Limitation Act এবং Civil Procedure Codeএর তিনি এতটা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন যে, সে পরিমাণ মুখস্থবিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত তা হলে কোনো রায়ের বিরুদ্ধে আর বিলেত-আপীল হত না।

শ্যামলালের স্ত্রী বরাবর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন; কিন্তু তাঁর মনে সুখও ছিল না, সন্তোষও ছিল না; কেননা যে-সব জিনিসের অভাব শ্যামলাল একদিনের জন্যও বোধ করেন নি, তাঁর স্ত্রী সে-সকলের— অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের অভাব, মেলামেশার লোকের অভাব, এমন-কি, কথা কইবার লোকের পর্যন্ত অভাব প্রতিদিন বোধ করতেন।

চাকরির প্রথম বৎসর না যেতেই শ্যামলালের একটি ছেলে হয়। সেই ছেলে হবার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী শুকিয়ে যেতে লাগলেন, ফুল যেমন করে শুকিয়ে যায়, তেমনি করে অর্থাৎ অলক্ষিতে এবং নীরবে। শ্যামলাল কিন্তু তা লক্ষ্য করলেন না। শ্যামলাল ছিলেন এক-বুদ্ধির লোক। তিনি যে কাজ হাতে নিতেন, তাতেই মগ্ন হয়ে যেতেন; তার বাইরের কোনো জিনিসে তাঁর মনও যেত না, তাঁর চোখও পড়ত না। তা ছাড়া তাঁর স্ত্রীর অবস্থা

কি হচ্ছে, তা লক্ষ্য করবার তাঁর অবসরও ছিল না। ঘুম থেকে উঠে তিনি রায় লিখতে বসতেন; সে লেখা শেষ করে তিনি আপিসে যেতেন; আপিস থেকে ফিরে এসে আইনের বই পড়তেন; তার পর রাত্তিরে আহারান্তে নিদ্রা দিতেন। তাঁর স্ত্রী এই বনবাস থেকে উদ্ধার পাবার জন্য স্বামীকে কোনো লোকালয়ে বদলি হবার চেষ্টা করতে বারবার অনুরোধ করতেন, কিন্তু শ্যামলাল বরাবর একই উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, ও-সব বোঝ না; চেষ্টা-চরিত্তির করে এ-সব জিনিস হয় না। কাকে কোথায় রাখবে, সে-সব উপরওয়ালারা সব দিক ভেবেচিন্তে ঠিক করে। তার আর বদল হবার জো নেই।" আসল কথা এই যে, তিনি বদলি হবার কোনো আবশ্যকতা বোধ করতেন না, কেননা তাঁর কাছে লোকসমাজ বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্বই ছিল না। আর তা ছাড়া সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা তাঁর সাহসে কুলোত না। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এতে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন, কেননা তিনি এ কথা বুঝতেন না যে, নিজ চেষ্টায় কিছু করা তাঁর স্বামীর পক্ষে অসম্ভব।

ফলে, আলো ও বাতাসের অভাবে ফুল যেমন শুকিয়ে যায়, শ্যামলালের স্ত্রী তেমনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। আমি ঘুরে ফিরে ঐ ফুলের তুলনাই দিচ্ছি, তার কারণ শুনতে পাই সেই ব্রাহ্মণকন্যা শরীরে ও মনে ফুলের মতোই সুন্দর, ফুলের মতোই সুকুমার ছিলেন, এবং তাঁর বাঁচবার জন্য আলো ও বাতাসের দর্শন ও স্পর্শনের প্রয়োজন ছিল। ছেলে হবার চার বৎসর পরে তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে আঁতুড়েই মারা গেলেন।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে কত ভালোবাসতেন তা তিনি স্ত্রী বর্তমানে বোঝেন নি, তার অভাবেই মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। জীবনে তিনি এই প্রথম শোক পেলেন; কেননা তাঁর মা ও বাবা তাঁর শৈশবেই মারা যান, এবং তাঁর কোনো ভাইবোন কখনো জন্মায় নি, সুতরাং মরেও নি। সেইসঙ্গে তিনি এই নতুন সত্যের আবিষ্কার করলেন যে, মানুষের ভিতর হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে— যা মানুষকে শাসন করে, এবং মানুষে যাকে শাসন করতে পারে না।

স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তিনি নিশ্চয়ই কাজকর্মের বার হয়ে যেতেন, যদি-না তাঁর একটি চার বৎসরের ছেলে আর

একটি চার দিনের মেয়ে থাকত। তাঁর মন ইতিমধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারে জীবনের মধ্যে অনেকটা শিকড় নামিয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, এই দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী নিতান্ত অসহায়, এবং তিনি ছাড়া পৃথিবীতে এদের অপর কোনো সহায় নেই। তাঁর নব-আবিষ্কৃত হৃদয় তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, চাকরির দাবি ছাড়া পৃথিবীতে আরো পাঁচ রকমের দাবি আছে, এবং কলেজ ও আদালতের পরীক্ষা ছাড়া মানুষকে আরো পাঁচ রকমের পরীক্ষা দিতে হয়। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন ; এ জ্ঞান হওয়ামাত্র তিনি মনস্থির করলেন যে, তাঁর ছেলে-মেয়ের জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের এবং একমাত্র নিজের ঘাড়েই নেবেন। স্বামী হিসেবে তাঁর কর্তব্য না-পালন করা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি সন্তানপালনের দ্বারা করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

এই জীবনের পরীক্ষা তিনি কি ভাবে দিয়েছিলেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল, সেই কথাটাই হচ্ছে এ গল্পের মোদ্দা কথা।

৩

শ্যামলাল আর বিবাহ করেন নি। তার কারণ, প্রথমত তাঁর এ বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল না, দ্বিতীয়ত তিনি তা অকর্তব্য মনে করতেন। তার পর তাঁর মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে, আবার নতুন এক স্ত্রীর কথা মনে হলে তিনি আঁৎকে উঠতেন। তাঁর মনে হত, ঐ মেয়েটিতে তাঁর স্ত্রী তার শরীরমনের একটি জীবন্ত স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।

কোনো কাজ হাতে নিয়ে তা আধা-খেঁচড়া ভাবে করা শ্যামলালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং এই সন্তান-লালনপালনের কাজ তিনি তাঁর সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। শ্যামলাল যেমন তাঁর সকল মন একটি জিনিসের উপর বসাতে পারতেন, তেমনি তিনি তাঁর সকল হৃদয় দুটি-একটি লোকের উপরও বসাতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সকল হৃদয় তাঁর ছেলে-মেয়ে অধিকার করে বসেছিল, সুতরাং তাঁর হৃদয়বৃত্তির একটি পয়সাও বাজে খরচে নষ্ট হয় নি। ফলে, তাঁর ছেলে ও মেয়ে শরীরে ও মনে অসাধারণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কেননা এ কাজে শ্যামলালের ভালোবাসা তাঁর কর্তব্যবুদ্ধির প্রবল সহায় হয়েছিল।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি চৌকির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে, বছর-দশেক মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব দুর্গম স্থানে— পটুয়াখালি দক্ষিণ-শাহাবাজপুর কক্সবাজার জেহানাবাদ প্রভৃতিই ছিল তাঁর কর্মস্থল। আজ এখানে, কাল ওখানে— এই কারণে তিনি তাঁর ছেলেকে স্কুলে দিতে পারেন নি, ঘরে রেখে নিজেই পড়িয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে ও-সব জায়গার কোনো স্কুল-মাস্টারের তুলনাই হতে পারে না। ফলে বীরেন্দ্রলাল যখন পনেরো বৎসর বয়সে প্রাইভেট স্টুডেণ্ট হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশান দিলে তখন সে অক্লেশে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করলে।

শ্যামলাল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বই পড়তে শুরু করলেন— কিন্তু আইনের নয়। তার কারণ, ইতিমধ্যে আগাগোড়া দেওয়ানী আইন মায় নজির তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং নূতন Law-Reports ছাড়া তাঁর আর কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বই পড়া ছাড়া সন্ধেটা কাটাবার আর কোনো উপায়ও ছিল না। সুতরাং শ্যামলাল হিস্টরি পড়তে শুরু করলেন, কেননা সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র হিস্টরিই ছিল তাঁর প্রিয় বস্তু। ঐ হিস্টরিই ছিল তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর নভেল, তাঁর নাটক। তিনি ছুটির সময় এক-একবার কলকাতায় গিয়ে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে সস্তায় হিস্টরির যে বই পেতেন তাই কিনে আনতেন, তা সে যে দেশেরই হোক, যে যুগেরই হোক আর যে লেখকেরই হোক। ফলে, তাঁর কাছে সেই-সব ইতিহাসের কেতাব জমে গিয়েছিল যা এ দেশে আর কেউ বড়ো একটা পড়ে না। যথা, Gibbon's *Decline and Fall*, Mill's *History of India*, Grote's *Greece*, Plutarch's *Lives*, Macaulay's *History of England*, Lamartine's *History of the Girondists*, Michelet's *French Revolution*, Cunningham's *History of the Sikhs*, Tod's *Rajasthan* ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রলাল বারো-তেরো বছর বয়স থেকেই ভালো করে বুঝুক আর না বুঝুক, এই-সব বই পড়তে শুরু করেছিল ; এবং পড়তে পড়তে শুধু ইতিহাসে নয় ইংরেজিতেও সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বীরেন্দ্রলাল নিজের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিয়েছিল ; কিন্তু শ্যামলাল তা লক্ষ্য করেন নি।

ম্যাট্রিকুলেশান পাস করবার পর শ্যামলাল ছেলেকে কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় পাঠাতে বাধ্য হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেহারে বদলি হয়ে গেলেন। তার পর চার বৎসরের মধ্যে বীরেন্দ্রলাল অবলীলাক্রমে ফার্স্ট ডিভিসনে আই. এ. এবং বি. এ. পাস করলে। তাঁর ছেলের পরীক্ষা পাস করবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে শ্যামলাল মনস্থির করলেন যে, তাকে এম. এ. পাসের পর সিভিল সার্ভিসের জন্য বিলেতে পাঠাবেন। বীরেন্দ্রলাল যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সে বিষয়ে তার বাপের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

বিলেতে ছেলে পড়াবার টাকারও তাঁর সংস্থান ছিল। শ্যামলাল জানতেন যে, খাওয়ার উদ্দেশ্য জীবন ধারণ করা এবং পরার উদ্দেশ্য লজ্জা নিবারণ করা; সুতরাং তাঁর সংসারে কোনোরূপ অপব্যয় কিংবা অতিব্যয় ছিল না। কাজেই তাঁর হাতে দশ-বারো হাজার টাকা জমে গিয়েছিল।

ছেলে কলকাতায় পড়তে যাবার পর থেকে শ্যামলালের দৈনিক জীবনের একমাত্র অবলম্বন হল তাঁর কন্যা। ইতিমধ্যে পড়ানো তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কাউকে না কিছু পড়িয়ে তিনি আর একদিনও থাকতে পারতেন না। কাজেই তিনি তাঁর সকল অবসর তাঁর এই কন্যার শিক্ষায় নিয়োগ করলেন। তাঁর যত্নে, তাঁর শিক্ষায়, তাঁর মেয়ের মন— ফুল যেমন উপরের দিকে আলোর দিকে মাথা তুলে ফুটে ওঠে, সেই রকম ফুটে উঠতে লাগল। লোকালয়ের বাইরে থাকায় তার চরিত্রও ফুলের মতো শুভ্র এবং ফুলের মতোই নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছিল। শ্যামলাল, তাঁর মেয়েকে এত লেখাপড়া শেখাবার এত বড়ো করে রাখবার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হবে তা ভাববার অবসর পান নি। তাঁর মনে শুধু একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, একদিন তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে হবে; তবে কবে এবং কার সঙ্গে, সে বিষয়ে তিনি কখনো কিছু চিন্তা করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই; অমন স্ত্রী পেলে যে-কোনো সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক নিজেকে ধন্য মনে করবে। আসল কথা, সমাজ বলে যে একটি জিনিস আছে, সে কথাটা তিনি সমাজ থেকে দূরে এবং আলগা থাকার দরুন একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে যে অনায়াসে Tod's *Rajasthan* এবং Plutarch's *Lives* পড়তে পারে, এতেই তিনি তাঁর জীবন সার্থক মনে করতেন। ফলে, তাঁর ছেলে যখন এম. এ. দেবার উদ্যোগ করছে, তখন তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে

দেবার কোনো উদ্যোগ করলেন না ; যদিচ তখন তার বয়েস প্রায় ষোলো। তাঁর মেয়ের জন্য যে একটি স্বামী-দেবতা কোনো অজ্ঞাত গোকুলে বাড়ছে এবং সে স্বামী যে দেবতুল্য হবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সময়ে শ্যামলালের জীবনে একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটল। একদিন তিনি তাঁর কর্মস্থলে তারে খবর পেলেন যে বীরেন্দ্রলাল কোনো পলিটিকাল অপরাধে কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছে। সেইসঙ্গে তাঁর বাড়িও খানাতল্লাসী হল। তাঁর ছেলের যে কস্মিন্‌কালে ফৌজদারী আদালতে বিচার হতে পারে, এ কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং এ সংবাদে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই নতুন লাগল যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর কি করা কর্তব্য তিনি ঠাউরে উঠতে পারলেন না।

এর পর শ্যামলালের দেহমনে এমন অবসাদ, এমন জড়তা এসে পড়ল যে তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হল না। তিনি এক বৎসরের ছুটির দরখাস্ত করলেন ; এবং সে দরখাস্ত তখনই মঞ্জুর হল। কেননা উপরওয়ালাদের মতে তাঁর ছেলের মতিভ্রংশতার জন্য শ্যামলাল যে কতকটা দায়ী, তার প্রমাণ তাঁর ঘরের বই। এ শুনে শ্যামলাল অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, হিস্টরি হচ্ছে শুধু পড়বার জিনিস, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে এ কথা পূর্বে কখনো তাঁর মনে হয় নি।

নূতনের সঙ্গে কারবার করবার অভ্যাস তাঁর ছিল না। কাজেই তাঁকে তাঁর মেয়ের পরামর্শমত চলতে হল। তিনি উকিল-কৌঁসুলি দিয়ে বীরেন্দ্রলালকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলেন। ফলে, তাঁর ছেলে রক্ষা পেলে না ; মধ্যে থেকে তাঁর যা-কিছু টাকা ছিল, সব উকিল-কৌঁসুলির পকেটে গেল। এই নতুনের সংঘর্ষে শ্যামলালের জীবনের জোড়া-সুখস্বপ্নের মধ্যে একটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, আর তাঁর কন্যার ফুটন্ত ফুলের মতো মনটির উপর বরফ পড়ে গেল।

৪

ছুটি নিয়ে শ্যামলাল বাড়ি যাবেন স্থির করলেন। আজ বিশ বৎসর পর তাঁর মনে আবার দেশের মায়া জেগে উঠল। তাঁর মনে ছেলেবেলাকার সুখের স্মৃতি সব ফিরে এল ; তাঁর মনে হল, তাঁর পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র স্থান যেখানে শান্তি আছে— ও যেন মায়ের কোল।

শ্যামলাল সেই মায়ের কোলে ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর কপালে সেখানেও শান্তি জুটল না।

দেশে পদার্পণ করবামাত্র তিনি ঘোরতর অশান্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা একবাক্যে তাঁকে ছি ছি করতে লাগল। মেয়ে এত বড়ো হয়েছে অথচ বিয়ে হয় নি, তার উপর সে আবার পুরুষের মতো লেখাপড়া জানে— এই দুই অপরাধে তাঁর মেয়েকেও দিবারাত্র নানারূপ লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহ্য করতে হল।

এই লোকনিন্দায় শ্যামলাল এতটা ভয় খেয়ে গেলেন যে, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন। পাঁচজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি শ্যামলালের ধাতে ছিল না।

তাঁর মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজার ভার শ্যামলাল তাঁর খুড়োর হাতে দিলেন। তাঁর খালি এই একটি শর্ত ছিল যে, পাত্র পাস-করা ছেলে হওয়া চাই। তাঁর মেয়ে যে মূর্খের হাতে পড়বে, এ কথা ভাবতেও তাঁর বুকের রক্ত জল হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর এ পণ বেশি দিন টিকল না, কেননা ও মেয়েকে বিয়ে করতে কোনো পাস-করা যুবক স্বীকৃত হল না।

কারো কারো নারাজ হবার কারণ হল, মেয়ের বয়েস। যদিচ তার বয়েস তখন ষোলো তবু জনরবে স্থির হল বিশ। এও শ্যামলালের খুড়োর দোষে। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন শ্রীমতীর বয়েস বারো, পশ্চিমের আবহাওয়ার গুণে বাড়টা কিছু বেশি হয়েছে বলে দেখতে ষোলো দেখায়। তিনি যদি নাতনীর বয়স চার বৎসর কমাতে না চেষ্টা করতেন তা হলে আমার বিশ্বাস লোকমুখে তা চার বৎসর বেড়ে যেত না।

কারো-বা নারাজ হবার কারণ, মেয়ের শিক্ষা। ইংরেজি-পড়া মেয়ে যে মেম হয়েছে, সে বিষয়ে গ্রামের লোকের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আর মেম-বউ ঘরে আনবার মতো বুকের পাটা ক' জনের আছে? অবশ্য এ ভয় পাবার কোনো কারণ ছিল না। বিলাসিতা শ্রীমতীর শরীরমনকে তিলমাত্রও স্পর্শ করে নি, এবং নেপথ্যবিধান করাটা যে নারীধর্ম এ জ্ঞান লাভ করবার তার কখনো সুযোগ ঘটে নি।

অধিকাংশ পাত্রের নারাজ হবার কারণ, শ্যামলালের বরপণ দেবার অসামর্থ্য। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ধন তিনি বর্তমান উকিল-কৌঁসুলিদের দিয়ে

বসেছিলেন, ভাবী উকিল-কৌসুলিদের জন্য কিছুই রাখেন নি।

এর জন্য আমি কাউকে দোষ দিই নে, কেননা এ মেয়ে বিয়ে করতে আমিও রাজি হই নি ; যদিচ আমি জানতুম যে, শ্যামলালের আমার উপরই সব চাইতে বেশি ঝোঁক ছিল। আমার নারাজ হবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীমতীর নামে গ্রামের লোকে নানারূপ কুৎসা রটিয়েছিল, তার কারণ, সে শুধু ষোড়শী নয়, অসাধারণ রূপসী। আমি অবশ্য সে কুৎসার এক বর্ণও বিশ্বাস করি নি ; কিন্তু আমি বয়েসকে ভয় না করলেও রূপকে ভয় করতুম।

সে যাই হোক, মাস পাঁচ-ছয় চেষ্টার পর শ্যামলাল এম. এ., বি. এ. জামাই পাবার আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। শেষটায় তিনি মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ ভার খুড়োর হস্তে ন্যস্ত করলেন। শ্যামলাল অবশ্য তাঁর খুড়োকে ভক্তি করতেন না, কেননা তাঁর চরিত্রে ভক্তি করবার মতো কোনো পদার্থ ছিল না। কিন্তু শ্যামলাল বুঝলেন যে, যে বিষয়ে তিনি কাঁচা— অর্থাৎ সংসারজ্ঞান— সে বিষয়ে তাঁর খুড়ো শুধু পাকা নয়, একেবারে ঝুনো ; অতএব তাঁর পক্ষে খুল্লতাতের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুড়োমহাশয়ের সকল চতুরতা ব্যর্থ হল, কেননা, তাঁর পিছনে টাকার জোর ছিল না। যেমন মাসের পর মাস যেতে লাগল, শ্যামলাল তত বেশি উদ্‌বিগ্ন ও তাঁর খুড়ো সেই পরিমাণে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন ; কেননা, মাসের পর মাস মেয়েরও বয়েস বেড়ে যেতে লাগল, এবং সেই-সঙ্গে এবং সেই অনুপাতে লোকনিন্দার মাত্রাও বেড়ে যেতে লাগল। এই পারিবারিক অশান্তির ভিতর একমাত্র প্রাণী যে শান্ত ছিল, সে হচ্ছে শ্রীমতী। এই-সব লাঞ্ছনা গঞ্জনা নিন্দা কুৎসা তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নি। তার কারণ, তার মনের উপর যে বরফ পড়েছিল তা এতদিনে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল। নিন্দাবাদ প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিসের ক্ষুদ্র কষ্ট সে-মনকে স্পর্শ করতে পারত না। তার এই স্থির ধীর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবকে গ্রামের লোক অহংকার বলে ধরে নিলে। এর ফলে শ্রীমতীর বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষবুদ্ধি এতটা বেড়ে গেল যে, শ্যামলাল আর সহ্য করতে না পেরে মেয়েকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি মনে করলেন, মেয়ের কপালে যা লেখা থাকে তাই হবে, এ উপস্থিত উপদ্রবের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য। শ্যামলাল খুড়োমহাশয়কে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন, তিনিও

তাতে কোনো আপত্তি করলেন না। খুড়োমহাশয় বুঝলেন, আর কিছুদিন থাকলে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি অকৃতকার্য হয়েছেন। কিন্তু সময় থাকতে যদি শ্যামলাল বিদায় হন তা হলে তিনি পাঁচজনকে বলতে পারবেন যে, শ্যামলাল অত অধীর না হলে তিনি নিশ্চয়ই তার মেয়ের ভালো বিয়ে দিয়ে দিতে পারতেন। অতঃপর পাঁজিপুথি দেখে শ্যামলালের যাত্রা করবার দিন স্থির হল।

যেদিন শ্যামলালের বাড়ি ছাড়বার কথা ছিল, তার আগের দিন তাঁর খুড়োমহাশয় বেলা বারোটার সময় হাসতে হাসতে শ্যামলালের কাছে এসে বললেন, "বাবাজি! তোমাকে আর কাল বাড়ি ছাড়তে হবে না। তোমার মেয়ের বর ঠিক হয়ে গেছে। উপরে তো ভগবান আছেন, তিনি কি আমাদের পরিবারে একটা কলঙ্ক হতে দেবেন?"

শ্যামলাল একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

"ক্ষেত্রপতি মুখুজ্যে।"

"কোন্ ক্ষেত্রপতি মুখুজ্যে?"

"আমাদের গ্রামের ক্ষেত্রপতি হে, দক্ষিণপাড়ায় যার বড়ো বাড়ি।"

"আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?"

"মেয়ের বিয়েকে, বাবাজি, আমি নই, তুমিই রসিকতা মনে কর।"

"বলেন কি, তার স্ত্রী তো আজ সবে তিনদিন হল মারা গেছে!"

"সেইজন্যেই তো সে এই বিষয়ে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। তার স্ত্রী বেঁচে থাকলে তো আর তুমি তোমার মেয়েকে সতীনের ঘর করতে পাঠাতে না।"

"কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আমার একবয়সী?"

"দোজবরে বলেই তো সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বিশ-একুশ বছরের মেয়েকে তো আর কোনো বিশ-একুশ বছরের ছেলে বিয়ে করবে না। এতদিন তো চেষ্টা করে দেখেছ।"

"কিন্তু আমার মেয়ের বয়স তো আর বিশ-একুশ নয়।"

"বাবাজি, আমার কাছে আর মিছে কথা বলে কি হবে? আমিই তো বলে বেড়াচ্ছি যে ওর বয়েস বারো কি তেরো। আসল বয়েস আর কেউ জানুক আর না জানুক— আমি তো জানি। তোমাকে তো সেদিন জন্মাতে

দেখলুম, তুমি কি আমাকে ভোগা দিতে পার ?”

“কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আকাট মূর্খ, সে তো এনট্রান্সও পাস করে নি।”

“সেইজন্যেই তো তোমার মেয়ে বিয়ে করতে সে রাজি হয়েছে। তোমার টাকা দেবার সামর্থ্য নেই আর বিনে পয়সায় পাস-করা ছেলে মেলে না, এর প্রমাণ তো হাজার বার পেয়েছ।”

শ্যামলাল বুঝলেন যে তাঁর খুড়োর সঙ্গে আর তর্ক করা অসম্ভব, কেননা খুড়োমহাশয়ের কথাগুলো যে সবই সত্য, তা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না; অথচ এ বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর হৃদয়মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, ক্ষেত্রপতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আর শ্রীমতীকে জ্যান্ত গোর দেওয়া একই কথা। তাই তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর খুড়ো ধরে নিলেন যে, সে মৌন-সম্মতির লক্ষণ। তিনি অমনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রপতিকে পাকা কথা দিয়ে এলেন। স্থির হল, ক্ষেত্রপতি তাঁর বিগত স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেই আগত স্ত্রীকে ঘরে আনবেন।

ক্ষেত্রপতির এ বিবাহ করবার আগ্রহের একমাত্র কারণ, শ্রীমতী সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার লোভ ক্ষেত্রপতি জীবনে কখনো সংবরণ করতে পারেন নি; এবং এ ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতীকে আত্মসাৎ করবার উপায়ান্তর নেই জেনে তিনি তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা হল না, কেননা তিনি লোকনিন্দাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। তিনি গ্রামের কাউকেও ভয় করতেন না, সকলে তাঁকে ভয় করত; তার কারণ তিনি পুলিসে চাকরি করতেন, তার উপর তাঁর দেহে বল, মনে সাহস ও ঘরে টাকা ছিল। এ তিন বিষয়ে গ্রামের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না।

শ্যামলালের খুড়ো তাঁকে এসে যখন জানালেন যে তিনি ক্ষেত্রপতিকে পাকা কথা দিয়ে এবং বিয়ের দিন স্থির করে এসেছেন, তখন শ্যামলাল বললেন, “আপনি যাই বলুন, আর না বলুন, আমি এ বিবাহ কিছুতেই হতে দেব না, প্রাণ গেলেও নয়।”

এ কথা শুনে খুড়োমহাশয় “ভদ্রলোককে কথা দিয়ে সে কথার আর কিছুতেই অন্যথা করা যেতে পারে না” এই বলে চিৎকার করতে লাগলেন। বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে গেল। কিন্তু শ্যামলাল যে সেই “না” বলে চুপ করলেন,

তার পর আর কোনো কথা কইলেন না। তার কারণ, হাজার চিৎকার করলেও তাঁর খুড়োর কোনো কথা শ্যামলালের কানে ঢুকছিল না; তাঁর শরীর মন ইন্দ্রিয় সব একেবারে অবশ অসাড় হয়ে গিয়েছিল, মাথায় বজ্রাঘাত হলে মানুষের যেমন হয়।

এ মহাসমস্যার মীমাংসা শ্রীমতী করে দিলে। সকলের সকল কথা শুনে, সকল অবস্থা জেনে, শ্রীমতী বললে এ বিবাহ সে করবেই। সে বুঝেছিল যে, তার বিবাহ না হওয়াতক্ তার বাপের বিড়ম্বনার আর শেষ হবে না। তা ছাড়া সে কোনো দুঃখকষ্টকেই আর ভয় করত না, বরং তার মনে হত যে তার পক্ষে জীবনে নিজে সুখী হবার ইচ্ছাটাও একটা মহাপাপ, সে ইচ্ছাটা যেন তার নির্মম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।

শ্যামলাল অবশ্য মেয়ের মতে মত দিলেন, কিন্তু ব্যাপারখানা যে কি হল, তা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এইটুকু শুধু বুঝলেন যে, পুরাতনের সংঘর্ষে তাঁর জোড়া-সুখস্বপ্নের আর-একটিও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এর পর এক মাস না যেতেই শ্যামলালের মেয়ের বিয়ে হল। সে বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। সেই আমি প্রথম ও শেষ শ্রীমতীকে দেখি। তার রূপের খ্যাতি পূর্ব থেকেই শুনেছিলুম, কিন্তু যা দেখলুম তাতে মনে হল, সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়— শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতোই সুঠাম, দেবতার মতোই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতোই প্রশান্ত আর নির্বিকার। বর-কনে মানিয়েছিল ভালো, কেননা ক্ষেত্রপতিও যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুপুরুষ; তার বয়েস পঁয়তাল্লিশের উপর হলেও ত্রিশের বেশি দেখাত না, আর তার মুখও ছিল পাষাণের মতোই নিটোল ও কঠিন। আমার মনে হল, আমি যেন দুটি statueর বিয়ের অভিনয় দেখছি। বর-কনেতে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকে নি, তার পর হঠাৎ কানে এল ক্ষেত্রপতি বলছেন, "যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।" এ কথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম, এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা comedy কি tragedy তা বুঝতে পারলুম না।

অগ্রহায়ণ ১৩২৩

ফরমায়েশি গল্প

মকদমপুরের জমিদার রায়মশায় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায়মশায় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে প্রথম কথা বললেন, "ঘোষাল! গল্প বলো।"

রায়মশায়ের মুখ থেকে এ কথা পড়তে-না-পড়তে তাঁর ডান ধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক হাসিমুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে,

"যে আজ্ঞে হুজুর, বলছি।"

"আজ কিসের গল্প বলবি বল্ তো?"

"বর্ষার গল্প, হুজুর।"

"একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়?"

একটি অস্থিচর্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এক টিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করলেন, "তার আর সন্দেহ কি? তা না হলে কি মশায়ের মতো গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?"

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে বললে, "মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?"

রায়মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

"আজ্ঞে চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।"

ঘোষাল পণ্ডিত মশায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল, "এ লাখ কথার এক কথা। কেননা মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটাও ভয়ে কাঁপানো সংগত। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে গেলে গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।"

পণ্ডিতমশায় এ কথা শুনে মহা খুশি হয়ে বললেন, "তা তো বটেই! আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই তো ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্তমান, তাতেই-না অলংকারশাস্ত্রে ওর নাম আদিরস।"

রায়মশায়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরোচ্ছিল, এইবার আবার কথা বেরোল ; কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়।

"আপনার অলংকারশাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হতে চললুম— বয়েস প্রায় পঞ্চাশ হল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভালো লাগবে? ওসব গল্প, যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।"

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে, রায়মশায় তাঁর বয়েস থেকে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সহধর্মিণীর বয়েস— অর্থাৎ ঝাড়া পনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বললে, "হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে, হুজুরের তো আর সে ভয় নেই।"

"দেখেছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবী লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন্ কথা বলতে হয়, তা ও জানে।"

"সে কথা আর বলতে! শাস্ত্রে বলে, যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধ বয়সেও যার মনে রস থাকে সেই যথার্থই রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে-সুঝে কথা কয়? ও জানে আপনার প্রাণে এ বয়সেও যে রস আছে, এ কালের যুবাদের মধ্যে হাজারে একজনেরও তা নেই।"

"ঠিক বলেছেন পণ্ডিতমশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটাই গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন ; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের এম. এ.র কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কানে হাত দিলে ; বললে, অশ্লীল।"

"কোন্ গানটা ঘোষাল?"

"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদু ডারা—"

"কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইস্টুপিট্ কানে হাত দিলে? অমন

কান মলে দিতে পারলি নে? হতভাগাদের যেমন ধর্মজ্ঞান তেমনি রসজ্ঞান! ইংরেজি পড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল!"

এই কথা শুনে সে-সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ অতি তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে— অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

"তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বলনীলমণি?"

রায়মশায় যাঁকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করলেন, তার নাম নীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে 'গোস্বামী'টি কেটে দিয়ে সুমুখে 'উজ্জ্বল' শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়— ঘোর শ্যাম; আর-এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বলনীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন, "আজ্ঞে, ইংরাজি-নবীশদের যে মতিগতি ফিরছে তা আমি জেনেশুনেই বলছি। আমারই জনকত পাস-করা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত—

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি

তা হলে আমি হলপ করে বলতে পারি তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।"

"ও দুয়ের তফাতটা কোথায়?"

"তফাতটা কোথায়?— বললেন ভালো পণ্ডিতমশায়! একটা টপ্পা আর একটা কীর্তন!"

"অর্থাৎ তফাত যা, তা নামে!"

"অবাক করলেন। তা হলে সোরী মিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে? নামের ভেদেই তো বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক, আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান তো আর টোলে জন্মায় না।"

"বটে! অমরুশতক থেকে শুরু করে নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত আলোচনা করে যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তা হলে মনু থেকে শুরু করে রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করেও ধর্মজ্ঞান জন্মায় না।"

"রাগ করবেন না পণ্ডিতমশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃত কাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়— ও দুয়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

"আপনি তো দেখছি এক কথারই বারবার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম টপ্পা ও কীর্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায় তা তো আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।"

"তফাত আছে বৈকি। যেমন তালের রস ও তাড়ি এক বস্তু নয়— একটায় নেশা হয়, আর-একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে কেউ কখনো ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়?"

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "পণ্ডিতমশায়, আপনিও এই-সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে তেমনি তার বুদ্ধি।"

রায়মশায় ঘোষালকে চব্বিশ ঘণ্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। 'আমার পাঁঠা আমি লেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না'—এই ছিল তাঁর 'মটো'। তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন, "কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বলনীলমণি! তোমাদের মতো ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে; তাগমাফিক অমনি একটি জুতসই উপমা লাগাও তো দেখি!"

"আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে কিন্তু রসজ্ঞান নেই।"

"রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো তো অমনি একটা রসিকতা!"

"আজ্ঞে ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!"

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না; বললেন, "এ আবার কি অদ্ভুত কথা! ঘোষালের ধর্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?"

"অবশ্য না। ও দুই তো আর পৃথক জ্ঞান নয়?"

"আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ, আমাদের কাছে যা বিশেষ আপনার কাছে তা অবশ্য সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে।"

"শুনুন পণ্ডিতমশায়, যার নাম রসজ্ঞান তারি নাম ধর্মজ্ঞান; আর যার নাম ধর্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। নামের প্রভেদে তো আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।"

"বলেন কি গোঁসাইজি! তা হলে আপনাদের মতে, যার নাম কাম তারই নাম ধর্ম, আর যার নাম অর্থ তারই নাম মোক্ষ?"

"আসলে ও সবই এক। রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।"

"বুঝছেন না পণ্ডিতমশায়, কথা খুব সোজা! গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা-চাল তারই নাম মুড়ি— নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।"

মদের পিঠ-পিঠ এই চাটের উপমা আসায় রায়-মশায়ের পাত্রমিত্রগণ মহাখুশি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনীর অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবামাত্র তার মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হতে একটা প্রচণ্ড সহাস্য 'হঁচ্চ' ধ্বনি নির্গত হয়ে উজ্জ্বলনীলমণির বক্ষদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্য -রসে সিক্ত করে দিলে। তিনি অমনি 'রাধামাধব' বলে সরে বসলেন। রায়মশায় এই-সব ব্যাপার দেখে-শুনে ভারি চটে বললেন, "তোমরা কটায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে তো হে! আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা শুরু করে দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনো মাথামুণ্ডু থাকে! ঘোষাল! গল্প বলো।"

"হুজুর, এই বললুম বলে।"

"শিগগির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। একি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?"

উজ্জ্বলনীলমণি বললেন, "আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে-সভায় ঘোষাল বক্তা, সে-সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি তো আমার নামই নয়—"

"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলঃ জলদাগমে।"

"পণ্ডিতমশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা তো সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে তো প্রত্যক্ষ।"

উজ্জ্বলনীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে— "তবে বলি, শ্রবণ করুন।"

"দেখ্, মধুর রসের গল্প যেন একদম চিনির পানা করে তুলিস নে। একটু হ্নুনঝাল যেন থাকে।"

"হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তা কি আর জানি নে!"

"আর দেখ্, একটু অলংকার দিয়ে বলিস, একেবারে যেন সাদা না হয়।"

"অলংকারের শখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান শখ, তা তো আর কারো জানতে বাকি নেই।"

"কিন্তু সে অলংকার যেন ধার-করা কিংবা চুরি-করা না হয়।"

"হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কানে দেব না, তা হলে গোঁসাইজি তা হেঁচকা টানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড়ো অনুগ্রহ করে তো—গিল্টি।"

"অন্যে যে যা বলে তা বলুক; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।"

"হুজুর জহুরী, সেই তো ভরসা। তবে শুনুন।

"শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্যোগ। চার দিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুস কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে পড়ছে তা জল নয়— একদম আলকাতরা। আর তার এক-একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—"

"কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে গলে পড়বে বল্ তো মূর্খ? যখন বর্ণনা শুরু করে দিস, তখন আর তোর সম্ভব-অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল্, জল চুঁইয়ে পড়ছে।"

"হুজুর বলতে চান আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—"

"দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না।"

এই শুনে দেওয়ানজি বললেন, "দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।"

"সে আর বলতে। হুজুর হিসেব-নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন তা হলে তাঁর বাড়িতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যাঁর চালে খড় ছিল না।"

"তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?"

"যে নল চালায় সে কি জানে কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে? যাক ও-সব কথা, এখন গল্প শুনুন।"

"এই দুর্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।"

"কি বললি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাতদুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে, আর তুই ঘরের ভিতর বসে মনের সুখে গল্প বলে যাচ্ছিস! ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"হুজুর, অধীর হবেন না; উদ্ধার তো করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে? কেউ তো আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।"

"তা তো জানি, কিন্তু তুই হয়তো ঐখানেই আর-একটাকে এনে জোটাবি। গল্প শুরু করে দিলে তোর তো আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।"

"দেখুন রায়মশায়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলংকারশাস্ত্রের হিসেবে কোনো দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও তো অভিসারিকাদের এমনি দুর্যোগের মধ্যেই বার করতেন।"

"দেখুন পণ্ডিতমশায়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলে-মেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাত নিউমনিয়া হবে। এ যে বাঙলাদেশে, তায় আবার কলিকাল!"

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাকত পারলেন না, সবেগে বলে উঠলেন, "তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে দেখবেন, কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং তাতে করে তাঁদের কারো যে কখনো অপমৃত্যু ঘটেছে এ কথা কোনো পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলেছে, বাইরের জলে তার কি করবে?"

"হুজুর তো ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণসন্তানকে জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে

না, কে বলতে পারে? অভিসারক বলে তো আর কোনো জানোয়ার নেই! দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল বটে, কিন্তু তার গায়ে জল লাগছিল না। তার মাথায় ছিল ছাতা, গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুটজুতো। তার পর শুনুন—

"শুধু ঝড়জল না। মাথার উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখের সুমুখে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপার! লাখে লাখে তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হাউই উড়ছে, তারই ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে— সেদিন স্বর্গে হচ্ছিল দেওয়ালি।"

"কি বললি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি!— তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে!"

"আজ্ঞে আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে তো সমস্ত ক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিতমশায়?"

"তা তো ঠিকই। আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুশি তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।"

"শুধু করতে পারেন না, করেও থাকেন। স্বর্গে তো আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত তা হলে কে আর সেখানে যেতে চাইত? আমি তো নয়ই—"

"উনি ত ননই! যেন উনি যেতে চাইলেই স্বর্গে যেতে পেতেন!"

"হুজুর, আমি কোথাও যেতে চাই নে, যেখানে আছি সেখানেই থাকতে চাই।"

"যেখানে আছেন সেইখানেই থাকতে চান! যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেলেন! তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি।"

"হুজুর যেখানে যাবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

"দেখেছেন পণ্ডিতমশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক্, লোকটা অনুগত বটে। যাক ও-সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে তাই হবে। তুই এখন বল, তার পর কি হল!"

"তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে এসে অন্ধকারের বুক চিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মতো এঁকে বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ল।

তার আলোতে দেখা গেল যে দশ হাত দূরে একটা পর্বতপ্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে হুংকার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়কো খুলে দিলে। তার পর ব্রাহ্মণসন্তান ঢোকবার আগেই ঝড়-জল হো হা করে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়ল, আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।"

"মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা গঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে রইল? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে তো!"

"হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই, রবারের।"

"এই যে বললি বুট?"

"বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর, আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে মন্দির অশুদ্ধ করে দেবে?"

"তার পর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে দিলে। তার পর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে জ্বালিয়ে দেখলে যে বাঁ দিকে একটা হারিকেন-লণ্ঠন কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জ্বেলে দেখতে পেলে ডান দিকে দেয়ালের গায়ে খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মতো একটি মূর্তি। আর সে কি মূর্তি! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণসন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মতো জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মতো, চোখ-দুটি পদ্মফুলের মতো, গাল-দুটি গোলাপফুলের মতো, ঠোঁট-দুটি ডালিম ফুলের মতো, কান-দুটি—"

"রাখ্ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, প্রণাম করলে না!"

"আজ্ঞে তার দোষ নেই। মূর্তিটি যে কোন্ দেবতার, তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। কালী শীতলা মনসা চণ্ডী প্রভৃতি কোনো জানাশুনো দেবতা তো নয়।"

"তা নাই হোক, দেবতা তো বটে! দেবতা তো তেত্রিশ কোটি— মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে? আর চেনে না বলে প্রণাম করবে না?"

"আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের তো কোনো ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নেই, ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।"

"দেখ্ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।"

"আজ্ঞে মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওল্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।"

"আবার বলছিস সন্ন্যাসী! দেখ্, যে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী দেখে নি তার কাছে গিয়ে এই-সব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বল, অবধূত বল, নাগা বল, আকালি বল, গিরি বল, পুরি বল, ভারতী বল, বাবাজি বল, আর কত নাম করব— রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কানফাটা উর্ধ্ববাহু দাদূপন্থী অঘোরপন্থী— দেশে এমন সাধু-সন্ন্যাসী নেই যে আমার পয়সা খায় নি, যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারো তো কখনো পৈতা দেখি নি— এক দণ্ডী ছাড়া। তাদেরও তো বাবা, পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।"

"হুজুর, এ ছোকরা ও-সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।"

"সন্ন্যাসী তো বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিস নে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না?"

"হুজুর, আমি বার করি নি, এরা নিজেরাই বেরিয়েছে। এরা ভিখ্ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টোঁ টোঁ কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়, শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো-মোজাও পরে, স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও শহুরে, একরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী।"

"এরা কিছু মানে-টানে?"

"আজ্ঞে এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।"

"কথাটা ভালো বুঝলুম না।"

"বোঝা বড়ো শক্ত হুজুর! এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।"

"বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্মমত পয়দা করলে কে?"

"হুজুর জর্মনরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মতো ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে! ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এ দেশে চালান দেয়, তেমনি ওরা

শংকরের সঙ্গে শংকরী মিলিয়ে এ দেশে চালান দিয়েছে।"

"চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?"

"আজ্ঞে সস্তা বলে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন, "ঘোষাল যাদের কথা বলছে তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাস-করা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।"

"অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং সে ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুশিমত 'সা'র জায়গায় 'নি' এবং 'নি'র জায়গায় 'সা' বসিয়ে দেন।"

রায়মশায়ের আর ধৈর্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চিৎকার করে বললেন, "তোমার টীকা-টিপ্পনী রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইস্টুপিটরা দুপাতা ইংরেজি পড়ে সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা-সব কি— হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃস্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।"

"হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই তা হলে আমার গল্প মারা যায়।"

"আর যদি প্রণাম না করে তো কান ধরে মন্দির থেকে বার করে দে।"

"হুজুর, তা হলেও আমার গল্প মারা যায়।"

"যাক মারা। আমি ঐ-সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছাচারের কথা শুনতে চাই নে।"

"হুজুর, যদি জোর করেন তো আমি নাচার। গল্প তা হলে এইখানেই বন্ধ করলুম।"

"বেশ! এ মাসের মাইনেও তা হলে এইখানেই বন্ধ হল।"

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল, "হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?"

"এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা আর এই হয়ে গেল মানুষ!"

"দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ তো আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা তো সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে, তবে আমি তো' আর পুরাণকার নই। এরকম ওলোপালোট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি তা বলছি। হুজুর মনোযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল তখন ভিতরে যদি জনপ্রাণী না থাকত তা হলে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে মন্দিরের মধ্যে অপর কোনো কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মতো নয় তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।"

"খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস বটে!"

"ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না যে স্বর্গের কোনো অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। দেবী হলে পুজো করতে পারত, মানবী হলে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর এক দিক থেকে ভক্তি আর-এক দিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।"

"কি বললি, ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই তো একসঙ্গেই থাকে।"

"ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি, আর প্রীতি অপরাভক্তি।"

"মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন-সতীনের মতো।"

"ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবন্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়। অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে তো হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?"

"হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষ পাগল হয়।"

"কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম শৌখিন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যমনারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত-মশায়?"

"প্রমাণ তো হাতেই রয়েছে— বিক্রমোর্বশী।"

"শুনলেন হুজুর, পণ্ডিতমশায় কি বললেন? এ অবস্থায় ব্রাহ্মণসন্তানটিকে কি করে ভালোবাসায় ফেলি?"

"তা হলে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হল?"

"আজ্ঞে তাও কি হয়! যা হল তা শুনুন—

"ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উস্‌খুস্‌ করতে দেখে সেই মূর্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খসে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি তখন আর তার বুঝতে বাকি থাকল না। এখন বুঝছেন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায় পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরী! তার উপর আবার এই দুর্যোগের সুযোগ! এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না— ব্রাহ্মণের ছেলে তো মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল; ব্রাহ্মণ যুবক সিধেভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়নকোণ থেকে একটি উল্কাকণা খসে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে পড়ে শুকিয়ে একেবারে শোলার মতো চিমসে ও খড়্‌খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বামাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল সে-সব গলে একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল, আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হতে শুরু হল। তার মনে হল যেন তার পাঁজরা সব ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয় তার ঠিক সেই অবস্থা

হল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে, তার বুকের ভিতর ভালোবাসা জন্মাচ্ছে।"

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি অত্যন্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন, "আহা! পূর্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব, তার উপমা হল কিনা ম্যালেরিয়া জ্বর! ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল তখনই জানি ও শেষটায় বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!"

ঘোষাল এ-সব কথার কোনো উত্তর না করে স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ— মশায়, জবাব দিন।

স্মৃতিরত্ন বললেন, "ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই তো চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিক ভাব বলছ, সেও তো একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?"

"পণ্ডিতমশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরো অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন খাওয়ালে ভালোবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।"

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন, "কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি-শিশি কুইনিন গিলেছি, কিন্তু আমার পিলে—"

রায়মশায় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কান দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কানে পৌঁচেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বললেন, "চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড়ো হয়ে উঠেছে সে কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কই, ও তো তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার-তার কাছে নাকে-কাঁদতে বসে না! পিলে-যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের— হৃদ্‌রোগ। ও যে কি ভয়ানক রোগ তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাতদুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে সঁপে দিলে, অথচ তার কে বাপ কে মা, কি জাত কি গোত্র জানা নেই, সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারো খেয়াল নেই। হ্যাঁ দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার

করেছিস! উজ্জ্বলনীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি সে কথা ঠিক।"

"আজ্ঞে সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্বরাগ তো আর জাতবিচার করে হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, 'পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি'—"

"বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি বদনায় করে। তার পর এখানে একবার জাতবিচার করতে এসে দেখো কি হয়।"

"হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন, শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। 'পানি' না বলে 'ব্রাণ্ডিপানি' বললে আর কোনো গোলই হত না। জল অবশ্য যার-তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালোবাসা জিনিসটে তো দুনিয়ার সেরা মদ।"

"তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথাও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস ভালো। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন, তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণি দোহার। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত মশায়ের মত শুনতে চাই, তোদের কথা শুনতে চাই নে।"

"অজ্ঞাতকুলশীলার প্রতি ভালোবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা দময়ন্তী মালবিকা বাসবদত্তা রত্নাবলী মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই তো—"

"আজ্ঞে তা তো হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে, আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।"

"কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্টো হয়, তা হলে মানুষে কোন্‌টা মেনে চলবে?"

"দুটোই। কাজকর্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।"

"দেখুন রায়মশায়, ঐখানেই তো স্মার্ত ভট্টাচার্য মশায়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক— তা সে জীবনেরই হোক আর কাব্যেরই হোক।"

"তা হলে আপনারা কি চান যে গল্পটা হোক জীবনের মতো, আর জীবনটা হোক গল্পের মতো?"

"আজ্ঞে তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য-মতে জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত

খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয় ; কিন্তু গোস্বামী-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।"

"তুমি থামো ঘোষাল, এ-সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে—"

"ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে তা বুঝলে আপনি ও-সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলংকারশাস্ত্র যদি ধর্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তা হলে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয় ভেবে দেখুন তো।"

"ঠিক বলেছেন পণ্ডিতমশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান যে দুয়ের প্রভেদ আকাশপাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তার পরে মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালোবাসা, তার পর হয় বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায়, মানুষের জীবনে যা হয় তার নাম প্রাণান্ত। কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।"

"তা হলে তুই দেখছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মারবি, নয় প্রাণ মারবি।"

"আজ্ঞে প্রাণে মারতে পারি, কিন্তু জাত কিছুতেই মারব না। হুজুরের কাছে গল্প বলছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই ?"

"দেখ্, তোকে আগেই বলেছি, ব্রহ্মহত্যা কিছুতেই হতে দেব না।"

"আজ্ঞে যদি আখেরে মাথায় বাজ প'ড়ে লোকটা মারা যায়, সেও কি আমার দোষ ? এ দুর্যোগ কি আমি বানিয়েছি ?"

"কি বললি ? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু— মন্দিরের ভিতরে— আর আমার সুমুখে ! বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি ! যেমন করে পারিস মিলনান্ত করতেই হবে— বিয়োগান্ত কিছুতেই হতে দেব না।"

"আজ্ঞে আমিও তো সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয় তা বলতে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক আমি ওর জাত আর প্রাণ— দুই টিকিয়ে রাখব, তার পর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, যদি একটু ধৈর্য ধরে না থাকেন তা হলে গল্প এগুবে কি করে, আর যদি না এগোয় তো তার অন্তই বা হবে কি করে।"

"আচ্ছা, বলে যা।"

"তবে শুনুন—

"ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, শেষে আর ততটা থাকল না। সব বিপদের মতো ভালোবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুশকিল, তার পর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞান-চৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সেই মেয়েটিকে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে মেয়েটির মাথায় চুল কপালের উপর চুড়ো করে বাঁধা, আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে বাঁধে তেমনি করে, বোধ হয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে। তার পর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গসৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব! তার দেহটি ছিল তার চোখের মতো লম্বা, তার নাকের মতো সোজা আর তার ঠোঁটের মতো পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ি চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে শুরু করে দিল।"

"চলে নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।"

"কি? কি? উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে?"

"হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন, চলে নীলশাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর।"

"ঘোষাল! মেয়েটার পরনে কি রঙের শাড়ি ছিল রে?"

"হুজুর, লাল।"

"আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!— চলে লাল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহিত মোর বললে ও কবিতার আর থাকে কি! আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কিনা জাত মেরে দিলে!"

"গোঁসাইজি, গোসা করছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরান যদি কেউ নিঙড়ায় তা হলে তা থেকে যা বেরোবে তার রঙ তো লাল। তবে বলতে পারি নে, হতে পারে যে কারো কারো রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক— ঘোর নীল।"

"নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্রলোকের মাথায় চড়ছ!"

"রাগ করেন কেন মশায়! কোনো সাহেবকে যদি বলা যায় যে তোমার গায়ের রক্ত নীল, তা হলে তো সে না চাইতে চাকরি দেয়।"

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায়মশায় হুংকার ছেড়ে বললেন, "যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস তা হলে রাত-দুপরেও গল্প শেষ হবে না— আর তুই ভেবেছিস এইখানেই আজ রাত কাটাব?"

"হুজুর, তর্ক আমি করি! আমি একজন গুণী লোক— নভেলিস্ট। কথায় বলে, যাদের আর-গুণ নেই তাদের ছার-গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই তো তর্ক করে।"

"ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বলছেন!"

"বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি; আপনি গোঁসাইজি, তার পর চালান দেখি তো কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন।"

"ওরে ঘোষাল, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর-একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়েস কত?"

"উনিশ কি বিশ।"

"সধবা কি বিধবা?"

"কুমারী। কাব্যে হুজুর, কুমারী ছাড়া আর-কিছু তো চলে না।"

"আমাকে বোকা পেয়েছিস, না খোকা পেয়েছিস? ছ ছেলের মার বয়েসি, আর তিনি হলেন কুমারী! বাঙালির ঘরে কোথায় এত বড়ো আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল্ তো?"

"হুজুর, মেয়েটি তো বাঙালি নয়— হিন্দুস্থানী।"

"যেই একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়েছে অমনি আর-একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস! কোথাও কিছু নেই, বলে দিলি হিন্দুস্থানী!"

"হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ করা ওড়না, আর তার শাড়ির সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।"

"হোক-না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানীও তো হিন্দু, আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। জানিস, দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হলে তাদের জাত যায়? কোনো হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়িতে অত বড়ো মেয়ে আইবুড়ো

দেখেছিস— বল্ তো গাধা !"

"হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।"

"কি বললি ? মুসলমান ! হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে— রাস্‌কেল, মুসলমান ঢুকিয়েছিস ! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্বনাশের কথা ! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনই মন্দির থেকে বার করে দে।"

"হুজুর, এই দুর্যোগের মধ্যে—"

"দুর্যোগ-ফুর্যোগ জানি নে, এই মুহূর্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্ধচন্দ্র।"

"হুজুর, বাইরে তো দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন তো বেচারা যায় কোথায় ? হোক-না মুসলমান, মানুষ তো বটে, আমাদের মতো ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।"

"খপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে ! আমার হুকুম মানবি কি না বল ? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছি। এই জমাদার ! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও।"

"হুজুর, একটু সবুর করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হলে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হত ? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালি কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।"

"আবার মিথ্যে কথা ! কুলীনের মেয়ের গায়ে ওড়না ওড়ে আর সে কোঁচা দিয়ে শাড়ি পরে !"

"হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়িটে ভিজে সুমুখের দিকে জড়ো হয়ে গিয়েছিল তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গায়ে ছিল চেলির চাদর তাই ওড়না বলে ভুল করেছিলুম।"

"এই যে বললি সলমাচুমকির কাজ করা ?"

"হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল তাই চুমকির মতো দেখাচ্ছিল।"

"তাই বল্। আঃ ! বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।"

"হুজুর, আপনার না হোক আমার তো তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে তো আমার পাঁচ-প্রাণ দশ দিকে উড়ে গেছল। ভুল করে একটা কথা—"

"অমন ভুল করিস কেন?"

"হুজুর, অমন ভুল অনেক বড়ো বড়ো কবিরাও করেন, আমি তো কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে-সব ছাপার ভুল বলে পার পেয়ে যায়।"

"সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে— এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটায় ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই তো বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস তাই নয়— ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে যা। কি খেয়ে গল্প বলিস বল্ তো? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।"

"হুজুরের প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব, তার পরে মুখ দিয়ে বেরোবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হল শুনুন—

"ভালোবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা একজনের মনের সিগারেট থেকে আর-এক জনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলী দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে, ব্রাহ্মণের ছেলের ভালোবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে শ্যাম্পেনের নেশার মতো আস্তে আস্তে ভালোবাসার রঙ ধরতে শুরু করল।"

"কি বললি? শ্যাম্পেনের নেশার মতো আস্তে আস্তে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস আর বেফাঁস বকছিস! বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস! পোর্ট বল, ক্লারেট বল, জিন বল, রম্ বল, হুইস্কি বল, ব্রাণ্ডি বল আমার তো আর কিছু জানতে বাকি নেই! শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরে না, নয় চট্ করে মাথায় চড়ে যায়। ভালোবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস তো শেরীর সঙ্গে তুলনা দে— গেলাসের পর গেলাসে যা রেক্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়।"

"হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালোবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর, এইখানে একটু মুশকিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেননা তার কোনো বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তা হলেই বুঝতে হবে সে-সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।"

"তবে কি ওদের মনের কথা জানবার জো নেই ?"

"আমি তো তা বলি নি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ, তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদ্‌রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হল শুনুন—

"তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুৎ, স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, তার পর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।"

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস, অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাস।"

"উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে হে ?"

"আজ্ঞে ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।"

"আখরই দিন আর যাই দিন আমি বলে রাখছি যে আখেরে ঐ 'নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসে'র বেশি আর আমি যেতে দেব না।"

"আজ্ঞে এর একটা তো আর-একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।"

"রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।"

"হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোনো বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁদুলে তা আপনি হয়ে ওঠে চুম্বক।"

"বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না, দেবমন্দিরকে করে তুললে একটা কুঞ্জবন! যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বলনীলমণির— এখন দেখছি এ দুটো মাসতুতো ভাই!"

"হুজুর, বড়ো বড়ো কবিরাও এ কাজ পূর্বে করে গিয়েছেন।"

"সত্যি নাকি পণ্ডিতমশায় ?"

"আজ্ঞে, আমি তো কোনো সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।"

"আমাদের পদাবলীতেও ও-সব ব্যাপার মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, 'যব গোধূলি সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি'।"

"ঘোষাল, নিজে করবি কুকীর্তি আর বড়ো বড়ো কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।"

"হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি নি, বাঙলার বড়ো বড়ো লেখকরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে আমি আগে-ভাগেই তা করে বসব, আমি তো একজন ছোটো গল্পকার। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' হিসেবেই আমি চলি।"

"বাঙলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজীর! মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চা আর বেশি করতে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে সে রস কতদূর গড়াবে।"

"তা হলে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।"

"আবার মিথ্যে কথা? এই হাজার বার বলছিস মন্দির, আর এখন বলছিস ভোগের দালান!"

"হুজুর, মন্দির হলে আর তার ভিতর ঠাকুর থাকত না? আগেই তো বলেছি যে সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্তি ছিল না।"

"তাও তো বটে! খুব ডিগবাজি খেতে শিখেছিস। তুই আর-জন্মে ছিলি গেরবাজ।"

"হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি।"

"আচ্ছা যাক, এখন তুই গল্প বলে যা, এতক্ষণে জমছে।"

"হুজুর, তার পর ব্রাহ্মণসন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণকন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে তার গায়ে সাত্বিক ভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সিঁথের সিঁদুর গলে তার ঠোঁটের উপর পড়ল, আর তার অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মতো লালটুকটুকে হয়ে উঠল।"

"রোস রোস, সিঁদুরের কথা কি বললি?"

"কই হুজুর, সিঁদুরের নামও তো ঠোঁটে আনি নি!"

"উঃ, তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস।"

"তা হলে হুজুর, ও মুখ ফস্কে হয়ে গেছে।"

"ও-সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে, রাস্কেল, আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে চালিয়ে দিচ্ছিলি!"

"আজ্ঞে সধবাই যদি হয়, তাতেই-বা ক্ষতি কি?"

"কি বললে উজ্জ্বলনীলমণি, ক্ষতি কি?"

"আজ্ঞে আমি বলছিলুম কি, নায়িকা তো পরকীয়াও হয়—"

এ কথা শুনে সভাসুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি-ছি করে উঠল। উজ্জ্বল-নীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন, "হয় কি না হয় তা বিবর্তবিলাস, মীরাবাইয়ের কড়চা প্রভৃতি পড়ে দেখুন, এমন-কি, কবিরাজ গোস্বামী পর্যন্ত—"

এই কথায় একটা মহা হৈচৈ পড়ে গেল, সকলে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে— কেউ তার কথায় কান দিতে রাজি হল না। উজ্জ্বলনীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। 'পিকোলো'র আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে, তাঁর আওয়াজও এই হৈচৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে তিনি বলছেন, "আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন তার পর যত খুশি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া তো পদকর্তাদের মতে 'কর্মীনারী'— সে না হলে সংসার চলে না; কিন্তু রস-সাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান তো পদাবলীতে—"

"রক্ষা করুন গোঁসাইজি, থামুন, আপনার ও-সব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হলে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন-না পণ্ডিতমশায় রাগ করে উঠে যাচ্ছেন! আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিতমশায়। ব্যাপারটা কি তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে, কিন্তু পরকীয়া নয়।"

"তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস, যা মুখে আসছে তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হল সধবা, অথচ কারো স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।"

"হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে বসে শেষটায় হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে তখন তাকে বেওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।"

" 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নেই। এ কালে ও-সব কথা মুখে আনতে নেই, কেননা তা শুনে অর্বাচীনদের মতিভ্রম হতে পারে। আজ যদি তোমরা ও-সব কাব্যে চালাও, দুদিন পরে তা সমাজে চলবে, তার পর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয়

প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা তোমার নবনবউন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে, তখন তুমি এত প্রলাপ বক যে প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠানো ভার। আজ যেরকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।"

এই বলে পণ্ডিতমশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে তাঁর গতিরোধ হল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে— "আপনি আমার ধর্মবাপ। আপনার পায়ে ধরি, আমাকে বিনা অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করে চলে যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনোই কারণ নেই। সিঁথেয় সিঁদুর থাকলেই যে সধবা হতেই হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল সিঁদুর।"

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায়মশায় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি তার আর আদি অন্ত নেই। আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।"

"হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হলে কি গেরস্তর ঝি-বউ লাল শাড়ি পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা-কোঁচা দেয়, মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধে, এক কপাল সিঁদুর লেপে—"

"হোক-না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে? ভৈরবীর আবার প্রেম কি রে?"

"হুজুর এতক্ষণই যদি ধৈর্য ধরে থাকলেন, তবে আর-একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয় খুশি হবেন। শুনুন—

"ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বললে তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বেস করলে না। 'আমার সিঁথের সিঁদুরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।' এই বলে সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে

দুজনের আবার মিলন হল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল, কারণ এই দশ বৎসর শয়নে-স্বপনে সে ঐ মূর্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিনতে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়োসড়ো হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। তার পরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণসন্তান বুঝতে পারল— এই সেই ; অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত 'তত্ত্বমসি' বলে ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছু পেলে না, শুধু দেওয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল, আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখা গেল মন্দির একেবারে শূন্য !"

"এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি !"

"হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, তাই শোনালুম।"

বলা বাহুল্য, ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায় সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বলনীলমণি। তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, "ভূতের গল্প না তোমার মাথা ! পেত্নীর গল্প।"

এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে খবর এল যে মা-ঠাকুরানীর মাথা ধরেছে। রায়মশায় অমনি হুড়মুড় করে উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়ক্লেশে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও সেদিনকার মতো ভঙ্গ হল।

চৈত্র ১৩২৪

ছোটো গল্প

আমরা পাঁচজনে মিলে এই যুদ্ধ নিয়ে বাক্‌যুদ্ধ করছিলুম। সুপ্রসন্ন হঠাৎ তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে একখানি বাঙলা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আমরা তাঁর পড়ায় বাধা দিলুম না। আমরা জানতুম যে তাঁর সঙ্গে কারো মতের মিল হচ্ছে না বলে তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে ফের আলোচনার ভিতর টেনে আনতে গেলে তিনি খুব চটে যেতেন। আমি বরাবর লক্ষ্য করে আসছি যে, এই যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়, শেষটায় তর্ক একটা মারামারি ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং মনে মনে আমি কথাটা উল্টে নেবার একটা সদুপায় খুঁজছি, এমন সময় সুপ্রসন্ন হঠাৎ আবার বইখানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, "Nonsense !"

কথাটা এত চেঁচিয়ে বললেন যে, তাতে আমরা সকলেই একটু চমকে উঠলুম।

আমি বললুম, "কি nonsense হে ?"

সুপ্রসন্ন বললেন, "তোমাদের এই বাঙলা বইয়ে যা লেখা হয় তাই। সাধে ভদ্রলোকে বাঙলা পড়ে না ! এই বইখানা খুলেই দেখি লেখক বলছেন, ছোটো গল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তার পর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার definition ! এর পরেও লোকে বলে বাঙালির শরীরে লজিক নেই !"

অনুকূল এই শুনে একটু হেসে উত্তর করলেন, "ওহে অত চট কেন ? দেখছ-না, লেখক নিজের নাম রেখেছেন 'বীরবল' ? ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে ও হচ্ছে রসিকতা।"

"তোমরা যাকে বল রসিকতা, আমি তাকেই বলি nonsense। একটা জোড়া কথাকে ভেঙে বলায় মানুষে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

এ শুনে প্রশান্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, "তোমার বুদ্ধির অগম্য হলেই যে তা আর-সকলের বুদ্ধির অগম্য হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বীরবলের ও কথা nonsenseও নয় রসিকতাও নয়— ষোলো-আনা সাচ্চা কথা।"

যে যা বলত প্রশান্ত তার প্রতিবাদ করত, এই ছিল তার চিরকেলে স্বভাব। সুতরাং সে সুপ্রসন্ন ও অনুকূল দুজনের দ্বিমতকে এক বাণে বিদ্ধ করায় আমরা মোটেই আশ্চর্য হলুম না। বরং নিজের মতকে সে কি করে প্রতিষ্ঠা করে তাই শোনবার আগ্রহ আমার মনে জেগে উঠল। তর্কের মুখে প্রশান্ত অনেক নতুন কথা বলত। তাই আমি বললুম, "দেখো প্রশান্ত, রসিকতাকে যে সত্য কথা মনে করে, রসজ্ঞান তারও নেই।"

পিঠ পিঠ জবাব এল— "সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্যজ্ঞান তারও নেই।"

"মানলুম। তার পর ওর সত্যিটি কোন্‌খানে বুঝিয়ে দাও তো হে?"

"বীরবলের কথাটা একবার উল্টে নেওয়া যাক। তা হলে দাঁড়ায় এই যে, ছোটো গল্প হচ্ছে সেই পদার্থ, যা প্রথমত ছোটো নয়, দ্বিতীয়ত গল্প নয়। তা যদি হয় তো Kantএর 'শুদ্ধবুদ্ধির সুবিচার'ও ছোটো গল্প।"

এ কথা শুনে আমরা অবশ্য হেসে উঠলুম, কিন্তু সুপ্রসন্ন আরো অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, "তোমার যেরকম বুদ্ধি তাতে তোমার বাঙলা লেখক হওয়া উচিত। Nonsenseকে উল্টে নিলেই যে তা Sense হয় এ তত্ত্ব কোন্ লজিকে পেয়েছ, গ্রীক না জর্মান? 'ছোটো' শব্দের নিজের কোনো অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য-কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না।"

"তা হলে War and Peaceএর চেহারা চোখের সুমুখে রাখলে Anna Kareninaকে ছোটো গল্প বলতে হবে? আর রাজসিংহের পাশে বসিয়ে দিলেই বিষবৃক্ষ ছোটো গল্প হয়ে যাবে? একই কথার যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মানে হয়, এইটে ভুলে গেলেই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যায়। গণিতে 'ছোটো' শব্দ relative, ও লজিকে correlative; কিন্তু সাহিত্যে তা positive।"

"তা হলে তোমার মতে ছোটো গল্পের ঠিক মাপটা কি?"

"এক ফর্মা। যার দেহ এক ফর্মায় আঁটে না, তা বড়ো গল্প না হতে পারে কিন্তু তা ছোটো গল্প নয়।"

"তোমার কথা গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা হচ্ছে এই যে, ফর্মাও সব এক মাপের নয়। ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, ষোলো-পেজি আছে।"

"ছন্দও আট মাত্রার, বারো মাত্রার, ষোলো মাত্রার হয়ে থাকে ; অতএব যদি বলা যায় যে পদ্য-ছন্দের সীমানা টপকে গেলে তা গদ্য না হতে পারে কিন্তু তা পদ্য হয় না, তা হলে সে কথাও তোমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"

সুপ্রসন্ন তর্কের এ প্যাঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বললেন, "আচ্ছা তা যেন হল। গল্প, গল্প হওয়া উচিত, এ কথা বলে বীরবল কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ? আমরা জানতে চাই, গল্প কাকে বলে ?"

প্রশান্ত অতি প্রশান্ত ভাবে উত্তর করলেন— "গল্প হচ্ছে সেই জিনিস যা আমরা করতে জানি নে।"

"শুনতে তো জানি ?"

"সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তোমরা ভালোবাস শুধু বর্ণনা আর বক্তৃতা, যার ভিতর গল্প ফোটা দূরে যাক শুধু চাপা পড়ে যায়। বড়ো গল্পের তোড়া বাঁধতে হলে হয়তো তার ভিতর দেদার পাতা পুরে দিতে হয়। কিন্তু ছোটো গল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মতো, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই।"

"দেখো প্রশান্ত, উপমা যুক্তি নয়, যারা উপমা দিয়ে কথা বলে তাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুর কোনো জ্ঞান লাভ করি নে, লাভ করি শুধু উপমারই জ্ঞান। তোমার ঐ ফুল পাতা রাখো! এখন বলো দেখি, ছোটো গল্পের প্রাণ কি ?"

"ট্রাজেডি।"

"কেন, কমেডি নয় কেন ?"

"এই কারণে যে, ট্রাজেডি অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যায়—যথা, খুন জখম মৃত্যু ইত্যাদি, আর কমেডির অভিনয় তো সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।"

অনুকূল এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এইবার বললেন, "আমার মত ঠিক উল্টো। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্তেই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত-গুলোকেই একসঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক। পৃথিবীতে যা ছোটো তাই কমিক, আর যা বড়ো তাই ট্রাজিক।"

জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক, এ তর্ক উঠলে যে প্রথমে তা কমিক হবে আর শেষটা ট্রাজিক হতেও পারে এ কথা আমি জানতুম। তার পর ঐ তো হচ্ছে সকল দর্শনের আসল সমস্যা। আর কোনো দর্শনই অদ্যাবধি

যখন তার মীমাংসা করতে পারে নি, তখন আমরা যে হাত-হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব, সে ভরসাও আমার ছিল না। আলোচনা-যুদ্ধ থেকে গল্পে এসে পড়ায় একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলুম, তাই দর্শনের একটা ঘোরতর তর্ক হতে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি এই বলে উভয়ের পক্ষের আপস-মীমাংসা করে দিলুম যে, ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোটো গল্পের প্রাণ।

প্রফেসার এতক্ষণ আমাদের তর্কে যোগ দেন নি; নীরবে একমনে আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "প্রশান্তর কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে ছোটো গল্প আমারই লেখা উচিত, কেননা আমার মুখে গল্প ছোটো হতে বাধ্য। কেননা আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই, আর বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি নেই। এই তো গেল প্রথম কথা। তার পর জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করি নে, কমেডিও মনে করি নে; কারণ আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুইই। ও দুইই হচ্ছে একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা বলতে যাচ্ছি। তোমরা দেখো প্রথমে তা ছোটো হয় কি না, আর দ্বিতীয়ত তা গল্প হয় কি না। এইটুকু ভরসা আমি দিতে পারি যে, তা ছাপলে আট পেজের কম হবে না, ষোলো পেজেরও বেশি হবে না— বারো পেজের কাছ ঘেঁষেই থাকবে। তবে তা এক 'সবুজ পত্র' ছাড়া আর কোনো কাগজ ছাপতে রাজি হবে কি না বলতে পারি নে। কেননা তার গায়ে ভাষার কোনো পোশাক থাকবে না। ভাষা জিনিসটে যদি আমার ঠোঁটের গোড়ায় থাকত তা হলে আমি আঁকও কষতুম না, গল্পও লিখতুম না, ওকালতি করতুম। আর, তা হলে আমার টাকারও এত টানাটানি হত না। সে যা হোক, এখন গল্প শোনো।"

প্রফেসারের কথা

আমি যে বছর বি. এস্‌-সি. পাস করি, সে বছর পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়ে জ্বরে পড়ি। সে জ্বর আর দু-তিন মাসের মধ্যে গা থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। দেখলুম, চণ্ডীদাসের অন্তরের পীরিতি-বেয়াধির মতো আমার গায়ের জ্বর শুধু 'থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে, জ্বালার নাহিক ওর।' শেষটায় স্থির করলুম, চেঞ্জে যাব। কোথায়, জান? উত্তরবঙ্গে!

ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান! এর কারণ, তখন বাবা সেখানে ছিলেন এবং ভালো হাওয়ার চাইতে ভালা খাওয়ার উপর আমার বেশি ভরসা ছিল। এ বিশ্বাস আমার পৈতৃক। বাবার জীবনের প্রধান শখ ছিল আহার। তিনি ওষুধে বিশ্বাস করতেন কিন্তু পথ্যে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং বাবার আশ্রয় নেওয়াই সংগত মনে করলুম। জানতুম, তাঁর আশ্রয়ে জ্বর বিষম হলেও সাবু খেতে হবে না।

একদিন রাত্তদুপুরে রাণাঘাট থেকে একটি প্যাসেঞ্জার-ট্রেনে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম। মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল। একে ডিসেম্বর মাস, তার উপর আমার শরীর ছিল অসুস্থ, তাই এক পাল অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে অতটা পথ যাবার প্রবৃত্তি হল না। জানতুম যে, প্যাসেঞ্জারে গেলে সম্ভবত একটা পুরো সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট আমার একার ভোগেই আসবে। আর তাও যদি না হয় তো গাড়িতে যে লম্বা হয়ে শুতে পারব, আর কোনো গার্ড-ড্রাইভার গোছের ইংরেজের সঙ্গে একত্র যে যেতে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। এর একটা আশা ফলেছিল, আর একটা ফলে নি। আমি লম্বা হয়ে শুতে পেরেছিলুম, কিন্তু ঘুমোতে পাই নি। গাড়িতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ হুঁশ ছিল ততক্ষণ শুধু মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা নিতান্ত অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্যন্ত ঠিক বোতলের মতো। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মতো হয়েছে, কিম্বা তার শরীরটা বোতলের মতো বলে সে মদ খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি করতে পারলুম না। যারা দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এ problemটা তাদের জন্য, অর্থাৎ ফিজিওলজিস্টদের জন্য রেখে দিলুম। যাক এ-সব কথা। আমার সঙ্গে বৃদ্ধটি কোনোরূপ অভদ্রতা করে নি, বরং দেখবামাত্রই আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে সে ভদ্রলোক এতটা মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিল যে আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে পড়বার ভান করলুম। মাতাল আমি পূর্বে কখনো এত হাতের গোড়ায়, আর এতক্ষণ ধরে দেখি নি, সুতরাং এই তার খাঁটি নমুনা কি না বলতে পারি নে। সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাসছিল ও কাঁদছিল; হাসছিল— বিড় বিড় করে কি বকে, আর কাঁদছিল— পরলোকগতা সহধর্মিণীর গুণকীর্তন করে। সে-যাত্রা গাড়িতে প্রথমেই মানবজীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম। আমার পক্ষে

এই মাতলামোর অভিনয়টা কিন্তু ঠিক কমেডি বলে বোধ হয় নি। দুর্বল শরীরে শীতের রাত্তিরে রাত্রি-জাগরণটা ঠাট্টার কথা নয়, বিশেষত সে জাগরণের অংশীদার যখন এমন লোক, যার সর্বাঙ্গ দিয়ে মদের গন্ধ অবিরাম ছুটছে। মানুষ যখন ব্যারাম থেকে সবে সেরে ওঠে তখন তার সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আমারও তাই হয়েছিল। ফলে জ্বর আসবার মুখে যেরকম গা পাক দেয়, মাথা ঘোরে, আমার ঠিক সেই রকম হচ্ছিল। ঘ্রাণে যে অর্ধ ভোজনের ফল হয়, এ সত্যের সে রাত্তিরে আমি নাকে-মুখে প্রমাণ পাই।

পরদিন ভোরের বেলায় শীতে হি হি করতে করতে স্টিমারে পদ্মা পার হলুম। সারায় গিয়ে এবার যে গাড়িতে চড়লুম তাতে জনপ্রাণী ছিল না। আগের রাত্তিরের পাপ সেইখানেই বিদেয় হল। মনে মনে বললুম, 'বাঁচলুম।' যদিচ বিনা নেশায় মানুষটা কিরকম তা দেখবার ঈষৎ কৌতূহল ছিল। সাদা চোখে হয়তো সে আমার দিকে কটমটিয়ে চাইত। শুনেছি, নেশার অনুরাগ খোঁয়ারিতে রাগে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, গাড়ি চলতে লাগল, কিন্তু সে এমনি ভাবে যে, গম্যস্থানে পৌঁছবার জন্য যেন তার কোনো তাড়া নেই। ট্রেন প্রতি স্টেশনে থেমে জিরিয়ে, একপেট জল খেয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে ঘটর-ঘটর করে অগ্রসর হতে লাগল। আমি সাহিত্যিক হলে এই ফাঁকে উত্তর-বঙ্গের মাঠঘাট জলবায়ু গাছপালার একটা লম্বা বর্ণনা লিখতে পারতুম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আমার চোখে এ-সব কিছুই পড়ে নি ; আর যদি পড়ে থাকে তো মনে কিছুই ঢোকে নি, কেননা কি যে দেখেছিলুম তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই মনে নেই। মনে এই মাত্র আছে যে, আমি গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি, গাড়ি হিলি স্টেশনে পৌঁচেছে— আর বেলা তখন একটা।

চোখ তাকিয়ে দেখি, একদল মুটে হুড়মুড় করে এসে গাড়ির ভিতর ঢুকে এক রাশ বাক্স ও তোরঙ্গে ঘর ছেয়ে ফেললে। সেই-সব বাক্স ও তোরঙ্গের উপর বড়ো বড়ো কালির অক্ষরে লেখা ছিল Mr. A. Day। দেখে আমার প্রাণে ভয় ঢুকে গেল এই মনে করে যে, রাতটে তো একটা সাহেবে জ্বালিয়েছে, দিনটা হয়তো আর-একটা সাহেবে জ্বালাবে, সম্ভবত বেশিই জ্বালাবে, কেননা আগন্তুক যে সরকারী সাহেব তার সাক্ষী— তাঁর চাপরাশধারী পেয়াদা সুমুখেই হাজির ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে

বসলুম। স্বীকার করছি, আমি বীরপুরুষ নই।

অতঃপর যিনি কামরায় প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখে আমি ভীত না হই, চকিত হয়ে গেলুম। তাঁর নাম মিস্টার Day না হয়ে মিস্টার Night হলেই ঠিক হত। আমরা বাঙালিরা, শুনতে পাই, মোঙ্গল-দ্রাবিড় জাত। কথাটা সম্ভবত ঠিক, কেননা আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙের বেশ-একটু আমেজ আছে। কিন্তু পাকা মাদ্রাজি রঙ শুধু দু-চার জনের মধ্যেই পাওয়া যায়। Mr. Day সেই দু-চার জনের এক জন। আমি কিন্তু তাঁর রঙ দেখে অবাক হই নি, চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিলুম। এ দেশে ঢের শ্যামবর্ণ লোক আছে যারা অতি সুপুরুষ, কিন্তু এই হ্যাটকোটধারী যে কোন্ জাতীয় জীব তা বলা কঠিন। মানুষের সঙ্গে ভাঁটার যে কতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে ইতিপূর্বে তার চাক্ষুষ পরিচয় কখনোই পাই নি। সেই দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় সমান লোকটির গা হাত পা মাথা চোখ গাল সবই ছিল গোলাকার। তার পর তাঁর সর্বাঙ্গ তাঁর কোট-পেণ্টালুনের ভিতর দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছিল। কোট-পেণ্টালুন তো কাপড়ের— তাঁর দেহ যে তাঁর চামড়া ফেটে বেরোয় নি, এই আশ্চর্য! তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাব্যাঙের কথা মনে পড়তে লাগল, আর আমি হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। যা অসামান্য তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সুরূপই হোক আর কুরূপই হোক। একটু পরে আমার হুঁশ হল যে ব্যবহারটা আমার পক্ষে অভদ্রতা হচ্ছে। অমনি আমি তার সুগোল নিটোল বপু থেকে চোখ তুলে নিয়ে অন্য দিকে চাইলুম। অন্ধকারের পর আলো দেখলে লোকের মন যেমন এক নিমেষে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, আমারও তাই হল। এবার যা চোখে পড়ল তা সত্য সত্যই আলো— সে রূপ আলোর মতোই উজ্জ্বল, আলোর মতোই প্রসন্ন। Mr. Dayর সঙ্গে দুটি কিশোরীও যে গাড়িতে উঠেছিলেন, প্রথমে তা লক্ষ্য করি নি। এখন দেখলুম, তার একটি Mr. Dayর ঈষৎ-সংক্ষিপ্ত শাড়ি-বাঁধাই সংস্করণ। এর বেশি আর কিছু বলতে চাই নে। Weismann যাই বলুন, বাপের রূপ সন্তানে বর্তায়, তা সে-রূপ স্বোপার্জিতই হোক আর অন্বয়াগতই হোক। অপরটির রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; কেননা আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমার চোখে ও মনে সেই মুহূর্তে যা চিরদিনের মতো ছেপে গেল, সে হচ্ছে একটা আলোর অনুভূতি। এর বেশি আর কিছু বলতে পারি নে। আমি যদি চিরজীবন আঁক

না কষে কবিতা লিখতুম, তা হলে হয়তো তার চেহারা কথায় এঁকে তোমাদের চোখের সুমুখে ধরে দিতে পারতুম। আমার মনে হল সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে তার আঙুলের ডগা দিয়ে অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden Jarএর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত তা হলে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বলতে গেলে প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ, তার অঙ্গ-ভঙ্গি, তার বেশ-ভূষা, সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরোচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, অধ্যাপক জে. সি. বোসের কথা সত্য— প্রাণ আর বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

এই উচ্ছ্বাস থেকে তোমরা অনুমান করছ যে, আমি প্রথম-দর্শনেই তার ভালোবাসায় পড়ে গেলুম। ভালোবাসা কাকে বলে তা জানি নে, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, সেই মুহূর্তে আমার বুকের ভিতর একটি নূতন জানালা খুলে গেল, আর সেই দ্বার দিয়ে আমি একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করলুম— যে জগতের আলোয় মোহ আছে, বাতাসে মদ আছে। এই থেকেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস, আমি যদি কবি হতুম তা হলে তোমরা যাকে ভালোবাসা বল তা আমার মনে অত শিগগির জন্মাত না। যারা ছেলেবেলা থেকে কাব্যচর্চা করে তারা ও জিনিসের টীকে নেয়। আমাদের মতো চিরজীবন আঁক-কষা লোকদেরই ও রোগ চট্ করে পেয়ে বসে। মাপ করো, একটু বক্তৃতা করে ফেললুম, তোমাদের কাছে সাফাই হবার জন্য। এখন শোন তার পর কি হল।

Mr. Day আমার সঙ্গে কথোপকথন শুরু করে দিলেন এবং সেই ছলে আমার আদ্যোপান্ত পরিচয় নিলেন। মেয়ে-দুটি আমাদের কথাবার্তা অবশ্য শুনছিল, স্থূলাঙ্গীটি মনোযোগ সহকারে, আর অপরটি আপাতদৃষ্টিতে— অন্যমনস্ক ভাবে। আমি আপাতদৃষ্টিতে বলছি এই কারণে যে, আমার এক-একটা কথায় তার চোখের হাসি সাড়া দিচ্ছিল। আমার নাম কিশোরীরঞ্জন এ কথা শুনে বিদ্যুৎ তার চোখের কোণে চিক্‌মিক্ করতে লাগল, তার ঠোঁটের উপর লুকোচুরি খেলতে লাগল। স্থূলাঙ্গীটি কিন্তু আসল কাজের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল। আমার বাবা যে পাটের কারবার করেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলে, তার পর অবিবাহিত, তার পর জাতিতে

কায়স্থ, এ খবরগুলো বুঝলুম সে তার বুকের নোটবুকে টুকে নিচ্ছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় Mr. Dayর প্রয়োজন হয় নি। তিনি আমার বাবাকে হয়তো নামে জানতেন, নয়তো তিনি আমার বেশভূষার পরিপাট্য, আসবাবপত্রের আভিজাত্য থেকে অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক্— অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। সুতরাং আমি বাবার এক ছেলে ও ফার্স্ট ডিভিসনে বি. এস্-সি. পাস করেছি, এ সংবাদ পেয়ে তিনি আমার প্রতি হঠাৎ অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। আগের রাত্তিরে বুড়ো সাহেবটি যে পরিমাণ হয়েছিলেন, তার চাইতে এক চুল কম নয়। মদ যে এ দুনিয়ায় কত রকমের আছে, এ যাত্রায় তার জ্ঞান আমার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

এর পর তাঁর পরিচয় তিনি নিজে হতেই দিলেন। যে পরিচয় তিনি খুব লম্বা করে দিয়েছিলেন, আমি তা দু কথায় বলছি। তিনিও কায়স্থ, তিনিও বি. এ. পাস; এখন তিনি গভর্নমেণ্টের একজন বড়ো চাকুরে— সেটেলমেণ্ট-অফিসার। কিন্তু যে কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে বলছিলেন, সে হচ্ছে এই যে, তিনি বিলেতফেরত নন, ব্রাহ্মও নন, পাকা হিন্দু; তবে তিনি শিক্ষিত লোক বলে স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন, এবং বাল্যবিবাহে বিশ্বাস করেন না; সংক্ষেপে তিনি reformer নন— reformed Hindu। মেয়েকে লেখাপড়া, জুতো-মোজা পরতে শিখিয়েছেন, এবং এই-সব শিক্ষা দেবার জন্য বড়ো করে রেখেছেন, এতদিনও বিবাহ দেন নি; তবে পয়লা নম্বরের পাস করা ছেলে পেলে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন। এ কথা শুনে আমি তার দিকে চাইলুম, কার দিকে অবশ্য বলবার দরকার নেই। অমনি তার মুখে আলো ফুটে উঠল, কিন্তু তার ভিতর কি যেন একটা মানে ছিল যা আমি ধরতে পারলুম না। আমার মনে হল, সে আলোর অন্তরে ছিল অপার রহস্য আর অগাধ মায়া। এক কথায়, আরতির আলোতে প্রতিমার চেহারা যেরকম দেখায়— সেই হাসির আলোতে তার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। শরীর যার রুগ্‌ণ সে পরের মায়া চায় এবং একটুতেই মনে করে অনেকখানি পায়। এই সূত্রে আমি একটা মস্তবড় সত্য আবিষ্কার করে ফেললুম, সে হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকে বলকে ভক্তি করে, কিন্তু ভালোবাসে দুর্বলকে।

সে যাই হোক, আমি মনে মনে তার গলায় মালা দিলুম, আর তার আকার-ইঙ্গিতে বুঝলুম, সেও তার প্রতিদান করলে। এই মানসিক গান্ধর্ব-বিবাহকে সামাজিক ব্রাহ্ম-বিবাহে পরিণত করতে যে বৃথায় কালক্ষেপ করব না, সে বিষয়েও কৃতসংকল্প হলুম। তুটির মধ্যে স্থন্দরীটিই যে বয়োজ্যেষ্ঠা সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, তুই বোনের ভিতর চেহারার প্রভেদ এত বেশি কেন? তার উত্তর— একটি হয়েছে মায়ের মতো, আর-একটি বাপের মতো। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অবশ্য আমাকে differential calculusএর আঁক কষতে হয় নি।

আমি ও মিস্টার দে তুজনেই হলদিবাড়ি নামলুম। দে-সাহেবের ঐ ছিল কর্মস্থল, এবং বাবাও তাঁর ব্যবসার কি তদ্‌বিরের জন্য সে সময়ে ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনে যখন আমি দে-সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি— তখন সেই স্থন্দরীর দিকে চেয়ে দেখি, সে মুখে হাসির রেখা পর্যন্ত নেই। যে চোখ এতক্ষণ বিদ্যুতের মতো চঞ্চল ছিল, সে চোখ এখন তারার মতো স্থির হয়ে রয়েছে, আর তার ভিতরে কি একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে। সে দৃষ্টি যখন আমার চোখের উপর পড়ল, তখন আমার মনে হল তা যেন স্পষ্টাক্ষরে বললে, 'আমি এ জীবনে তোমাকে আর ভুলতে পারব না ; আশা করি তুমিও আমাকে মনে রাখবে।' মানুষের চোখ যে কথা কয় এ কথা আমি আগে জানতুম না। অতঃপর আমি চোখ নিচু করে সেখান থেকে চলে এলুম।

তার পর যা হল শোনো। আমি এ বিয়েতে বাবার মত করালুম। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার ভালো ছেলে ; স্থতরাং বাবা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দ্বিধা করলেন না। প্রস্তাবটা অবশ্য বরের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হল। উভয়পক্ষের ভিতর মামুলি কথাবার্তা চলল। তার পর আমরা একদিন সেজেগুজে মেয়ে দেখতে গেলুম। মেয়ে আমি আগে দেখলেও বাবা তো দেখেন নি। তা ছাড়া রীতরক্ষে বলেও তো একটা জিনিস আছে।

দে-সাহেবের বাড়িতে আমরা উপস্থিত হবার পর, খানিকক্ষণ বাদেই একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের স্থমুখে এনে হাজির করা হল। সে এসে দাঁড়াবামাত্র আমার চোখে বিদ্যুতের আলো নয়, বুকে বিদ্যুতের ধাক্কা

লাগল। এ সে নয়— অন্যটি। সাজগোজের ভিতর তার কদর্যতা জোর করে ঠেলে বেরিয়েছিল। আমি যদি তার সেদিনকার মূর্তির বর্ণনা করি, তা হলে নিষ্ঠুর কথা বলব। তার কথা তাই থাক্। আমি এ ধাক্কায় এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে, কাঠের পুতুলের মতো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পর্দার আড়াল থেকে পাশের ঘরে একটি মেয়ে বোধ হয় আমার ঐ অবস্থা দেখে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। আমার বুঝতে বাকি রইল না— সে হাসি কার। আমি যদি কবি হতুম, তা হলে সে মুহূর্তে বলতুম, "ধরণী, দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ব্যাপার কি হয়েছিল জান? যে মেয়েটিকে আমাকে দেখানো হয়েছিল, সে হচ্ছে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা; আর যাকে পর্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল সে হচ্ছে দে-বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী, অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের। বলা বাহুল্য, আমি বিবাহ করতে কিছুতেই রাজি হলুম না, যদিচ বাবা বিরক্ত হলেন, দে-সাহেব রাগ করলেন, আর দেশসুদ্ধ লোক আমার নিন্দা করতে লাগল।

এ ঘটনার হপ্তা-খানেক বাদে ডাকে একখানি চিঠি পেলুম। লেখা স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠি এই—

"যদি আমার প্রতি তোমার কোনোরূপ মায়া থাকে তা হলে তুমি ঐ বিবাহ করো নচেৎ এ পরিবারে আমার তিষ্ঠানো ভার হবে।

কিশোরী"

এ চিঠি পেয়ে আমার সংকল্প ক্ষণিকের জন্য টলেছিল; কিন্তু ভেবে দেখলুম, ও কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা দুজনেই এক ঘরের লোক, এবং দুজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রাখতে হবে, এবং সে দুই মিথ্যাভাবে। নিজের মন যাচিয়ে বুঝলুম, চিরজীবন এ অভিনয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এই হচ্ছে আমার গল্প। এখন তোমরা স্থির করো যে এ ট্রাজেডি, কি কমেডি, কিংবা এক সঙ্গে দুইই।

প্রফেসর এই বলে থামলে অনুকূল হেসে বলল, "অবশ্য কমেডি। ইংরেজিতে যাকে বলে Comedy of Errors।"

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "মোটেই নয়। এ শুধু ট্রাজেডি নয়, একেবারে চতুরঙ্গ ট্রাজেডি।"

ঐ চতুরঙ্গ বিশেষণের সার্থকতা কি, প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর করলেন— "স্ত্রী কিশোরী আর প্রোফেসার কিশোরী, এই দুই কিশোরীর পক্ষে ব্যাপারটা যে কি ট্রাজিক তা তো সকলেই বুঝতে পারছ। আর এটা বোঝাও শক্ত নয় যে, দে-সাহেবের মনের শান্তিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, আর তাঁর মেয়ের হয় আর বিয়ে হল না, নয় কোনো বাঁদরের সঙ্গে হল।"

প্রফেসর এর জবাবে বললেন, "শ্রীমতীর জন্য দুঃখ করবার কিছু নেই, তার আমার চাইতে ঢের ভালো বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী এখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আর সে আমার দ্বিগুণ মাইনে পায়। কথাটা হয়তো তোমরা বিশ্বাস করছ না, কিন্তু ঘটনা তাই। দে-বাহাদুর দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে একটি এম. এ.র সঙ্গে তার বিবাহ দেন, তার পরে সাহেব-সুবোকে ধরে তাকে ডেপুটি করে দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তাকে খালি-পায়ে বেড়াতে হত, এখন সে দুবেলা জুতো-মোজা পরছে। তার পর বলা বাহুল্য যে, দে-বাহাদুরের যেরকম আকৃতি-প্রকৃতি, তাতে করে তিনি ট্রাজেডি দূরে থাক্ কোনো কমেডিরও নায়ক হতে পারেন না, তাঁর যথার্থ স্থান হচ্ছে প্রহসনের মধ্যে।"

"আচ্ছা, তা হলে তোমাদের দুজনের পক্ষে তো ঘটনাটা ট্রাজিক ?"

"কি করে জানলে ? অপর কিশোরীর বিষয় তো তুমি কিছুই জান না, আর আমার মনের খবরই বা তুমি কি রাখ ?"

"আচ্ছা, ধরে নিচ্ছি যে অপরটির পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে কমেডি, খুব সম্ভবত তাই— কেননা তা নইলে তোমার দুর্দশা দেখে সে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠবে কেন ? কিন্তু তোমার পক্ষে যে এটা ট্রাজেডি, তার প্রমাণ, তুমি অদ্যাবধি বিবাহ কর নি।"

"বিবাহ করা আর না করা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড়ো ট্রাজেডি তা যখন জানি নে, তখন ধরে নেওয়া যাক— করাটাই হচ্ছে কমেডি, যদিচ বিবাহটা কমেডির শেষ অঙ্ক বলেই নাটকে প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক, আমি যে বিয়ে করি নি তার কারণ— টাকার অভাব।"

"বটে ! তুমি যে মাইনে পাও তাতে আর-দশজন ছেলে-পিলে নিয়ে তো দিব্যি ঘর-সংসার করছে !"

"তা ঠিক। আমার পক্ষে তা করা কেন সম্ভব নয়, তা বলছি। বছর-কয়েক আগে বোধ হয় জান যে, পাটের কারবারে একটা বড়ো গোছের মার

খেয়ে বাবার ধন ও প্রাণ দুইই এক সঙ্গে যায়। ফলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। তার পর এই চাকরিতে ঢুকে মার অনুরোধে বিয়ে করতে রাজি হলুম। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল ; আমি অবশ্য মেয়ে দেখি নি, কিন্তু পাকাদেখাও হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে আবার একখানি চিঠি পেলুম, লেখা সেই স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠির মোদ্দা কথা এই যে, লেখিকা বিধবা হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কপর্দকশূন্য। দে-সাহেব তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে এক কড়াও দিয়ে যান নি। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ঘুষের টাকা তিনি তাঁর কন্যারত্নকে দিয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলা করা কর্তব্য কি না, সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে মামলা করা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে তাঁর সংসারের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ভেবে দেখো দেখি, যে গল্পটা তোমাদের বললুম, সেটা আদালতে কি বিশ্রী আকারে দেখা দিত। বলা বাহুল্য, এর পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলুম, মা বিরক্ত হলেন, কন্যাপক্ষ রাগ করলেন, দেশসুদ্ধ লোক নিন্দে করতে লাগল, কিন্তু আমি তাতে টললুম না। কেননা, দু-সংসার চালাবার মতো রোজগার আমার নেই।”

“দেখো, তুমি অদ্ভুত কথা বলছ, একটি হিন্দু বিধবার আর কি লাগে, মাসে দশ টাকা হলেই তো চলে যায়, তা আর তুমি দিতে পার না ?”

“যদি দশ টাকায় হত, তা হলে আমি পাকাদেখার পর বিয়ে ভেঙে দিয়ে সমাজে দুর্নামের ভাগী হতুম না। সে একা নয়, তার বাপ-মা আছে, তারা যে হতদরিদ্র তা বোধ হয় তাদের দে-সাহেবকে কন্যাদান থেকেই বুঝতে পার। তার পর আমি যে-ঘটনার উল্লেখ করেছি তার সাত মাস পরে তার যে কন্যাসন্তান হয়, সে এখন বড়ো হয়ে উঠছে। এই সব-কটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাকেই করতে হয়, আর তা অবশ্য দশ টাকায় হয় না।”

অনুকূল জিজ্ঞাসা করলে, “তাঁর রূপ আজও কি আলোর মতো জ্বলছে ?”

“বলতে পারি নে, কেননা তাঁর সঙ্গে সেই ট্রেনে ছাড়া আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।”

“কি বলছ, তুমি তার গোনাগুষ্টি খাইয়ে পরিয়ে রাখছ, আর সে তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করে নি !”

“একবার কেন, বহুবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি করি নি।”

অনুকূল হেসে বললে, "পাছে 'নেশার অনুরাগ খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়' এই ভয়ে বুঝি?"

"না, তার কন্যাটি পাছে তার দিদির মতো দেখতে হয় এই ভয়ে!"

শেষে আমি বললুম, "প্রফেসার, তোমার গল্প উৎরেছে। তুমি করতে চাইলে বিয়ে, তা হল না, কিন্তু বিয়ের দায়টা পড়ল তোমার ঘাড়ে। এ ব্যাপার যদি ট্রাজি-কমেডি না হয় তো ট্রাজি-কমেডি কাকে বলে তা আমি জানি নে।"

সুপ্রসন্ন বললে, "তা হতে পারে, কিন্তু এ গল্প ছোটো হয় নি, কেননা, এতক্ষণে ষোলো পেজ পেরিয়ে গেল।"

প্রশান্ত অমনি বলে উঠল যে, "তা যদি হয়ে থাকে তো সে প্রফেসারের গল্প বলার দোষে নয়— তোমাদের জেরা আর সওয়াল-জবাবের গুণে।"

প্রফেসার হেসে বললেন, "প্রশান্ত যা বলছে তা ঠিক, শুধু 'তোমাদের' বদলে 'আমাদের' ব্যবহার করলে তার বক্তব্যটা ব্যাকরণশুদ্ধ হত।"

শ্রাবণ ১৩২৫

রাম ও শ্যাম

শ্রীমান চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

আর পাঁচ জনের দেখাদেখি আমিও অতঃপর গল্প লিখতে শুরু করেছি, কেননা গল্প না লিখলে আজকাল সাহিত্য-সমাজে কোনোরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। ইতিপূর্বে যে লিখি নি তার কারণ, লেখবার এমন কোনো বিষয় দেখতে পাই নি যা পূর্ব-লেখকরা দখল করে না নিয়েছেন। শেষটা আবিষ্কার করলুম, বাঙলার গল্প-সাহিত্যে আদর্শপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা বড়োই দুর্লভ, যা দুর্লভ তাই সুলভ করবার উদ্দেশ্যেই আমার এ গল্প লেখা। আমার হাতের প্রথম গল্পটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার মতে সেটি উৎরে থাকে তা হলে পরে ঐ বিষয়ে একটি বড়ো গল্প লিখব। ক্রমে সাহস বেড়ে গেলে অবশেষে এই একই বিষয়ে, চাই কি একটি মহাকাব্যও লিখতে পারি। একটা কথা বলে রাখি, মানুষে যাকে সুন্দর বলে এ গল্পের ভিতর তার নাম-গন্ধও নেই— যদি কিছু থাকে তো আছে শিব। আর সত্য ?— গল্পের ভিতর ও বস্তু সেই খোঁজে যে ইতিহাস ও উপন্যাসের ভেদ জানে না। তোমার দৃষ্টির জন্য এই সঙ্গে গল্পটির জাবেদা নকল পাঠাচ্ছি।

গল্প

প্রথম অঙ্ক

স্বভাব

বাঙলা দেশের একটি পাড়াগেঁয়ে-শহরে দুকড়ি দত্তের সহধর্মিণী যখন যমজ পুত্র প্রসব করলেন, তখন দত্তজা মহাশয় ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এ দুই ছেলে বড়ো হলে যে কত বড়ো লোক হবে, সে কথা জানলে তাঁর আনন্দের অবশ্য আর সীমা থাকত না। কিন্তু কি করে তিনি তা জানবেন? এই কলিকালে কারো জন্মদিনে তো কোনো দৈববাণী হয় না, অতএব বলা বাহুল্য তাদের জন্মদিনেও হয় নি।

তবে ছেলে-দুটির বিষয়বুদ্ধি যে নৈসর্গিক এবং অসাধারণ, তার পরিচয়

সেইদিনই পাওয়া গেল। তারা ভূমিষ্ঠ হতে-না-হতেই তাদের জননীকে আধাআধি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলে। একটি দখল করে নিলে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ, আর-একটি দখল করে নিলে তাঁর বাম অঙ্গ, এবং এই সুবন্দোবস্তের ফলে মাতৃদুগ্ধ তারা সমান অংশে পান করতে লাগল। মাতৃদুগ্ধ পান করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির নামই যদি হয় মাতৃভক্তি, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে এই ভ্রাতৃযুগলের তুল্য মাতৃভক্ত শিশু ভারতবর্ষে আর কখনো জন্মায় নি। ফলে, তারা দুধ না ছাড়তেই তাদের মাতা দেহ ছাড়লেন— ক্ষয়রোগে।

এখানে একটি কথার উল্লেখ করে রাখা আবশ্যক। এরা দু ভাই এমনি পিঠপিঠ জন্মেছিল যে, এদের মধ্যে কে বড়ো আর কে ছোটো তা কেউ স্থির করতে পারলেন না। এইটেই রয়ে গেল এদের জীবনের আসল রহস্য, অতএব এ গল্পেরও আসল রহস্য। সে যাই হোক, কার্যত দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, একক্ষণজন্মা বলে প্রসিদ্ধ হল।

শুভদিনে শুভক্ষণে তাদের অন্নপ্রাশন হল, এবং দত্তজা তাদের নাম রাখলেন— রাম ও শ্যাম। পৃথিবীতে যমজের উপযুক্ত এত খাসা খাসা জোড়া নাম থাকতে— যেমন নকুল-সহদেব, হরি-হর, কানাই-বলাই প্রভৃতি— রাম-শ্যামই যে দত্ত মহাশয়ের কেন বেশি পছন্দ হল তা বলা কঠিন। লোকে বলে, দত্তজা পুত্রদ্বয়ের আকৃতি নয়, বর্ণের উপরেই দৃষ্টি রেখে এই নামকরণ করে-ছিলেন। এই যমজের দেহের যে বর্ণ ছিল তার ভদ্র নাম অবশ্য শ্যাম। সে যাই হোক এটা নিশ্চিত যে, তাঁর পুত্রদ্বয় যে একদিন তাদের নাম সার্থক করবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। এতে তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। কারণ রাম-শ্যামের নামকরণের সময় আকাশ থেকে তো আর পুষ্পবৃষ্টি হয় নি!

অনেকদিন যাবৎ রাম-শ্যামের কি শরীরে কি অন্তরে মহাপুরুষসুলভ কোনোরূপ লক্ষণই দেখা যায় নি। তারা শৈশবে কারো ননী চুরি করে নি, বাল্যে কারো মন চুরি করে নি। তাদের বাল্যজীবন ছিল ঠিক সেই ধরনের জীবন, যেমন আর-পাঁচজনের ছেলের হয়ে থাকে। ছেলেও ছিল তারা নেহাত মাঝারি গোছের, কিন্তু তা সত্ত্বেও কৈশোরে পদার্পণ করতে-না-করতে তারা স্কুলের ছেলেদের একদম দলপতি হয়ে উঠল। তাদের আত্মশক্তি যে কোন্ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হবে তার পূর্বাভাস এইখান থেকেই সকলের পাওয়া উচিত ছিল।

সকল বিষয়ে মাঝারি হয়েও তারা সকলের মাথা হল কি করে? এর অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তারা ছিল চৌকস। যে-সব ছেলেরা পড়ায় ফার্স্ট হত তারা খেলায় লাস্ট হত, আর যে-সব ছেলেরা খেলায় ফার্স্ট হত তারা পড়ায় লাস্ট হত। পাছে কোনো বিষয়ে লাস্ট হতে হয়, এই ভয়ে তারা কোনো বিষয়েই ফার্স্ট হয় নি। চৌকস হতে হলে যে মাঝারি হতে হয়, এ জ্ঞান তাদের ছিল; কেননা বয়েসের তুলনায় তারা ছিল যেমন সেয়ানা তদধিক হুঁশিয়ার।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাদের শরীরে এমন একটি গুণ ছিল যা এ দেশে ছোটোদের কথা ছেড়ে দেও— বড়োদের দেহেও মেলা দুষ্কর। তারা ছিল বেজায় কৃতকর্মা ছেলে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে energetic। স্কুলের যত ব্যাপারে তারা হত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রণী। চাঁদা, সে ফুটবলেরই হোক আর সরস্বতী পুজোরই হোক, তাদের তুল্য আর কেউ আদায় করতে পারত না। উকিল-মোক্তারদের কথা তো ছেড়েই দাও, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের বাড়ি পর্যন্ত তারা চড়াও করত এবং কখনো শুধু-হাতে ফিরত না। তারা ছিল যেমনি ছট্‌ফটে তেমনি চট্‌পটে। একে তো তাদের মুখে খই ফুটত, তার উপর চোখ কোথায় রাঙাতে হবে ও কোথায় নামাতে হবে, তা তারা দিব্যি জানত। স্কুলের ছেলেদের যত রকম ক্লাব ছিল, এক ভাই হত তার সেক্রেটারি আর-এক ভাই হত তার ট্রেজারার। তার পর স্কুলের কর্তৃপক্ষদের কাছে যত প্রকার আবেদন-নিবেদন করা হত, রাম-শ্যাম ছিল সে-সবের যুগপৎ কর্তা ও বক্তা। উপরন্তু মাস্টারদের অভিনন্দন দিতেও তারা ছিল যেমন ওস্তাদ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও তারা ছিল তেমনি ওস্তাদ। এক কথায় সাবালক হবার বহু পূর্বে তারা দুজনে হয়ে উঠেছিল স্কুল-পলিটিক্সের দুটি অ-তৃতীয় নেতা। এই নেতৃত্বের বলে তারা স্কুলটিকে একেবারে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে চাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন তারা দুভাই সেখানে ছিল ততদিন স্কুলটির জীবন ছিল— অর্থাৎ আজ নালিশ, কাল সালিশ, পরশু ধর্মঘট এই-সব নিয়েই স্কুলের কর্তৃপক্ষদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। ফলে কত ছেলে বেত খেলে, কত ছেলের নাম কাটা গেল, কিন্তু রাম-শ্যামের গায়ে যে কখনো আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না, সে তাদের ডিপ্লোমাসির গুণে। ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

তার পর পলিটিক্সের যা প্রাণ— অর্থাৎ পেট্রিয়টিজম, সে বিষয়েও আর কেউ ছিল না যে রাম-শ্যামের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে। স্ব-স্কুল সম্বন্ধে তাদের মমত্ববোধ এত অসাধারণ ছিল যে, আমি যদি জর্মান দার্শনিক হতুম তা হলে বলতুম যে সমগ্র স্কুলের 'সমবেত আত্মা' তাদের দেহে বিগ্রহবান হয়েছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাদের স্কুলের সঙ্গে অপর কোনো স্কুলের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ হলে রাম-শ্যাম তাতে যোগ দিত না বটে— কিন্তু সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াত এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান বাক্য-বর্ষণ করত— কখনো স্বপক্ষকে উৎসাহিত করবার জন্য, কখনো বিপক্ষকে লাঞ্ছিত করবার জন্য। স্বপক্ষ জিতলে তারা ইংরেজিতে 'ব্র্যাভো' 'হিপ হিপ হুর্‌রে' বলে তারস্বরে চিৎকার করত। আর বিপক্ষদল জিতলে তারা প্রথমেই রেফারিকে জুয়াচোর বলে বসত; তাতে কেউ প্রতিবাদ করলে রাম-শ্যাম অমনি 'my school, right or wrong' বলে এমনি হুংকার ছাড়ত যে স্বদলবলের ভিতর সে হুংকারে যাদের স্কুল-পেট্রিয়টিজম প্রকুপিত হয়ে উঠত তারা বেপরোয়া হয়ে বিপক্ষদলের সঙ্গে মারামারি করতে লেগে যেত। মারামারি বাধবামাত্র রাম-শ্যামের দেহ অবশ্য এক নিমেষে সেখান থেকে অন্তর্ধান হত, কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আত্মা বিরাজ করত। জান তো, আত্মার ধর্মই এই যে, তা যেখানে আছে সেখানে সর্বত্রই আছে, কিন্তু কোথায়ও তাকে ধরে-ছুঁয়ে পাবার জো নেই।

রাম-শ্যামের এই বাল্যলীলা থেকে বোধ হয় তুমি অনুমান করতে পেরেছ যে, এরা দু ভাই কলিযুগের যুগধর্মের— অর্থাৎ পলিটিক্সের— যুগল অবতার স্বরূপে এই ভূ-ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

শিক্ষা

রাম-শ্যাম ষোলো বৎসরও অতিক্রম করলেন, সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হলেন, অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। যেমন তেমন করে হোক, হাতের পাঁচ রাখতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এর পর তাঁরা কলকাতায় পড়তে এলেন। এইখান থেকেই তাঁদের আসল পলিটিক্সের শিক্ষানবিসি শুরু হল। কলেজে ভর্তি হবামাত্র নিজের

প্রতি তাঁদের ভক্তি যথোচিত বেড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁদের উচ্চ আশা সিমলাস্পর্ধী হয়ে উঠল। সহসা তাঁদের হুঁশ হল যে, স্কুল-কলেজের মোড়লী করা রূপ তুচ্ছ ব্যবসায়ের মজুরী তাঁদের মতো শক্তিশালী লোকের পোষায় না। তাই তাঁরা মনস্থির করলেন, তাঁরা হবেন দেশনায়ক; এবং পলিটিক্সের মহানাটকের অভিনয়ে যাতে সর্বাগ্রগণ্য হতে পারেন তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হতে লাগলেন।

মহানগরীর আবহাওয়া থেকে এ তথ্য তাঁরা দু দিনেই উদ্ধার করলেন যে, এ যুগে ধর্মবলও বল নয়, কর্মবলও বল নয়, একমাত্র বল হচ্ছে বুদ্ধিবল— ওরফে বাক্যবল। এ বল যে তাঁদের শরীরে আছে তার পরিচয় তাঁরা স্কুলেই পেয়েছিলেন। স্বাক্ষরিত অভিনন্দনপত্র এবং বেনামী দরখাস্ত লিখে, জিভের জোরে এক দিকে বড়োদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে, আর-এক দিকে ছোটোদের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আদায় করে তাঁরা বাক্যবলের কতকটা চর্চা ইতিপূর্বেই করেছিলেন, এবার তার সম্যক্ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন।

রাম-শ্যাম যেমন এ ধরাধামে প্রবেশ করা মাত্র তাঁদের জননীকে আপসে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে ভোগ-দখল করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করামাত্র তাঁরা তদ্রূপ আপসে মা-সরস্বতীকে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে ভোগ-দখল করতে ব্রতী হলেন। বাণীর এ কালে দুটি অঙ্গ আছে, এক রসনা আর-এক লেখনী। রাম ধরলেন বক্তৃতার দিক, আর শ্যাম ধরলেন লেখার দিক। এর কারণ, স্কুলে থাকতেই তাঁরা প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, অভিনন্দন জবর হত রামের মুখে, আর অভিযোগ জবর হত শ্যামের কলমে।

বলা বাহুল্য, নৈসর্গিক প্রতিভার বলে অচিরে রাম হয়ে উঠলেন একজন মহাবক্তা আর শ্যাম হয়ে উঠলেন একজন মহালেখক। যা এক কথায় বলা যায় রাম তা অনায়াসে একশো কথায় বলতেন, আর যা এক ছত্রে লেখা যায় শ্যাম তা অনায়াসে একশো ছত্রে লিখতেন। রাম-শ্যামের বক্তব্য অবশ্য বেশি কিছু ছিল না। তার কারণ, যারা অহর্নিশি পরের ভাবনা ভাবে তারা নিজে কোনো কিছু ভাববার কোনো অবসরই পায় না। ফলে, অনেক কথা বলে কিছু না-বলার আর্টে তাঁরা Gladstoneএর সমকক্ষ হয়ে উঠলেন।

রামের মুখ ও শ্যামের কলম থেকে অজস্র কথা যে অনর্গল বেরোত তার

আরো একটি কারণ ছিল। জ্ঞানের বালাই তো তাঁদের অন্তরে ছিলই না, তার উপরে যে ধর্ম শরীরে থাকলে মানুষের মুখে কথা বাধে, কলমের মুখে কথা আটকায়, সে ধর্ম অর্থাৎ সত্যমিথ্যার ভেদজ্ঞান— দুকড়ি দত্তের বংশধরযুগলের দেহে আদপেই ছিল না। এ জ্ঞানের অভাবটা যে পলিটিক্সে ও গল্প-সাহিত্যে কত বড়ো জিনিস সে কথা কি আর খুলে বলা দরকার?

যদি জিজ্ঞাসা কর যে তাঁরা এই অতুল বাক্-শক্তির চর্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন, এক কথায়, কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন— তার উত্তর, কলেজের ছাত্রদের কলকাতা শহরে যতরকম সভা-সমিতি আছে রাম তাতে অনবরত বক্তৃতা করতেন, এবং শ্যাম সে-সবের লেখালেখির কাজ দুবেলা করতেন, তার উপর নানা কাগজে নানা ছদ্মনামে নানা সত্যমিথ্যা পত্রও লিখতেন। সে-সকল অবশ্য ছাপাও হত। বিনে পয়সায় লেখা পেলে কোন্ কাগজ ছাড়ে!

পূর্বেই বলেছি, রাম-শ্যামের বক্তব্য বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল তার মূল্য অসাধারণ। মানিকের খানিকও ভালো, এ কথা কে না জানে? একে তো তাঁদের ভাষা ছিল গালভরা ইংরেজি, তার উপর ভাব আবার বুকভরা পেট্রিয়টিক, এই মণিকাঞ্চনের যোগ দেখলে প্রবীণদেরই মাথার ঠিক থাকে না— নবীনদের কথা তো ছেড়েই দেও। তাঁদের সকল কথা সকল লেখার মূলসূত্র ছিল এক। তাঁরা এ কালের ইউরোপের সঙ্গে সে কালের ভারতের তুলনা করে দেখিয়ে দিতেন যে, এ কালের আর্থিক সভ্যতা সে কালের আধ্যাত্মিক সভ্যতার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত হেয়। তাঁরা এই মহাসত্য প্রচার করতেন যে, অতীত ভারতই পতিত ভারতকে উদ্ধার করবে, অপর কোনো উপায় নেই। রামের মুখে এ কথা শুনে, শ্যামের লেখায় এ কথা পড়ে আমাদের সকলের চোখেই জল আসত, আর দু-চারজন উৎসাহী লোক ঘর ছেড়ে বনেও চলে গেল— অতীতের সন্ধানে। এর পর, রাম-শ্যামের পেট্রিয়টিজমের খ্যাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর টপকে যে সমগ্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল তাতে আর আশ্চর্য কি।— সে তো হবারই কথা।

রাম-শ্যাম দেশের অতীত সম্বন্ধে যতই বলা-কওয়া করুন-না কেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। দেশের ভবিষ্যতের উপায় যাই হোক নিজের ভবিষ্যৎ যে বর্তমানের সাহায্যেই গড়ে তুলতে হয়, এ জ্ঞান

তাঁরা ভুলেও হারান নি। পাস না করলে যে পয়সা রোজগার করা যায় না, আর বাক্যের পিছনে অর্থ না থাকলে তার যে কোনো বলই থাকে না— এ পাকা কথাটা তাঁরা ভালোরকমই জানতেন। তাই তাঁরা যথাসময়ে বি. এ. এবং বি. এল্. পাস করলেন, দুইই অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করলে লোকে বলত খুব মুখস্থ করেছে, আর থার্ড ডিভিসনে পাস করলে বলত ভালো মুখস্থ করতে পারে নি। এই দুই অপবাদ এড়াবার জন্যই তাঁরা সেকেণ্ড ডিভিসনে স্থান নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। মুখস্থ অবশ্য তাঁরা ঢের করেছিলেন, সে কিন্তু সেই-সব বড়ো বড়ো ইংরেজি কথা— যা বক্তৃতার আর লেখার কাজে লাগে।

সংসারের বিচিত্র কর্মক্ষেত্রের তাঁরা যে কোন্ ক্ষেত্র দখল করবেন সে বিষয়ে তাঁরা একদম মনস্থির করে ফেললেন। রাম ঠিক করলেন, তিনি হবেন একজন বড়ো উকিল, আর শ্যাম ঠিক করলেন তিনি হবেন একজন বড়ো এডিটার। এর থেকে তুমি যেন মনে কোরো না যে তাঁরা পলিটিক্সের দিকে পিঠ ফেরাবার বন্দোবস্ত করলেন। রাম-শ্যাম অত কাঁচা অত বে-হিসেবী ছেলে ছিলেন না। তাঁরা বেশ জানতেন যে, পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে তাঁরা ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করবেন, আর একবার ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে পারলে দেশের লোক ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পলিটিক্সের নেতা করে দেবে।

এইখানে একটি কথা বলে রাখি। আকৃতি-প্রকৃতিতে রামের সঙ্গে শ্যামের পোনেরো-আনা তিন পাই মিল থাকলেও এক পাই গরমিল ছিল, যে গরমিল একবৃন্তে দুটি ফুলের মধ্যে চিরদিনই থেকে যায়।

প্রথমত রামের ছিল মোটার ধাত, আর শ্যামের রোগার ধাত। দ্বিতীয়ত, রামের কণ্ঠস্বর ছিল ভেরীর মতো আর শ্যামের তুরীর মতো, জোর অবশ্য দুয়েরই সমান ছিল, কিন্তু একটা খাদের দিকে, আর-একটা জিলের দিকে।

কালিদাস বলে গেছেন যে, বড়োলোকের প্রজ্ঞা তাদের আকারের সদৃশ হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কবির কথা মিথ্যে নয়। দুজনের মধ্যে রাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ, আর শ্যাম অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত। রাম ছিলেন বেশি দরবারী, আর শ্যাম ছিলেন বেশি তকরারী। রামের কৃতিত্ব ছিল হিক্‌মতে, শ্যামের হুজ্জুতে। রাম সিদ্ধহস্ত ছিলেন দল পাকাতে, আর শ্যাম দল ভাঙাতে। এক কথায় দলাদলি ছিল রামের পেশা, আর শ্যামের নেশা। রামের motto

ছিল আগে ভেদ তার পরে সাম, আর শ্যামের motto ছিল আগে ভেদ তার পরে বিগ্রহ ; কেননা রাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভক্তি করুক, আর শ্যাম চাইতেন লোকে তাঁকে ভয় করুক। তাঁদের চরিত্রের প্রভেদটা একটি ব্যাপার থেকেই স্পষ্ট দেখানো যায়। আগেই বলেছি যে, স্কুলকলেজে যতপ্রকার সভাসমিতি ছিল, এই ভ্রাতৃযুগল সে-সবের সেক্রেটারি ট্রেজারারের পদ অধিকার করে বসতেন। কিন্তু রাম বরাবর ট্রেজারারই হতেন, আর শ্যাম সেক্রেটারি।

এ হেন চরিত্র, এ হেন বুদ্ধি নিয়ে রাম ও শ্যাম যখন সংসারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন তখন সকলেই বুঝল যে, তাঁরা জীবনে একটা বড়ো খেলা খেলবেন।

তৃতীয় অঙ্ক

পেট্রিয়টিজম

যিনি মহাপুরুষ-চরিতের চর্চা করেছেন তিনিই জানেন যে, তাঁদের জীবনের একটা ভাগ তাঁরা অজ্ঞাতবাসে কাটান ; সে সময় তাঁরা কোথায় ছিলেন কি করেছেন সে খবর কেউ জানে না।

কলেজ ছাড়বার পর রাম-শ্যাম দশ বৎসরের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। এ কয় বৎসর তাঁরা যে কোথায় ছিলেন, এবং কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

তার পর স্বদেশী যুগে তাঁদের পুনরাবির্ভাব হল। বন্দে মাতরম্-এর ডাক শুনে তাঁদের সুপ্ত মাতৃভক্তি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না ; অমনি অজ্ঞাতবাস ছেড়ে প্রকাশ্য মাতৃসেবায় লেগে গেলেন। যে অগাধ মাতৃভক্তি শৈশবে তাঁদের গর্ভধারিণীর হৃদয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, পূর্ণযৌবনে তা তাঁদের জন্মভূমির পৃষ্ঠে গিয়ে ভর করলে। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বাতাসের স্পর্শে জল যেমন নেচে ওঠে, আগুনের স্পর্শে খড় যেমন জ্বলে ওঠে, রামের রসনা আর শ্যামের লেখনীর স্পর্শে আমাদের হৃদয় তেমনি উদ্‌বেলিত আন্দোলিত হয়ে উঠল, আমাদের উৎসাহ তেমনি সংধুক্ষিত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এবার তাঁরা ধরলেন এক নতুন সুর। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অতীতকে

টেঁকে গুঁজে ভারতবর্ষের আর্থিক ভবিষ্যতের তাঁরা ব্যাখ্যান শুরু করলেন। তাঁদের বাক্যবলে সে ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ছবি দেখে সকলেরই মুখে জল এল। যারা পূর্বে বনে চলে গিয়েছিল তারা আবার ঘরে ফিরে এল।

রাম যখন স্পষ্ট করে বললেন যে, 'আমি দেশের চিনি খাব', আর শ্যাম যখন স্পষ্ট করে লিখলেন যে, 'আমি বিদেশের নুন খাব না'— তখন আর কারো বুঝতে বাকি থাকল না যে অতঃপর রামের মুখ দিয়ে শুধু মধুক্ষরণ হবে, আর শ্যামের কলম শুধু দেশের গুণ গাইবে, অর্থাৎ তাঁরা দুজনে একমনে এ কালের যুগধর্ম প্রচার করবেন; অমনি আমাদের মনে তাঁদের প্রতি ভক্তি উথলে উঠল।

যুগধর্মের প্রচারে যাতে কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য দেশের লোক চাঁদা করে টাকা তুলে শ্যামের জন্য একখানি ইংরেজি কাগজ বার করে দিলেন, সে কাগজের নাম হল Nationalist। শ্যামের হাতে পড়ে সেখানি হয়ে উঠল একখানি চাবুক। শ্যাম সজোরে তা আকাশের উপর চালাতে লাগলেন, তার পটপটানির আওয়াজে আকাশ বাতাস ভরে গেল। সেই রণবাদ্য শুনে আমাদের বুকের পাটা দশগুণ বেড়ে গেল।

কথায় বলে, দিন যেতে জানে, ক্ষণ যেতে জানে না। শ্যামের ভাগ্যে ঘটলও তাই। এই চাবুক দৈবাৎ একদিন একটি বড়োসাহেবের গায়ে লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করলেন। দেশময় হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল।

যথাসময়ে ফৌজদারী আদালতে শ্যামের বিচার হল; এবং এই সূত্রে রাম তাঁর অসাধারণ আইনের জ্ঞান ও অসামান্য ওকালতিবুদ্ধি দেখাবার একটি অপূর্ব সুযোগ পেলেন। রামের জেরার জোরে, বাহাজের বলে, আইনের হিক্‌মতে মামলা মাঝপথেই ফেঁসে গেল। রাম নিম্ন আদালতে আইনের যে-সব কূটতর্ক তুলেছিলেন সে তর্ক এখানে তুললে তুমি ভেবড়ে যাবে, কেননা তার মর্ম তুমি বুঝতে পারবে না; বেচারা ম্যাজিস্ট্রেটও তার নাগাল পায় নি। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কিরকম বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন তার একটা পরিচয় দিই। রাম এই আপত্তি তুললেন যে, ইংরেজের ইংরেজির যা মানে শ্যামের ইংরেজির সে মানে করলে আসামীর উপর সম্পূর্ণ অবিচার করা হবে। কেননা শ্যাম যে

ভাষা লেখেন সে তাঁর নিজস্ব ভাষা, এক কথায় সে হচ্ছে শ্যামের স্বকৃত ভঙ্গ-ইংরেজি ! বাঙলা খুব ভালো না জানলে সে ইংরেজির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ফরিয়াদির সাহেব-কৌসুলি এ আপত্তির আর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না, কেননা তিনি এ কথা অস্বীকার করতে পারলেন না যে, শ্যামের ইংরেজি ইংলণ্ডের ইংরেজি নয়। শ্যাম খালাস হলেন। লোকে রাম-শ্যামের জয়জয়কার করতে লাগল।

শ্যাম যেদিন খালাস পেলেন বাঙলার সেদিন হল— ইংরেজরা যাকে বলে— একটি 'লাল হরফের দিন'। লোকের অমন আনন্দ অমন উল্লাস সেদিনের পূর্বে আর কখনো দেখা যায় নি।

এমন-কি, এই ফচ্‌কে কলকাতা শহরের লোকরাও সেদিন যে কাণ্ড করেছিল তা এতই বিরাট যে বীরবলী ভাষায় তার বর্ণনা করা অসাধ্য, তার জন্য চাই 'মেঘনাদবধ'এর কলম। রাম-শ্যামকে একটি ফিটানে চড়িয়ে হাজার হাজার লোকে বড়ো রাস্তা দিয়ে সেই ফিটান যখন টেনে নিয়ে যেতে লাগল তখন পথঘাট সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, এত লোক বোধ হয় জগন্নাথের রথযাত্রাতেও একত্র হয় না। লোকে বললে, রাম-শ্যাম কৃষ্ণার্জুন। তার পর এই যুগলমূর্তি দেখবার জন্য জনতার মধ্যে এমনি ঠেলাঠেলি মারামারি লেগে গেল যে কত লোকের যে হাত-পা ভাঙলে তার আর ঠিকঠিকানা নেই।

আমি ভিড় দেখলে ভড়কাই— ওর ভিতর পড়লে বেহুঁশ হয়ে যাবার ভয়ে এবং সেই চড়কের সঙ দেখা ছাড়া অপর কোনো শোভাযাত্রা দেখতে কখনো ঘর থেকে বার হই নে। কিন্তু সেদিন উৎসাহের চোটে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। চোরবাগানের মোড়ে গিয়ে যখন দেখলুম যে, চিৎপুরের দুধার থেকে রাম-শ্যামের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে তখন আমার চোখে জল এসেছিল। আর কোনো গুণের না হোক পেট্রিয়টিজমের সম্মান যে বাঙালি করতে জানে সেদিন তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেল।

এইখান থেকেই দেশ আবার মোড় ফিরলে ; অর্থাৎ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই স্বদেশী আন্দোলন উপরের চাপে বসে গেল। কত ছা-পোষা লোকের চাকরি গেল, কত ছেলের স্কুল থেকে নাম কাটা গেল, কত যুবক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হল, বাদবাকি আমরা সব একদম দমে গেলুম। রাম-শ্যামের গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্যন্ত লাগল না। অনেক কথা বলে কিছু-না-বলার আর্টের যে

কি গুণ, এবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁরা অবশ্য দমেও গেলেন না। এ দুই ভাই এই হাঙ্গামার ভিতর থেকে শুধু যে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এলেন তাই নয়, তাঁদের মনেরও কোনো জায়গায় আঘাত লাগল না; কেননা স্বদেশীর সকল কথাই দিবারাত্র তাঁদের মুখের উপরই ছিল, তার একটি কথাও তাঁদের বুকের ভিতর প্রবেশ করবার ফুরসৎ পায় নি।

রামের ওকালতির সনন্দ আর শ্যামের খবরের কাগজ দুইই অবশ্য তাঁদের হাতেই রয়ে গেল। তার পর দেশ যখন জুড়োল, তখন রামের ওকালতির পশার ও শ্যামের কাগজের প্রসার শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনের পর দিন আপনা হতেই বেড়ে যেতে লাগল। শেক্সপীয়র বলেছেন যে, মানুষমাত্রেরই জীবনে এমন একটা জোয়ার আসে যার ঝুঁটি চেপে ধরতে পারলে তার কাঁধে চড়ে যেখানে প্রাণ চায় সেখানেই যাওয়া যায়। যে স্বদেশীর জোয়ারে আমরা সকলেই হাবুডুবু খেলুম এবং অনেকে একেবারে ডুবে গেল, রাম-শ্যাম তার কাঁধে চড়ে একজন বড়ো উকিল আর-একজন বড়ো এডিটার হতে চললেন।

চতুর্থ অঙ্ক

ইভলিউসান

অবতারের কথা হচ্ছে— 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। মহাপুরুষদের লীলাও নিত্য-লীলা নয়। তাঁরা অনাবশ্যক দেখা দেন না, যখন দরকার বোঝেন তখনই আবার আবির্ভূত হন।

স্বদেশী আন্দোলন চাপা পড়বার ঠিক দশ বৎসর পরে রাম-শ্যাম রাজনীতির আসরে আবার সদর্পে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু সে এক নব মূর্তিতে, যুগল রূপে নয়— স্ব স্ব রূপে। তাঁদের উভয়েরই চেহারা আর সাজগোজ ইতিমধ্যে এতটা বদলে গিয়েছিল যে তাঁদের দুজনকে যমজ ভ্রাতা তো অনেক দূরের কথা, পরস্পরের ভ্রাতা বলেই চেনা গেল না।

রামের দেহটি হয়েছিল ঠিক ঢাকের মতো আর শ্যামের হয়েছিল তার কাঠির মতো। এর কারণ রামের হয়েছিল বহুমূত্র আর শ্যামের শ্বাসরোগ।

তাদের বেশভূষাও একদম বদলে গিয়েছিল। এবার দেখা গেল, রামের দাড়িগোঁফ দুইই কামানো, মাথার চুল কয়েদীদের ফ্যাসানে ছাঁটা, এবং পরনে ইংরেজি পোশাক; হঠাৎ দেখতে পাকা বিলেত-ফেরত বলে ভুল হয়। অপর

পক্ষে শ্যামের দেখা গেল দাড়ি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবৃদ্ধ, পরনে থানধুতি, গায়ে আঙরাখা, পায়ে তালতলার চটি, হঠাৎ দেখতে ঘোর থিয়জফিস্ট বলে ভুল হয়।

এ হেন রূপান্তরের কারণ, ইতিমধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড়ো উকিল আর শ্যাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড়ো এডিটার! এই বড়ো হবার চেষ্টার ফলেই তাঁদের এতাদৃশ বদল হয়েছিল। রামের পশার যেমন বাড়তে লাগল, তিনি চালচলনে তেমনি সাহেবিয়ানার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন; আর যত তিনি সেই দিকে ঝুঁকতে লাগলেন তত তাঁর পশার বাড়তে লাগল। অপর পক্ষে শ্যামের কাগজের প্রসার যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি তিনি হিঁদুয়ানির দিকে ঝুঁকতে লাগলেন; আর যত তিনি হিঁদুয়ানির দিকে ঝুঁকতে লাগলেন তত তাঁর কাগজের প্রসার বাড়তে লাগল।

তাঁরা যে-দুটি রোগ সংগ্রহ করেছিলেন সেও ঐ বড়ো হবার পথে। এ দেশে মস্তিষ্কের বেশি চর্চা করলে যে বহুমূত্র হয়, আর হৃদয়ের বেশি চর্চা করলে যে হাঁপানি হয় এ কথা কে না জানে।

বাইরের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনের চেহারাও ফিরে গিয়েছিল।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন রিফরমার, আর শ্যাম একজন নব্য-হিন্দু। সমাজ-সংস্কার ছাড়া রামের মুখে অপর কোনো কথা ছিল না, আর বেদান্ত ছাড়া শ্যামের মুখে অপর কোনো কথা ছিল না। রাম বলতেন বাল্যবিবাহ বন্ধ না হলে দেশের কোনো উন্নতি হবে না, আর শ্যাম বলতেন 'অথাতো ব্রহ্ম' জিজ্ঞাসা না করলে দেশের কোনো উন্নতি হবে না। রাম বলতেন যে, দেশের লোক যদি শক্তিশালী হতে চায় তো তাদের Eugenics মেনে চলতে হবে, আর শ্যাম বলতেন, ওর জন্য 'শাস্ত্রযোনীত্বাৎ' মেনে চলতে হবে। রাম বলতেন জাতিভেদ তুলে দিতে হবে, শ্যাম বলতেন বর্ণাশ্রম ধর্ম ফিরিয়ে আনতে হবে। এক কথায় রাম দোহাই দিতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, আর শ্যাম প্রাচ্য দর্শনের। বলা বাহুল্য, রামের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞান, আর শ্যামের প্রাচ্য-দর্শনের জ্ঞান, দুইই ছিল তুল্যমূল্য।

এর থেকে অবশ্য মনে কোরো না যে, আচারে বিচারে রাম-শ্যামের ভিতর কোনোরূপ প্রভেদ ছিল। যে কৌশলে কথা মুখে রাখলেও তা পেটে যায় না সে কৌশলে তাঁরা চিরাভ্যস্ত ছিলেন। রাম তাঁর মেয়েদের যথাসময়ে অর্থাৎ

দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করতেন— প্রধানত পাত্রের জাত ও কুল দেখে; আর নিত্য মুরগি না খেলে শ্যামের অম্বল হত, আর চায়ের বদলে Bovril না খেলে তিনি জোর কলমে লেখবার মতো বুকের জোর পেতেন না। সুরা অবশ্য দুজনেই পান করতেন, উভয়ে কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক রসের রসিক ছিলেন না। রাম খেতেন হুইস্কি আর শ্যাম ব্রাণ্ডি।

রাম-শ্যামের কথার সঙ্গে কাজের এই গরমিলটা ইউরোপে অবশ্য দোষ বলে গণ্য হত— তার কারণ, ইউরোপের মোটা বুদ্ধি সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক সত্যের প্রভেদটা ধরতে পারে নি। রাম এ সত্য জানতেন যে, সত্য কাজে লাগে অপর লোকের; আর শ্যাম জানতেন যে, ও বস্তু কাজে লাগে পরলোকের। নিজের ইহলোকের জীবন সুখে যাপন করতে হলে যে ব্যবহারিক সত্য মেনে চলতে হয়, এ জ্ঞান রাম-শ্যাম দুজনেরই সমান ছিল।

পঞ্চম অঙ্ক

পলিটিক্স

এবার অবশ্য দুজনে দু দলের নায়ক হয়েই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। রাম হলেন দক্ষিণ মার্গের মহাজন ও শ্যাম বাম মার্গের। এর কারণ শৈশবে রাম লালিত-পালিত হয়েছিলেন মা'র ডান কোলে, আর শ্যাম তাঁর বাঁ কোলে।

দু দলে যুদ্ধের সূত্রপাত হল সেই দিন যেদিন তারে খবর এল যে, জর্মানরা চাই কি ভারতবর্ষের উপরেও চড়াও হতে পারে।

এই সংবাদ যেই পাওয়া অমনি রাম প্রকাশ্য সভায় বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন— 'আমি যুদ্ধ করব'। দেশের বাতাস অমনি কেঁপে উঠল। শ্যাম তার ঠিক পরের দিনই নিজের কাগজে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখলেন, 'আমি যুদ্ধ করব না'। দেশের আকাশ অমনি চমকে উঠল।

রাম-শ্যামের এই দৃঢ় সংকল্পের সংবাদ শুনে যুদ্ধের কর্তৃপক্ষেরা ভীত কিম্বা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, অদ্যাবধি তার কোনো পাকা খবর পাওয়া যায় নি; সম্ভবত আগামী Peace Conferenceএ সে কথা প্রকাশ পাবে।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ফল হল এই যে, স্বদেশ রক্ষা আগে, না স্ব-রাজ্য লাভ আগে, এই নিয়ে দেশময় একটা মহাতর্ক বেধে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের

লোক দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা রক্ষণশীল তারা হল রাম-পন্থী আর যারা অরক্ষণশীল তারা হল শ্যাম-পন্থী। রামের দল হল ওজনে ভারী আর শ্যামের দল হল সংখ্যায় বেশি। তার কারণ যারা মোটা তারা হল রামের চেলা, আর যারা রোগা তারা হল শ্যামের চেলা। বাঙলাদেশে মোটাদের চাইতে রোগারা যে দলে ঢের বেশি পুরু— সে কথা বলাই বেশি। এর পর দু দলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যে বেধে যাবে সে কথা সকলেই টের পেলে। দেশের জন্য যারা কেয়ার করে, তারা মনমরা হয়ে গেল ; যারা করে না, তারা তামাশা দেখবার জন্য উৎসুক হল ; যারা ঘুমিয়ে আছে, তারা একবার জেগে উঠে আবার পাশ ফিরে শুলে ; আর বিলেতি কাগজওয়ালারা মহানন্দে বলতে লাগল— 'নারদ' 'নারদ'।

যুদ্ধের প্রস্তাবে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল, রিফরমের প্রস্তাবে সে যুদ্ধ দস্তুরমত বেধে গেল।

রিফরমের প্রতি রাম হলেন দক্ষিণ আর শ্যাম হলেন বাম। এ দেশের মেয়েরা বাড়িতে ছেলে হলে যেরকম আনন্দে নৃত্য করে, রাম সেইরকম নৃত্য করতে লাগলেন ; আর মেয়ে হলে তারা যেরকম হা-হুতাশ করে, শ্যাম সেই-রকম হাঁ-হুতাশ করতে লাগলেন। রাম বললেন, 'রিফরম গ্রাহ্য, কিন্তু তার বদল চাই।' শ্যাম অমনি বলে উঠলেন, 'রিফরম অগ্রাহ্য, কেননা তার বদল চাই।'

এই দুটি বাক্যের ভিতর এক syntax ছাড়া আর কি প্রভেদ আছে দেশের লোকে প্রথমে তা ঠাহর করতে পারে নি ; তারা মনে করেছিল যে, একই কথা রাম বলছেন positive আকারে, আর শ্যাম বলছেন negative আকারে। তাদের সে ভুল তাঁরা দুদিনেই ভাঙিয়ে দিলেন।

রাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্যামের মত নেতি-মূলক, আর শ্যাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, রামের মত ইতি-অন্ত, তখন আর কারো বুঝতে বাকি থাকল না যে, রিফরমার ও বৈদান্তিকে যা প্রভেদ এ উভয়ের মধ্যে ঠিক সেই প্রভেদ আছে ; অর্থাৎ দক্ষিণ মার্গ হচ্ছে পাশ্চাত্য আর বাম মার্গ হচ্ছে প্রাচ্য।

এর পর দু দলে প্রকৃত লড়াই লাগল। রাম-শ্যাম উভয়েই কিন্তু একটু মুশকিলে পড়ে গেলেন। স্বদেশীযুগে একজন করতেন বক্তৃতা আর-একজন লিখতেন কাগজ। কিন্তু স্বরাজের যুগে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুন

প্রত্যেককেই অগত্যা যুগপৎ লেখক ও বক্তা হতে হল ; অর্থাৎ দুজনেই আবার বাল্যজীবনে ফিরে গেলেন। শ্যাম বক্তৃতা শুরু করে দিলেন, আর রাম কাগজ বার করলেন। সে কাগজের নাম রাখা হল Rationalist।

বলা বাহুল্য Rationalistএর সঙ্গে Nationalistএর তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বেধে গেল। Rationalist খুলে দেখো তাতে Nationalistএর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই, আর Nationalist খুলে দেখো তাতে Rationalistএর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।

নির্বিবাদী লোক বাঙলাতেও আছে, এবং নির্বিবাদী বলে তারা যে একেবারে নির্বোধ কিম্বা পাষণ্ড, তাও নয়। ব্যাপার দেখে শুনে এই নিরীহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে ঘরে বসে থাকার ফল হচ্ছে শুধু ঘরের ভাত বেশি করে খাওয়া ; এতে করে দেশের যে কোনো উপকার হয় না, সে জ্ঞান এই নিরক্ষর দলের ছিল। শেষটায় তারা রাম-শ্যামের ভিতর একটা আপস-মীমাংসা করে দেবার জন্য হরিকে তাঁদের কাছে দূত পাঠালেন। হরিকে পাঠাবার কারণ এই যে, তার তুল্য গো-বেচারা এ দেশে খুব কমই আছে, তার উপর সে ছিল রাম-শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।

হরি প্রস্তাব করলে যে, দুজনে মিলে যদি Rational-nationalist কিম্বা National-rationalist হন তা হলে দু দিক রক্ষা পায়। এ প্রস্তাব অবশ্য উভয়েই বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করলেন, কেননা দুজনেরই মতে rationalism এবং nationalism হচ্ছে দিনরাতের মতো ঠিক উল্টো উল্টো জিনিস ; একটি যেমন সাদা আর-একটি তেমনি কালো, যাবচ্চন্দ্রদিবাকর ও-দুই কিছুতেই এক হতে পারে না। হরি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেজায় অপদস্থ হলেন। রামের চেলারা তাঁকে বললেন কবি, আর শ্যামের চেলারা দার্শনিক। হরির লাঞ্ছনা দেখে আর কেউ সাহস করে মিটমাট করতে অগ্রসর হল না।

দলাদলি থেকেই গেল ; শুধু থেকে গেল না, ভয়ংকর বাড়তে লাগল। ঢাকে কাঠিতে যখন মারামারি বাধে তখন মানুষের কান কিরকম ঝালাপালা হয় তা তো জানই। দেশের লোক মনে মনে বললে, এখন থামলে বাঁচি। কিন্তু এই গোল থামা দূরে থাক্‌ ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল, এবং সেও কতকটা রাম-শ্যামের চালের গুণে।

এতদিনে রাম-শ্যামের এ জ্ঞান জন্মেছিল যে, বাঙলাতে কোনো বাঙালিকে বড়ো লোক বলে মানে না, যতক্ষণ না সে মরে। অতএব পরস্পরের সঙ্গে পলিটিক্সের লড়াই নিরাপদে লড়তে হলে উভয়ের পক্ষেই এই একটি বিদেশী শিখণ্ডী সুমুখে খাড়া করা দরকার। কেননা বাঙালির বিশ্বাস— মানুষের মতো মানুষ দেশে নেই, আছে শুধু বিদেশে।

রাম তাই মুরুব্বি পাকড়ালেন বোম্বাইয়ের চোরজি ক্রোড়জি কলওয়ালাকে। Rationalist অমনি লিখলে— 'কলওয়ালার মতো অত বড়ো মাথা ভারতবর্ষে আর কারো নেই।'

অপর পক্ষে শ্যাম মুরুব্বি পাকড়ালেন মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্তি গৌরীপাদং আইন আচারিয়ারকে। Nationalist অমনি লিখলে—'আইন আচারিয়ারের মতো অত বড়ো বুক ভারতবর্ষে আর কারো নেই।'

এর জবাবে Rationalist লিখলে— 'অব্রাহ্মণের যে ছায়া মাড়ায় না, সেই হল শ্যামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দার!' পাল্টা জবাবে Nationalist লিখলে—'কলের কুলির রক্ত চুষে যে জোঁকের মতো মোটা ও লাল হয়েছে, সেই হল রামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দার!' বেচারা কলওয়ালা— বেচারা আইন আচারিয়ার! দুজনেই সমান গাল খেতে লাগল।

যে-সব বাঙালি দলাদলির বাইরে ছিল, তারা এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল; কেননা বাঙলার নেতাদ্বয় স্বজাতিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাঙালির মাথাও নেই, বুকও নেই; যে কজনের আছে তারা হয় এ দলে নয় ও দলে ভর্তি হয়েছে। এ কথার পর আমাদের আর মুখ থাকল না। লজ্জায় আমরা অধোবদন হয়ে গেলুম।

কিন্তু সব দেশেই এমন দু-চারজন অবুঝ লোক থাকে যারা কোনো জিনিস সহজে বোঝে না। তারা ধরে নিলে যে, মেড়া লড়ে খোঁটার জোরে, সুতরাং তারা সেই খোঁটার অনুসন্ধানে বেরোল, এবং দুদিনেই তার খোঁজ পেলে।

রাম ও শ্যাম দুজনেই তাদের কানে কানে বললেন যে, তাঁদের পিছনে আছে— বিলেত। রামের বিশ্বাস তিনি হাতিয়েছেন বিলেতের capital, আর শ্যামের বিশ্বাস তিনি হাত করেছেন বিলেতের labour; এই ভরসায় দু পক্ষেরই বড়োরা মনে করলে যে তারা নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। এর পর দু দলের কি আর মিল হয়? যা হতে পারে সে হচ্ছে একদম ছাড়াছাড়ি, এবং হলও তাই।

রাম স্বদলবলে দ্বারিকায় গিয়ে এক মহাসভা করলেন, আর শ্যাম রামেশ্বরে গিয়ে আর-এক মহাসভা করলেন। ফলে, এক দিকে মোটাভাই চোটাভাই বাট্‌লিওয়ালা কাথ্‌লিওয়ালাদের আনন্দে বাক্‌রোধ হয়ে গেল, অন্য দিকে বেঙ্কট কেঙ্কট জম্বুলিঙ্গম্ কোটীলিঙ্গম্‌দেরও উৎসাহে দশা ধরল।

রামের চেলারা বললেন, 'আমরা ভারতবর্ষে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব,' শ্যামের চেলারা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমরা ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্যের সংস্থাপন করব।' Nationalist বিপক্ষের উপরে এই বলে চাপান দিলে যে, 'তোমরা যা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছ তার নাম রামরাজ্য নয়, তোমাদের আরাম-রাজ্য।' Rationalist অমনি উতোর গাইলে— 'তোমরা যার স্থাপনা করতে চাচ্ছ— তার নাম ধর্মরাজ্য নয়— তোমাদের শর্ম-রাজ্য।'

লাভের মধ্যে দাঁড়াল এই যে, বাঙলায় রিফরমের কথাটা চাপা পড়ে গেল, তার পরিবর্তে রাম বড়ো না শ্যাম বড়ো এইটে হয়ে উঠল আসল মীমাংসার বিষয়। ছেলেবেলায় রাম-শ্যামের জীবনের যেটা ছিল রহস্য, সেইটে হয়ে উঠল এখন সমস্যা।

এ সমস্যার মীমাংসা আজ করা কিন্তু অসম্ভব, কেননা 'স্বরাজ' এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো আকাশে ঝুলছে; অতঃপর তা উড়ে স্বর্গে যাবে কি ঝরে মর্তে পড়বে, সে কথা রামও বলতে পারেন না, শ্যামও বলতে পারেন না। হরি বলে, ও এখন অনেকদিন ঐ মাথার উপরেই ঝুলবে। কিন্তু ধরো যদি যে, রিফরম-স্কিমটি যেমন আছে ঠিক তেমনি এ দেশে ভূমিষ্ঠ হয়, তা হলেই যে এ সমস্যার মীমাংসা হবে তাই-বা কি করে বলা যায়? হয়তো তখন দেখা যাবে যে, রাম হয়েছেন বাঙলার Finance Minister, আর শ্যাম হয়েছেন তার Chief Secretary! তা হলে?

তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, ভারতমাতা রাম-শ্যামের টানাটানিতে নিশ্চয়ই খাড়া হয়ে উঠবেন, যদি ইতিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে; এবং তা ঘটবার সম্ভাবনা যে নেই, সে কথা চোখের মাথা না খেলে বলবার জো নেই। মা এখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামক মারাত্মক ক্ষয়রোগে যেরকম আক্রান্ত হয়েছেন, তাতে করে তাঁর পক্ষে হঠাৎকারে রাম-শ্যামের হাত এড়িয়ে চলে যাবার আটক কি?

"আমার কথা ফুরল, নটে গাছটি মুড়ল।"

—বীরবল

পুনশ্চ

এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বললেন, "কই গল্প তো শেষ হল না?"

আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর করলুম, "এ গল্পের মজাই তো এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এ দেশে কবে যে শুরু হয়েছে তা কারো স্মরণ নেই, আর কখনো যে শেষ হবে তারও কোনো আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হত, তা হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড়ো ট্রাজেডি হত না।"

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৫

অদৃষ্ট

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ফরাসী থেকে অদৃষ্ট নামধেয়[১] যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভালো হয়।

এ কিন্তু বিলেতি অদৃষ্ট।

এ দেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভালো করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য— অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে সেই পরিমাণ সত্য— তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

১

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়িতে। এই কলকাতা শহরে খেলারাম পালের গলিতে খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চৌড়া আর অত মাথা-উঁচু-করা বাড়ি, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে ভুল হয়। সেই সার সার দোতলা-সমান-উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রঙ, সেই ঢঙ। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর স্মুমুখে দিঘি নেই, আছে মাঠ; তাও আবার বড়ো নয়, ছোটো; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ি অবশ্য কলকাতা শহরে বড়ো রাস্তায় ও গলি-ঘুঁজিতে আরো দশ-বিশটা মেলে; তবে খেলারামের বসতবাটীর স্মুমুখে যা আছে, তা কলকাতা শহরের অপর কোনো বনেদী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ তার সিংহদরজার দুধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতি লোকে বলে বিলেতি শেয়াল, তার কারণ বয়সের গুণে তার ইঁটের শরীর ভেঙে পড়েছে, আর তার চুনবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ারি হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল-সন্ধে পয়সায় পাঁচটি খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

---

১ 'Henri Barbusseএর ফরাসী হইতে'। সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৬

২

এই সিংহ-দুটির দুর্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পালবাবুদেরও ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ির ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালবাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানির আমলে কলকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড়োমানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতি-দস্তুর সাজিয়েছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিক্‌মিক্ করত, চক্‌মক্ করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার! তার পর সাটিনে ও মখমলে মোড়া কত যে কৌচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মতো জিনিস ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানি-করা তুষার-ধবল নবনীতসুকুমার মর্মর-প্রস্তরে গঠিত প্রমাণ-সাইজের স্ত্রীমূর্তিসকল সেই বারান্দার দুধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত— প্রতিটি এক-একটি বিচিত্র ভঙ্গিতে। তাদের মধ্যে কেউ-বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ-বা সদ্য নেয়ে উঠেছে, কেউ-বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ-বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ-বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চুড়ো করে বাঁধছে, কেউ-বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে— দেখলে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ— পালপ্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় একদিন বলেছিলেন, 'মেজবাবুর দৌলতে মর্তে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে তা হলে এ পুরী সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে।' এ কথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মোসাহেব বলে ওঠেন, 'তা হলে বাবুকে একদিনেই ফতুর হতে হত শাড়ির দাম দিতে।' এ উত্তরে চারি দিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন-কি, মনে হল যে, ঐ-সব পাষাণমূর্তিদেরও মুখে-চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে,

এই কলকাতা শহরের উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

৩

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙা চৌকি। মেঝেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়েসের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে-ইঁদুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার-সাহেব দিনে আপিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্তন হয় ইঁদুরের— কীর্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্যয়ের কারণ জানতে হলে পালবংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিচুড়ি পাকালে ও-দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে ওঠে।

ফল কথা এই যে, পালবাবুদের সম্পত্তি এখনো যথেষ্ট আছে; কিন্তু শরিকী বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত এখন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়েছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম— শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক-সমাজে তিনি চাটুজ্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল-ব্যারিস্টার নন, তা হলেও তিনি ইংরেজি পোশাক পরেন— তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরি। চাটুজ্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্স্ট ডিভিসনেই পাস করে এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাস করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literatureএ taste ছিল, অন্তত এই কথা তো তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষিরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে

গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে পালবাবুদের জমিদারি সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটোখাটো উদাহরণ। বাঙালি উকিল না হয়ে সাহেব কৌঁসুলি হলে তিনি যে Barএ ফেল করে Benchএ প্রমোশন পেতেন, সে কথা তো আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই সে যে একদম তিনশো টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই তো একটা মহা-সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন ?— সেরেফ মুরুব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনেদী ঘরের ছেলে আর বড়োমানুষের জামাই— অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি ছিল সহায়।

৪

বলা বাহুল্য, জমিদারি সম্বন্ধে চাটুজ্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম-শ্রেণীতে বি. এল. পাস করেন, সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারি বিষয়ে কোনোরূপ জ্ঞান কখনো অর্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরমহিতৈষী জনৈক বড়ো জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্য, সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেননা, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁশিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তার পর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্‌ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারি শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত, আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন, 'দেখো বাবাজি, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল সালিয়ানা দু লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারির উন্নতি করতে জানি, এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে। আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারি করার অর্থ কি জান ? জমিদারির কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে একরকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে, পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর

ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারির পিঠ, আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি, প্রজাকে শায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে ; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগবাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ কড়া করে ধরো কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হলেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায় তোমাকে একটু রাশভারী হতে হবে, আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি, এ তো ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মনজোগানো কথা কইবে তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারি করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।'

এ কথা শুনে চাটুজ্যে-সাহেব আশ্বস্ত হলেন ; মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারিতে পাস করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশভারী হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি ছিলেন একে মাথায় ছোটো তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্সা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন— অবশ্য হাল-ফেশান অনুযায়ী দুসন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌরকার্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশভারী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন, রাশভারী হতে না পেরে গম্ভীর হতে পারলেই জমিদারি শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তার পর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন-কি, মেয়েমানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াক্কড় হবে। তিনি আপিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারোটায় আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুজ্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলনও থেমে গেল।

৫

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল বেলা বারোটা সাড়ে-বারোটার সময় পান চিবতে চিবতে আপিসে আসা, তার পর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক— সেখানে কর্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখল যে, ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুশি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হলেও বেলা এগারোটাতে হাজিরা সই করতে শুরু করে দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর কদিন লাগে ?

মুশকিল হল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরানো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যে বিশ বৎসর কাল সে এই স্টেটে একই পোস্টে একই মাইনেতে বরাবর কাজ করে এসেছে। এতদিন যে তার চাকরি বজায় ছিল, তার কারণ— সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁষত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়ে নি, তার কারণ সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালোবাসত না, পৃথিবীতে ভালোবাসত শুধু দুটি জিনিস ; —এক তার স্ত্রী, আর-এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালোবাসার প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যেরকম চমৎকার, তার সাজা তামাকও হত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্যনিয়মিত কাজ ছিল— সর্বপ্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় 'প্রিয়ে, প্রিয়তরে, প্রিয়তমে' এই সম্বোধন এবং শেষে 'তোমারই প্রাণবন্ধু দাস' এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে ধরে পুরো চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরির পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেত— অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তার পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল— পরের হাতের লেখা-চিঠি তার স্ত্রীকে পাঠানো তার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। সে

কল্কেয় প্রথমে বেশ করে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে সেজে তার উপর আল্‌গোছে মাটির তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে শুয়ে শুয়ে টীকে সাজিয়ে, তার পর সে টীকের মুখাগ্নি করে হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে ধীরে ধীরে তামাক ধরাত। আধঘণ্টা তদ্‌বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে, নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না— এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের কাজ করত এবং সে কাজও সে করত অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে সে-ফুরসৎ তার কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তার একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারির কাজ করত— আর সবাই জানত যে, অমন হুঁকোবরদার মুচিখোলার নবাববাড়িতেও পাওয়া দুষ্কর। তার করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসানও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও, সে সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিল। প্রথমত তার ধারণা ছিল যে, তার মাইনে যে বাড়ে না, তা সে চোর নয় বলে। অথচ তার বেতনবৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেননা, তার স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির যে কোনোই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তার পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্তৃপক্ষের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই যে, প্রাণবন্ধু যা-খুশি তাই করত, যা-খুশি তাই বলত— কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কান দিতেন না; কেননা, তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে স্টেটের একজন পেন্‌সানভোগী।

৬

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে প্রাণবন্ধু পড়ল মুশকিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারোটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে

তাকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরো বেশি মুশকিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা— আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয়-সংকটে তিনি তাকে কর্ম হতে অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ত চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে, "হুজুর, আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারোটার মধ্যে আপিসে পৌছানো যায় ?"

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারোটার ভিতর পৌছতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে আপিসে আসাটা চাটুজ্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হল প্রথম জিত।

দুদিন না যেতেই চাটুজ্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণবন্ধুকে ডেকে কখনো তন্মুহূর্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন, তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটায় বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতরস্বরে বললে, "হুজুর, আমি গরিব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও উঠতে হত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে ডান হাতে কলম চালাতুম।"

এবারও হুজুরকে চুপ করে থাকতে হল; কেননা, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা-খুশি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন। একখানি জরুরি দলিল, যা একদিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না তখন তিনি দেওয়ানজির প্রতি এই দোষারোপ

করলেন যে, তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজি উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে। যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না করে নিত্যি ঘণ্টাখানেক ধরে আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হল এবং কৈফিয়ত চাওয়া হল। হুজুরের উপর দু-দুবার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার-সাহেবের মুখের উপরে এই জবাব করলে, "হুজুর, আমার লেখার একটু হাত আছে তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি।"

"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় তো আপিসের লেখা লিখলেই হয়— বাজে লেখা কেন ?"

"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরিব মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে তো ছাইপাঁশ লিখে দেশের মাসিক পত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম।"

এই উত্তরে চাটুজ্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আর যার কাছেই থাক্, তাঁর কাছে তো আর অবিদিত ছিল না। তিনি আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন, "দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেলল, "বড়োমানুষের জামাই ! কিন্তু অদৃষ্ট তো আর সবারই সমান নয়।"

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল— আর-এক ছিলিম ভালো করে তামাক সাজতে।

প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনোই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা

কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

৭

চাটুজ্যে-সাহেব দেওয়ানজিকে ডেকে বললেন, "প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বাহাল করা হোক।" নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজি সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন, প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিন্‌কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে-চাকরি তার এতদিন বজায় ছিল, আজ তা যাবার এমন কোনো নূতন কারণ ঘটে নি। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরোতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে— অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল, তার পর সপ্তম দিনের সকালবেলা চাটুজ্যে-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে, এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তার পর তিনি যখন ধড়া-চুড়ো পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখো তো, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড়ো চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর-একখানি মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই তো আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেকনজরে দেখেন না, কেননা আমি চোর নই, অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে, পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি তো আর কখনো দেখি নি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন, তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ, অমন বুদ্ধি, অমন বিদ্যে, অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ-সব শুনে তিনিও মহাখুশি।

প্রিয়পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে স্টেট্‌টা আর কিছুদিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারির ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মতো খাড়া হয়ে এগারোটা-পাঁচটায় ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন, ওতে তাঁকে রাশভারী দেখায়, কিন্তু আসলে কিরকম দেখায় জান?— ঠিক একটি সাক্ষীগোপালের মতো। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্মচারীদের সব এগারোটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানি নে। কেননা, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে, সেই পুরুতদের মতো যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে, 'হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি।' ইনি এতেই খুশি, কেননা এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে, লেফাফা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তা হলে পোশাক পরলেও সাহেব হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান? মেমসাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখলে তো তাই মনে হয়। কেন জান?— এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রঙটা ফ্যাকাসে— সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি-গোঁফের লেশমাত্র নেই, কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার কটা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেমসাহেবের মেমসাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে, হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মতো গুণী লোকের চাকরির ভাবনা নেই। তবে কিনা, অনেক দিন আছি বলে জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেননা, তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতেও কানা। তাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব, তাঁর, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেমসাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়, কারণ এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী— প্রায় তোমার মতো। তার পর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়— শুধু ভাত নয়, মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক, এঁর গৃহিণীকে যে চিঠিখানা লিখেছি, সে একটা পড়বার মতো জিনিস। আমার দুঃখ রইল এই যে, সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম

না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি, আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই কর্ত্রীঠাকুরানী খুব ভালো লেখাপড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী এ দুজনের মধ্যে কে বেশি গুণী। আশা করছি, কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুজ্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন— "এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোরা হয়েছে।"

বলা বাহুল্য, পত্রপাঠমাত্র প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরোল। চাটুজ্যে-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারেন, একমাত্র স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হওয়া ছাড়া। কেননা, তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি, পত্নীগতপ্রাণ।

এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনোরূপ উপায় ছিল না, কেননা তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

নীল-লোহিত

আমাকে যখন কেউ গল্প লিখতে অনুরোধ করে তখন আমি মনে মনে এই বলে দুঃখ করি যে, ভগবান কেন আমাকে নীল-লোহিতের প্রতিভা দেন নি। সে প্রতিভা যদি আমার শরীরে থাকত তা হলে আমি বাঙলার সকল মাসিক পত্রের সকল সম্পাদক মহাশয়দের অনুরোধ একসঙ্গে অক্লেশে রক্ষা করতে পারতুম।

গল্প বলতে নীল-লোহিতের তুল্য গুণী আমি অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নি।

অনেক সময়ে মনে ভাবি যে, তাঁর মুখে যে-সব গল্প শুনেছি, তারই গুটিকয়েক লিখে গল্প লেখার দায় হতে খালাস হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে-সব গল্প লেখবার জন্যও লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুণিপণা থাকা চাই। তাঁর বলবার ভঙ্গিটি বাদ দিয়ে তাঁর গল্প লিপিবদ্ধ করলে সে গল্পের আত্মা থাকবে বটে, কিন্তু তার দেহ থাকবে না। তিনি যে গল্প বলতেন, তাই আমাদের চোখের সুমুখে শরীরী হয়ে উঠত এবং সাঙ্গোপাঙ্গ মূর্তি ধারণ করত। এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আর-কারো আছে কি না জানি নে। কিন্তু আমার যে নেই, তা নিঃসন্দেহ। এ বর্ণনার ওস্তাদি ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোটোখাটো জিনিস ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসংগত নয়, অনাবশ্যক নয়। সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুলতেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল ঐ চিত্র-শিল্পীর হাতেরই তুলির আঁচড়।

তার পর, কথা তিনি শুধু মুখে বলতেন না। গল্প তাঁর হাত পা বুক গলা সব একত্র হয়ে একসঙ্গে বলত। এক কথায় তিনি শুধু গল্প বলতেন না, সেই গল্পের অভিনয়ও করতেন। যে তাঁকে গল্প বলতে না শুনেছে, তাকে তাঁর অভিনয়ের ভিতর যে কি অপূর্ব প্রাণ ছিল, তেজ ছিল, রস ছিল, তা কথায় বোঝানো অসম্ভব। তিনি যখন কোনো ধ্বনির বর্ণনা করতেন, তখন তাঁর কানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হত যে, তিনি যেন সে শব্দ সত্য সত্যই স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছেন। তাজি ঘোড়াকে ছারতকে ছাড়লে সে চলন্তে চলতে যখন

গরম হয়ে ওঠে, আর তার নাকের ডগা যেমন ফুলে ওঠে ও সেই সঙ্গে একটু একটু কাঁপতে থাকে, নীল-লোহিত গল্প বলতে বলতে গরম হয়ে উঠলে তাঁর নাকের ডগাও তেমনি বিস্ফারিত ও বেপথুমান হত। আর তাঁর চোখ?— এমন অপূর্ব মুখর চোখ আমি আর-কোনো লোকের কপালে আর-কখনো দেখি নি। গল্প বলবার সময় তাঁর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ থাকত, যেন সেখানে একটি ছবি ঝোলানো আছে, আর নীল-লোহিত সেই ছবি দেখে দেখে তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। সে চোখের তারা ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে যাতায়াত করত; যাতে করে ঐ আকাশপটের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত তার সমগ্র রূপটা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর চোখের আড়াল না হয় এই উদ্দেশ্যে। তার পর তাঁর মনে যখন তীব্র কোমল প্রসন্ন বিষণ্ণ সতেজ নিস্তেজ ভাব উদয় হত, তাঁর চক্ষুর্দ্বয়ও সেই ভাবের অনুরূপ কখনো বিস্ফারিত, কখনো সংকুচিত, কখনো ত্রস্ত, কখনো প্রকৃতিস্থ, কখনো উদ্দীপ্ত, কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ত। আর কথা তাঁর মুখ দিয়ে এমনি অনর্গল বেরোত যে, আমাদের মনে হত যে, নীল-লোহিত মানুষ নয় একটা জ্যান্ত গ্রামোফোন। আর তাতে ভগবান নিজ হাতে দম দিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুবান্ধবরা সবাই বলতেন যে, নীল-লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যদিচ আমার ধারণা ছিল অন্যরূপ, তবুও এ অপবাদের আমি কখনো মুখ খুলে প্রতিবাদ করতে পারি নি। কেননা, এ কথা কারো অস্বীকার করবার জো ছিল না যে, বন্ধুবর ভুলেও কখনো সত্য কথা বলতেন না। কথা সত্য না হলেই যে তা মিথ্যা হতে হবে, এই হচ্ছে সাধারণত মানুষের ধারণা; আর এ ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করতে হলে মনোবিজ্ঞানের তর্ক তুলতে হয়, আর সে তর্ক আমার বন্ধুরা শুনতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

লোকে নীল-লোহিতকে কেন মিথ্যাবাদী বলত জানেন? তাঁর প্রতি গল্পের hero ছিলেন স্বয়ং নীল-লোহিত, আর নীল-লোহিতের জীবনে যত অসংখ্য অপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল, তার একটিও লাখের মধ্যে একের জীবনেও একবারও ঘটে না।

তাঁর গল্পারম্ভের ইতিহাস এই। যদি কেউ বলত যে, সে বাঘ মেরেছে, তা হলে নীল-লোহিত তৎক্ষণাৎ বলতেন যে তিনি সিংহ মেরেছেন এবং সেই

সিংহ শিকারের আনুপূর্বিক বর্ণনা করতেন। একদিন কথা হচ্ছিল যে, হাতি ধরা বড়ো শক্ত কাজ। নীল-লোহিত অমনি বললেন যে তিনি একবার মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গারো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই 'দায়দার'দের সঙ্গে তিনিও একটি পোষমানা 'কুন্‌কি'র পিঠে চড়ে বসলেন। তাঁর দুঃসাহস দেখে মহারাজ কিরাতনাথ হতভম্ব হয়ে গেলেন, কেননা, 'দায়দার'রা জীবনের ছাড়পত্র লিখে, তবে বুনো-হাতি-ভোলানে ঐ মাদী হাতির পিঠে আসোয়ার হয়। তার পর ঐ কুন্‌কি জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁতলা— মেঘের মতো তার রঙ, আর পাহাড়ের মতো তার ধড়, আর তার দাঁত দুটো এত বড়ো যে তার উপর একখানা খাটিয়া বিছিয়ে মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ঐ দাঁতলাটা একেবারে মত্ত হয়ে ছিল, তাই সে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছগুলো শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে উপড়ে ফেলে নিজের চলবার পথ পরিষ্কার করে আসছিল। তার পর কুন্‌কিটিকে দেখে সে প্রথমে মেঘগর্জন করে উঠল। তার পর সেই হস্তিরমণীর কানে কানে ফুস্‌ফুস্ করে কত কি বলতে লাগল। তার পর হস্তিযুগলের ভিতর শুরু হল, 'অঙ্গ হেলাহেলি গদ্‌গদ ভাষ'। ইতিমধ্যে 'দায়দার'রা কুন্‌কির পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে তার পিছনের পা ধরে ঝুলছিল, আর নীল-লোহিত তার লেজ ধরে। এ অবস্থায় 'দায়দার'দের অবশ্যকর্তব্য ছিল যে, মাটিতে নেমে চট্‌পট্ শোণের দড়ি দিয়ে ঐ দাঁতলাটার পাগুলো বেঁধেছেঁদে দেওয়া। কিন্তু তারা বললে, 'এ হাতি পাগলা হাতি, ওর গায়ে হাত দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়— যদি রশি দিয়ে পা বেঁধেও ফেলি, তার পর যখন ওর পিঠে চড়ে বসব, তখন সে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের ভিতর এমনি ছুটবে যে, গাছের ধাক্কা লেগে আমাদের মাথা চুর হয়ে যাবে।' এ কথা শুনে নীল-লোহিত 'দায়দার'দের damned coward বলে, এক ঝুলে কুন্‌কির লেজ ছেড়ে দাঁতলার লেজ ধরে সেই লেজ বেয়ে উঠে তার কাঁধে গিয়ে চড়ে বসলেন। মানুষের গায়ে মাছি বসলে তার যেমন অসোয়াস্তি হয়, দাঁতলাটারও তাই হল, আর সে তখনি তার শুঁড় ওঁচালে ঐ নররূপী মাছিটাকে টিপে মেরে ফেলবার জন্য। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নীল-লোহিত কি করেছিলেন, জানেন? তিনি তিলমাত্র দ্বিধা না করে উপুড় হয়ে পড়ে দাঁতলাটার কানে মুখ দিয়ে নিধুবাবুর একটা ভৈরবীর টপ্পা গাইতে শুরু করলেন, আর সেই মদমত্ত হস্তী অমনি স্থির

হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু নিমীলিত করে গান শুনতে লাগল। ঐ প্রণয়-সংগীত শুনে হাতি বেচারা এমনি তন্ময়, এমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে ইত্যবসরে 'দায়দার'রা যে তার চারটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে, সে তা টেরও পেলে না। ফলে দাঁতলার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না। সে হাতি এখন মহারাজ কিরাতনাথের হাতিশালায় বাঁধা আছে।

মহারাজ কিরাতনাথ কে?—এ প্রশ্ন করলে নীল-লোহিত ভারি চটে যেতেন। তিনি বলতেন, ওরকম করে বাধা দিলে তিনি গল্প বলতে পারবেন না। আর যেহেতু তাঁর গল্প আমরা সবাই শুনতে চাইতুম, সেইজন্যে পাছে তিনি গল্প বলা বন্ধ করে দেন, এই ভয়ে ঐ-সব বাজে প্রশ্ন করা আমরা বন্ধ করে দিলুম। কারণ, সকলে ধরে নিলে যে নীল-লোহিতের গল্প সর্বৈব মিছে ; ও গল্প শোনবার জিনিস, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিস নয়। কেননা, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, নীল-লোহিত সতেরো বার ঘোড়া থেকে পড়েছিলেন, আর তার একবার দার্জিলিঙে ঘোড়াসুদ্ধ দু হাজার ফুট নীচে খদে, অথচ তাঁর গায়ে কখনো একটি আঁচড়ও যায় নি, যদিচ পড়বার সময় তিনি সঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন। নীল-লোহিত তিনবার জলে ডুবেছিলেন ; যেখানে তিস্তা এসে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে, সেখানে একবার চড়ায় লেগে জাহাজের তলা ফেঁসে যায়, সকলে ডুবে মারা যায়, একমাত্র নীল-লোহিত পাঁচ মাইল জল সাঁতরে শেষটা রোউমারিতে গিয়ে উঠেছিলেন। আর-এক বার মেঘনায় জাহাজ ঝড়ে সোজা ডুবে যায় ; সেবারও তিনি তিন দিন তিন রাত ঐ জাহাজের মাস্তুলের ডগায় পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ ছিলেন ; অন্য জাহাজ এসে তাঁকে তুলে নিলে। আর শেষবার মাতলার মোহানায় জাহাজ উল্টে যায়, তিনি ঐ জাহাজের নীচেই চাপা পড়েছিলেন, কিন্তু ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে তিনি ঐ জাহাজের হাল ধরে ফেললেন, আর ঐ হাল বেয়ে তিনি ঐ জাহাজের উল্টো পিঠে গিয়ে চড়ে বসলেন। ঐ উল্টানো জাহাজ ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তার পর একখানা জার্মান মানোয়ারী জাহাজ তাঁকে তুলে নেয়, আর সেই জাহাজেই কাইজারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কাইজার নাকি বলেছিলেন যে, নীল-লোহিত যদি তাঁর সঙ্গে জার্মানীতে যান তা হলে তিনি তাঁকে সবমেরিনের সর্বপ্রধান কাপ্তেন করে দেবেন। যে মাইনে কাইজার তাঁকে দিতে

চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর পোষায় না বলে তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এ-সব নীল-লোহিতের কথাবস্তুর নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করলুম, কিন্তু তাঁর কথারসের বিন্দুমাত্র পরিচয় দিতে পারলুম না। তুফানের বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা তাঁর মুখে না শুনলে— গুণীর হাতে পড়লে জলের ভিতর থেকে যে কি আশ্চর্য রৌদ্ররস বেরোয় তা কেউ আন্দাজ করতে পারবেন না।

নীল-লোহিতকে দিয়ে গল্প লেখাবার চেষ্টা করেছিলুম, কেননা গল্প তিনি আর বলেন না। তিনি আমার অনুরোধে একটি গল্প লিখেওছিলেন। কিন্তু সেটি পড়ে দেখলুম তা একেবারে অচল। সে গল্প প্রথম থেকে শেষ লাইন তক পড়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু সত্য, একেবারে আঁককষা সত্য, কিন্তু গল্প মোটেই নেই। সুতরাং বুঝলুম যে তাঁর দ্বারা আমাদের সাহিত্যে কোনোরূপ শ্রীবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই। তিনি কেন যে গল্প বলা ছেড়ে দিলেন তার ইতিহাস এখন শুনুন।

বাঙলায় যখন স্বদেশী ডাকাতি হতে শুরু হল তখন পাঁচজন একত্র হলেই ঐ ডাকাতির বিষয় আলোচনা হত। খবরের কাগজে ঐরকম একটা ডাকাতির রিপোর্ট পড়ে অনেকের কল্পনা অনেক রকমে খেলত। কথায় কথায় সে রিপোর্ট ফেঁপে উঠত, ফুলে উঠত। কেউ বলতেন, ছেলেরা একটানা বিশ ক্রোশ দৌড়ে পালিয়েছে, কেউ বলত, তারা তেতলার ছাদ থেকে লাফ মেরে পড়ে পিট্‌টান দিয়েছে। একদিন আমাদের আড্ডায় এই-সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় নীল-লোহিত বললেন যে, "আমি একবার এক ডাকাতি করি, তার বৃত্তান্ত শুনুন।" তাঁর সে বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত লিখতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস হয়, সুতরাং ডাকাতি করে তাঁর পালানোর ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলছি।

নীল-লোহিত উত্তরবঙ্গে এক সা-মহাজনের বাড়ি ডাকাতি করতে যান। রাত দশটায় তিনি সে বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। এক ঘণ্টার ভিতর সেখানে গ্রামের প্রায় হাজার চাষা এসে বাড়ি ঘেরাও করলে ডাকাত ধরবার জন্য। নীল-লোহিত যখন দেখলেন যে পালাবার আর উপায় নেই, তখন তিনি চট করে তাঁর পল্টনি সাজ খুলে ফেলে একটি বিধবার পরনের একখানি সাদা শাড়ি টেনে নিয়ে সেইখানি মালকোঁচা মেরে পরে, পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকে তাঁকে বাড়ির চাকর ভেবে আর বাধা দিলে না। একটু পরেই লোকে টের পেলে যে, ডাকাতের সর্দার পালিয়েছে, অমনি

দেদার লোক তাঁর পিছনে ছুটতে লাগল। মাইল-দশেক দৌড়ে যাবার পর তিনি দেখলেন যে রাস্তার দুপাশের গ্রামের লোকরাও তাঁকে তাড়া করেছে। শেষটায় তিনি ধরা পড়েন-পড়েন— এমন সময় তাঁর নজর পড়ল যে একটা বর্মা-টাট্টু একটা ছোলার ক্ষেতে চরছে; তার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা। নীল-লোহিত প্রাণপণে ছুটে গিয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে, তার মুখের ভিতর সেই দড়ি পুরে দিয়ে, তাতে এক পেঁচ লাগিয়ে সেটিকে লাগাম বানালেন। তার পর সেই ঘোড়ায় চড়ে— দে ছুট্! রাত বারোটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সে টাট্টু বিচিত্র চালে চলতে লাগল, কখনো কদমে, কখনো তুল্‌কিতে, কখনো চার-পা তুলে লাফিয়ে। জীবনে এই একটিবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়েন নি। তার পর সে হঠাৎ থেমে গেল। নীল-লোহিত দেখলেন, সুমুখে একটা প্রকাণ্ড বিল— অন্তত তিন মাইল চওড়া। অমনি ঘোড়া থেকে নেমে নীল-লোহিত সেই বিলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাঁতার কেটে পার হলেন, দ্বিতীয় মাইল এমনি সাঁতার, আর তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে— এইজন্য যে, পাড় থেকে কেউ দেখলে ভাববে যে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। নীল-লোহিত যখন ও পারে গিয়ে পৌঁছলেন তখন ভোর হয়-হয়। ক্লান্তিতে তখন তাঁর পা আর চলছে না। সুতরাং বিলের ধারে একটি ছোটো খোড়ো ঘর দেখবামাত্র তিনি 'যা থাকে কুল-কপালে' বলে সেই ঘরের দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা মারলেন। তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলে গেল, আর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরমাসুন্দরী যুবতী। তার পরনে সাদা শাড়ি, গলায় কণ্ঠী, আর নাকে রসকলি। নীল-লোহিত বুঝতে পারলেন যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে একটি বোষ্টমী, আর সে থাকে একা। নীল-লোহিত সেই রমণীকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন। শুনে তার চোখে জল এল, আর সে তিলমাত্র দ্বিধা না করে নীল-লোহিতের ভালোবাসায় পড়ে গেল। আর সেই সুন্দরীর পরামর্শে নীল-লোহিত পরনের ধুতি শাড়ি করে পরলেন। আর সেই যুবতী নিজ হাতে তাঁর গলায় কণ্ঠী পরালে, আর তার নাকে রসকলি-ভঞ্জন করে দিলে। গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন নীল-লোহিতের মুখাকৃতি ছিল একেবারে মেয়ের মতো। সুতরাং তাঁর এ ছদ্মবেশ আর কেউ ধরতে পারলে না। তার পরে তারা দু-সখীতে দুটি খঞ্জনি নিয়ে 'জয় রাধে' বলে বেরিয়ে পড়ল; তার পর পায়ে হেঁটে ভিক্ষে করতে করতে

বৃন্দাবন গিয়ে উপস্থিত হল। তার পর কিছুদিন মেয়ে সেজে বৃন্দাবনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার পর, পুলিসের গোলমাল যখন থেমে গেল, তখন তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। আর তাঁর সেই পথে-বিবর্জিতা বোষ্টমী মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বাঘনাপাড়ায় চলে গেল— কোনো দাড়িওয়ালা বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করতে।

নীল-লোহিতের এই রোমান্টিক ডাকাতির গল্প মুখে মুখে এত প্রচার হয়ে পড়ল যে, শেষটায় পুলিসের কানে গিয়ে পৌঁছল। ফলে নীল-লোহিত ডাকাতির চার্জে গ্রেপ্তার হলেন। এ আসামীকে নিয়ে পুলিস পড়ল মহা ফাঁপরে, কারণ নীল-লোহিতের মুখের কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির আর কোনোই প্রমাণ ছিল না। পুলিস তদন্ত করে দেখলে যে, যে গ্রামে নীল-লোহিত ডাকাতি করেছেন, উত্তরবঙ্গে সে নামের কোনো গ্রামই নেই। যে সা-মহাজনের বাড়িতে তিনি ডাকাতি করেছেন, উত্তরবঙ্গে সে নামের কোনো সা-মহাজন নেই। যে দিনে তিনি ডাকাতি করেছেন— সেদিন বাঙলা দেশে কোথাও কোনো ডাকাতি হয় নি। তার পর এও প্রমাণ হল যে, নীল-লোহিত জীবনে কখনো কলকাতা শহরের বাইরে যান নি, এমন-কি, হাওড়াতেও নয়। বিধবার একমাত্র সন্তান বলে নীল-লোহিতের মা নীল-লোহিতকে গঙ্গা পার হতে দেন নি— পাছে ছেলে ডুবে মরে, এই ভয়ে। অপর পক্ষে নীল-লোহিতের বিপক্ষে অনেক সন্দেহের কারণ ছিল। প্রথমত, তার নাম। যার নাম এমন বেয়াড়া, তার চরিত্রও নিশ্চয় বেয়াড়া। তার পর, লোহিত রক্তের রঙ— অতএব ও নামের লোকের খুন-জখমের প্রতি টান থাকা সম্ভব; দ্বিতীয়ত, তিনি একে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান, তার উপর তাঁর ঘরে খাবার আছে, অথচ তিনি বিয়ে করেন নি, যদিচ তাঁর বয়স তেইশ হবে; তৃতীয়ত, তিনি বি. এ. পাস করেছেন, অথচ কোনো কাজ করেন না; চতুর্থত, তিনি রাত একটা-দুটোর আগে কখনো বাড়ি ফেরেন না— যদিচ তাঁর চরিত্রে কোনো দোষ নেই। মদ তো দূরে থাক্, পুলিস-তদন্তে জানা গেল যে তিনি পান-তামাক পর্যন্ত স্পর্শ করেন না; আর নিজের মা-মাসি ছাড়া তিনি জীবনে আর-কোনো স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ান নি।

এ অবস্থায় তিনি নিশ্চয় interned হতেন, যদি না আমরা পাঁচজনে গিয়ে বড়োসাহেবদের বলে-কয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতুম। আমরা সকলে যখন

একবাক্যে সাক্ষী দিলুম যে নীল-লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই, আর সেইসঙ্গে তাঁর গল্পের দু-একটি নমুনা তাঁদের শোনালুম, তখন তাঁরা নীল-লোহিতকে অব্যাহতি দিলেন এই বলে যে— "যাও, আর মিথ্যে কথা বোলো না।" যদিচ কাইজারের সঙ্গে নীল-লোহিতের বন্ধুত্বের গল্প শুনে তাঁদের মনে একটু খট্‌কা লেগেছিল। এর পর থেকে নীল-লোহিত আর মিথ্যা গল্প করেন না, ফলে গল্পও করেন না। কেননা তাঁর জীবনে এমন কোনো সত্য ঘটনা ঘটে নি, ঐ এক গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া— যার বিষয় কিছু বলবার আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

আসল কথা কি জানেন? তিনি মিথ্যে কথা বলতেন না, কেননা ও-সব কথা বলায় তাঁর কোনোরূপ স্বার্থ ছিল না। ধন-মান-পদমর্যাদা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীল-লোহিত যা বলতেন, সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটির পৃথিবীতে নামানো হল তখন যে তাঁর প্রতিভা নষ্ট হল শুধু তাই নয়, তাঁর জীবনও মাটি হল।— দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হতে লাগল।

গল্প বলা বন্ধ করবার পর তিনি প্রথমে বিবাহ করলেন, তার পর চাকরি নিলেন। তার পর তাঁর বছর বছর ছেলেমেয়ে হতে লাগল। তার পর তিনি বেজায় মোটা হয়ে পড়লেন, তাঁর সেই মুখর চোখ মাংসের মধ্যে ডুবে গেল। এখন তিনি পুরোপুরি কেরানীর জীবন যাপন করছেন— যেমন হাজার হাজার লোক করে থাকে। লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন; কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম হারিয়ে, যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন— সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এই ভেবেই খুশি যে, তিনি এতদিনে মানুষ হয়েছেন— কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে জানেন? নীল-লোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে— যা টিঁকে রয়েছে তা হচ্ছে সংসারের সার ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্র মাত্র।

আশ্বিন ১৩২৯

নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা

১

পুজোর নম্বর 'বসুমতী'র জন্য একটি গল্প লিখে দিতে বহুদিন থেকে প্রতিশ্রুত আছি। নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন লেখায় হাত দিতে পারি নি।

আজ ঘুম থেকে উঠেই সংকল্প করলুম যে, যা থাকে কপালে একটা গল্প সূর্য ডোববার আগেই লিখে শেষ করব।

তার পর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই— এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেননা দিল্লিতে আমি যাই নি।

এ অবস্থায় নিজের মাথা থেকে গল্প বার করা অসম্ভব দেখে একটা অপরের জানা না হোক, আমার শোনা গল্প লেখাই স্থির করলুম।

এ গল্পটি আমি নীল-লোহিতের মুখে শুনেছিলুম। নীল-লোহিত লোকটি যে কে, তা অবশ্য আপনি জানেন। গত বৎসর এই সময়ে তাঁর সবিশেষ পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়েছি। আর আপনার কাগজের পাঠক সম্প্রদায়েরও অনেকেরই বোধ হয় নীল-লোহিতের কথা স্মরণ আছে।

আমার জনৈক ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বন্ধু একদিন আমার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, বর্তমান বেদ জাল, আর এ জাল ব্রাহ্মণরা করেছে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, মূল বেদ যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়েছিল তখন অবশ্য তার বেবাক অক্ষর ধুয়ে গেছল। এ অকাট্য যুক্তি শুনে আমি হাস্য সংবরণ করতে পারি নি। ফলে বন্ধুবর একেবারে উগ্র-ক্ষত্রিয় হয়ে উঠে আমাকে সরোষে বলেন যে, তাঁর কথা আমি বুঝতে পারব না, যেহেতু, আমরা ব্রাহ্মণরা বাস করি ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতে, আর তাঁরা বাস করেন বিশ্বামিত্রের জগতে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তার পর ভেবে দেখেছি যে, কথাটা সত্য। আমাদের সকলের দেহ শুধু একই মাটির পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা বিশ্বে বাস করে। আমি বাস করি মর্তলোকে, আর নীল-লোহিত বাস করতেন কল্পলোকে। সাদা কথায় আমি বাস করি ব্রিটিশ রাজ্যে, আর নীল-লোহিত বাস করতেন কল্পনারাজ্যে। সুতরাং

আমার মুখে নীল-লোহিতের গল্প শুনে শ্রোতাদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে।

তখন সবে সুরাট কংগ্রেস ভেঙেছে। কলকাতায় আর কোনো কথা নেই। পাঁচজন একত্র হলেই— সে কংগ্রেস কেন ভাঙল, কি করে ভাঙল, যে জুতোটা উড়ে এসে প্রেসিডেণ্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ল সেটা বিলেতি পম্প্ কি পাঞ্জাবী নাগরা, মারহাট্টি চটি কি মাদ্রাজী চাপ্‌লি— এই-সব নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে ঘোর গবেষণা ও মহা বাদানুবাদ চলছে।

একদিন আমরা সকলে আড্ডায় বসে উক্ত যুগপ্রবর্তক জুতোটির জাতি-নির্ণয় করতে ব্যস্ত আছি, এমন সময় নীল-লোহিত হঠাৎ বলে উঠলেন যে, তিনি স্বয়ং সশরীরে সুরাটে উপস্থিত ছিলেন এবং ভিতরকার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন ; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, প্রাণ গেলেও সে-রহস্য সে ফাঁস করবে না।

এ কথা শুনে একজন eye-witnessএর কথা শোনবার জন্য আমরা সকলে ব্যগ্র হয়ে উঠলুম, যদিচ আমরা সবাই জানতুম যে, সে কথার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

নীল-লোহিত বললেন, "তোমরা যদি তর্ক থামাও তো গল্প বলি।"

অমনি আমরা সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলুম। তিনি তাঁর সুরাট-অভিযানের বর্ণনা শুরু করলেন। তাঁর কথার অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করতে হলে গল্প একটা নভেল হয়ে উঠবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি তাঁর মোদ্দা কথা আপনাদের শোনাচ্ছি— অর্থাৎ মাছ বাদ দিয়ে তার কাঁটাটুকু আপনাদের কাছে ধরে দিচ্ছি।

২

নীল-লোহিত সুরাট গেছলেন বি. এন্. আর. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার গাড়িতে, অর্থাৎ একেবারে একলা ; তাই তাঁর সঙ্গে অপর কোনো বাঙালি ডেলিগেটের সাক্ষাৎ হয় নি। গাড়ি ঢিকোতে ঢিকোতে ছ দিনের দিন সন্ধেবেলায় সুরাট গিয়ে পৌঁছল। নীল-লোহিত সুরাট স্টেশনে নেমে একখানি টঙ্গা ভাড়া করে কংগ্রেস-ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন। গুজরাটে টঙ্গা অবশ্য একরকম গোরুর গাড়ি, কিন্তু গুজরাটের গোরু বাঙলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজী।

তারা ঠিক তাজি-ঘোড়ার মতো কদমে চলে, আর তাদের গলার ঘণ্টা গির্জার ঘণ্টার মতো সা-র-গ-ম সাধে, আর বাইজির পায়ের ঘুঙুরের মতো তালে বাজে। গাড়িতে ছ দিন নীল-লোহিতকে একরকম অনশনেই কাটাতে হয়েছিল। সকালবেলায় এক গেলাস কাঁচা দুধ ও রাত্তিরে এক মুঠো কাঁচা ছোলার বেশি তাঁর ভাগ্যে আর কিছু আহার জোটে নি। স্টেশনে স্টেশনে অবশ্য লাড্ডু পাওয়া যায়, কিন্তু সে লাড্ডু আকারে ভাটার মতো, আর সে চিজ দাঁতে ভাঙবার জো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মতো মোটা। আর পুরি?— তার একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেণ্টকে আর দেশে ফিরতে হত না। পৃথিবীতে নাকি এমন জুতো নেই, যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তার কাছেও ঘেঁষতে পারে। এক-একখানি পুরি যেন এক-একখানা খড়ম। সুতরাং নীল-লোহিত যদিও অনশনে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, তবুও সুরাটের বড়ো রাস্তার দৃশ্য দেখে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদম ভুলে গেলেন। যতদূর যাও, পথের দুপাশে সব জানালাতে যেন সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গুর্জরে অবরোধপ্রথা নেই, আর গুর্জররমণীদের তুল্য সুন্দরী সুরপুরীতেও মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মোহ উপস্থিত হল, যেন প্রতি জানালায় একটি করে Juliet দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি হচ্ছেন স্বয়ং Romeo; কিন্তু টঙ্গা এমনি ছুটে চলেছে যে, তিনি কারো কারো কাছে 'kill the envious moon' এ কথা-কটি বলবারও অবকাশ পেলেন না। তার পর এক সময়ে তাঁর মনে হল যে, টঙ্গা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, আর তাঁর দক্ষিণ ও বাম দুপাশ দিয়েই অসংখ্য সুন্দরীর শোভাযাত্রা চলেছে। নীল-লোহিত যে পথিমধ্যে কারো ভালোবাসায় পড়ে যান নি, তার একমাত্র কারণ— এই নাগরীর হাটে কাকে ছেড়ে কার ভালোবাসায় তিনি পড়বেন? বিবাহ অবশ্য একসঙ্গে দুশো তিনশো করা যায়, কিন্তু ভালোবাসায় পড়তে হয় মাত্র একজনের সঙ্গে— অন্তত এক সময়ে তো তাই। এ দিকে পেট খালি, ও দিকে হৃদয় পূর্ণ; এই অবস্থায় নীল-লোহিত কংগ্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হবামাত্র তাঁর রূপের নেশা ছুটে গেল। তিনি প্রথমে গিয়েই টিকিট কিনলেন, তাতেই তাঁর পকেট প্রায় খালি হয়ে এল। তার পর শোনেন যে, কংগ্রেস-ক্যাম্পে আর জায়গা নেই; যার কাছেই যান,

তিনিই বললেন, "ন স্থানং তিলধারণে"। ছ দিন পেটে ভাত নেই, ছ রাত্তির চোখে ঘুম নেই, তার উপর আবার যদি সুরাটের পথে পথে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে হয় তা হলেই তো নির্ঘাত মৃত্যু। নীল-লোহিত একেবারে জলে পড়লেন, আর ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না। তাঁর এই দুরবস্থা দেখে টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে Extremist ক্যাম্পে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে। নীল-লোহিতের নাড়ীতে আবার রক্ত ফিরে এল। টঙ্গা যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। এবার কিন্তু কোনো বাড়ির কোনো গবাক্ষ আর তাঁর নয়ন আকর্ষণ করতে পারলে না— যদিচ প্রতি গবাক্ষেই একটি করে সন্ধ্যাতারা ফুটে ছিল। তিনি অকারণে সমস্ত সুরাট-সুন্দরীদের উপর মহা চটে গেলেন, যেন তাঁরাই তাঁর কংগ্রেসের প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়েছে। শেষটায় রাত আটটায় তিনি কংগ্রেসের মহারাষ্ট্র-শিবিরে গিয়ে পৌছলেন, এবং পৌছেই পকেটে যে-কটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেই কটি টঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে বিদায় করলেন। মহারাষ্ট্র-শিবিরে লোকের ভিড় দেখে সেখানে রাত কাটাতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। সে যেন একটা Black hole, এক-একটা ছোট্ট ঘরে পঞ্চাশ-ষাট জন করে জোয়ান। 'শুতে না পাই অন্তত খেতে পাব' এই আশায় তিনি সেখানে থাকাই স্থির করলেন। কিন্তু খাবার আয়োজন দেখে তাঁর চক্ষুস্থির! চার দিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু লঙ্কা লঙ্কা আর লঙ্কা! সে লঙ্কা কেউ কুটছে, কেউ বাটছে, কেউ পিষছে, কেউ ছেঁচছে। তার গন্ধতেই তাঁর মুখ জ্বালা করতে লাগল। তিনি ঢোক গিলে মনে মনে বললেন, 'এখন উপায় কি, নুন দিয়েই ভাত খাব।' কিন্তু ভাত সেদিন তাঁর আর কপালে লেখা ছিল না। সে ক্যাম্পেও তাঁর স্থান হল না। সকলে ধরে নিলে যে, তিনি একজন স্পাই। তাঁর যে এ কূল ও কূল দু কূল গেল, তার প্রথম কারণ তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁর সঙ্গে ব্যাগ-বিছানা কিছুই ছিল না। তিনি ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সুরাটের লোকের কাছে এই প্রমাণ করবার জন্য যে তিনি হচ্ছেন একজন স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা সন্ন্যাসী।

নীল-লোহিত মহারাষ্ট্র-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। আর তাঁর অবস্থা তখন এই যে, পেটে ভাত নেই,

পকেটে পয়সা নেই, সুরাটে একটি পরিচিত লোক নেই। সভ্যসমাজের মধ্যে তিনি পড়লেন দ্বিতীয় Robinson Crusoeর অবস্থায়।

ঘোর বিপদের মধ্যে না পড়লে নীল-লোহিতের বলবুদ্ধি খুলত না। সহজ অবস্থায় নীল-লোহিত ছিলেন আর পাঁচজনের মতো; কিন্তু বিপদে পড়লেই তিনি হয়ে উঠতেন একটি superman, সংস্কৃতে যাকে বলে অতিমানুষ। তাই পথে বেরিয়েই তাঁর শরীর-মনে কে জানে কোত্থেকে অলৌকিক শক্তি ও সাহস এসে জুটল। তিনি তাঁর মনকে বোঝালেন যে, তিনি hunger-strike করেছেন— সভ্যসমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে। অমনি তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। তিনি সংকল্প করলেন যে, এ বিপদ থেকে তিনি আত্মবলে উদ্ধার লাভ করবেন। কি করে যে তা করবেন, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁর মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁর ছিল আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁর সমান অভক্তি জন্মাল, কারণ, তারা যা করতে যায় তা দল বেঁধে ও পরস্পরের হাত-ধরাধরি করে। একলা কিছু করবার সাহস ও শক্তি তাদের কারো শরীরে নেই। নীল-লোহিত তাই 'একলা চলো রে' বলে সেই অমানিশার অন্ধকারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার তিনি রাজপথ ছেড়ে সুরাটের গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়লেন। সে-সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ডেকেছে। রাস্তার দু পাশের বাড়িগুলোর দুয়োর জানলা সব জেলের ফটকের মতো কষে বন্ধ। চার পাশে সব নির্জন, সব নীরব, নিঝুম, যেন সমগ্র সুরাট শহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটা বাড়ির গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো, সেইখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল।

নীল-লোহিত ছাড়া অপর কেউ এই শ্মশানপুরীর মধ্যে ঢুকলে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি ঘণ্টা-দুই এই অন্ধকারের ভিতর সাঁতরাতে সাঁতরাতে শেষটায় কূলে গিয়ে ঠেকলেন। হঠাৎ তিনি একটা বাড়ির সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যার দোতলার ঘরে দেদার ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে, আর যার ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে স্ত্রীকণ্ঠের অতি সুমধুর সংগীত।

নীল-লোহিত তিলমাত্র দ্বিধা না করে নিজের মাথার পাগড়িটি খুলে সেই বাড়ির বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে লাগিয়ে দিয়ে, সেই পাগড়ি বেয়ে দোতলায়

উঠে গেলেন।

তাঁর পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে একটি অপ্সরোপম রমণী বেরিয়ে এলেন। তার পর দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইলেন। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক নীল-লোহিত জীবনে কিম্বা কল্পনাতে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেন নি। নীল-লোহিতের মনে হল যে, রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁর সর্বাঙ্গ একেবারে হীরেমানিকে ঝক্‌ঝক্ করছিল। নীল-লোহিতের চোখ সে রূপের তেজে ঝলসে যাবার উপক্রম হল, তিনি মাটির দিকে চোখ নামালেন।

প্রথম কথা কইলেন স্ত্রীলোকটি। তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "বাঙালি।"

"সুরাটে কেন এসেছ?"

"কংগ্রেস-ডেলিগেট্ হয়ে।"

"কংগ্রেস-ক্যাম্পে না গিয়ে এখানে কেন এলে?"

"পথ ভুলে।"

"টঙ্গায় চড়লে টঙ্গাওয়ালা তো তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেত।"

"আমার ব্যাগ বিছানা সব স্টেশনে হারিয়ে গিয়েছে। টাকাকড়ি সব ব্যাগের ভিতরে ছিল। তাই টঙ্গা ভাড়া করবার পয়সা কাছে না থাকায় হেঁটে বেরিয়েছিলুম। তার পর তিন-চার ঘণ্টা ঘোরবার পর এখানে এসে পৌচেছি।"

"এ বাড়িতে ঢুকলে কিসের জন্য?"

"আলো দেখে ও সংগীত শুনে।"

"পরের বাড়িতে না বলা-কওয়া প্রবেশ করতে তোমার দ্বিধা হল না?"

"যে জলে ডোবে, সে বাঁচবার জন্য হাতের গোড়ায় যা পায় তাই চেপে ধরে। আমি উপবাসে মৃতপ্রায়। কিছু খেতে পাই কি না দেখবার জন্য এখানে প্রবেশ করেছি— বাড়ি কার তা ভাববার আমার সময় ছিল না। ঝাড়-লণ্ঠন দেখে বুঝলুম— এ বাড়িতে অন্নকষ্ট নেই; আর গান শুনে বুঝলুম, এ বাড়িতে প্লেগ নেই।"

নীল-লোহিতের কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে করুণার উদয় হল। তিনি

তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর দাসীদের ডেকে বললেন নীল-লোহিতের জন্য খাবার আনতে। তাই শুনে নীল-লোহিতের ধড়ে আবার প্রাণ এল। তিনি এক-নজরে ঘরটি দেখে নিলেন। নীচে কাশ্মীরি গালিচা পাতা, আর ঘর-পোরা বাদ্যযন্ত্র। তিনি গৃহকর্ত্রীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা যা হতে চাচ্ছ, আমি তাই।"

"অর্থাৎ ?"

"আমি স্বাধীন।"

এর পর বড়ো বড়ো রুপোর থালায় করে দাসীরা দেদার ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করলে। নীল-লোহিত আহারে বসে গেলেন। সে আহারের বর্ণনা করতে হলে দুখানি বড়ো বড়ো ক্যাটলগ তৈরি করতে হয়। একখানি ফলের, আরখানি মিষ্টান্নের। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সকল ঋতুর ফল আর সকল প্রদেশের মিষ্টান্ন নীল-লোহিতের সুমুখে স্তূপীকৃত করে রাখা হল। তিনিও তাঁর এক সপ্তাহের ক্ষুধা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সেদিন আহারে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দিতে পারতেন।

তাঁর আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে ফটকে কে অতি আস্তে ঘা দিলে। গৃহকর্ত্রী একটি দাসীকে নীচে গিয়ে দুয়োর খুলে দিতে আদেশ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি ভদ্রলোক এসে সেখানে উপস্থিত। নীল-লোহিত দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি বম্বে অঞ্চলের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি যে অগাধ ধনী, তা তাঁর উদরেই প্রকাশ। ভদ্রলোক নীল-লোহিতকে দেখেই আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তার পর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনেকক্ষণ ধরে গুজরাটিতে কি কথাবার্তা হল। তার পর সেই ভদ্রলোকটি নীল-লোহিতকে সম্বোধন করে অতি অভদ্র হিন্দিতে বললেন যে, আহারান্তে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নচেৎ তিনি তাঁকে পুলিসের হাতে সঁপে দেবেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বললেন যে, তা কখনোই হতে পারে না। সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালে বাঙালি ছোকরাটি প্লেগে মারা যাবে। আর ছোকরাটি যে চোর-ডাকাত নয় তার প্রমাণ তার চেহারা— "এইসা খপ্‌সুরত" ছোকরা চোর-ডাকাত কখনোই হতে পারে না।

এ কথা শুনে ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। আবার দুজনে বাগ্‌বিতণ্ডা

শুরু হল। শেষটায় উভয়ের মধ্যে এই আপস হল যে রাত্তিরে নীল-লোহিতকে চাকরদের সঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু সকালে উঠেই তাঁকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।

ঘুমে নীল-লোহিতের চোখ বুজে আসছিল, তাই তিনি দ্বিরুক্তি না করে নীচে গিয়ে চাকরদের ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে, ঐ বোম্বেটের অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীল-লোহিত চোখ তাকিয়ে দেখেন যে, বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। তিনি মুখ-হাত ধুয়ে সবে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় উপর থেকে হুকুম এল যে— "বাইজি বোলাতা।" উপরে গিয়ে দেখেন যে স্ত্রীলোকটি নূতন মূর্তি ধারণ করেছেন। সাজসজ্জা সব বাঙালি রমণীর ন্যায়। শরীরে জহরতের সম্পর্ক নেই, গহনা আগাগোড়া সোনার, আর তাঁর পরনে ঢাকাই শাড়ি, গায়ে একখানি বুটিদার ঢাকাই চাদর। তিনি নীল-লোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি এখন কোথায় যেতে চান। নীল-লোহিত উত্তর করলেন, কংগ্রেস-ক্যাম্পে। স্ত্রীলোকটি বললেন, সে হতেই পারে না। গত রাত্তিরের আগন্তুক ভদ্রলোকটি যদি তাঁর সাক্ষাৎ পান তা হলে তাঁর বিপদ ঘটবে— হয় গুণ্ডা, নয় পাহারাওয়ালার হাতে তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হবে। অতএব পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কর্তব্য। স্ত্রীলোকটি তাঁর জন্য ব্যাগ, বিছানা, দেশে ফেরবার রেল-ভাড়ার টাকা ইত্যাদি সব ঠিক করে রেখেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসে যাওয়ায় বিপদ আছে, এ কথা শুনে নীল-লোহিত জেদ ধরে বসলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাবেনই যাবেন। সেই সুন্দরী তাঁকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন; কিন্তু নীল-লোহিত কিছুতেই তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। "ভয় পেয়েছি", এ কথা স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার পুরুষমানুষে সহজে করে না। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিলেন যেমন সুন্দরী, নীল-লোহিতও ছিলেন তেমনি বীরপুরুষ। অনেক বকাবকির পর শেষটায় স্থির হল উক্ত স্ত্রীলোকটি স্বয়ং নীল-লোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যাবেন— নিজের দাসী সাজিয়ে। তিনি বললেন যে, তিনি সঙ্গে থাকলে কেউ নীল-লোহিতের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।

মধ্যাহ্নভোজনের পর নীল-লোহিতকে পাঞ্জাবী রমণীর বেশ ধারণ করতে

হল। পরনে চুড়িদার পাজামা, পায়ে নাগরা, গায়ে কুর্তা ও মাথা-মুখ-ঢাকা ওড়না। এ-সব সাজসজ্জা গৃহকর্ত্রীর একটি পাঞ্জাবী দাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। আর সে-সব কাপড় নীল-লোহিতের গায়ে ঠিক বসে গেল। কেননা পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ও বাঙালি পুরুষ মাপে প্রায় এক। তার পর দুজনে একটি আধ-বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কংগ্রেসে গিয়ে মেয়েদের গ্যালারিতে বসলেন। কংগ্রেসের কাজ শুরু হল, এমন সময় হঠাৎ নীল-লোহিত দেখতে পেলেন যে, উক্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের মধ্যে বসে আছেন। এ দেখে তিনি আর তাঁর রাগ সামলাতে পারলেন না, ডান পায়ের নাগরা খুলে তাঁকে ছুঁড়ে মারলেন। সেই নাগরাটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেণ্টের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। নীল-লোহিতের কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন। তার পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে নীল-লোহিতের হাত ধরে তিনি কংগ্রেসের তাঁবুর বাইরে এসে গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফিরলেন। আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নীল-লোহিতকে বাঙালি সাজিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সেই গাড়িতেই তাঁকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। স্টেশনে নীল-লোহিত ব্যাগ খুলে দেখেন, তার ভিতর পাঁচশো টাকার নোট আর সেই স্ত্রীলোকটির একখানি ছবি রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তিনি দেশে ফিরলেন।

সুরাট কংগ্রেসের যুগপ্রবর্তক জুতো যে নীল-লোহিতের পাদুকা, এ কথা শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

নীল-লোহিতের মুখে এই অপূর্ব কাহিনী শুনে আমরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম— কেননা তাঁর এই গল্প সম্বন্ধে কি বলব কেউ তা ঠাউরাতে পারলুম না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর রামযাদব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি সেই সুরাট-সুন্দরীর পাঁচশত টাকা বেমালুম হজম করে ফেললেন? নীল-লোহিত উত্তর করলেন— "না। আমি কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে অন্নপূর্ণার পূজা দিয়ে এসেছি।" আবার সকলেই চুপ করলেন। তার পর মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ছবিখানা তোমার কাছে আছে?" নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "হাঁ, আছে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন হল— "সেখানি দেখাতে পার?" উত্তর— "দেখতে ইচ্ছে হয়, কিনে দেখতে পার।" প্রশ্ন— "সে ছবি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?" উত্তর—

"দেদার।" প্রশ্ন— "কি রকম?" উত্তর— "নূরজাহানের ছবি দেখলেই সেই স্থরাট-স্থন্দরীকে দেখতে পাবে। এ দুটি স্ত্রীলোকই এক ছাঁচে ঢালাই।"

এর পর কিছু বলা বৃথা দেখে আমরা সভা ভঙ্গ করে চলে গেলুম।

আশ্বিন ১৩৩০

প্রিন্স

আপনি আমাকে আপনার কাগজের জন্য একটি ছোটো গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু কি করে আপনার অনুরোধ রক্ষা করব তা এতদিন ভেবে পাচ্ছিলুম না। আজ কদিন ধরে বহু চেষ্টা করেও মাথা থেকে ছোটো কি বড়ো কোনোরকম গল্প বার করতে পারলুম না। তার পর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, পৃথিবীতে নানারকম ছোটোখাটো ঘটনা তো নিত্যই ঘটে। আর সেই-সব ঘটনার ভিতরও তো যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। সুতরাং আমার চোখের সুমুখে যা-সব ঘটেছে, তারই মধ্যে একটির বর্ণনা করলেই সম্ভবত সেটি গল্পের মতো শোনাবে।

আমি যখন বিলেতে ছিলুম তখন সে দেশে একটি হিন্দুস্থানী যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় দুদিনেই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আমরা দুজনেই ভারতবর্ষের লোক, দুজনেই বিলাত-প্রবাসী, দুজনেরই বয়েস এক; এই সূত্রেই আমাদের পরস্পরের সখ্য জন্মায়। কেননা একটি বিষয় ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ সাদৃশ্য ছিল না— না বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে, না চরিত্রে, না শিক্ষায়, না চেহারায়, না অবস্থায়।

বন্ধুটি ছিলেন পশ্চিমের কোনো রাজবংশের সন্তান। তাঁর উপাধি ছিল Prince— কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা তাঁর পদের অনুরূপ না হওয়ায় তিনি বিলেতে তাঁর নামের পূর্বে ঐ Prince উপসর্গটি ব্যবহার করতেন না। কিন্তু অপরের কাছে তাঁর বংশমর্যাদা গোপন করলেও তিনি নিজের কাছে সে সত্যটি এক মুহূর্তও গোপন করতে পারতেন না। বরং পৈতৃক সম্পত্তির অভাবে পৈতৃক তাঁর নামটিই তাঁর কাছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জিনিস হয়ে উঠেছিল। তাঁর চাল-চলন কথা-বার্তা আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল। তাঁর ব্যবহারের একটি নমুনা দিচ্ছি, তার থেকেই আপনারা তাঁর সমগ্র চরিত্র বুঝতে পারবেন।

তিনি পোশাকে দেদার টাকা খরচ করতেন, এবং এ বিষয়ে অতিব্যয় করবার জন্য তাঁকে অপরাপর বিষয়ে অতিশয় মিতব্যয়ী হতে হত; এমন-কি, তাঁর আহার একরকম উপবাসের শামিলই ছিল। ইংলণ্ডের রাজপুত্র যে দোকানে পোশাক

তৈরি করান তিনিও সেই দোকানে পোশাক তৈরি করাতেন সমান ব্যয় করে, কিন্তু তিনি জীবন ধারণ করতেন রুটি মাখম ও কলা খেয়ে।

বিলেতে আমরা পাঁচজন দেশী ছোকরা একত্র হলেই নানা বিষয়ে আলোচনা করি। ধর্ম সমাজ দর্শন বিজ্ঞান কাব্যকলা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের তর্কের আর অন্ত ছিল না। এ-সব আলোচনায় Prince কখনো যোগদান করতেন না। আমাদের বাক্‌বিতণ্ডায় যোগ দেওয়া দূরে থাক্ আমাদের বকাবকি তিনি কানে তুলতেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। ও-সব কথা শুনলে তিনি এমনি চুপ হয়ে যেতেন যে মনে হত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অপর পক্ষে তিনি যখন মুখ খুলতেন তখন আবার আমরা সব চুপ হয়ে যেতুম। তার কারণ, যে একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর সম্যক্ অভিজ্ঞতা ছিল সে বিষয়ে আমরা সকলে ছিলুম সমান অনভিজ্ঞ। ভদ্রভাষায় সে বিষয়টির নাম হচ্ছে love।

আমরা কবিতা পড়ে নভেল পড়ে যে loveএর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে শিখি, সে loveএর সন্ধান তিনি বড়ো-একটা রাখতেন না। যেমন চুম্বক ও লৌহের ভিতর, তেমনি স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যে নৈসর্গিক টান আছে, সেই আকর্ষণী শক্তিরই বিচিত্র লীলা তাঁর আদ্যোপান্ত মুখস্থ ছিল। এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য তিনি বই পড়ে লাভ করেন নি, শিখেছিলেন হাতে-কলমে। এ শিক্ষা লাভ করবার তাঁর সুযোগও যথেষ্ট ছিল। যে রাজপুরীতে তিনি আশৈশব লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন সেখানে মানবজীবনের মুখ্যকর্ম ছিল প্রণয়চর্চা। Princeএর গল্প আমরা যে পাঁচজনে হাঁ করে শুনতুম, যেমন ছোটো ছেলে রূপকথা শোনে, তার কারণ তখন আমরা সবাই ছিলুম তরুণের দল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই মনে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল, আর রমণীপ্রসঙ্গ আমাদের সকলেরই অন্তরের এমন-একটি তারে ঘা দিত যার উপর দর্শন-বিজ্ঞানের বিশেষ কেনো প্রভাব নেই। সে কথা যাক, এ হেন শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে Prince যে বিলাতে মাসে একবার করে loveএ পড়তেন সে বলাই বাহুল্য। তাতে অবশ্য তাঁর মানসিক কিম্বা সাংসারিক কোনো ক্ষতি হয় নি। তিনি পদে-পদে যেমন বিপদে পড়তেন আবার তেমনি হাত-হাত ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারতেন। ফলে তাঁর নিত্যনূতন প্রণয়কাহিনী শোনবার জন্য আমরা সদাসর্বদাই প্রস্তুত থাকতুম।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, Princeএর পদমর্যাদার অনুরূপ তাঁর সম্পত্তি ছিল না। যত দিন যেতে লাগল তত তাঁর আর্থিক অবস্থা হীন হয়ে পড়তে লাগল। শেষটা তাঁর মনে হল যে, তিনি যদি কোনো ক্রোরপতির কন্যা বিবাহ করতে পারেন তা হলে তিনি ধর্মের অবিরোধে অর্থ ও কামের অপর্যাপ্ত ফলভোগী হতে পারবেন। বিলাতে অনেক নিঃস্ব লোক আমেরিকার millionaire কলু-কসাইদের কন্যা বিবাহ করেন, অর্থের লোভে ও উপাধির জোরে। যদি Lord উপাধির মূল্য স্বরূপ আমেরিকানরা অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দান করতে প্রস্তুত হয় তা হলে তারা Prince উপাধির দাম যে আরো বেশি দেবে সে বিষয়ে বন্ধুবরের মনে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

এ চিন্তা তাঁর মনে উদয় হবা মাত্র লণ্ডনের একটি বড়ো হোটেলে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন যেখানে আমেরিকার millionaireরা এসে বাস করে।

সাতদিন যেতে না যেতে তিনি সেখানে একটি millionaireএর কন্যার সঙ্গে দস্তুর মতো loveএ পড়ে গেলেন। তার পর তিনি কি উপায়ে সেই মহিলাটির কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবেন তা স্থির করতে না পেরে আমার কাছে মন্ত্রণা নিতে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, আমি যেমন সহৃদয় লোক তেমনি সদ্‌বিবেচক। তিনি আমাকে একদিন স্পষ্টই বলেছিলেন যে, তিনি যদি কখনো রাজা হন তা হলে তিনি আমাকে তাঁর মন্ত্রী করবেন। কেননা রাজকার্যের ভার আমি হাতে নিলে তিনি নিশ্চিন্ত মনে অন্দরমহলে বাস করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মুশকিল হয়েছিল এই যে, তিনি মেয়েটির কখনো একলা দেখা পেতেন না, তার মা কন্যারত্নটিকে যক্ষের ধনের মতো আগলে নিয়ে বেড়াত।

কথায় কথায় জানতে পেলুম যে মেয়েটি প্রতি সকালে ঘোড়ায় চড়ে Hyde Parkএ বেড়াতে যায় এবং এই একমাত্র সময় যখন তার মাতা তার রক্ষক থাকেন না।

আমি বললুম, "এই তো তোমার সুযোগ। তুমিও একদিন তাই করো-না। ঘোড়সোয়ার অবস্থায় বীরপুরুষের মতো প্রণয় নিবেদন করলে কোনো মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না, বিশেষত Hyde Parkএ এবং বসন্তকালে ফুলেফলে লতায়পাতায় প্রকৃতি যখন সুসজ্জিত হয়ে ওঠে সে দৃশ্যে মানুষের

মন স্বতঃই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে ও ইউরোপে কোনো প্রভেদ নাই। মানুষের স্বভাব মূলত এক।"

আমার এ প্রস্তাব শুনে Prince একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে আমার প্রতি কথার অসম্ভব রকম তারিফ করতে করতে আশায় বুক বেঁধে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার সাতদিন পরে এক রবিবারে ঘুম থেকে উঠে আমি ঘরে বসে কাগজ পড়ছি, এমন সময় একটি Boy messenger এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। খুলে দেখি সেখানি Princeএর লেখা। তাতে শুধু একটি ছত্র লেখা ছিল— "I am dying"।

পত্রপাঠ আমি একটি গাড়ি ভাড়া করে তাঁর হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি Prince বিছানায় শুয়ে রয়েছেন কম্বল মুড়ি দিয়ে। প্রথমে তাঁকে দেখে আমি চিনতে পারি নি। কারণ তাঁর মুখ এত ফুলেছিল যে তাঁর কান থেকে কান পর্যন্ত সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে আমার চোখে পড়ল যে Princeএর তিলফুলের মতো নাসিকা তালফলের মতো গোলাকার হয়েছে।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কটুভাষায় নিজের ভাগ্যের নিন্দে করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত দুঃখের কান্নার ভিতর থেকে আমি এই সার সংগ্রহ করলুম যে, তিনি আমার পরামর্শমত অশ্বারোহী হয়ে Hyde Parkএ কন্যারত্ন আহরণ করতে গিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁর পাঁচশো টাকা এক দিনে খরচ হয়ে গিয়েছে ঘোড়ার ভাড়া দিতে ও ঘোড়ায় চড়বার পোশাক তৈরি করাতে।···তিনি যে একজন পয়লা নম্বরের ঘোড়সোয়ার তাঁর প্রণয়পাত্রীকে তাই দেখাতে তিনি একটি খুব তেজী ঘোড়া ভাড়া করেছিলেন। এতেই তাঁর সর্বনাশ ঘটেছে।

ঘোড়াটি রাস্তায় খুব ভালোমানুষের মতো চলেছিল, কিন্তু Hyde Parkএ প্রবেশ করেই সে হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে চার পা তুলে লাফাতে শুরু করলে। Prince অনেক কষ্টে তাকে কোনো রকমে তার প্রণয়পাত্রীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে I love you এই কথাকটি বলবার অভিপ্রায়ে যেমন I lo— পর্যন্ত বলেছেন অমনি তাঁর ঘোড়া হঠাৎ এমনি জোরে মাথা তুললে যে সেই অশ্বমস্তকের আঘাতে তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা নির্গত

না হয়ে তাঁর নাসিকা দিয়ে রক্তস্রাব হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে সেই আমেরিকান মহিলা খিলখিল করে হেসে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। আর তিনি হোটেলে ফিরে শয্যাশায়ী হলেন।

সত্য কথা বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর মুখের চেহারা দেখে ও তাঁর নাকী কথা শুনে আমারও বেজায় হাসি পেয়েছিল এবং অতিকষ্টে সে হাসি আমি চাপি। তাঁর কান্নাকাটির উত্তরে কি বলব ভেবে না পেয়ে আমি শেষটা বললুম যে— "Man proposes, God disposes।"

তার উত্তরে তিনি বললেন, "তা যদি হত তো বলবার কোনো কথা ছিল না ; কিন্তু আমি যে propose না করতেই ঘোড়া-বেটা সব dispose করে দিলে।"

এ কথার পর আমি তাঁকে আশ্বস্ত করবার বৃথা চেষ্টা না করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলুম এই ভরসায় যে, তাঁর নাকের জখমের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হৃদয়ের জখমও সেরে যাবে। মাস-খানেক বাদে দেখা যাবে যে Prince আবার loveএর একটি নূতন পালা আরম্ভ করেছেন। আসলে ঘটলও তাই— শুধু পূর্ব-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ তাঁর নাকের উপর একটা বিশ্রী দাগ থেকে গেল।

বৈশাখ ১৩৩১

বীরপুরুষের লাঞ্ছনা

স্ত্রীজাতিকে আমরা অবলা বলি, কারণ আমাদের দৃঢ় ধারণা যে বল জিনিসটে পুরুষদের একচেটে। কিন্তু এই অবলাদের হাতে পুরুষজাতিকে কত অবস্থায় কত রকমে লাঞ্ছিত হতে হয় তা আমরা সকলেই জানি— নিজের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে নয়, কিন্তু নাটক-নভেল পড়ার ফলে। আমরা যাকে উঁচুদরের কাব্য বলি তার ভিতরকার কথা হচ্ছে নারী। নারী বাদ দিয়ে ট্রাজেডিও হয় না কমেডিও হয় না।

স্ত্রী-কর্তৃক পুরুষনিগ্রহের অনেক মর্মভেদী কথা সংস্কৃত কবিদের মুখেও শুনেছি, Strindbergএর বইয়েও পড়েছি; কিন্তু আমি স্বচক্ষে যে বুকভাঙা ব্যাপার দেখেছি তার তুল্য স্ত্রী-কর্তৃক পুরুষনিগ্রহের বিবরণ বিশ্বসাহিত্যে নেই।

এ ব্যাপার ঘটেছিল বিলেতে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে। আমি সে দেশে থাকাকালীন এ দেশ থেকে একটি যুবক ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অত বলিষ্ঠ অত সুপুরুষ যুবক আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। আমরা আর-পাঁচজন ছিলুম এগ্‌জামিন পাস-করা বঙ্গযুবক, অতএব বলা বাহুল্য কেউ আমাদের দেখে রাজপুত্র বলে ভুল করত না। অপর পক্ষে এই নব আগন্তুকটিকে সকলেই রাজপুত্র বলে ভুল করত। তাঁর শরীর ছিল যেমন সুঠাম তেমনি বলিষ্ঠ, আর তাঁর মুখটি ছিল কুঁদে কাটা। টেনিস খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে, দাঁড় টানতে তাঁর জুড়ি বিলাতপ্রবাসী ভারত-বাসীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত না। তিনি বাঙালি হলেও, কোনো পাঞ্জাবি কি কাশ্মীরি যুবক রূপে-বলে তাঁর সমকক্ষ ছিল না। যাঁরা তাঁর চাইতে বলিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা কদাকার, আর যাঁরা তাঁর চাইতে সুন্দর ছিলেন তাঁরা নেহাত মেয়েলি। একমাত্র তাঁর শরীরেই বল ও রূপের রাসায়নিক যোগ হয়েছিল।

আমি চিরকালই রূপ ও শক্তির বিশেষ ভক্ত। কাজেই আমি দুদিনেই তাঁর একটি ভক্ত বন্ধু হয়ে উঠলুম। সত্য কথা বলতে গেলে আমার চেয়ে তাঁর বড়ো বন্ধু বিলেতে আর কেউ ছিল না। তাঁর আর-একটি মহা গুণ ছিল। তিনি যে কত সুপুরুষ আর কত বীরপুরুষ সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন। তিনি জীবনে কখনো এক ফোঁটা মদ খান নি, এক টান সিগারেট টানেন নি। কারণ

তিনি ডাক্তারদের মুখে শুনেছিলেন যে মদ ও তামাক শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

এ জাতীয় পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীজাতির হৃদয় জয় করবার ইচ্ছা অতি স্বাভাবিক। তিনিও তাই মনে ভাবতেন যে, তিনিও বিলাতে এসেছেন শুধু সে ভূ-ভাগের স্ত্রীরাজ্য জয় করতে। তাঁর কথা শুনে মনে হত যে তিনি এ বিষয়ে একজন দ্বিতীয় জুলিয়াস সিজার। অর্থাৎ স্ত্রীহৃদয় জয় করতে তাঁকে কোনোরূপ চেষ্টা করতে হত না, কোনোরূপ আয়াস পেতে হত না— আগাগোড়া ছিল Veni Vedi Veciর ব্যাপার। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের প্রতি তিনি একবার দৃষ্টিপাত করতেন, তার গলাতেই তিনি শিকল গছাতেন।

বন্ধুবরের ইংলণ্ডের নারীরাজ্য জয়ের কাহিনী কতদূর সত্য তা বলা অসম্ভব। সম্ভবত সে বিবরণের অনেক অংশ কাল্পনিক। বীরপুরুষদের আত্ম-কথা প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। আলেক্জাণ্ডার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, পৃথিবীতে জয় করবার মতো দেশ আর অবশিষ্ট নেই। কথাটা যে অত্যুক্তি সে বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই। তাই বলে তিনি যে একজন বীরপুরুষ ছিলেন এবং নানাদেশ জয় করেছিলেন একথা তো কেউ অস্বীকার করে না। সুতরাং বন্ধুবর যে গণ্ডা গণ্ডা Duchess-Countessদের প্রণয়-ডোরে শৃঙ্খলিত করেছিলেন, সে কথা না মানলেও আমি মানতে বাধ্য যে বিলেতের দাসী-চাকরানীরা তাঁকে দেখে চঞ্চল হয়ে উঠত। এ ঘটনা আমার চোখে দেখা। 'দাসী-চাকরানী' শুনে নাক সিঁটকাবেন না। মনে রাখবেন, তারাও স্ত্রীলোক আর তাদের অন্তরেও স্ত্রীলোকের হৃদয় আছে। আর তাদের হৃদয়ও এক নজরে কেড়ে নেওয়া কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। বন্ধুবর পদমর্যাদা দেখে প্রণয় করতেন না, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর সর্বভূতে সমদৃষ্টি ছিল। এ কথাটা বলে রাখা দরকার নচেৎ বন্ধুবরের লাঞ্ছনার ইতিহাসটি শুনে আপনারা মনে করতে পারেন যে তাঁর রুচি ছিল ইতর।

এ দেশের মতো বিলেতেও মেলা হয়। বিলেতের কোনো এক পাড়াগেঁয়ে শহরে তাঁর সঙ্গে আমি একবার একটি মেলা দেখতে যাই। গিয়ে দেখি সেখানে একটিও ভদ্রসন্তান নেই, আছে শুধু ছোটোলোকের ছেলে-মেয়েরা। ব্যাপার দেখে আমি সেখান থেকে অনতিবিলম্বে সরে পড়তে চেয়েছিলুম, কিন্তু বন্ধুবর তাতে কিছুতেই রাজি হলেন না। অত নারীসমাগম দেখে তাঁর বিজয়পিপাসা

এতটা প্রবল হয়েছিল যে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা আমার শক্তিতে কুলোলো না।

মেলা এ দেশে যেমন হয়ে থাকে, দেখলুম বিলেতেও প্রায় সেইরকমই হয়। দেদার ছোটোখাটো তাঁবু খাটিয়ে লোকে সব মণিহারীর দোকান পেতে বসে আছে; চার দিকে দেদার লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলি। ইতর শ্রেণীর যুবকরা পরস্পর চিৎকার করছে, কখনো-বা রঙ্গ ক'রে শেয়াল-কুকুর ডাকছে ও সেই শ্রেণীর যুবতীরা গিল্‌গিল্‌ করে হাসছে আর এ ওর গায়ে হেসে ঢলে পড়ছে। আমাদের মেলার সঙ্গে বিলেতি মেলার প্রভেদ এই যে, বিলেতে হাসাহাসি দৌড়াদৌড়ির মাত্রাটা একটু বেশি, কেননা সে দেশের লোকেরা আমাদের চাইতে একটু বেশি জীবন্ত। সে যাই হোক, অত ইতর লোকের সংঘর্ষটা আমার পক্ষে তেমন আরামজনক হয় নি। তাই আমি একটা নাগরদোলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। অবশ্য সে দোলায় চড়বার আমার প্রবৃত্তি হয় নি, ইতর জাতের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সঙ্গে একযোগে উৎসব করার অভ্যাস আমার ছিল না বলে। খানিকক্ষণ পরে দেখি বন্ধুবর লাফিয়ে গিয়ে নাগরদোলার এক চেয়ারে চড়ে বসলেন। তার পর লক্ষ্য করি তার পাশের চেয়ারে একটি যুবতী বসে আছেন, আর তার মাথায় একটা রুমাল বাঁধা, আর হাতে একগাছি চাবুক। এ যে কোন্‌ শ্রেণীর স্ত্রীলোক তা আমি ঠাওর করতে পারলুম না। মেয়েটি দেখতে ভদ্র-মহিলার মতো, কিন্তু বিলেতের কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে মাথায় রেশমের ফ্যাটা বেঁধে হাতে ঘোড়ার চাবুক নিয়ে এরকম জায়গায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। মনে করলুম, হয়তো কোনো ভদ্রমহিলা এই অদ্ভুত বেশ ধারণ করে গোপনে মেলা দেখতে এসেছেন এইজন্য যে কেউ তাকে চিনতে না পারে।

বন্ধুবরের দু মিনিটের মধ্যে উক্ত মহিলাটির সঙ্গে গলাগলি ভাব হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা ধরে তিনি ও তাঁর সঙ্গিনী নাগরদোলায় দুললেন। আর এই আধঘণ্টা ধরে দুজনে শুধু ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিলেন আর মৃদুমন্দ হাস্য করছিলেন। নাগরদোলা থেকে নেমে তাঁরা দুজনে সটান একটি খাবার দোকানে গিয়ে ঢুকলেন এবং তার পর সেখান থেকে ভূরিভোজন করে বেরিয়ে এলেন। অবশ্য খরচ সব বন্ধুবরের। ইতিমধ্যে দেখি তাঁদের বন্ধুত্ব খুব জমে গিয়েছে। কারণ এবার তাঁরা দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো হাত-ধরাধরি করে

বেড়াচ্ছেন। আমি অবশ্য দূর থেকেই তাঁদের love-making দেখছিলুম। হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য আমার চোখে পড়ল। দেখি, বন্ধুবর শূন্য মার্গে দুবার ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়লেন। অমনি তাঁর চার পাশে দেদার লোক জমে গেল। আমি ভিড় ঠেলে গিয়ে দেখি যে বন্ধুবর তখনো ভূমি-শয্যায় পড়ে রয়েছেন। আর উক্ত মহিলাটি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বন্ধুবরকে তুলতে যাচ্ছি দেখে ইংরাজ যুবতী আমাকে বললেন যে তুমি পারবে না, তোমার বন্ধু বেজায় ভারী, আমি একে তুলছি। এই বলে তিনি বন্ধুবরকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালেন, তার পর তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সেই আলিঙ্গনের অব্যবহিত পরে দেখি বন্ধুবর আবার শূন্য মার্গে উড্ডীন হয়েছেন। তার এক মুহূর্ত পরে বন্ধুবর আবার ডিগবাজি খেয়ে মাটির উপর পড়লেন; এবার মুখ থুবড়ে। আর রমণীটি এক লম্ফে গিয়ে তাঁর পিঠে আসোয়ার হয়ে তাঁকে চাবুক দিয়ে বেদম পিটতে লাগলেন। আমি ছুটে গিয়ে রমণীটিকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলুম। সে উত্তরে বললে যে, তোমার বন্ধুটি আমাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাতে চেয়েছে, তাই আমি প্রথমে তার পিঠে চড়েই ঘোড়ায় চড়তে শিখছি। আর ঘোড়া চলছে না বলেই তার উপর চাবুক চালাচ্ছি।

অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে বন্ধুবরের পিঠ থেকে সোয়ার নামালুম। আর, পাঁচজনে ধরাধরি করে তাঁকে খাড়া করলুম। দেখলুম, বন্ধুবরের হাত-পা কিছুই ভাঙে নি, শুধু পড়ার shockএ তিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন।

তাঁর এই অবস্থা দেখে রমণীটি আমাকে অতি ভদ্রভাবে বললে যে, "যদি তোমার বন্ধুটি আমাকে না বলতেন যে তাঁর মতো কুস্তিগীর ও তাঁর মতো ঘোড়সোয়ার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই তা হলে তাঁকে আর এই প্রকাশ্য লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত না। তিনি যে কত বড়ো কুস্তিগীর তার পরিচয় তো তোমরা পেয়েছ। আমার সঙ্গে বাঁও কস্‌তে গিয়েই তিনি দুবার দুবার শূন্যে ডিগবাজি খেয়েছেন। আর ঘোড়ায় চড়া কাকে বলে তা তোমাদের দেখাচ্ছি।

এই বলে তিনি গিয়ে ঘোড়ার দোলার একটি কাঠের ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চড়ে বসলেন। তার পর সে দোলা যখন বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরতে লাগল তখন দেখি তিনি তার উপর সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। তার পর তিনি এক

পায়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার উপর নৃত্য করতে লাগলেন, তার পর আকাশে লাফিয়ে উঠে জোড়া ডিগবাজি খেয়ে সেই ভ্রাম্যমাণ কাঠের অশ্বপৃষ্ঠে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকবৃন্দ আনন্দে চিৎকার করতে ও সজোরে করতালি দিতে লাগল।

বন্ধুবর অবাক হয়ে হাঁ করে এই ব্যাপার দেখতে লাগলেন। ব্যাপার তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এমন সময়ে পাশের একটি লোক বন্ধুবরকে বললেন, ঐ মেয়েটিকে চেনেন না? ও যে বিলেতের একটি প্রসিদ্ধ circus girl!

স্ত্রীলোক-কর্তৃক পুরুষনিগ্রহের এর চাইতে বড়ো ট্রাজেডি কেউ কখনো দেখেছেন না শুনেছেন?

কার্তিক ১৩৩১

গল্প লেখা

স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথন

"গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাবছ?"

"একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনো গল্প আসছে না, তাই বসে বসে ভাবছি।"

"এর জন্য আর এত ভাবনা কি? গল্প মনে না আসে, লিখো না।"

"গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কি না জানি নে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই।"

"কথাটা ঠিক বুঝলুম না।"

"আমি লিখে খাই, তাই inspirationএর জন্য অপেক্ষা করতে পারি নে। ক্ষিধে জিনিসটে নিত্য, আর inspiration অনিত্য।"

"লিখে যে কত খাও, তা আমি জানি। তা হলে একটা পড়া-গল্প লিখে দেও-না।"

"লোকে যে সে-চুরি ধরতে পারবে।"

"ইংরেজি থেকে চুরি-করা গল্প বেমালুম চালানো যায়।"

"যেমন ইংরেজকে ধুতি-চাদর পরালে তাকে বাঙালি বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়!"

"দেখো, এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙালির বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্ট প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।"

"অর্থাৎ ইংরেজও বাঙালির মতো আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্মমৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্‌ করে।"

"আর এই ছট্‌ফটানিকেই তো আমরা জীবন বলি।"

"তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিসটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্তত ছোটো গল্পে তো নয়ই। জীবনের ছোটো-বড়ো ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর, সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পারে যা নিত্য ঘটে, এ দেশে তা নিত্য ঘটে না।"

"এইখানেই তোমার ভুল। যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়?

যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।”

“এই তোমার বিশ্বাস ?”

“এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাতদুপুরে একটা পোড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম— আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে-সে রমণী নয়— একেবারে তিলোত্তমা! এরকম ঘটনা বাঙালির জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি— আর পড়েই যাব, যত দিন না কেউ এর চাইতেও বেশি অসম্ভব একটা গল্প লিখবে।”

“তা হলে তোমার মতে গল্পমাত্রই রূপকথা ?”

“অবশ্য।”

“ও দুয়ের ভিতর কোনো প্রভেদ নেই ?”

“একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোলো-আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব বলে মানি।”

“তা হলে বলি, ইংরেজি গল্পের বাঙলা করলে তা হবে রূপকথা।”

“অর্থাৎ বিলেতের লোক যা লেখে, তাই অলৌকিক।”

“অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা হতে পারে না কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা হতে পারে না বলে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।”

“আমি তো বাঙলা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি। তুমি এখন ইংরেজি গল্পের একটা উদাহরণ দাও।”

“আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড়ো গল্পের উদাহরণ; আমি দিচ্ছি একটি ছোটো লেখকের ছোটো গল্পের উদাহরণ।”

“অর্থাৎ যাকে কেউ লেখক বলে স্বীকার করে না, তার লেখার নমুনা দেবে ?— একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।”

“ভালোমন্দের প্রমাণ, জিনিসের ও মানুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মানিকের থানিকও ভালো।”

“এই বিলেতি অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মানিক বেরোয় ?”

“মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটি বেরোয়, এ কথা কালিদাস জানতেন।”

"এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার রত্ন বার করো।"

লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাত গরিব। কোথাও চাকরি না পেয়ে সে গল্প লিখতে বসে গেল। তার inspiration এল হৃদয় থেকে নয়— পেট থেকে। যখন তার প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হল তখন সমস্ত সমালোচকরা বললে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তার যে অন্তর্দৃষ্টি আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা পড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা বসে গেল যে, তাঁর চোখে এমন ভগবদ্দত্ত এক্স-রে আছে যার আলো স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তর পর্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তার পর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রী-হৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রী-হৃদয়ের একজন অদ্বিতীয় expert, আর ঐ ধরনের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদের বিশ্বাস জন্মে গেল যে, লেখক তাঁদের হৃদয়ের কথা সবই জানেন। তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গির মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পান। মেয়েরা যদি শোনে যে কেউ হাত দেখতে জানে, তাকে যেমন তারা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না— তেমনি বিলেতে সব বড়ো ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশের ও বেশের বিচিত্র রেখা ও রঙ সব দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোনো সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর কস্মিন্‌কালেও কোনো কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনাপাওনার হিসেবে তাঁর মনের খাতায় একদিনও অঙ্কপাত করে নি। তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দুটি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সংকোচে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন। ইংরেজ ভদ্রলোকেরা ডিনারে বসে যত না খায় তার চাইতে ঢের বেশি কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিস্টটি কথা কইতেন না— শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ওরকম চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় জীবনে কখনো চোখেও দেখেন নি। এর জন্য তাঁর স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। তারা ধরে নিলে যে, তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই, আর তাঁর নীরবতার কারণ তাঁর দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি একজন বড়ো

লেখক বলে গণ্য হলেন ; কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হতে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড়ো লেখক। তাই তিনি এমন কয়েকখানি নভেল লেখবার সংকল্প করলেন যা শেক্সপীয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে বসে লেখা যায় না ; কেননা লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন ; কেননা, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেকট্রিসিটিতে ভরপুর। এ যুগের য়ুরোপের সব বড়ো লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তারা সকলেই স্বীকার করে যে, তাদের যে-সব বই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, সে-সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধরলে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজি বেরোয়, জার্মানের হাত থেকে সুবোধ জার্মান, রাশিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাশিয়ান, ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেকট্রিসিটিতে পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তার মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁর masterpiece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিস্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল সবাই আর্টিস্ট— অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিস্ট হবার দিকে।

এই হবু-আর্টিস্টদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিস্টের চোখ পড়ল। তিনি আর-পাঁচজনের চাইতে বেশি সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তাদের তুলনায় ছিলেন ঢের বেশি জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশি, চলতেন বেশি, হাসতেন বেশি। তার উপর তিনি স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসংকোচে মেলামেশা করতেন, কোনোরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁর স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষজাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁর কোনোরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তাদের নয়ন-মন তাঁর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হত।

দু-চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি

হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগরা দেখলেই ভয়ে সংকোচে ও সম্ভ্রমে জড়োসড়ো হয়ে পড়তেন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং এদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হল, সে শুধু মেয়েটির গুণে।

নভেলিস্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালোবাসায় পরিণত হল। নভেলিস্টের বুক এতদিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল তিনিই অবলীলাক্রমে তা অধিকার করে নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাকল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটি মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্যে মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা করে সে কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এই স্ত্রী-হৃদয়ের বিশেষজ্ঞ এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারলেন না। শেষটায় বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি একদিন বিষণ্ণভাবে নভেলিস্টকে বললে যে, সে দেশে ফিরে যাবে— টাকার অভাবে; আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয়ে তাকে গিয়ে স্কুল-মিস্ট্রেস হতে হবে— পেটের দায়ে। তার সকল উচ্চ আশার সমাধি হবে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে, আর সকল আর্টিস্টিক শক্তি সার্থক হবে মুদিবাকালির মেয়েদের গ্রামার শেখানোতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিস্টের হৃদয়ঙ্গম হল না। দুদিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাসি-মুখে ইংলণ্ডে চলে গেল। কিছুদিন পরে সে ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। তাতে সে তার স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্তি করে লিখেছিল যে, সে চিঠি পড়ে নভেলিস্ট মনে মনে স্বীকার করলেন, মেয়েটি ইচ্ছে করলে খুব ভালো লেখক হতে পারে। নভেলিস্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি বসে ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোনো প্রত্যুত্তর এল না। এ দিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা করে করে ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটায় একদিন সে মন স্থির করলে যে, যা থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে। সেইদিনই সে প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চলে গেল। তার পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হল। গাড়ি থেকে নেমেই সে দেখলে যে, মেয়েটি পোস্ট-আপিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বললে, "তুমি এখানে?"

"তোমাকে একটি কথা বলতে এসেছি।"

"কি কথা?"

"আমি তোমাকে ভালোবাসি।"

"সে তো অনেক দিন থেকেই জানি। আর কোনো কথা আছে?"

"আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।"

"এ কথা আগে বললে না কেন?"

"এ প্রশ্ন করছ কেন?"

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কার সঙ্গে?"

"এখানকার একটি উকিলের সঙ্গে।"

এ কথা শুনে নভেলিস্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল।

"বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হল?"

"অবশ্য। এর পর ও গল্প আর কি করে টেনে বাড়ানো যেত?"

"অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে করলেই বলতে পারতেন যে, ভদ্রলোক প্রথমত থতমত খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' বলে চিৎকার করতে করতে মেয়েটির পিছনে ছুটতে লাগলেন, আর সেও খিল্‌খিল্ করে হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে লাগল। রাস্তায় ভিড় জমে গেল। তার পর এসে জুটল সেই সলিসিটর স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তার পর যবনিকাপতন।"

"তা হলে ও ট্রাজেডি তো কমেডি হয়ে উঠত।"

"তাতে ক্ষতি কি? জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্প-লেখকদের হাতে পড়ে সবই তো কমিক হয়ে ওঠে। যে তা বোঝে না, সেই তা পড়ে কাঁদে; আর যে বোঝে, তার কান্না পায়।"

"রসিকতা রাখো। এ ইংরেজি গল্প কি বাঙলায় ভাঙিয়ে নেওয়া যায়?"

"এরকম ঘটনা বাঙালি-জীবনে অবশ্য ঘটে না।"

"বিলেতি জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়— তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে?"

"এ গল্পের আসল ঘটনা যা, তা সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।"

"আসল ঘটনাটি কি ?"

"ভালোবাসব, কিন্তু বিয়ে করব না সাহসের অভাবে— এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।"

"বিয়ে ও ভালোবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনো দেখেছ, না শুনেছ ?"

"শোনবার কোনো প্রয়োজন নেই, দেখেছি দেদার।"

"আমি কখনো দেখি নি, তাই তোমার মুখে শুনতে চাই।"

"তুমি গল্পলেখক হয়ে এ সত্য কখনো দেখ নি, কল্পনার চোখেও নয় ?"

"না।"

"তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে।"

"খুব সম্ভবত তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে ?"

"এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যারা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসতে পারে না।"

"আমি ভেবেছিলুম, তুমি বলতে চাচ্ছ যে—"

"তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালোবাসার অমিল এ দেশেও যে হয় সে কথা তো এখন স্বীকার করছ ?"

"যাক ও-সব কথা। ও গল্প যে বাঙলায় ভাঙিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা তো মান ?"

"মোটেই না। টাকা ভাঙালে রুপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিস একই থাকে, শুধু তার ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে, তার হাতে ইংরেজি গল্প ঠিক বাঙলা হবে। ভালো কথা, তোমার ইংরেজি গল্পটার নাম কি ?"

"THE MAN WHO UNDERSTOOD WOMEN."

"এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙালি হতে পারবে। কারণ তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ The man who understands women."

"এই ঘণ্টাখানেক ধরে বকর্ বকর্ করে আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।"

"আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—"

"গল্প না, প্রবন্ধ?"

"একাধারে ও দুইই।"

"আর তা পড়বে কে, পড়ে খুশিই-বা হবে কে?"

"তারা, যারা জীবনের মর্ম বই পড়ে শেখে না, দায়ে পড়ে শেখে।"

"অর্থাৎ মেয়েরা।"

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

ভাববার কথা

কথারম্ভ

শ্রীকণ্ঠবাবু সেদিন তাঁর বৈঠকখানায় একা বসে গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দগোপালবাবু হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু ঘরের ভিতর জুতার শব্দ শুনে চমকে উঠে স্বমুখে আনন্দগোপালবাবুকে দেখে হাসিমুখে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "কে, আনন্দগোপাল? কলকাতায় কবে এলে? আমি ভেবেছিলুম কে না কে। এসো বোসো— খবর কি?"

"ভালো। তোমার খবর কি?"

"ভালো।"

"আমি ভেবেছিলুম, তেমন ভালো নয়।"

"কিসের জন্য?"

"তোমার মুখ দেখে। গালে হাত দিয়ে কি ভাবছিলে?"

"কিছুই ভাবছিলুম না, শুধু অবাক হয়ে বসে ছিলুম।"

"কিসে অবাক হলে?"

"আমার ছেলেটার কথাবার্তা শুনে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে।"

"কোন্ ছেলেটির?"

"যে ছেলেটা এবার বি. এল. পাস করেছে।"

"সে তো তোমার রত্ন ছেলে। দেহ-মনে ঠিক ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। মনে আছে আমরা যখন কলেজে পড়তুম তখন একটা ল্যাটিন বুলি শিখি— Mens sana in corpore sano। সেকালে আমাদের ধারণা ছিল, একাধারে অন্তত এ দেশে ও-দুই গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। কলেজে তোমার ছিল mens sana আর আমার corpore sano— তাই তো আমাদের দুজনের এত বন্ধুত্ব হল। তখন মনে হত, আমার দেহে যদি তোমার মন থাকত তা হলে পৃথিবীর কোনো নায়িকাই আমাকে দেখে স্থির থাকতে পারত না। এমন-কি, স্বয়ং ক্লিওপেট্রাও যদি আমাকে রাস্তায় দেখতে পেত তা হলে সেও তার প্রাসাদশিখর থেকে নক্ষত্রের মতো খসে এসে আমার বুকে

সংলগ্ন হয়ে Star of Indiaর মতো জলজল করত। কিন্তু আমার সেই যৌবনস্বপ্ন সাকার হয়েছে তোমার মধ্যমকুমার প্রফুল্লপ্রসূনে। তুমি যা সৃষ্টি করেছ তা একখানি মহাকাব্য ; তোমার এ কুমার— নবকুমারসম্ভব। আমি মনে করতুম, এ যুগে ওরকম সৃষ্টি অসম্ভব।"

"দেখো আনন্দ, তোমার এ-সব রসিকতা আজ ভালো লাগছে না।"

"আমি যে-সব কথা বলছি, তার ভাষা ঈষৎ রসিকতা-ঘেঁষা হলেও, আসলে সত্য কথা ; প্রফুল্ল যে এক পদাঘাতে বিলেতি চামড়ার ফুটবল বিলেতি সাহেবদের মাথার উপর দিয়ে পাখির মতো উড়িয়ে দেয়, এ কথা কে না জানে। তার পর ইউনিভারসিটির ভিতর যতগুলি বেড়া আছে, সবগুলোই সে টপ্ টপ্ করে ডিঙিয়ে গেল। এগজামিনেশনের এতাদৃশ hurdle jump বাঙলার কটি ফুটবল-খেলিয়ে করতে পারে ? শুধু তাই নয়, সে কবিতাও লেখে চমৎকার। সেদিন কল্লোল, কি কালিকলম, কি বেণু, কি বীণা, এই রকম একটা কাগজে প্রফুল্লর লেখা 'আকাঙ্ক্ষা-প্রসূন' বলে একটি কবিতা পড়লুম।"

"তুমি ও-সব ছাইপাঁশও পড় নাকি ?"

"পড়তে বাধ্য হই। থাকি পাড়াগাঁয়ে ; করি জমিদারি ; হাতে কাজ নেই আছে সময়। সেই সময় কাটাবার জন্যে ছেলেরা যত বই কেনে কিন্তু পড়ে না, সে সবই আমি পড়ি ; নচেৎ টাকাগুলো যে মাঠে মারা যায়। দেখো, এই সূত্রে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এ যুগে ইংরেজিতে যারা বই লেখে তারা একজনও ইংরেজ নয়, সব নরওয়ে সুইডেন ফিন্ল্যাণ্ড ও আইস্ল্যাণ্ডের লোক— আর সবাই জাতে বণ্ডি, তাদের সবারই উপাধি সেন। যথা— ইবসেন, হামসেন, বিয়র্নসেন ইত্যাদি। সে যাই হোক, তোমার ছেলের সে কবিতা পড়ে আমারও মনে আকাঙ্ক্ষার ফুল ফুটে উঠল। এ ফুলের স্পষ্ট কোনো রূপ নেই, আছে শুধু বর্ণ আর গন্ধ। আর সে গন্ধ এমনি নতুন যে, তা বুকের নাকে ঢুকলে নেশা হয়। সে গন্ধ ক্লোরোফরমের দাদা। ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসির চাইতে তা নিদ্রাকর্ষক। ও কবিতা দু-চার ছত্র পড়তে-না-পড়তে যে ঘুমিয়ে না পড়ে সে মানুষ নয়, দেবতা। আর 'সবুজ পত্রে' প্রফুল্লর লেখা একটা ছোটো গল্পও পড়েছি। এ গল্প আগাগোড়া আর্ট। সে তো গল্প নয়, নায়ক-নায়িকার হৃৎপিণ্ড নিয়ে অপূর্ব পিংপং-খেলা। সে হৃৎপিণ্ড দুটি এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবী স্পর্শ করে নি, বরাবর শূন্যেই ঝুলে

ছিল— সূর্য চন্দ্র যেমন আকাশে ঝুলে থাকে, পরস্পরের প্রেমের টানে। শেষটায় এ প্রেমের খেলার ফল হল draw।"

"দেখো আনন্দ, তোমার বয়েস হয়েছে, কিন্তু বাজে বকবার অভ্যাস আজও গেল না। বরং তোমার যত বয়েস বাড়ছে তত বেশি বাচাল হচ্ছ।"

"তোমার ছেলের প্রশংসা শুনলে তুমি খুশি হবে মনে করেই এত কথা বললুম। কোনো বাপ যে ছেলের গুণগান শুনে এলে যেতে পারে এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমার ছেলে যখন হারমোনিয়মে প্যাঁ পোঁ শুরু করে, তখন যদি কেউ বলে 'কেয়া মীড়' তা হলে তো আমি হাতে স্বর্গ পাই এই ভেবে যে, আমি তানসেনের বাবা।"

"তুমি যাকে প্রশংসা বলছ, তার বাঙলা নাম হচ্ছে ঠাট্টা। আর এ ঠাট্টার মানে হচ্ছে, প্রফুল্ল যে কি চীজ হয়েছে তা আমি বুঝি আর না বুঝি, তুমি ঠিক বুঝেছ। তোমার এ-সব রসিকতা আমার গায়ে বেশি করে বিঁধছে এই জন্যে যে, আমি সত্যই ভেবে পাচ্ছি নে— প্রফুল্ল fool না genius!"

"এ বড়ো কঠিন সমস্যা। Geniusএর সঙ্গে foolএর একটা মস্ত মিল আছে; উভয়েই born, not made। এ উভয়ের প্রভেদ ধরা বড়ো শক্ত। তাই সাহিত্য-সমালোচকেরা নিত্য geniusকে fool বলে ভুল করে, আর foolকে genius বলে।"

"Geniusএর সঙ্গে insanityর সম্বন্ধ কি সে মহাসমস্যা নিয়ে মাথা বকাচ্ছিলুম না।"

"তবে কিসের ভাবনা ভাবছিলে? দেখো, লোকে যাকে বলে ভাবনা, সেটা হচ্ছে আসলে ভাষার অভাব। Freud প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, repressed speech থেকেই মানুষের মনে যে রোগ জন্মায় তারই নাম চিন্তা। মন খুলে সব কথা বলে ফেলো— তা হলেই ভাবনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।"

"আমি ভাবছিলুম, আমার পুত্ররত্ন যা বললেন তা শুধু তাঁরই মুখের কথা, না, এ যুগের যুবকমাত্রেরই মনের কথা।"

"প্রফুল্ল কি বললে শোনা যাক; তা হলেই বুঝতে পারব, তা Vox dei কি Vox populi।"

"ব্যাপার কি হয়েছে বলছি, শোনো। আজ সকালে গীতা পড়ছিলুম;

একটা জায়গায় খটকা লাগল, তাই প্রফুল্লকে ডেকে পাঠালুম শ্লোকটার ঠিক মানে বুঝিয়ে দিতে।"

"গীতার অনেক কথায় মনে খটকা লাগে, কিন্তু সে-সব কথার তত্ত্ব অপরের মুখে শুনে বোঝবার জো নেই; অপরের কাজ দেখে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। যেমন আমি গীতার একটা বচনের হদিস পেয়েছি রায় ধর্মদাস ঘোষ বাহাদুরের জীবন পর্যালোচনা করে।"

"সে ভদ্রলোকটি কে?"

"তিনি, যিনি পাটের ভিতর-বাজারে ফট্‌কা খেলে ধনকুবের হয়েছেন।"

"তিনি কি একজন গীতাপন্থী?"

"যা বলছি তা শুনলেই বুঝতে পারবে।"

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন— এ বচনটা আমার বরাবরই রসিকতা বলে মনে হত। কুলিগিরি করব, কিন্তু মজুরি পাব না— আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত মন এ কথায় সায় দেয় না; বরং আমরা চাই, মজুরি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব, কিন্তু বসতে পেলে দাঁড়াব না, শুতে পেলে বসব না। কিন্তু ঘোষ বাহাদুর এই হিসেবে চলেছেন যে, অহর্নিশি দৌড়াদৌড়ি করে পয়সা কামাব, অথচ তার এক পয়সাও খরচ করব না; অর্থাৎ টাকা করবার তাঁর অধিকার আছে— মা ফলেষু কদাচন।"

"তোমার রসিকতা দেখছি আজ বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে।"

"রসিকতা আমি করছি, না, তুমি করছ? তুমি ফিলজফিতে এম. এ. আর প্রফুল্ল বটানিতে। গীতা তুমি বুঝতে পার না, আর প্রফুল্ল শুধু বুঝবে না— উপরন্তু বোঝাবে! লোকে যে বলে— মোগলপাঠান হদ্দ হল ফার্সি পড়ে তাঁতি— সে কথাটা রসিকতা, না, আর-কিছু?"

"দেখো, আমরা যেকালে কলেজে পড়তুম, সেকালে গীতার রেওয়াজ ছিল না। আমরা বিলেতি দর্শন পড়েই মানুষ হয়েছি, তাই তার অনেক কথায় খটকা লাগে। আর গীতা আজকাল সবাই পড়ছে; সাহেবরা পড়ছে, বাঙালি সাহেবরা পড়ছে, মেয়েরা পড়ছে, মাড়োয়ারিরা পড়ছে। ও-দর্শন এখন হাওয়ায় ভাসছে। এর থেকে অনুমান করেছিলুম যে, আমার ছেলে ও-দর্শনের ভিতর আমার চাইতে বেশি প্রবেশ করেছে— বিশেষত সে যখন গীতার বিষয় মিটিংয়ে বক্তৃতা করে।"

"কি বললে! প্রফুল্ল বাবাজি কি আবার ধর্মপ্রচার শুরু করেছে না কি?

আমি তো জানি সে এম. এ. বি. এল, তার উপরে সে sportsman, কবি, গল্পলেখক, পলিটিশিয়ান। উপরন্তু সে যে আবার বুদ্ধদেব ও যীশুখৃস্টের ব্যাবসা ধরেছে, তা তো জানতুম না। আজকালকার ছেলেরা কি চৌকোস, আর তাদের কি wide culture! এরা প্রতিজনে একাধারে খেলায় ইংরেজ, পড়ায় জর্মান, বুদ্ধিতে ফরাসী, প্রেমে ইটালিয়ান, পলিটিক্সে রাশিয়ান। ইংরেজরা আমাদের স্বরাজ দিলে, তা নেবে কে— এই ভাবনায় আমার রাত্রিতে ঘুম হত না। এখন সে দুশ্চিন্তা গেল। আজ থেকে ঘুমিয়ে বাঁচব।"

কথা-মধ্য

"দেখো স্বরাজ আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করে না বরং আমি ঘুমিয়ে পড়লেই স্বরাজ আমার কাছে আসে। কিন্তু প্রফুল্লর কথা ভেবে বোধ হয় আমার insomnia হবে। সে তোমার চাইতেও অদ্ভুত কথা বলে।"

"এটা অবশ্য ভয়ের কথা।"

"তুমি বল অদ্ভুত বাজে কথা, প্রফুল্ল বলে অদ্ভুত কাজের কথা।"

"তার কথা তবে শোনবার মতন।"

"তুমি তো কারো কথা শুনবে না, শুধু নিজে বকবে।"

"তুমি তোমাদের পরস্পরের কথোপকথন রিপোর্ট কর, আমি তা নীরবে শুনে যাব— যেমন নীরবে আমি খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ি।"

—আমি যখন তাকে শ্লোকটার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিতে বললেম, তখন সে অম্লান বদনে বললে, 'আমি গীতার এক বর্ণও পড়ি নি।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে তুমি সেদিন মিটিংয়ে গীতা সম্বন্ধে অমন চমৎকার বক্তৃতা করলে কি করে— যার রিপোর্ট আমি কাগজে পড়লুম।' প্রফুল্ল উত্তর করলে, 'গীতার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি আছে বলে।' 'যার বিন্দুবিসর্গ জান না, তার উপর তোমার অগাধ ভক্তি!' সে উত্তর করলে, 'ভক্তি জিনিসটা অজানার প্রতিই হয়।'

'কিরকম?'

'আপনি দেশের যত লোককে বড়োলোক বলে ভক্তি করেন, আপনি কি তাঁদের সবাইকে জানেন? আমি জানি আপনি তাঁদের কখনো চোখে দেখেন নি।'

'হাঁ, তা ঠিক; কিন্তু আমি তাঁদের বিষয় খবরের কাগজে পড়েছি, লোকের

মুখে শুনেছি।'

'আমিও গীতার বিষয় কাগজে পড়েছি ও লোকের মুখে শুনেছি।'

'তা হলে তোমার বক্তৃতা শুনে ও কাগজে তার রিপোর্ট পড়ে আর-পাঁচজন অজ্ঞ লোকের গীতার উপরে ভক্তি বাড়বে?'

'অবশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তো বক্তৃতা করা।'

'লোকের মনে ভক্তির এরকম মূলহীন ফুল ফোটাবার সার্থকতা কি?'

'ও হচ্ছে nation-buldingএর একটা পরীক্ষোত্তীর্ণ উপায়।'

'কি হিসেবে?'

'General Bernhardi বলেছেন যে, জর্মানীর গত যুদ্ধের মূলে ছিল জর্মান ন্যাশনালাজিম, আর সে ন্যাশনালাজিমের মূলে আছে কাণ্ট ও গেটে। আপনি কি বলতে চান কাণ্ট ও গেটের সঙ্গে বার্ন্হার্ডির বিশেষ পরিচয় ছিল?'

'না। তিনি যখন বলেছেন যে, গত যুদ্ধের জন্য দায়ী কাণ্ট এবং গেটে তখন যে তাঁর ও-দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনোরূপ পরিচয় নেই, তা নিঃসন্দেহ।'

'তা হলেও তিনি কাণ্টের দর্শনের ও গেটের কবিতার সারমর্ম বুঝেছিলেন। কাণ্টের সারকথা হচ্ছে agnosticism, আর গেটেরও তাই— গীতারও তাই।'

'মানছি যে agnosticismই হচ্ছে nation-buildingএর ভিত। কিন্তু গীতার ধর্ম যে agnosticism, এ কথা তোমাকে কে বললে?'

'এ যুগে যারা গীতা গুলে খেয়েছে, সেই-সব expertরা এ বিষয়ে একমত যে, গীতার প্রথম অংশে আছে utilitarianism, শেষ অংশে agnosticism, আর তার মধ্যভাগ প্রক্ষিপ্ত।'

'তোমার expert বন্ধুরা যে গীতা গুলে খেয়েছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে একাধারে মিল্ এবং স্পেন্সর—এ একটা নূতন আবিষ্কার বটে। তোমার expert গুরুরা আর-একটি সত্য আবিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছেন, সেটি হচ্ছে, যাঁর নাম বুদ্ধদেব তাঁর নামই বার্টাণ্ড রসেল। যাক ও-সব কথা। এখন দেখছি তোমাদের কালিদাসকেও প্রচার করতে হবে।'

'অবশ্য। আমি আসছে হপ্তায় কালিদাস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করব।'

'কোথায়?'

'Youngman's Hindu Associationএ।'

'অনুমান করছি, গীতার সঙ্গে তোমার পরিচয় যদ্রূপ, শকুন্তলার সঙ্গেও তোমার পরিচয় তদ্রূপ।'

'আগেই তো বলেছি যে, সংস্কৃত সাহিত্য আমরা জানি নে বলেই তার প্রতি আমাদের ভক্তি আছে, জানলে তার প্রতি আমাদের অভক্তি হত।'

'নিশ্চয়ই তাই হত। কারণ, তখন বুঝতে পারতে যে, মিল্ ও স্পেন্সর শ্রীকৃষ্ণের অবতার নন— ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ; এবং কিপলিং কালিদাসের প্রপৌত্র নন। এখন আমি জানতে চাই যে, পূর্বপুরুষের নামের দোহাই দিয়ে নতুন নেশান কি করে গড়বে; ও উপায়ে পুরোনোকেই আর টিঁকিয়ে রাখা দুষ্কর।'

'অর্থাৎ আমাদের নূতন সাহিত্য গড়তে হবে। এ জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ আছে। আমরা নূতন সাহিত্যই গড়ছি।'

'কি সাহিত্য তোমরা গড়ছ?'

'কাব্যসাহিত্য।'

'বুঝেছি, তোমরা আগে নব-গেটে হয়ে পরে নব-কাণ্ট হবে। পারম্পর্যের ধারাই এই— আগে কালিদাস পরে শংকর। তবে আমার ভয় এই যে, জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বড়ো কবি কি হতে পারবে?'

'দেখুন, জ্ঞান মানে তো যা অতীতে হয়ে গিয়েছে, তারই জ্ঞান। অতীতের দিকে পিঠ না ফেরালে আমরা ভবিষ্যৎ গড়তে পারব না।'

'আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক যে, কাব্যের সঙ্গে সরস্বতীর মুখ-দেখাদেখি নেই। কিন্তু তোমরা তো পলিটিক্স জিনিসটাকেও ঠেলে তুলতে চাও? আর তুমি কি বলতে চাও যে, জ্ঞানশূন্য না হলে পলিটিশিয়ান হওয়া যায় না?'

'কোন্ জ্ঞান পলিটিক্সের কাজে লাগে?'

'কিঞ্চিৎ হিস্টরির আর কিঞ্চিৎ ইকনমিক্সের, অর্থাৎ ইংরেজরা যাকে বলে factsএর।'

'আমরা যখন নতুন হিস্টরি ও নতুন ইকনমিক্স গড়তে চাচ্ছি, তখন পুরোনো হিস্টরি ও পুরোনো ইকনমিক্সের জ্ঞান আমাদের উন্নতির পথে শুধু বাধাস্বরূপ। আর factsএর জ্ঞান যে idealismএর প্রধান শত্রু, তা তো আপনি মানেন? আমরা এ ক্ষেত্রে করতে চাই শুধু idealismএর চর্চা—'

'Idealism জিনিসটে যে মস্ত জিনিস, তা আমিও স্বীকার করি; কিন্তু শুধু

ততক্ষণ— যতক্ষণ তা কথামাত্র থাকে। তাকে কাজে খাটাতে গেলেই তার মানে ধরা পড়ে।'

'আচ্ছা, একটা কাজের কথাই বলা যাক। রামকে কাউন্সিলে পাঠাতে হবে কিম্বা শ্যামকে, হিস্টরির জ্ঞান তার কি সাহায্য করবে? যার মনে idealism আছে, সেই শুধু রামের বদলে শ্যামের জন্য খাটতে প্রস্তুত।'

'এই ভোট জোগাড় করার ব্যাপারটার নাম idealism?'

'অবশ্য। এ কাজ করবার জন্য আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে শরীর ভাঙতে হয়; Vote for শ্যাম বলে চিৎকার করে গলা ভাঙতে হয়। আর যে কাজ করবার জন্য চাই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপাতন, তারই নাম তো idealism।'

'ধর্ম কাব্য পলিটিক্স সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যে সমান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার আইনের জ্ঞানও কি সমান?'

'আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে পারছি নে।'

'আমি জানতে চাই, আইন কিছু জান— কি জান না?'

'আইনের কতকগুলো কথা জানি, তার বেশি কিছু জানি নে।'

'তবে বি. এল. পাস করলে কি করে?'

'নোট মুখস্থ করে। বই পড়লে ফেল হতুম।'

'আইন কিছু না জেনে universityর পরীক্ষা তো পাস করলে; কিন্তু ঐ বিদ্যে নিয়ে আদালতের পরীক্ষা পাস করবে কি করে?'

'আদালতে পরীক্ষা করবে কে?'

'জজ-সাহেবরা।'

'আপনি বলতে চান, যারা জজ হয়, তারা সবাই আইন জানে? একালে যার পেটে বিদ্যে আছে, সে তো জজ হতে পারে না। সুতরাং একেলে জজের কাছে প্র্যাক্টিস্ করতে বিদ্যের দরকার নেই। পলিটিক্স ঠিক থাকলেই প্র্যাক্টিস ঠিক হবে।'

'কিরকম?'

'জজিয়তি লাভ করবার জন্য চাই নরম পলিটিক্স, আর প্র্যাক্টিস করবার জন্য গরম।'

'আর যার পলিটিক্স নরমও নয় গরমও নয়, তার কি হবে?'

'তার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।'

কথা-শেষ

শ্রীকণ্ঠবাবু অতঃপর বললেন যে, "এই-সব সদালাপের পর আমি প্রফুল্লকে বললুম, 'এখন এসো'।" এ কথা শুনে আনন্দগোপাল হেসে বললেন, "তার পরেই বুঝি তুমি দমে গেলে। আমি হলে তো উৎফুল্ল হয়ে উঠতুম।"

"কেন?"

"তোমার ছেলে genius।"

"কিসে বুঝলে?"

"তার মতামত শুনে।"

"এ-সব মতামতের ভিতর কি পেলে?"

"প্রথমত নূতনত্ব, দ্বিতীয়ত বিশ্বাস।"

"বিশ্বাস! কিসের উপর?"

"নিজের উপর।"

"নিজের উপর অগাধ এবং অটল বিশ্বাস তো প্রতি foolএরই আছে।"

"কিন্তু সে বিশ্বাস শুধু একের এবং সে এক হচ্ছে স্বয়ং fool, কিন্তু যার আত্মবিশ্বাসের নীচে জনগণ ঢেরা-সই দেয় সেই তো superman।"

"তবে তুমি ভাব যে প্রফুল্লর মতামত শুধু একা তার নয়, যুবকমাত্রেরই?"

"বহুর মনে যা অস্পষ্টভাবে থাকে, তাই যার মনে স্পষ্ট আকার ধারণ করে সেই তো যুগধর্মের অবতার। জ্ঞান ভক্তির বিরোধী— এ তো পুরোনো কথা। আর, তা যে কর্মেরও প্রতিবন্ধক, এই হচ্ছে নবযুগবাণী। এ বাণীর জোর প্রচারক হবে তোমার মধ্যম-কুমার।"

"কি কর্ম এরা করতে চায়?"

"একসঙ্গে সরস্বতী ও ইলেক্‌শানের বেগার খাটতে।"

"তাতে দেশের কি লাভ?"

"কোনো লোকসান নেই।"

"মূর্খতার চর্চায় কোনো লোকসান নেই?"

"যেমন তোমার-আমার মতো পাণ্ডিত্যের চর্চায় দেশের কোনো উপকার হয় নি, তেমন এদের তার অ-চর্চায় কোনো অপকার হবে না।

"তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত?"

"দেখো, তোমার-আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা বলবার অধিকার নেই। তুমি-আমি যথাসাধ্য যথাশক্তি জ্ঞানের চর্চা করেছি, অর্থাৎ বই পড়েছি। আর প্রফুল্ল তো বলেই দিয়েছে যে জ্ঞান মানে হচ্ছে অতীতের জ্ঞান। অতএব আমাদের মুখে শোভা পায় শুধু অতীতের কথা।"

"তুমি দেখছি প্রফুল্লর একজন শিষ্য হয়ে উঠলে!"

"তার কারণ আমি মডার্ন।"

"এর অর্থ?"

"আমি অতীতেরও ধার ধারি নে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্কা রাখি নে। মনোজগতে দিন আনি, দিন খাই— অর্থাৎ যা পাই পেটে পুরি; আমার পেটে সব যায় — প্রফুল্লরও কথা, গীতারও কথা।"

"তুমি দেখছি একজন মুক্তপুরুষ। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি পরলোকে স্বর্গ চায় না, সেই মুক্ত। তুমি দেখছি ইহলোকেও স্বর্গরাজ্য চাও না। অতএব পুরো মুক্ত।"

"দেখো শ্রীকণ্ঠ, ভবিষ্যতের আলোচনা করতে করতে কলকেটা নিজের ধোঁয়া নিয়ে ফুঁকেই নির্বাণপ্রাপ্ত হল। অতএব ভবিষ্যতের কথা এখন মুলতবি থাক। বর্তমানে আর-এক ছিলেম তামাক ডাকো।"

এ কথা শুনে শ্রীকণ্ঠ বাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাকরকে শিগ্‌গির তামাক দিতে বললেন। চাকরও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শিগ্‌গির কলকে বদলাতে গিয়ে সেটা উল্টে ফেললে, অমনি ফরাসে আগুন ধরে গেল। ধূম যে না-বলা-কওয়া অগ্নিতে পরিণত হবে, এ কথা কেউ ভাবে নি। তাই দুই বন্ধুতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গাত্রোত্থান করলে, আর তাঁদের আলোচনা বন্ধ হল।

শ্রাবণ ১৩৩৪

সম্পাদক ও বন্ধু

"দেখো সুরনাথ, তোমার কাগজের এ সংখ্যাটি তেমন সুবিধে হয় নি।"

"কেন বলো দেখি?"

"নিজেই ভেবে দেখো, তা হলেই বুঝতে পারবে। যখন সম্পাদকী করছ, তখন কোন্ লেখাটা ভালো, আর কোন্‌টা ভালো নয় তা নিশ্চয় বুঝতে পার।"

"অবশ্য লেখা বেছে নিতে না জানলে সম্পাদকী করি কোন্ সাহসে? এ সংখ্যায় কি আছে বলছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কালিদাস, মুণ্ড না জটিল', পি. সি. রায়ের 'খদ্দর-রসায়ন', বিনয় সরকারের 'নয়া টঙ্কা', সুনীতি চাটুজ্যের 'হারাপ্‌পার ভাষাতত্ত্ব', রাখাল বাঁড়ুজ্যের 'বঙ্গদেশের প্রাক্-ভৌগলিক ইতিহাস', বীরবলের 'অন্নচিন্তা', শরৎ চাটুজ্যের 'বেদের মেয়ে', প্রমথ চৌধুরীর 'উত্তর দক্ষিণ', ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'সংগীতের X-RAY', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'ইসলামের রসপিপাসা'— এ-সব লেখার কোনোটিরই কি মূল্য নেই!"

"আমি ও-সব দর্শন-বিজ্ঞান, হিস্টরি-জিওগ্রাফি, ধর্ম ও আর্ট প্রভৃতি বিষয়ের পণ্ডিতি প্রবন্ধের কথা বলছি নে। আর 'বেদের মেয়ে'র সঙ্গে তো আমি ভালোবাসায় পড়ে গিয়েছি। আর বীরবলের 'অন্নচিন্তা' পড়ে আমার চোখে জল এসেছিল।"

"তবে কোন্‌টিতে তোমার আপত্তি?"

"এবার কাগজে যে কবিতাটি বেরিয়েছে সেটি কি?"

"পিয়া ও পাপিয়া'র কথা বলছ? ও-কবিতার ত্রিপদী কি চতুষ্পদী হয়ে গিয়েছে? ওতে কবিতার মাল-মশলা কি নেই?"

"সবই আছে, নেই শুধু মস্তিষ্ক।"

"মস্তিষ্ক না থাক, হৃদয় তো আছে?"

"হৃদয়ের মানে যদি হয় 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', তা হলে অবশ্য ও-ছাইয়ের সে আধার আছে। ও-কবিতার পিয়া-পাপিয়ার কথোপকথন কার সাধ্য বোঝে, বিশেষত যখন ওর ভিতর পিয়াও নেই, পাপিয়াও নেই।"

"ও-দুটির কোনোটির থাকবার তো কোনো কথা নেই। কবির আজও বিয়ে হয় নি— তা তার পিয়া আসবে কোথ্‌থেকে? আর ছেলেটি অতি

সচ্চরিত্র— তাই কোনো অবিবাহিতা পিয়া তার কল্পনার ভিতরই নেই। আর সে জ্ঞান হয়ে অবধি বাস করছে হ্যারিসন্ রোডে, দিবারাত্র শুনে আস্‌ছে শুধু ট্রামের ঘড়ঘড়ানি— পাপিয়ার ডাক সে জন্মে শোনে নি। ও-পাড়ার কৃষ্ণদাস পালের ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রস্তরমূর্তি তো আর পাপিয়ার তান ছাড়ে না!"

"দেখো, এ-সব রসিকতা ছেড়ে দাও। যেমন কবিতার নাম, তেমনি কবির নাম। উক্ত মূর্তিযুগলও এ-দুটি নাম একসঙ্গে শুনলে হেসে উঠত, যদিচ হাস্যরসিক বলে তাদের কোনো খ্যাতি নেই।"

"কবির নাম তো অতুলানন্দ। এ নাম শুনে তোমার এত হাসি পাচ্ছে কেন?"

"এই ভেবে যে, ওরকম কবিতা সেই লিখতে পারে যার অন্তরে আনন্দ অতুল। যার অন্তরে আনন্দের একটা মাত্রা আছে, সে আর ছাপার অক্ষরে ও ভাবে পিউ পিউ করতে পারে না।"

"ও নামে তোমার আপত্তি তো শুধু ঐ 'অ' উপসর্গে?"

"হাঁ, তাই।"

"দেখো, ছোকরার বয়েস এখন আঠারো বছর। যখন ওর অন্নপ্রাশন হয়, নন্-কো-অপারেশনের বহু পূর্বে, তখন যদি ওর বাপ-মা ঐ উপসর্গটি ছেঁটে দিয়ে ওর নাম রাখতেন 'তুলানন্দ'— তা হলে দেশসুদ্ধ লোকও হেসে উঠত। এমন-কি, যমুনালাল বাজাজও হাসি সম্বরণ করতে পারতেন না।"

"তোমার এ কথা আমি মানি। কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি ছাপলে কেন? তুমি তো জান, ও রচনা সেই জাতের, যা না লিখলে কারো কোনো ক্ষতি ছিল না।"

"অতুলানন্দ যে রবীন্দ্রনাথ নয়, সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং ও কবিতাটি না ছাপলে কোনো ক্ষতি ছিল না।"

"তবে একপাতা কালি নষ্ট করলে কেন? কবিতার মতো ছাপার কালি তো সস্তা নয়।"

"কেন ছেপেছি, তা সত্যি বলব?"

"সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ কেন?"

"পাছে সে কথা শুনে তুমি হেসে ওঠ।"

"কথা যদি হাস্যকর হয়, অবশ্য হাসব।"

"ব্যাপারটা এক হিসেবে হাস্যকর।"

"অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? ব্যাপার কি?"

"অতুলের কবিতা না ছাপলে তার মা দুঃখিত হবে বলে।"

"আমি তো জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় পরীক্ষকেরা যে ছেলে গোল্লা পেয়েছে, বাপ-মার খাতিরে তার কাগজে শূন্যের আগে একটা ৯ বসিয়ে দেন। সাহিত্যেও কি মার্ক দেবার সেই পদ্ধতি?"

"না। সেইজন্যেই তো বলতে ইতস্তত করছি।"

"এ ব্যাপারের ভিতর গোপনীয় কিছু আছে নাকি?"

"কিছুই না; তবে যা নিত্য ঘটে না, সে ঘটনাকে মানুষে সহজভাবে নিতে পারে না। এই কারণেই সামাজিক লোকে এমন অনেক জিনিসের সাক্ষাৎ নিজের ও অপরের মনের ভিতর পায়, যে জিনিসের নাম তারা মুখে আনতে চায় না, পাছে লোকে তা শুনে হাসে। আমরা কেউ চাই নে যে, আর-পাঁচজনে আমাদের মন্দ লোক মনে করুক; আর সেই সঙ্গে আমরা এও চাই নে যে, আর-পাঁচজনে আমাদের অদ্ভুত লোক মনে করুক। প্রত্যেকে যে সকলের মতো, আমরা সকলে তাই প্রমাণ করতেই ব্যস্ত।"

"যা নিত্য ঘটে না, আর ঘটলেও সকলের চোখে পড়ে না, সেই ঘটনার নামই তো অপূর্ব, অদ্ভুত ইত্যাদি। অপূর্ব, মানে মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সত্য যা আমাদের পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে আমরা প্রথমেই মনে করি যে, তা ঘটে নি, কেননা, তা ঘটা উচিত হয় নি। আমাদের ঔচিত্যজ্ঞানই আমাদের সত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ধরো, তুমি যদি বল যে তুমি ভূত দেখেছ, তা হলে আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করব, আর যদি তা না করি তো মনে করব, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"তা তো ঠিক। যে যা বলে, তাই বিশ্বাস করবার জন্য নিজের উপর অগাধ অবিশ্বাস চাই। আর নিজেকে পরের কথার খেলার পুতুল মনে করতে পারে শুধু জড়পদার্থ, অবশ্য জড়পদার্থের যদি মন বলে কোনো জিনিস থাকে।"

"তুমি যেরকম ভণিতা করছ, তার থেকে আন্দাজ করছি, 'পিয়া ও পাপিয়া'র আবির্ভাবের পিছনে একটা মস্ত রোমান্স আছে।"

"রোমান্স এক বিন্দুও নেই। যদি থাকত, ইতস্তত করব কেন? নিজেকে রোমান্সের নায়ক মনে করতে কার না ভালো লাগে? বিশেষত তার, যার

প্রকৃতিতে romanticismএর লেশমাত্রও নেই? ও-প্রকৃতির লোক যখন একটা রোমান্টিক গল্প গড়ে তোলে তখন অসংখ্য লোক তা পড়ে মুগ্ধ হয়— কারণ, বেশির ভাগ লোকের গায়ে romanticismএর গন্ধ পর্যন্ত নেই। মানুষের জীবনে যা নেই, কল্পনায় সে তাই পেতে চায়। আর তার সেই ক্ষিধের খোরাক জোগায় রোমান্টিক সাহিত্য। যে গল্পের ভিতর মনের আগুন নেই, চোখের জল নেই, বাসনার উনপঞ্চাশ বায়ু নেই, আর যার অন্তে খুন নেই, আত্মহত্যা নেই, তা কি কখনো রোমান্টিক হয়? 'পিয়া ও পাপিয়া'র পিছনে যা আছে সে হচ্ছে সাইকোলজির একটি ঈষৎ বাঁকা রেখা। আর সে বাঁক এত সামান্য যে সকলের তা চোখে পড়ে না, বিশেষত ও-রেখার গায়ে যখন কোনো ডগডগে রঙ নেই। এইজন্যই তো ব্যাপারটি তোমাকে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে। এ ব্যাপারের ভিতর যদি কোনো নারীর হরণ কিম্বা বরণ থাকত, তা হলে তো সে বীরত্বের কাহিনী তোমাকে স্ফূর্তি করে বলতুম।"

"তোমার মুখ থেকে যে কখনো রোমান্টিক গল্প বেরুবে, বিশেষত তোমার নিজের সম্বন্ধে, এ দুরাশা কখনো করি নি। তোমাকে তো কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে জানি। তুমি যে সেন্টিমেন্টের কতটা ধার ধারো তা তো আমার জানতে বাকি নেই। তুমি মুখ খুললেই যে মনের চুল চিরতে আরম্ভ করবে, এতদিনে কি তাও বুঝি নি? মানুষের মন জিনিসটিকে তুমি এক জিনিস বলে কখনোই মান নি। তোমার বিশ্বাস, ও এক হচ্ছে বহুর সমষ্টি। তোমার ধারণা যে, মনের ঐক্য মানে তার গড়নের ঐক্য। মনের ভিতরকার সব রেখা মিলে তাকে একটা ধরবার ছোঁবার মতো আকার দিয়েছে। আর এ-সব রেখাই সরল রেখা। তুমিও যে মানসিক বঙ্কিম রেখার সাক্ষাৎ পেয়েছ, এ অবশ্য তোমার পক্ষে একটা নতুন আবিষ্কার। এ আবিষ্কারকাহিনী শোনবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে, অবশ্য সে কৌতূহল scientific কৌতূহল মনে কোরো না, তোমার মনের গোপন কথা শোনবার জন্য আমি উৎসুক।"

"ব্যাপারটা তোমাকে সংক্ষেপে বলছি। শুনলেই বুঝতে পারবে যে এর ভিতর আমার নিজের মনের কোনো কথাই নেই— সরলও নয়, কুটিলও নয়। এখন শোনো।—

"ব্যাপারটা অতি সামান্য। আমি যখন কলেজ থেকে এম. এ. পাস করে বেরোই তখন অতুলের মার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। প্রস্তাবটি

অবশ্য কন্যাপক্ষ থেকেই এসেছিল। আমার আত্মীয়রা তাতে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের আপত্তির কোনো কারণ ছিল না, কেননা, ও পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুকাল থেকে চেনা-শোনা ছিল। ও পক্ষের কুলশীলের কোনো খুঁত ছিল না, উপরন্তু মেয়েটি দেখতে পরমা সুন্দরী না হলেও সচরাচর বাঙালি মেয়ে যেরকম হয়ে থাকে তার চেয়ে নিরেস নয় বরং সরেস, কারণ তার স্বাস্থ্য ছিল, যা সকলের থাকে না। আমার গুরুজনরা এ প্রস্তাবে আমার মতের অপেক্ষা না রেখেই তাঁদের মত দিয়েছিলেন। তাঁরা যে আমার মত জানতে চান নি তার একটি কারণ— তাঁরা জানতেন যে, মেয়েটি আমার পূর্ব-পরিচিত। 'ওর চেয়ে ভালো মেয়ে পাবে কোথায় ?'— এই ছিল তাঁদের মুখের ও মনের কথা। আমার মত জানতে চাইলে তাঁরা একটু মুশকিলে পড়তেন। কারণ আমি তখন কোনো বিয়ের প্রস্তাবে সহজে রাজি হতুম না, সুতরাং ও প্রস্তাবেও নয়। হুড়কো মেয়ে যেমন স্বামী দেখলেই পালাই-পালাই করে, আমার মন সেকালে তেমনি স্ত্রী-নামক জীবকে কল্পনার চোখে দেখলেও পালাই-পালাই করত। তা ছাড়া সেকালে আমার বিবাহ করা আর জেলে যাওয়া দুইই এক মনে হত। ও কথা মনে করতেও আমি ভয় পেতুম। তুমি মনে ভাবছ যে, আমার এ কথা শুধু কথার কথা ; একটা সাহিত্যিক খেয়াল মাত্র। আমি যে ঠিক আর-পাঁচজনের মতো নই, তাই প্রমাণ করবার জন্য এ-সব মনের কথা বানিয়ে বলছি ; সাহিত্যিকদের পূর্বস্মৃতির মতো এ পূর্বস্মৃতিও কল্পনা-প্রসূত। কেননা, আমিও গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই গৃহস্থ হয়েছি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, মানুষের মৃত্যুভয় আছে বলে মানুষে মৃত্যু এড়াতে পারে না— পারে শুধু কষ্টে-সৃষ্টে মৃত্যুর দিন একটু পিছিয়ে দিতে। আর মজা এই যে, যার মৃত্যুভয় অতিরিক্ত সে যে ও ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করে, এর প্রমাণও দুর্লভ নয়। অজানা জিনিসের ভয় জানলে দেখা যায় ভুয়ো।

"সে যাই হোক, এই বিয়ে ভেঙে গেল। আমিও বাঁচলুম। কেন ভেঙে গেল শুনবে ? মেয়ের আত্মীয়রা খোঁজ-খবর করে জানতে পেলেন যে, আমি নিঃস্ব— অর্থাৎ আমাদের পরিবারের বা'র-চটক দেখে লোকে যে মনে করে যে সে-চটক রুপোর জলুস, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা ঠিক। আমার বাপ-খুড়োরা কেউ পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারের প্রসাদে বাবুগিরি করেন

নি, আর তাঁরা বাবুগিরি করতেন বলেই ছেলেদের জন্যও ধন সঞ্চয় করতে পারেন নি। আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার। কন্যাপক্ষের মতে এরকম পরিবারে মেয়ে দেওয়া আর তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া দু'ই সমান।

"আমাদের আর্থিক অবস্থার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লতিকার আত্মীয়-স্বজন আমার চরিত্রের নানারকম ত্রুটিরও আবিষ্কার করলেন। আমি নাকি গানবাজনার মজলিসে আড্ডা দিই, গাইয়ে-বাজিয়ে প্রভৃতি চরিত্রহীন লোকদের সহবত করি; পান খাই, তামাক খাই, নস্যি নিই, এমন-কি, Blue Ribbon Societyর নাম-লেখানো মেম্বার নই। এক কথায় আমি চরিত্রহীন।

"আমার নামে লতিকার পরিবার এই-সব অপবাদ রটাচ্ছে শুনে আমার গুরুজনেরাও মহা চটে গেলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে আমাকে ভালোমন্দ বলবার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, অপর কারও নেই; বিশেষত আমার ভাবী শ্বশুরকুলের তো মোটেই নেই। ছোটোকাকা ওদের স্পষ্টই বললেন যে, 'শ্যাম্পেন তো আর গোরুর জন্য তৈরি হয় নি, হয়েছে মানুষের জন্য, আর আমাদের ছেলেরা সব মানুষ, গোরু নয়।' ভাঙা প্রস্তাব জোড়া লাগবার যদি কোনো সম্ভাবনা থাকত তো ছোটোকাকার এক উক্তিতেই তা চুরমার হয়ে গেল। আমি আগেই বলেছি যে, এ বিয়ে ভাঙাতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সেই সঙ্গে সব পক্ষই মনে করলেন যে, আপদ শান্তি। তবে শুনতে পেলুম যে, একমাত্র লতিকাই প্রসন্ন হয় নি। কোনো মেয়েই তার মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিলে খুশি হয় না। উপরন্তু আমার নিন্দাবাদটা তার কানে মোটেই সত্যি কথার মতো শোনায় নি। যখন বিয়ের প্রস্তাব এগোচ্ছিল, তখন বাড়িতে আমার অনেক গুণগান সে শুনেছে। দুদিন আগে যে দেবতা ছিল, দুদিন পরে সে কি করে অপদেবতা হল, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারলে না। কারণ, তখন তার বয়েস মাত্র ষোলো— আর সংসারের কোনো অভিজ্ঞতা তার ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়ে হল না বলে সে দুঃখিত হয় নি, কিন্তু আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে মনে করে সে বিরক্ত হয়েছিল।

"লতিকার আত্মীয়েরা আমার চরিত্রহীনতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই

আর-একটি সচ্চরিত্র যুবককে আবিষ্কার করলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে ভাঙবার এক মাস পরেই সরোজরঞ্জনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়ে গেল। এতে আমি মহা খুশি হলুম। সরোজকে আমি অনেক দিন থাকতে জানতুম। আমার চাইতে সে ছিল সব বিষয়েই বেশি সৎপাত্র। সে ছিল অতি বলিষ্ঠ, অতি সুপুরুষ, আর এগজামিনে সে বরাবর আমার উপরেই হত। সরোজের মতো ভদ্র আর ভালো ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। উপরন্তু তার বাপ রেখে গিয়েছিলেন যথেষ্ট পয়সা। আমার যদি কোনো ভগ্নী থাকত তা হলে সরোজকে আমার ভগ্নীপতি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতুম। বিধাতা তাকে আদর্শ জামাই করে গড়েছিলেন।

"আমি যা মনে ভেবেছিলুম, হলও তাই। সরোজ তার স্ত্রীকে অতি সুখে রেখেছিল। আদর-যত্ন অন্ন-বস্ত্রের অভাব লতিকা একদিনের জন্যও বোধ করে নি। এক কথায় আদর্শ স্বামীর শরীরে যে-সব গুণ থাকা দরকার, সরোজের শরীরে সে-সবই ছিল। দাম্পত্যজীবন যতদূর মসৃণ ও যতদূর নিষ্কণ্টক হতে পারে, এ দম্পতির তা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহের দশ বৎসর পরেই লতিকা বিধবা হল। সরোজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকারি চাকরি করত। অল্পদিনের মধ্যেই চাকরিতে সে খুব উন্নতি করেছিল। ইংরেজি সে নিখুঁতভাবে লিখতে পারত, তার হাতের ইংরেজির ভিতর একটিও বানান ভুল থাকত না, একটিও আর্ষ প্রয়োগ থাকত না। এক হিসেবে তার ইংরেজি কলমই ছিল তার উন্নতির মূল। যদি সে বেঁচে থাকত তা হলে এতদিনে সে বড়ো কর্তাদের দলে ঢুকে যেত। বুদ্ধিবিদ্যার সঙ্গে যার দেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে, সে যাতে হাত দেবে তাতেই কৃতকার্য হতে বাধ্য। লতিকা একটি আট বছরের ছেলে নিয়ে দেশে ফিরে এল।

"এর পর থেকেই তার অন্তরে যত স্নেহ ছিল, সব গিয়ে পড়ল তার ঐ একমাত্র সন্তানের উপর। ঐ ছেলে হল তার ধ্যান ও জ্ঞান। ঐ ছেলেটিকে মানুষ করে তোলাই হল তার জীবনের ব্রত।

"এ পর্যন্ত যা বললুম, তার ভিতর কিছুই নূতনত্ব নেই। এ দেশে, এবং আমার বিশ্বাস অপর দেশেও, বহু মায়ের ও-অবস্থায় একই মনোভাব হয়ে থাকে। তবে লতিকা তার ছেলেকে শুধু মানুষ করে তুলতে চায় না, চায় অতি-মানুষ করতে। আর এ অতি-মানুষের আদর্শ কে জান? শ্রীসুরনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরফে আমি। এ কথা শুনে হেসো না। সে তার ছেলেকে পান-তামাক খেতে শেখাতে চায় না, সেই শিক্ষা দিতে চায় যাতে সে আমার মতো সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে। লতিকাকে তার স্বামী কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে তাকে বুঝিয়েছিল যে, সুরনাথ যা লিখেছে, তার চাইতে সে যা লেখে নি, তার মূল্য ঢের বেশি। অর্থাৎ আমি যদি আলসে না হতুম তো দশ ভল্যুম হিস্‌ট্রি লিখতে পারতুম, আর না হয় তো পাঁচ ভল্যুম দর্শন। আমার ভিতর নাকি যে শক্তি ছিল তার আমি সদ্‌ব্যবহার করি নি; এই কারণে সে মনে করে, আমিই হচ্ছি ওস্তাদ সাহিত্যিক। ফলে তার ছেলের সাহিত্যিক শিক্ষার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। আর এই ছেলেটির নাম অতুলানন্দ। আমি জানি সে কখনো সাহিত্যিক হবে না, অন্তত আমার জাতের বাজে সাহিত্যিক হবে না। কারণ ছেলেটি হচ্ছে হুবহু সরোজের দ্বিতীয় সংস্করণ। সেই নাক, সেই চোখ, সেই মন, সেই প্রাণ! এ ছোকরা কর্মক্ষেত্রে বড়োলোক হতে পারে, কিন্তু কাব্যজগতে এর বিশেষ কোনো স্থান নেই। সরোজের মতো এরও মন বাঁধা ও সোজা পথ ছাড়া গলিঘুঁজিতে চলতে চায় না। এর চরিত্রে ও মনে বেতালা বলে কোনো জিনিস নেই। আমার ভয় হয় এই যে, এর মনের ছন্দকে আমি শেষটা মুক্ত-ছন্দ না করে দিই। কারণ, তা-হলে অতুল আর সে মুক্তির তাল সামলাতে পারবে না। হাঁটা এক কথা, আর বাঁশবাজি করা আলাদা। কিন্তু অতুলকে এক ধাক্কায় সাহিত্যজগৎ থেকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ তা করতে গেলে লতিকার মস্ত একটা illusion ভেঙে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরেও অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার স্ত্রী হচ্ছেন লতিকার বাল্যবন্ধু ও প্রিয়সখী। অতুলকে সরস্বতী ছেড়ে লক্ষ্মীর সেবা করতে বললে আমাকে দুবেলা এই কথা শুনতে হবে যে, পরের জন্যে কিছু করা আমার ধাতে নেই। তাই নানাদিক ভেবেচিন্তে আমি তাকে কবিতা-রচনায় লাগিয়ে দিলুম। জানতুম ও বাঁধা ছন্দে, বাঁধি গতে যা-হয়-একটা-কিছু খাড়া করে তুলবে। এই হচ্ছে 'পিয়া ও পাপিয়া'র জন্মকথা। এ কবিতা ছাপার অক্ষরে ওঠবার ফলে লতিকা ওকে পাঁচশো টাকা দিয়ে এক সেট শেক্সপিয়ার কিনে দিয়েছে। মনে ভেবো না যে, অতুলের মায়ের খাতিরে আমি তার মাথা খাচ্ছি। ও ছেলের মাথা কেউ খেতে পারবে না। অতুলের ভিতর কবিত্ব

না থাক্ মনুষ্যত্ব আছে, আর সে মনুষ্যত্বের পরিচয় ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেবে। ও যখন জীবনে নিজের পথ খুঁজে পাবে, তখন কবিতা লেখবার বাজে শখ ওর মিটে যাবে। আর, তখনো যদি ওর কলম চালাবার ঝোঁক থাকে তো আমি যা লিখি নি— কেননা লিখতে পারি নি— ও তাই লিখবে ; অর্থাৎ হয় দশ ভল্যুম ইতিহাস, নয় পাঁচ ভল্যুম দর্শন। পদ্য লেখার মেহন্নতে ওর গদ্যের হাত তৈরি হবে।

"ওর অন্তরে যে কবিত্ব নেই, তার কারণ ওর বাপের অন্তরে তা ছিল না, ওর মার অন্তরেও তা নেই— অবশ্য কবিত্ব মানে যদি sentimentalism হয়।

"এখন যে কথা থেকে শুরু করেছিলুম সেই কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আমার প্রতি লতিকার এই অদ্ভুত শ্রদ্ধার মূলে কি আছে ? এ মনোভাবের রূপই বা কি, নামই বা কি ? একে ঠিক ভক্তিও বলা যায় না, প্রীতিও বলা যায় না। সুতরাং এ হচ্ছে ভক্তি ও প্রীতি -রূপ মনের দুটি সুপরিচিত মনোভাবের মাঝামাঝি সাইকোলজির একটি বাঁকা রেখা।

"আর এ যদি ভক্তিমূলক প্রীতি অথবা প্রীতিমূলক ভক্তি হয়, তা হলেও সে ভক্তি-প্রীতি কোনো রক্তমাংসে-গড়া ব্যক্তির প্রতি নয়, অর্থাৎ ও মনোভাব আমার প্রতি নয় ; কিন্তু লতিকার মগ্ন-চৈতন্যে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে যে কাল্পনিক সুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে উঠেছে, তারই প্রতি— অর্থাৎ একটা ছায়ার প্রতি, যে ছায়ার এ পৃথিবীতে কোনো কায়া নেই। আমি শুধু তার উপলক্ষ মাত্র। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, তার মনে আমার প্রতি এই অমূলক ভক্তির মূলে আছে আমার প্রতি তার আত্মীয়-স্বজনের সেকালের সেই অযথা অভক্তি। এ হচ্ছে সেই অপবাদের প্রতিবাদ মাত্র। এ প্রতিবাদ তার মনে তার অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। দেখছ এর ভিতর কোনো রোমান্স নেই, কেননা, এর ভিতর যা আছে, সে মনোভাব অস্পষ্ট— অতুলের মধ্যস্থতাই একমাত্র স্পষ্ট জিনিস।"

"রোমান্স নেই সত্য, কিন্তু এই একই ব্যাপারের ভিতর ট্রাজেডি থাকতে পারে।"

"কিরকম ?"

"আমি এইরকম আর-একটি ব্যাপার জানি, যা শেষটা ট্রাজেডিতে

পরিণত হয়েছিল। আজ থাক্, সে গল্প আর-এক দিন বলব। কত ক্ষুদ্র ঘটনা মানুষের মনে যে কত বড়ো অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তা সে গল্প শুনলেই বুঝতে পারবে।"

ভাদ্র ১৩৩৪

পূজার বাল

উকিল অবশ্য আমরা সবাই হই পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না। তবুও যে আমরা অনেকেই ও ব্যাবসার মায়া কাটাতে পারি নে তার কারণ, ও ব্যাবসার টান শুধু টাকার টান নয়। আমাদের ভিতর যাঁদের মন পলিটিক্সের উপর পড়ে আছে, তাঁরা জানেন যে, বার-লাইব্রেরির তুল্য পলিটিক্সের স্কুল ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। ও স্কুলে ঢুকলে আমরা যে জুনিয়ার পলিটিক্সের হাড়হদ্দর সন্ধান পাই, শুধু তাই নয় সেইসঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল মেজাজও নিত্য তর্ক-বিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডার ফলে সপ্তমে চড়ে থাকে। এ স্কুলের আর-এক মহাগুণ এই যে, এখানে কোনো ছাত্র নেই, সবাই শিক্ষক; জায়গাটা হচ্ছে, এ কালের ভাষায় যাকে বলে, পুরো ডিমোক্রাটিক। মিটিং তো এখানে নিত্য হয়, উপরন্তু freedom of speech এ ক্ষেত্রে অবাধ। তার পর যাঁদের মন পলিটিক্যাল নয়— সাহিত্যিক, তাঁরাও উকিলের বার-লাইব্রেরিতে ঢুকলেই দেখতে পাবেন যে, এতাদৃশ গল্পের আড্ডা দেশে অন্যত্র খুঁজে পাওয়া ভার। উকিলমহলে একদিনে যে-সব গল্প শোনা যায় তাতে অন্তত বারোখানা মাসিকপত্রের বারোমাস পেট ভরানো যায়।

পৃথিবীর মানুষের দুটিমাত্র ক্রিয়াশক্তি আছে— এক বল, আর এক ছল। মানুষ যে কত অবস্থায় কত ভাবে কত প্রকার বল-প্রয়োগ করে তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই-সব উকিলের কাছ থেকে যাঁরা ফৌজদারি আদালতে প্র্যাকটিস্‌ করেন; আর non-violent লোকেরা যে কত অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল প্রয়োগ করেন তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই-সব উকিলের কাছ থেকে— যাঁরা দেওয়ানি আদালতে প্র্যাকটিস্‌ করেন।

আমি জনৈক ফৌজদারি উকিলের মুখে একটি গল্প শুনেছি, সেটি আপনারা শুনলেও বলবেন যে, হাঁ, এটি একটি গল্প বটে। আমার জনৈক উকিলবন্ধু উত্তরবঙ্গের কোনো জিলাকোর্টে একটি খুনী মামলায় আসামীকে defend করেন। কিন্তু তাকে তিনি খালাস করতে পারেন নি। জুরী আসামীকে একমত হয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর জজ-সাহেব তার উপর ফাঁসির হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে ফাঁসির বদলে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ।

আমার উকিল বন্ধুটির দেশে criminal lawyer বলে খ্যাতি আছে। এর থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, জীবনে তিনি বহু অপরাধীকে খালাস করেছেন আর বহু নিরপরাধকে জেলে পাঠিয়েছেন। খুনী মামলার আসামীর প্রাণরক্ষা না করতে পারলে প্রায় সব উকিলই ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েন; বোধ হয় তাঁরা মনে করেন যে, বেচারার অপঘাতমৃত্যুর জন্য তাঁরাও কতক পরিমাণে দায়ী। এ ক্ষেত্রে আমার বন্ধু গলার জোরে আসামীর গলা বাঁচিয়েছিলেন, তবুও তার দ্বীপান্তর-গমনে তাঁর পুত্রশোক উপস্থিত হয়েছিল। এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি এ মামলার কথা উঠলেই রাগে ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়তেন; তখন তাঁর বড়ো বড়ো চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠত আর তার ভিতর থেকে বড়ো বড়ো ফোঁটায় জল পড়ত। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ আর জজসাহেব যদি টিফিনের— পরে নয়— পূর্বে জুরীকে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে জুরী একবাক্যে আসামীকে not guilty বলত। জজ-সাহেব নাকি টিফিনের সময় অতিরিক্ত হুইস্কি পান করেছিলেন এবং তার ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সব ঘুলিয়ে ফেলেছিলেন।

মামলায় হারলেই সে হারের জন্য উকিলমাত্রই জজের বিচারের দোষ ধরেন— যেমন পরীক্ষায় ফেল হলে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরে। সেই জন্য আমি আমার বন্ধুর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আসামীর প্রতি অনুরাগই তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কারণ, সে ছিল প্রথমত ব্রাহ্মণের ছেলে, তার পর জমিদারের ছেলে, তার উপর সুন্দর ছেলে, উপরন্তু কলেজের ভালো ছেলে। এরকম ছেলে যে কাউকে খুন-জখম করতে পারে, এ কথা আমার বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি— তাই তিনি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ঘটনাটি আমরা পাঁচজন একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কারণ, সংসারের নিয়মই এই যে, পৃথিবীর পুরানো ঘটনা সব ঢাকা পড়ে নব নব ঘটনার জালে, আর আদালতে নিত্য নব ঘটনার কথা শোনা যায়। উক্ত ঘটনার বছর-পাঁচেক পরে আমার বন্ধুটি একদিন বার-লাইব্রেরিতে এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন যে, এখানি মন দিয়ে পড়ো কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে কিছু বোলো না। সেদিন আমার বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে

বুঝতে পারলুম না যে, তাঁর মনের ভিতর কি ভাব বিরাজ করছে— আনন্দ, না মর্মান্তিক দুঃখ? শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলুম যে, একটা ভয়ের চেহারা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। চিঠির দিকে তাকিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল যে, তার উপরে কোনো ডাকঘরের ছাপ নেই। তাই মনে হয়েছিল যে, এখানি কোনো স্ত্রীলোকের চিঠি— যে চিঠি সে তাঁকে দেবার সুযোগ অথবা সাহস পায় নি। এরকম সন্দেহ হবার প্রধান কারণ এই যে, আমার বন্ধু আমাকে এ পত্রের বিষয়ে নীরব থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তার পর যখন লক্ষ্য করলুম যে, শিরোনামা অতি সুন্দর পরিষ্কার ও পাকা ইংরাজি অক্ষরে লেখা, তখন সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। আমি লাইব্রেরির একটি নিভৃত কোণে একখানি চেয়ারে বসে সেখানি এইভাবে পড়তে শুরু করলুম— যেন সেখানি কোনো briefএর অংশ। ফলে কেউ আর আমার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে সেটি দেখবার চেষ্টা করলে না। উকিল-সমাজের একটা নীতি অথবা রীতি আছে, যা সকলেই মান্য করে, সকলেই পরের ব্রিফকে পরস্ত্রীর মতো দেখে, অর্থাৎ কেহই প্রকাশ্যে তার দিকে নজর দেয় না।

সে চিঠিখানি নেহাত বড়ো নয়, তাই সেখানি এতদিন পরে প্রকাশ করছি। পড়ে দেখলেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবেন।

আন্দামান

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দেশ থেকে যখন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসি, তখন নানারকম দুঃখে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার ভিতর একটি প্রধান দুঃখ ছিল এই যে, আসবার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আসতে পারি নি। আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্য সত্যই অপূর্ব। আমি জানতুম যে, উকিল-ব্যারিস্টাররা মামলা লড়ে পয়সার জন্য, এবং তারা তাদের কতর্ব্যটুকু সমাধা করেই খালাস— মামলার ফলাফল তাদের মনকে তেমন স্পর্শ করে না। এ ক্ষেত্রে পরিচয় পেলুম যে, মানুষ কেবলমাত্র তার কর্তব্যটুকু সেরেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অনেক মামলা উকিলদের মনকেও পেয়ে বসে। আপনি আমাকে খালাস করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, উপরন্তু আমার বিপদ আপনি নিজের বিপদ হিসেবেই

গণ্য করেছিলেন। আমার সাজা হওয়ার ফলে আপনি যে মর্মান্তিক কষ্ট বোধ করেছিলেন তা থেকে আমি বুঝলুম যে, আপনি আমার আপন ভাইয়ের মতো আমার বিপদে ব্যথা বোধ করেছিলেন। এর ফলে আপনার স্মৃতি আমার মনে চিরকালের জন্ম গাঁথা রয়ে গিয়েছে।

আর-একটা কথা, আসল ঘটনা কি ঘটেছিল তা আপনার কাছে আমরা গোপন করেছিলুম। আজকে সব কথা খুলে বলছি। সে কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে, ঘটনা যা ঘটেছিল তা নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও প্রকাশ করতে পারতুম না। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে, সুযোগ পেলেই আপনাকে এ ঘটনার সত্য ইতিহাস জানাব। একটি বাঙালি ভদ্রলোকের এখানকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তিনি দুদিন পরে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর হাতেই এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তিনি এ চিঠি আপনার হাতে দেবেন।

আপনি জানেন যে, আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়তুম। শুধু পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসি। আমি পঞ্চমীর দিন রাত আটটায় বাড়ি পৌঁছই। বাড়ি গিয়েই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা করি, তার পর বাড়ির ভিতর মার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বঙ্কুও আমার সঙ্গে মার কাছে গেল। বঙ্কু কে জানেন? সেই ছোকরাটি— যে আমার মামলার আগাগোড়া তদ্‌বির করছিল, আর যে দিবারাত্র আপনার কাছে থাকত, আপনাকে আমাদের defence বুঝিয়ে দিত। বঙ্কু আমার আত্মীয় নয়— আমরা ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ। কিন্তু এক হিসেবে সে আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের মতোই ছিল। বঙ্কুর ঠাকুরদাদা আমার ঠাকুরদাদার দেওয়ান ছিলেন, এবং তাঁর দত্ত জোতজমার প্রসাদে ওদের পরিবার গাঁয়ের একটি ভদ্র গেরস্ত পরিবার হয়ে উঠেছিল। ও পরিবার আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল। উপরন্তু বঙ্কু ছিল আমার সমবয়সী ও সহপাঠী। সে যখন ম্যাট্রিক পড়ত, তখন তার বাপ মারা যান। সে তাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার ঘাড়ে নিলে। সেই অবধি সে গ্রামেই বাস করত এবং আমার বাবা ও মা যখন তার ঘাড়ে যে কাজের ভার চাপাতেন তখন সে কাজ যেমন করেই হোক, সে উদ্ধার করে দিত। এই-সব কারণে সে যথার্থই ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদের বাড়িতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ, এবং তার সুমুখে সকলেই নির্ভয়ে সকল কথাই বলতেন। বাড়ির

ভিতর গিয়ে শুনি যে মা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। বন্ধু ও আমি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করবার পর তিনি আমাকে ও বন্ধুকে পাশের একখানি খাটে বসতে বললেন। আমরা বসবামাত্র মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছ?"

"ভালো।"

"কলকাতায় কেমন ছিলে?"

"ভালোই ছিলুম।"

"তবে কলকাতা ছেড়ে এখানে এলে কি জন্যে?"

"পুজোর সময় বাড়ি আসব না?"

"কার বাড়িতে এসেছ?"

"কেন, আমাদের বাড়িতে?"

"তোমাদের তো কোনো বাড়ি নেই।"

"মা, তুমি কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছি নে।"

"এ বাড়ি অবশ্য তোমার চৌদ্দপুরুষের; কিন্তু তোমার নয়। অমন করে চেয়ে রইলে কেন? জিজ্ঞাসা করি, জমিদারি কার, তোমাদের না অন্যের?"

"আমাদের বলেই তো চিরকাল শুনে আসছি।"

"তবে আমি বলি শোনো। তোমাদের এখন ফোঁটা দেবার মাটিটুকুও নেই।"

"আগে ছিল, এখন গেল কি করে?"

"জমিদারি পাঁচ-আনির কাছে বন্ধক ছিল তা তো জান?"

"হাঁ জানি।"

"এখন পাঁচ-আনি দশ-আনিরও মালিক হয়েছে। তোমাদের অংশ এখন পাঁচ-আনির কাছে আর বন্ধক নেই, এখন তা দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, আর তা কিনেছে পাঁচ-আনি।"

"বল কি! সত্যি?"

"সঙ্গে সঙ্গে বাড়িখানিও গিয়েছে। পাঁচ-আনি এখন তোমাদের ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করেছে। যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে এবার পুজো করবে।"

"তা হলে আমাদের পুজো বন্ধ থাকবে?"

"অবশ্য। এ অধিকার এখন পাঁচ-আনির, সে অধিকার সে ছাড়বে না। যে ঠাকুর আমরা এনেছি, সেই ঠাকুরই সে নিজের পুরুত দিয়ে পুজো করাবে, ধুমধামও হবে যথেষ্ট, আমাদের কাঙালি বিদেয় করবে।"

"এর কোনো উপায় নেই মা ?"

"থাকবে না কেন, কিন্তু তোমাদের দ্বারা তা হবে না। আমার পেটে হয়েছে শুধু শেয়াল-কুকুর— যদি মানুষের গর্ভধারিণী হতুম, তা হলে আর তোমার চৌদ্দপুরুষের পুজো বন্ধ হত না।"

"উপায় কি ?"

"উপায় সোজা, শত্রুনিপাত করা।"

মার মুখে এ প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। তাঁর কথা শুনে আমি মাথা নিচু করে বারবাড়িতে চলে এলুম। বন্ধুও 'আসছি' বলে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, তাই আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে লাগলুম। মনটা এতই অস্থির হয়েছিল যে, তখন কি ভাবছিলুম তা বলতে পারি নে। এইভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। তার পর বন্ধু হঠাৎ এসে উপস্থিত হল। সে এসেই বললে যে, "চল্, মার কাছে যাই, তাঁকে একটা খবর দিয়ে আসি।" বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম, তার এত গম্ভীর চেহারা আমি জীবনে কখনো দেখি নি ; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের ভিতর এমনই একটা দৃঢ় আদেশের সুর ছিল যে আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে আবার বাড়ির ভিতর গেলুম। মা তখনো নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। বন্ধু তাঁর ঘরে ঢুকেই বললে, "মা, একটা সুখবর আছে, তোমার শত্রু নিপাত হয়েছে।" এ কথা শুনে মা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে হাঁ করে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বন্ধু আবার বললে, "মা, কথা মিথ্যে নয়। আমিই তাকে নিজ হাতে নিপাত করেছি। বলি বাধে নি, এক কোপেই সাবাড় করেছি"— এই বলেই সে বুকের ভিতর থেকে একখানা দা বার করে দেখালে, সেখানি তাজা রক্তমাখা ; এতই তাজা যে, তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

তাই দেখে মা মূর্ছা গেলেন, আর আমি এক মুহূর্তের মধ্যে আলাদা মানুষ হয়ে গেলুম। আমার মনের ভিতর যেন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। মনের পুরানো ভাব, পুরানো আশা-ভয় সব চুরমার হয়ে গেল।

ভালোমন্দ জ্ঞান মুহূর্তে লোপ পেল, আমার মনে হল যেন আমি একটা মহাশ্মশানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, আর তখন মনে হল, পৃথিবীতে মৃত্যুই সত্য, জীবনটা মিছে।

আসল ঘটনা যা ঘটেছিল, তা আপনাকে খুলেই লিখলুম। দেখছেন, এ ঘটনা আমি সেকালে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারতুম না, প্রাণ গেলেও নয়। আজ যে আপনার কাছে প্রকাশ করছি, তার কারণ, মা এখন ইহলোকে নেই, বঙ্কু তো শুনেছি সংসার ত্যাগ করেছে।

আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, খুন আমি করি নি। তবে আমি যে শাস্তি ভোগ করছি, তার কারণ, আসল ঘটনাটা প্রকাশ না পায় তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি এবং সত্য গোপন করতে হলে যে পরিমাণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তা নিতে কুন্ঠিত হই নি। এ-সব কথা আপনাকে না বললে আমার মনের একটা ভার নামত না, তাই আপনার কাছে অকপটে তা প্রকাশ করলুম নিজের মনের সোয়াস্তির জন্য। আমি ভালো আছি, অর্থাৎ এখানে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যতদূর স্বস্তিতে ও মনের আরামে থাকা সম্ভব, ততদূর আছি। ইতি

প্রণত শ্রী—

এ চিঠি পড়ে আমিও অবাক হয়ে গেলুম। শুধু মনে হতে লাগল যে, রাগের মুখের একটি কথা ও ঝোঁকের মাথায় একটি কাজ মানুষের জীবনে কি প্রলয় ঘটাতে পারে।

আশ্বিন ১৩৩৪

সহযাত্রী

সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেলের গাড়িতে। ঘণ্টা-তিনেক মাত্র তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা আমার জীবনে এমন অপূর্ব তিন ঘণ্টা যে, তার স্মৃতি আমার মনে আজও জল্-জল্ করছে। এক এক সময়ে মনে হয় যে, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার একটা কল্পনা মাত্র। আসলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয় নি, কখনো কোনো কথাবার্তা হয় নি। সমস্ত ব্যাপারটি এতই অদ্ভুত যে, সেটিকে সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাস করবার পক্ষে আমার মনের ভিতরেই বাধা আছে। লোকে বলে, স্বপ্ন কখনো কখনো সত্য হয়, সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সত্য আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এখন, ঘটনা কি হয়েছিল, বলছি।

বছর পাঁচ-ছয় আগে আমি একদিন রাত দশটায় ঝাঝা থেকে একখানি জরুরি টেলিগ্রাম পাই যে সেখানে আমার জনৈক আত্মীয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর যদি আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তা হলে সেই রাত্রেই আমার রওনা হওয়া প্রয়োজন। আমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না করে একখানি ঠিকা গাড়িতে হাবড়ার দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে, মিনিট-পাঁচেক পরেই একখানি গাড়ি ছাড়বে, যাতে আমি ঝাঝা যেতে পারি। গাড়িখানি অবশ্য slow passenger এবং ছাড়ে অসময়ে, তবুও দেখি ট্রেন একেবারে ভর্তি, কোথাও ভালো করে বসবার স্থান নেই, শোবার স্থান তো দূরের কথা। খালি ছিল শুধু একটি ফার্স্ট ক্লাস compartment। তাই আমি একখানি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনে সেই গাড়িতেই চড়ে বসলুম। প্রথমে সে গাড়িতে আমি একাই ছিলুম, মধ্যে কোন্ স্টেশনে মনে নেই, একটি বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক কামরায় এসে ঢুকলেন। তিনি এসেই আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। এ কথা - সে কথা বলবার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বৌবাজারের কসাই-কালী ভদ্রকালী না দক্ষিণাকালী আমি বললুম, "জানি নে।" তিনি একটি বাঙালি হিন্দুসন্তানের মুখে এতাদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন ; পরে বললেন যে, তিনি এ দেশে পূর্বে এঞ্জিনীয়র ছিলেন; এখন বিলেতে বসে তন্ত্রশাস্ত্র চর্চা করছেন, মাত্র সম্প্রতি বাঙলায় ফিরে এসেছেন নানারূপ কালীমূর্তি দর্শন করবার জন্য।

তার পর সমস্ত রাত্ত ধরে আমার কাছে কালীমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। সে রাত্তিরে মন আমার নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন ছিল, সুতরাং তাঁর কথা আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢোকে নি, নইলে আমি কালীর বিষয়ে এমন একখানি treatise লিখতে পারতুম, যার প্রসাদে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে Doctor উপাধি পেতুম। আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমি সব কথা খুলে বললুম। শুনে তিনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমার আত্মীয় ভালো হয়ে গেছে।"

শেষ রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে চোখ খুলে দেখি, ট্রেন আসানসোল স্টেশনে হাজির, এবং আমার সাহেব সহযাত্রীটি অদৃশ্য হয়েছেন। কামরাটি খালি দেখে ভাবলুম যে, এই বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোকের বিষয় আমি তো স্বপ্ন দেখি নি? রাত্তিরের ব্যাপার সত্য কি স্বপ্ন, তা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি গাড়ি থেকে নেমে refreshment roomএ প্রবেশ করলুম এক পেয়ালা চায়ের সাহায্যে চোখ থেকে ঘুমের ঘোর ছাড়াবার জন্য।

২

মিনিট-দশেক পরে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি সেখানে দুটি নূতন আরোহী বসে আছেন। একজন পল্টনি সাহেব, আর-এক জন সাধু। সাহেবটির চেহারা ও বেশভূষা দেখে বুঝলুম, তিনি হয় একজন কর্নেল নয় মেজর, আভিজাত্যের ছাপ তাঁর সর্বাঙ্গে ছিল। আমি গাড়িতে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্তে উঠে পড়ে আমার বসবার জন্য জায়গা করে দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়লুম; কিন্তু আমার চোখ পড়ে রইল ঐ সাধুটিরই উপর। প্রথমেই নজরে পড়ল, তিনি একটি মহাপুরুষ না হলেও একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। তাঁর তুলনায় কর্নেল-সাহেবটি ছিলেন একটি ছোকরা মাত্র। স্বামীজি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে তাঁর বুকের বেড় অন্তত আটচল্লিশ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থুল নন। এ শরীর যে কুস্তিগীর পালোয়ানের সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। কুস্তিগীর হলেও তাঁর চেহারাতে চোয়াড়ে ভাব ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, অর্থাৎ তামাতে রুপোর খাদ দিলে এই উভয় ধাতু মিলে যে রঙের সৃষ্টি করে, সেই গোছের রঙ। তাঁর চোখের তারা দুটি ছিল ফিরোজার

মতো নীল ও নিরেট। এরকম নিষ্ঠুর চোখ আমি মানুষের মুখে ইতিপূর্বে দেখি নি। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের রেশমের আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়া পাগড়ি ও পায়ে পেশোয়ারী চাপ্‌লি। তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম, কারণ, পাঠান যে সাধু হয় তা আমি জানতুম না; আর আমি ধরে নিয়েছিলুম যে, এ ব্যক্তি পাঠান না হয়ে যায় না। এঁর মুখে-চোখে একটা নির্ভীক বেপরোয়া ভাব ছিল যা এ দেশের কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কারো মুখে সচরাচর দেখা যায় না।

আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে সন্ন্যাসী আমাকে বাঙলায় বললেন, "মশায় কি মনে করেছেন যে, আমি ভুল করে এ গাড়িতে উঠেছি— থার্ড ক্লাস ভেবে ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকেছি? অত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আমি নই, এই দেখুন আমার টিকিট।"

কথাটা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে বললুম, "না, তা কেন মনে করব। আজকাল অনেক সাধু-সন্ন্যাসীই তো দেখতে পাই ফার্স্ট ক্লাসেই যাতায়াত করেন। এমন-কি, কেউ কেউ একা একটি সেলুন অধিকার করে বসে থাকেন।"

এর উত্তর হল একটি অট্টহাস্য। তার পর তিনি বললেন, "সে মশায়, পরের পয়সায়। আমার মশায়, এমন ভক্ত নেই যাদের বিশ্বাস আমাকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলেই তারা স্বর্গে seat পাবে। গেরুয়া পরলেই যে পরের কাছে হাত পাততে হবে, বিধির এমন কোনো বিধান নেই।"

"তা অবশ্য।"

"কে কি কাপড় পরে, তার থেকে যদি কে কিরকম লোক তা চেনা যেত তা হলে তো আপনাকেও সাহেব বলে মানতে হত।"

আমার পরনে ছিল ইংরাজি কাপড়, সুতরাং সন্ন্যাসী ঠাকুরের এ বিদ্রূপ নীরবে আমাকে সহ্য করতে হল।

এর পরেই তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে আকাশের দিকে মুখ তুলে রইলেন। অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর, তিনি একদৃষ্টে কর্নেল-সাহেবকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কর্নেল-সাহেবের কামান-প্রমাণ বন্দুকটির উপর। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, "May I have a look at your weapon, sir?"

কর্নেল-সাহেব উত্তর করলেন, "Certainly, here it is" ; এই বলে তিনি বন্দুকটি স্বামীজির হাতে তুলে দিলেন। স্বামীজি "thank you" বলে সেটি করতলগত করলেন। তার পর সেটি নেড়ে চেড়ে বললেন, "It's a Winchester repeater."

"That's right."

"Splendid weapon— but no use for us *Shikaris.*"

"No, it's not a sporting gun."

"Would you care to have a look at my gun ? I am sure you will like it."

এই বলে তিনি বেঞ্চের নীচ থেকে একটি বন্দুকের বাক্স টেনে নিয়ে, একটি রাইফেল বার করে, "Let me take out the balls" বলে তার ভিতর থেকে দুটি টোটা নিষ্কাশিত করে সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। সাহেব সে বন্দুকটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং দু-তিনবার মৃদুস্বরে বললেন, "It's a beauty", তার পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "Did you get it in Calcutta ?"

"No, I brought it out from England."

"It must have cost you a lot of money."

"Two hundred and fifty pounds."

এর পর সাহেব-স্বামীতে যে কথোপকথন হল— তা আমার অবোধ্য। মনে আছে শুধু দু-চারটি ইংরাজি কথা— যথা Twelve-bore, 454, Holland & Holland প্রভৃতি। আন্দাজ করলুম, এ-সব হচ্ছে বন্দুক নামক বস্তুর নাম ধাম রূপ গুণ ইত্যাদি। তার পর সীতারামপুর স্টেশনে সাহেব নেমে গেলেন এবং যাবার সময় স্বামীজির করমর্দন করে বললেন, "Well, good-bye, glad to have met you "। স্বামীজিও উত্তর করলেন, "Au revoir"।

আমি এতক্ষণ অবাক হয়ে স্বামীজির কথাবার্তা শুনলুম এবং তার থেকে এই সার সংগ্রহ করলুম যে, তিনি বাঙালি, ইংরাজি-শিক্ষিত, ধনী ও শিকারী। এ-রকম লোকের সাক্ষাৎ জীবনে একবার ছাড়া দুবার পথে-ঘাটে মেলে না।

এর পর স্বামীজি যে ব্যবহার করলেন, তা আমার আরো অদ্ভুত লাগল। সন্ন্যাসী হলেও দেখলুম, তিনি আসনসিদ্ধ যোগী নন। এমন ছট্‌ফটে লোক

এ বয়সের লোকের ভিতর দেখা যায় না। পাঁচ মিনিট অন্তর তিনি এখান থেকে উঠে ওখানে বসতে লাগলেন, বিড়-বিড় করে কি বকতে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে গাড়ির ভিতরেই পায়চারি করতে লাগলেন। শুধু পাশ দিয়ে আর-একখানি গাড়ি চলে গেলে তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পাশের গাড়ির যাত্রীদের অতি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। আমরা তেড়ে চলেছি পশ্চিম মুখে, আর অপর গাড়িগুলি তেড়ে চলেছে পূর্ব মুখে ; পথমধ্যে উভয়ের মিলন হচ্ছে সেকেণ্ডখানিকের জন্য। এ অবস্থায় এক গাড়ির লোক অপর গাড়ির লোকেদের কি লক্ষ্য করতে পারে, বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম যে, নিজের গাড়ির লোকের চাইতে অপর গাড়ির লোক সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ঢের বেশি। কারণ, সীতারামপুরের পরে তিনি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক্ আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নি। তাঁর এ ব্যবহার দেখে আমি যে আশ্চর্য হয়েছি তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ, তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনি বোধ হয় জানতে চান যে, আমি পাশের চলন্ত ট্রেনে কি খুঁজছি। আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে বলছি, মন দিয়ে শুনুন।"

৩

আমার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর। জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমিদারি। আমার বাবার ছিল মস্ত জমিদারি ; উত্তরাধিকারিস্বত্বে আমি এখন তার মালিক। বাবা যখন মারা যান আমি তখন নেহাৎ নাবালক। কাজেই কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে, আর আমার শিক্ষক হলেন একজন ইংরাজ ভদ্রলোক। তিনি এককালে ছিলেন কাপ্তেন। আমি কখনো স্কুল-কলেজে পড়ি নি। আমি যা কিছু শিখেছি সে-সবই তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কি শিখিয়েছেন জানেন ?— ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুঁড়তে, ইংরাজিতে কথা কইতে। এ তিন বিষয়ে বাঙলার জমিদারের ছেলের মধ্যে আমি বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার ইংরাজি কথা তো আপনি শুনেছেন। আর আমি যে কিরকম সওয়ার তা জানে বাঙলার পয়লা নম্বরের ঘোড়ারা। আর আমি একটা গণ্ডারকে পঁচিশ ফুট দূর থেকে এক গুলিতে ধরাশায়ী করতে পারি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।— আমার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সংস্কৃতভাষা ধর্মকথা পূজাপাঠ আর

তন্ত্রমন্ত্র। জমিদারের ছেলের ধর্মজ্ঞান থাকা না কি নিতান্ত দরকার। তাই আমি একসঙ্গে ঘোর হিন্দু ও ঘোর সাহেব— একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়।

তবে এ বেশ কেন? আমি গেরুয়া পরেছি কাঞ্চনের অভাবে নয়, কামিনীর অভাবে। কথাটা শুনে বোধ হয় আপনি ভাবছেন যে বড়ো মানুষের ছেলের আবার কামিনীর অভাব! আমি কিন্তু মশায়, আর-পাঁচ জনের মতো নই। টাকা থাকলেই বদখেয়ালী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। জীবনে এক ফোঁটা মদও খাই নি, একটান তামাকও টানি নি, আর অদ্যাবধি নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করি নি। আমি পর পর তিনটি বিবাহ করি, তিনটিই গত হয়েছে।

আমার প্রথম বিবাহ নাবালক অবস্থাতেই হয় একটি সমান ঘরের মেয়ের সঙ্গে। সে স্ত্রীটি ছিল যেমন বড়ো জমিদারের মেয়ে হয়ে থাকে। তার ছিল কুল শীল ভদ্রতা; ছিল না শুধু রূপ আর বুদ্ধি। ছেলেবেলা থেকে দুধ খেয়ে খেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি নীল গাই। কিন্তু সে গাই কখনও বিয়োয় নি, এই যা রক্ষে।

দ্বিতীয়টি আমি নিজে দেখে বিয়ে করি। গেরস্তের মেয়ে। সে ছিল যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী— যাকে কথায় বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। জমিদারির কাজকর্ম সব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু শিকার করেই বেড়াতুম। অমন মেয়ে বোধ হয় বাঙলাদেশে লাখে একটি পাওয়া যায় না। রূপে তাকে অনেকে হয় তো টেক্কা দিতে পারে, কিন্তু গুণে নয়।

তার মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করি— স্ত্রীবিয়োগের এক মাসের মধ্যে। এই তৃতীয় পক্ষই আমাকে এ বেশ ধরিয়েছে। এর থেকে মনে ভাববেন না যে সে দেব্যা হয়ে আমার সম্পত্তি ভোগদখল করছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় 'এক সের আটা আওর আধা সের ঘিউ মিলা দে ভগবান' বলে সকাল-সন্ধ্যা চিৎকার করে বেড়াচ্ছি। ছেলেবেলায় একটি গান শুনেছিলুম—

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়,
কাল শশী যাবেন কাশী
ভস্মরাশি মেখে গায়।

শর্মাও কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে কাশী যাবার ছেলে নয়। আমার তৃতীয় পক্ষ দেশছাড়া হয়েছেন বলে আমিও দেশছাড়া হয়েছি। কথাটা একটু হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে, না?— ব্যাপার কি হয়েছে, আপনাকে বলছি। তা

আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে আপনার খুশি। I don't care a rap for other people's opinion।

আমাদের বাড়ির ভিতরের বাগানে একটি প্রকাণ্ড দিঘি আছে— মেয়েদের স্নানের জন্য। আমার তৃতীয়া স্ত্রী বিবাহের মাসকয়েক পরে একদিন সন্ধেবেলা সেখানে গা ধুতে যান ও সেই পুকুরে ডুবে মারা যান। আমি অবশ্য তখন বাড়ি ছিলুম না, আসামে খেদা করতে গিয়েছিলুম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আমার কানে পৌছতে প্রায় সাত দিন লাগে, আর আমি বাড়ি ফিরে দেখি যে, আমার স্ত্রী চলে গিয়েছেন— তবে লোকান্তরে কি দেশান্তরে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলুম না। এ সন্দেহের কারণ বলছি।

সে ছিল নিতান্ত গরিবের মেয়ে, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। স্বর্গের অপ্সরা ভুলে মর্তে এসে পড়েছিল। পয়সার অভাবে বাপ বহুকাল মেয়েটির বিয়ে দিতে পারে নি। আমি যখন এ বিবাহের প্রস্তাব করি তখন তার বয়েস আঠারো। তার বাপ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নি শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে রাজরানী হবে, এতেও আপত্তি! এরকম মুখছোপ খাওয়া আমার বংশের অভ্যাস নেই। আমি সেই হতভাগা ব্রাহ্মণকে বলে পাঠালুম যে, যদি সে তার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হয় তো মেয়েটিকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসব, আর তার ঘর-দোর হাতি দিয়ে ভাঙিয়ে জলে ফেলে দেব। তখন সে ভয়ে মেয়ে তুলে নিয়ে এসে আমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করলে। দুদিন না যেতেই কানাঘুষোয় শুনলুম যে, এ বিবাহে বাপের কোনো আপত্তি ছিল না— আপত্তি ছিল মেয়ের। আমারই এক ছোকরা আমলার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেও বিবাহ করবে না, এই পণ সে ধরে বসেছিল। ছোকরাটি ছিল তার গাঁয়ের লোক, দেখতে সুপুরুষ, আর গাইতে বাজাতে ওস্তাদ। উপরন্তু তাকে সচ্চরিত্র বলে জানতুম। বলা বাহুল্য, এ গুজব শোনবামাত্র আমি ছোকরাটিকে আমার বাড়ি থেকে দূর করে দিলুম। তার কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেলেন। সুতরাং আমার মনে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, সে মরে নি— পালিয়েছে। সে যে কি প্রকৃতির মেয়ে ছিল তা আমি বলতে পারি নে, কারণ, বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার ভালো করে আলাপ-পরিচয় হয় নি। সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই

তাকে ছুঁতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না। বহুমূল্য রত্ন বাক্সেই বন্ধ ছিল, হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান হল। এই ঘটনা ঘটবার পর থেকেই আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। ওঃ, কি রূপ তার! তবে তার বিয়োগে যত না হল দুঃখ, তার চাইতে বেশি হল রাগ। সে বোঝে নি যে, স্বর্গের অপ্সরাও মর্তে এসে কেউটের লেজে পা দিতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সংসারে বীতরাগ হয়েই বুঝি আপনি কাষায়-বসন ধারণ করেছেন?"

তিনি উত্তর করলেন, "সংসারে বীতরাগ হয়েছি বলে আত্মহত্যা করবার তো কোনো কারণ নেই। পৃথিবীতে দেদার বাঘ-ভালুক গুলি খাবার আশায় বসে রয়েছে, তাদের বঞ্চিত করে নিজে গুলি খেয়ে বসব কেন? তা ছাড়া আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর তো আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম। আমার আত্মীয়স্বজন দেশময় আমার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করছিলেন; আমি নিঃসন্তান, আমাদের বংশরক্ষা তো হওয়া চাই। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল যাতে করে চতুর্থ পক্ষ আর এ যাত্রা করা হল না।

"আমি বাড়ি থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলুম। রানাঘাট স্টেশনে একটি ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের গাড়ি পাশে এসে লাগতেই সে গাড়িখানি ছেড়ে দিলে। দেখি, সে-গাড়ির একটি থার্ড ক্লাসের কম্পার্টমেণ্টে আমার সেই গুণধর আমলাটি বসে আছে, আর পাশে একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী। সে যুবতীটি যে আমার তৃতীয়পক্ষ, তা বুঝতে আমার আর দেরি হল না—যদিও তার মুখটি ভালো করে দেখতে পাই নি। তবে instinct বলেও তো একটা জিনিস আছে। সেইদিন থেকে আমি শুধু ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়াই— একদিন-না-একদিন তাদের ধরবই, এ লুকোচুরি খেলার একদিন সাঙ্গ হবেই। গেরুয়া ধারণের উদ্দেশ্য— যাতে করে তারা আমাকে চিনতে না পারে। আর সঙ্গে যে এই বন্দুক নিয়ে বেড়াই, তার কারণ জানেন? এবার যেদিন ও-দুজনের সাক্ষাৎ পাব, সেদিন এর দুটি গুলি দুজনের বুকের ভিতর বসে যাবে। আমার স্ত্রী হরণ করে নিয়ে যাবে, আর অক্ষত শরীরে হেসে-খেলে বেড়াবে, এমন লোক এ দুনিয়ায় আজও জন্মায় নি। তার পর

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ— তার ক্রোড়ে আশ্রয় নেব।"

এই কথা বলতে না বলতে ট্রেন দেওঘর স্টেশনে এসে পৌঁছল। পাশ দিয়ে একখানি ট্রেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল। সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "এই যে, ট্রেনে তারা যাচ্ছে।"

এই বলেই তিনি বন্দুক হাতে করে তড়াক করে প্লাটফরমে লাফিয়ে পড়লেন। তার পর বন্দুকের ঘোড়া দুটি টানলেন। দুবার শুধু ক্লিক ক্লিক আওয়াজ হল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তার ভিতর টোটা নেই। তখন তিনি আলখাল্লার বুকের পকেট থেকে দুটি টোটা বার করে বন্দুকে পুরলেন— ইতিমধ্যে সে ট্রেনখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের গাড়িও ছেড়ে দিলে। সিতিকণ্ঠ বন্দুক হাতে দেওঘরের স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তার পর সিতিকণ্ঠকে জীবনে আর কখনো দেখি নি, নিজের গাড়িতেও নয়, পাশের গাড়িতেও নয়। আমি শুধু ভাবি, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর এখন কোথায়? হিমালয়ে না সাগরপারে, জেলে না পাগলা-গারদে?

আশ্বিন ১৩৩৬

ঝাঁপান খেলা

এ গল্প আমার একটি বন্ধুর মুখে শোনা।

বন্ধুবর আসলে ছিলেন মুন্সেফ, কিন্তু তাঁর হওয়া উচিত ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমত তাঁর ছিল পুরো হাকিমি মেজাজ; আর সেই কারণে তিনি পরতেন ইংরাজি পোশাক, খেতেন ইংরাজি খানা, ফুঁকতেন আধ হাত লম্বা বর্মা চুরুট। উপরন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি লেখেন নির্ভুল ইংরাজি, আর বলেন ইংরাজের মুখের ইংরাজি। কিন্তু মুন্সেফি আদালতে এই দুই বিদ্যের পরিচয় দেবার তেমন সুযোগ নেই— এই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান দুঃখ। রায় অবশ্য তাঁকে ইংরাজিতেই লিখতে হত, কিন্তু বাকি খাজনার মামলার রায়ে তো আর শেক্সপীয়র মিলটন কোট করা চলে না।

কাজেই তিনি বাধ্য হয়ে আমাদের পাঁচজনের কাছে সাহিত্য আলোচনাচ্ছলে তাঁর বিদ্যের দৌড় দেখাতেন। আমরা কিন্তু তাঁর কথাবার্তা শুনতে খুবই ভালোবাসতুম। তিনি গল্প করতে যে পটু ছিলেন, শুধু তাই নয়, গল্প বলতেনও চমৎকার। চমৎকার বলছি এইজন্যে যে, সে-সব গল্পের বিষয়ও নতুন, বলবার কায়দাও অ-কেতাবী। সে গল্পগুলি ইংরাজি সাহিত্য থেকে চোরাই মাল নয়। তিনি মুন্সেফ না হয়ে ডেপুটি হলে যে একজন ছোটোখাটো বঙ্কিম হতেন, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই— অবশ্য যদি তাঁর বাঙলা এমন পাঁচমিশেলি না হত। বঙ্কিমের বই পড়ে যেমন মনে হয় যে, বাঙলা ভাষা সংস্কৃত-বাপ-কি-বেটা— বন্ধুবরের কথা শুনে বোঝা যেত যে, বাঙলা ছত্রিশ জাতের ভাষা। তার ভিতর মধ্যে মধ্যে এমন-সব কথা থাকত— যাদের কোনো অভিধানে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, এমন-কি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের সদ্যপ্রকাশিত 'চলন্তিকা'তেও নয়। এ হেন পৈতে-ফেলা ভাষা ভদ্রসমাজে নিত্য শোনা যায় না।

২

বন্ধুবরের নাম করছি নে এই ভয়ে যে, পাছে তাঁর literary ক্ষমতা আছে জানলে তাঁর প্রোমোশন বন্ধ হয়। কে না জানে যে সাহিত্যের মতো বে-আইনি জিনিস আর নেই? তা ছাড়া তিনি যখন লেখক নন, তখন

তাঁর নামের কোনো মূল্য নেই। মুন্সেফবাবু ও ডেপুটিবাবুদের নাম আর কে মনে করে রাখে?

তিনি একদিন আমাকে সম্বোধন করে বললেন যে, "আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো আমার ছেলেবেলার একটা গল্প বলি।"

আমি বললুম, "আপনি আপনার ছেলেবেলার গল্প বলবেন, তাতে আমি ক্ষুণ্ণ হব কেন?"

"তাতে একটা জিনিস আছে, যা আপনার কানে ভালো না লাগতে পারে। সে জিনিসটে হচ্ছে গল্পের নায়কের নাম। আর লেখকমাত্রেই নামের বিষয়ে বড়ো sensitive। আপনি মনে করতে পারেন যে, ও নামটি আমি ইচ্ছে করেই রেখেছি— একটু রসিকতা করবার জন্য। কিন্তু আমার ওরকম কোনো কু-মতলব নেই। গল্প যারা বানিয়ে বলে, অর্থাৎ লেখকরা, তাদের অবশ্য নায়ক-নায়িকার নামকরণের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমার মতো যারা সত্য ঘটনা বর্ণনা করে, তাদের যার যে নাম, তা বলা ছাড়া আর উপায় নেই।"

এ কথা শুনে আমি তাঁকে ভরসা দিলুম যে, "নায়কের নাম যাই হোক-না কেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না। একাধিক লেখকের এক নাম হলেই মুশকিল, কেননা তা হলে পাঠকরা অন্যের লেখার জন্য আমাদের দায়ী করবে, অথবা আমাদের লেখার দায় অপরের ঘাড়ে চাপাবে। কিন্তু লেখক আর নায়ক তো এক চিজ নয়। সুতরাং আপনি নির্ভয়ে বলে যান। আপনার গল্পের নায়ক যদি গুণ্ডাও হয়, আর আমার যা নাম তার নামও যদি তাই হয়, তা হলেও Goonda Actএ আমি গ্রেপ্তার হব না। আমার মতো নিরীহ লেখক বাঙলায় যে দ্বিতীয় নেই, তা কে না জানে?"

বন্ধুবর হেসে বললেন, "তবে বলি, শ্রবণ করুন।"

৩

বাবার জীবনের প্রধান শখ ছিল শিকার। তাই তিনি বারোমাস বন্দুক ঘোড়া ও কুকুর নিয়েই মত্ত থাকতেন। আমরাও তাই জন্মাবধি বারুদ কুকুর ও ঘোড়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকেই বড়ো হয়েছি। কুকুর যে চোখে দেখে না, গন্ধ

শুঁকেই জানোয়ার চেনে, এ কথা তো আপনারা সবাই জানেন ; কিন্তু নানা জাতীয় কুকুরের গায়ে যে নানারকমের রঙের মতো নানারকমের গন্ধ আছে, তা বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করেন নি। ওদের আভিজাত্যের পরিচয় ওদের গন্ধেই পাওয়া যায়। ফুলেরও যেমন, কুকুরেরও তেমনি, রূপের সঙ্গে গন্ধের একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। যাক ও-সব কথা।

আমার বয়স যখন ছয় ও সাতের মাঝামাঝি— বাবা একটি নীলকুঠেল সাহেবের কাছ থেকে গুটিকয়েক শিকারী কুকুর কিনে নিয়ে এলেন। একটি বুলডগ, দুটি গ্রে-হাউণ্ড, দুটি ফক্স আর একটি বুল-টেরিয়র। গ্রে-হাউণ্ড দুটি বাঙলায় যাকে বলে 'ডালকুত্তা'— দেখতে ঠিক হরিণের মতো। সেই রঙ, সেই চোখ, মাথায় শুধু শিং নেই, আর ছুটতেও তদ্রূপ। বুলডগটির রূপের কথা আর বলে কাজ নেই। তার মুখ নাক বলে কোনো জিনিস ছিল না, চোখ দুটি একদম গোল। তার মুখে থাকবার ভিতর ছিল শুধু দুপাটি দাঁত। সে কাউকে কামড়াবামাত্র তার চোয়াল আটকে যেত, আর তখন তার মুখের ভিতর লোহার শিক পুরে দিয়ে মোক্ষম চাড় দিয়ে তবে মুখ খোলা যেত।

নীলকুঠেল সাহেবের কৃষ্ণপক্ষের মেম, কুঠির হেড বরকন্দাজ উমেশ সর্দারের মেয়ে টগর বিবি, তার দাম চড়াবার জন্য বাবাকে বলেছিল যে, "পেলাগ্ ধরবেক তো ছাড়বেক না।" 'পেলাগ্' হচ্ছে অবশ্য ইংরাজি **pluck** শব্দের বুনো অপভ্রংশ। এ কথা যে সত্য তার প্রমাণ আমরা দুদিন না যেতেই পেলুম। পাড়ার বাগ্দিদের একটা মস্ত কুকুর ছিল। সে আসলে দেশি হলেও বিলেতির বেনামিতে চলে যেত। যেমন দেশি খৃস্টানেরও কখনো কখনো বিলেতি নাম থাকে, তেমনই তারও নাম ছিল রিচার্ড। সে যে পুরো বিলেতি না হোক, উঁচুদরের দো-আঁশলা, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। রিচার্ড একদিন পেলাগের সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছিল। ফলে পেলাগ্ না-বলা-কওয়া তার গায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে, পাঁচজনে পড়ে যখন তার দাঁত ছাড়ালে, তখন দেখা গেল যে, রিচার্ডের হাড়গোড় সব থেঁতলে পিষে গিয়েছে। বাবাকে তার জন্য রিচার্ডের মালিককে ড্যামেজ দিতে হয়েছিল নগদ দশ টাকা। এতে আমার ভারি রাগ হয়েছিল। কারণ, এ কটা টাকা পেলে আমরা মনের সুখে ঘুড়ি উড়িয়ে বাঁচতুম, আর আমার স্কুল-ফ্রেণ্ড

ভজহরি কুণ্ডুর পরামর্শমত মার বাক্স থেকে এক টাকা চুরি করতে হত না।

৪

বাবা এই-সব শিকারী কুকুর নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে বাড়িসুদ্ধ লোককে, বিশেষত মাকে, বেজায় ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। তাদের ঠিকমত নাওয়ানো হচ্ছে না, খাওয়ানো হচ্ছে না, বলে দিবারাত্র চাকরদের উপর বকাবকি শুরু করলেন। বামন ঠাকুর পেলাগের জন্য একদিন মোগলাই-দস্তুর কোর্মা রেঁধেছিল, তাতে গরম মসলা ও নুনের কমতি ছিল না, উপরন্তু ছিল পোয়াখানেক ঘি। বাবা শুনে মহাক্ষিপ্ত হয়ে মাকে গিয়ে বললেন যে, "বামন ঠাকুর দেখছি কুকুরকটাকে দুদিনেই মেরে ফেলবে। ঘি খেলে যে কুকুরের রেঁায়া উঠে যায়, আর নুন খেলে যে সর্বাঙ্গে ঘা হয়— এ কথাটাও কি ঠাকুর জানে না?" মা বিরক্ত হয়ে বললেন যে, "জানবে কি করে? ঠাকুর তো এর আগে কখনো কুকুরের ভোগ রাঁধে নি। ওর রান্না কুকুর-বাবুদের যদি পছন্দ না হয় তো খুঁজে পেতে একজন কুকুরের বামন নিয়ে এসো।"

অনেক তল্লাসের পর একটি ১লা নম্বরের কুকুরের বামন পাওয়া গেল। জনরব, সে আগে লাটসাহেবের কুকুরদের খিদ্‌মত্‌গার ছিল। সে জাতে লালবেগী। লালবেগীরা যে কারা আর তাদের জাতব্যাবসা যে কি, তা যিনিই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা শুনেছেন, তিনিই জানেন। এ লোকটি একাধারে কুকুরের নর্স এবং ডাক্তার। কুকুরজাতির ঔষধ-পথ্য সব তার নখাগ্রে। কুকুরের খানাকে যে রাতিব বলে, আর তা যে রাঁধতে হয় বিনা নুন-ঝালে আর শুধু হলুদ দিয়ে— এ কথা আমরা প্রথম শুনলুম তার মুখে। কুকুরের জন্য খানা পাকাবার হিসেব এই যে, তাতে কাঁচা মাংসের রূপ-গুণ সব বজায় থাকবে। আমাদের যেমন কুইনিন ও রেড়ির তৈল, কুকুরদেরও নাকি হিং রশুন তেমনি সর্বরোগের মহৌষধ।

বাবা তার পশ্বায়ুর্বেদে পাণ্ডিত্য দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলেন, আর আমরাও ভারি খুশি হলুম, কিন্তু সে অন্য কারণে। সে কারণ যে কি, তা পরে বলছি। আর ভাইদের মধ্যে আমিই হয়ে পড়লুম তার মহাভক্ত, যদিচ কুকুর জানোয়ারটির সঙ্গে আমার কোনোরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল না; এবং তাদের ধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। দাদা বলতেন, তিনি কুকুরের

হাড়হদ্দ জানেন ; তাই দাদার মুখে শুনে শিখেছিলুম যে, যে কুকুরের বিশটি নখ থাকে তার নখে বিষ থাকে। কুকুর সম্বন্ধে আমার এইটুকুমাত্র জ্ঞান ছিল। এখন বুঝি, দাদার এ জ্ঞান তাঁর ষত্বণত্ব-জ্ঞানের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে যাই হোক, কুকুরের প্রতি আমার যে পরিমাণ অপ্রীতি ছিল, তার রক্ষকের প্রতি আমার সেই পরিমাণ প্রীতি জন্মাল।

৫

এ লোকটির নাম ছিল বীরবল। বাবা ছিলেন সেকালে হিন্দু কলেজের ছেলে, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের শিষ্য, অতএব মহা সাহিত্যভক্ত ; তাই ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে বহু নামী লোকের সমাগম হত, কিন্তু এঁদের একজনেরও চেহারা আমার মনে নেই। মনে আছে একমাত্র বীরবলের। এর কারণ এঁরা অসামান্য ছিলেন গুণে, রূপে নয়। অপরপক্ষে বীরবল ছিল রূপে-গুণে অনুপম। অবশ্য সেই-সব গুণে, যে-সব গুণ ছোটো ছেলেরা বুঝতে পারে। সে ছিল যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই নির্ভীক। ঘোড়ার বাগডোর সে একটানে ছিঁড়ে ফেলত। বড়ো বড়ো প্রাচীর সে অবলীলাক্রমে লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেত। তার উপর সে ছিল আশ্চর্য ঘোড়সোয়ার। ঘোড়া— সে যতই বড়ো হোক-না, যতই দুরন্ত হোক-না— বীরবল তাকে এক বোতল বিয়ার খাইয়ে একলাফে তার পিঠে চড়ে বসত, আর ঘাড়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার কানে কসে ফুঁ দিত ; আর তখন সে ঘোড়া মরি-বাঁচি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত, কিন্তু বীরবলকে ফেলতে পারত না।

আর তার রূপ! অমন সুপুরুষ আমি জীবনে কখনো দেখি নি। সে ছিল কালোপাথরের জীবন্ত এপোলো। সে যখন প্রথমে এল, পরনে হলুদে-ছোপানো ধুতি, মাথায় একই রঙের পাগড়ি, তার নীচে একমাথা কালো কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ঠোঁটে হাসি ও বগলে লালটুকটুকে একখানি হাত-আড়াই বাঁশের লকড়ি, তখন বাড়িসুদ্ধ লোক তার রূপ দেখে চমকে উঠলেন। মা আস্তে বললেন, "স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ!" বাবা কিছু বলেন নি, কিন্তু বীরবলের রূপ যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তার প্রমাণ, মাস-দুই পরে ঝগড়ু মেথর যখন বাবার কাছে এসে নালিশ করলে যে, বীরবল তার বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে, তখন বাবা 'আচ্ছা' 'আচ্ছা' বলে তাকে বিদেয় করলেন। মার মনে হল

এটা অবিচার, এবং বাবাকে সে কথা বলাতে তিনি বললেন, "তুমিও যেমন, ওদের বিয়েই নেই, তো কে কার বউ। আর তা ছাড়া ঝগড়ুকে তো দেখেছ, বেটা বাঁদরের বাচ্ছা। আর লখিয়াকেও তো দেখেছ? কী সুন্দরী! সে যে ঝগড়ুকে ছেড়ে বীরবলের কাছে চলে যাবে,. এ তো নিতান্ত স্বাভাবিক। রাধাকে কেউ ঘরে রাখতে পারবে না— সে কৃষ্ণের কাছে যাবেই যাবে। এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।" এ কথা শুনে মা চুপ করে রইলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বাবার রূপজ্ঞান তাঁর ধর্মজ্ঞানকে চাপা দিয়েছিল। বীরবলের রূপ ছিল যে অসাধারণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বাবার প্রচণ্ড ধর্মজ্ঞানও সে রূপের আওতায় পড়ে গিয়েছিল; কারণ, বাবা ছিলেন সেকালের একদম ইংরাজি-পড়া ঘোর moralist।

৬

বীরবলের রূপ আমি বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু করছি নে এই ভয়ে যে, পাছে তা কেতাবী হয়ে পড়ে। তাকে দেখেছিলুম ছেলেবেলায়, সুতরাং তার যে-ছবি আজ আমার চোখের সমুখে খাড়া আছে, তার ভিতর স্মৃতির ভাগ কতটা আর কল্পনার ভাগই-বা কতটা, তা বলতে পারি নে। তবে এ কথা সত্য, সে যার সম্পর্কে এসেছিল, তাকেই জাদু করেছিল— এমন-কি, কুকুর কটাকেও। তাকে দেখামাত্রই কুকুরগুলো লেজ নাড়তে শুরু করত, আর Pluck তো একেবারে চিৎ হয়ে আহ্লাদে চার পা আকাশে তুলে দিত, অথচ দরকার হলে সে Pluckকে কড়া শাসন করতে কসুর করত না। সে তার পিঠে হাতও বোলাত, চাবুকও লাগাত।

তার চলাফেরা বলা-কওয়ার ভিতর একটা খাতির-নদারত ভাব ছিল, যেটা আসলে তার প্রাণের স্ফূর্তির বাহ্যরূপমাত্র। সে ছিল সদানন্দ। আর প্রদীপ যেমন তার আলো চার দিকে ছড়িয়ে দেয়, সেও তার মনের সহজ আনন্দ চার পাশে ছড়িয়ে দিত। এটা অবশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবীতে এমন লোকও আছে, যার মুখ দেখলেই মনটা দমে যায়। তার প্রকৃতি ছিল এ জাতের লোকের ঠিক উল্টো।

তার উপর ছোটো ছেলেদের বশ করবার নানা বিদ্যে তার জানা ছিল। সে ঘুড়ি তৈরি করত চমৎকার। তার হাতের ঘুড়ি কি ডাইনে কি বাঁয়ে

কখনো কান্নি মারত না। সুতো ছেড়ে দিলেই বেলুনের মতো সোজা উপরে উঠে যেত। তাসের সুতোর জন্য যে চাই শীতল মাঞ্জা, আর লকের সুতোর জন্য খর, তা অবশ্য আমরা সবাই জানতুম। কিন্তু শীতল মাঞ্জার মাড় কতটা ঘন করলে আর খর মাঞ্জায় বোতলচুর কতটা মেশালে সুতো অকাট্য হয়, তার হিসেব জানত একা বীরবল। এমন-কি, বাণ্ডিলের সুতো হলুদে ছুপিয়ে খর মাঞ্জার যোগে যে লকের সুতোকেও কেটে দিতে পারে তার হাতে-কলমে প্রমাণ দিত বীরবল। তা ছাড়া চীনে-ঘুড়ির সে যে বর্ণনা করত, তা শুনে আমাদের মনে হত, এবার মরে চীন দেশে জন্মাব। এ-সব দিনের কথা এখন মনে করতে হাসি পায়। কিন্তু আমার পৃথিবীর সঙ্গে তখন প্রথম পরিচয়, যা দেখতুম আর যা শুনতুম, সবই অপূর্ব ঠেকত।

৭

আমি ছিলুম তার favourite। বীরবল বলত, সে আমাকে তার সব বিদ্যে শেখাবে— অবশ্য বড়ো হলে। আমার অবশ্য তার কোনো বিদ্যেই শেখবার লোভ ছিল না, লোভ ছিল শুধু সে-সব দেখবার।

তাই সে আমাকে একদিন বলেছিল যে, সে আর তার ভাই-ব্রাদারিতে মিলে রাত্রিতে ঝাঁপান খেলবে। আমি যদি দেখতে চাই তো রাত-দুপুরে একা তার বাড়ি গেলেই সব দেখতে পাব। অবশ্য বাবা মা আমাকে অত রাত্তিরে বীরবলের বাড়ি একা যেতে দেবেন না, তা আমি জানতুম, তাই যদিও ঝাঁপান খেলা দেখবার আমার অত্যন্ত লোভ ছিল, তবুও বীরবলের প্রস্তাবে রাজি হতে পারলুম না।

ঝাঁপান খেলা ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের দেশে কেওড়া মেথর হাড়ি ডোমরা বছরে একদিন সাপ খেলে— সাপের বিষদাঁত না ভেঙে। সেই দিনই কে কেমন সাপুড়ে তার পরীক্ষা হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে রোজাদের। ঝাঁপান যেখানে খেলা হয়, সেখানেই এক-আধজন মারা যায়। হাজার ওস্তাদ হোক্, আস্ত জাত-সাপ নিয়ে খেলা তো ছেলেখেলা নয়। ঐ বিষদাঁত ছুঁলেই মরণ, যদি না রোজা ঝেড়ে সে বিষ নামাতে পারে। পুলিস এ খেলা খেলতে দেয় না, তাই গুণীর দল রাত দুপুরে ঘরে দুয়োর দিয়ে এ খেলা খেলে। যেদিন বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল,

সেইদিনই এ খেলা খেলতে হয়। বীরবল অবশ্য ব্যাবসাদার সাপুড়ে ছিল না। কিন্তু যে কার্যে বিপদ আছে, বীরবল হাসিমুখে গিয়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর শুনেছি সে সাপ খেলাতও চমৎকার। সাপ যে দিক থেকে যে ভাবেই ছোবল মারুক-না কেন, বীরবলের অঙ্গ কখনো ছুঁতে পারে নি।

বীরবল সে রাত্তিরে একটা প্রকাণ্ড খয়ে-গোখরো নিয়ে তার হাতসাফাই দেখাবে, তাই সে আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল।

৮

তার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি যে, বীরবলকে রাত্তিরে সাপে কামড়েছে, সে এখন মরমর। এ সংবাদ নিয়ে এলেন ঝগড়ু; তিনিও নাকি ঐ দলে ছিলেন— তুবড়ি বাজাবার ওস্তাদ হিসেবে। অতি মাত্রায় মদ্যপানের ফলে ঝগড়ু সাপের সঙ্গে ইয়ারকি করতে গিয়েছিল, আর তাকে বাঁচাতে গিয়েই নাকি সাপের ছোবল বীরবলের হাতে পড়েছে। এ সংবাদ পেয়েই বাবা আমাদের এবং কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে বীরবলের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমরা গিয়ে দেখি, তার ভাই-ব্রাদারিতে মিলে তাকে উঠোনে নামিয়েছে, আর মঙ্গলা খৃস্টান বিড় বিড় করে কী মন্ত্র পড়ছে ও বীরবলের গায়ে জলের ছিটে দিচ্ছে; আর লখিয়া সজোরে তার গা টিপছে—সাপের বিষ ডলে নামাবার জন্য। বীরবলের ভাই-ব্রাদারি থেকে-থেকে বেহুলার যাত্রার ধুয়ো ধরেছে— "ও সে বাঁচবে না।" মঙ্গলা খৃস্টান ওদিগের মধ্যে সবচাইতে নামী রোজা। সে বাবাকে সম্বোধন করে বললে, "হুজুর, বোধ হয় রোগীকে আর বাঁচাতে পারলুম না— যেমনি কামড়েছে তেমনি যদি আমাকে ডাকত তা হলে বিষ ঝেড়ে ঠিক নামিয়ে দিতুম। কিন্তু অন্য রোজারা তিন ঘণ্টা ধরে ঝাড়ফুঁক করে যখন হাল ছেড়ে পালিয়ে গেল, তখন আমাকে খবর দিলে। এখন আর কোনো মন্তরই লাগছে না, না চণ্ডীর না মেরির।"

বীরবলের দেখলুম সর্বাঙ্গ একেবারে নীল হয়ে গিয়েছে, আর হাত-পা সব আড়ষ্ট। সে চোখ বুজে শুয়ে আছে আর তার নাক দিয়ে একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। হঠাৎ বীরবল চোখ খুললে, আর আমার দিকে চেয়ে বললে, "বাবা, হাম চলতা, কুচ ডর নেই।" এই কটি কথা বলে সে আবার চোখ

বুজলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিশ্বাসও বন্ধ হয়ে গেল। তখন দেখলুম সেই দেহ, সেই রূপ, সবই রয়েছে— চলে গিয়েছে শুধু বীরবল।

পেলাগ্ ছুটে গিয়ে তার মৃতদেহ একবার শুঁকলে, তার পরে চলে এল। দেখলুম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমার শুধু মনে হল যে, দিনের আলো নিভে গেল।

এখন আমি ভাবি, আমিও কি একদিন এই শেষ কথাটি বলে যেতে পারব— "হাম চলতা, কুচ ডর নেই।"

চৈত্র ১৩৩৭

নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর

আদিপর্ব

সেদিন রূপেন্দ্র আমাদের নবতর-জীবন সমিতিতে মহা বক্তৃতা করছিলেন— এই কথা সকলকে বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশের মামুলি বিবাহপ্রথার বদলে স্বয়ম্বরপ্রথা না চালালে আমরা জাতিগঠন কিছুতেই করতে পারব না।

রূপেন্দ্রের এ বিষয়ে এত উৎসাহ হবার কারণ— প্রথমত তাঁর বাপ-মা তাঁর জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন, দ্বিতীয়ত তিনি দুদিন আগে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ পড়েছিলেন, আর তৃতীয়ত তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যথার্থই রূপেন্দ্র, অর্থাৎ অসাধারণ সুপুরুষ। আর আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে তার বক্তৃতা একমনে শুনছিলুম, তার কারণ, আমরা সকলেই ছিলুম অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য। কাজেই এ আলোচনায় আমরা সকলেই মনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম, চুপ করে ছিলেন শুধু নীল-লোহিত। তাই রসিকলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, তুমি কোনো কথা কইছ না কেন? রূপেন্দ্রের প্রস্তাবে তোমার মৌন কি সম্মতির লক্ষণ নাকি?" নীল-লোহিত কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বলেন, "যা হয় তা হওয়া উচিত, এরকম nonsensical কথার উপর আর কি বলব?" এ কথা শুনে আমরা সকলেই কান খাড়া করলুম, কেননা বুঝলুম এইবার নীল-লোহিতের কেচ্ছা শুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বাঙলার মেয়েরা আজও স্বয়ম্বরা হয় নাকি?" নীল-লোহিত বললেন, "আলবৎ।" আমি আবার প্রশ্ন করলুম, "তুমি কি করে জানলে?" নীল-লোহিত বললেন, "জানলুম কি করে? বই কি কাগজ পড়ে নয়, শুঁড়ির দোকান কিম্বা গুলির আড্ডায় পরের মুখে শুনেও নয়— নিজের চোখে দেখে।"

"চোখে দেখে!"

"হাঁ, চোখে দেখে। আমি একটি জাঁকালো স্বয়ম্বর-সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, আর আমার চোখ বলে যে একটা জিনিস আছে, তা তো তোমরা সকলেই জান।"

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোনবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে নীল-লোহিত তাঁর বর্ণনা শুরু করলেন—

আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানি চিঠি পাই, অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হল মেয়ের লেখা। তার প্রতি অক্ষরটি যেন ছাপার অক্ষর, আর সেগুলি সাজানো হয়েছে সব সরল রেখায়। লেখা দেখে মনে হল পূর্ব-পরিচিত, কিন্তু কোথায় এ লেখা দেখেছি, তা মনে করতে পারলুম না। শেষটায় চিঠিখানি খুলে যা পড়লুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিখানি এই—

"আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist। একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে সেটিকে কার্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না। আর অপর কেউ তাঁকে থামাতে পারে না, কারণ তাঁর পয়সা আছে, আর সে পয়সা তিনি অকাতরে অপব্যয় করেন। বড়ো-মানুষের খোশ-খেয়ালও তো একরকম idealism।

"বাবা যেদিন থেকে পৈতা নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষাত্রধর্মের চর্চা করছেন। অতঃপর তিনি মনস্থির করেছেন যে, আমাকে এবার স্বয়ম্বরা হতে হবে। আমাদের বাড়িতে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় স্বয়ম্বর-সভা বসবে। আপনি যদি সে সভায় উপস্থিত হন— অবশ্য নিমন্ত্রিত হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে— তো খুশি হই। এরকম অপূর্ব নাটক আপনি কলকাতায় কোনো থিয়েটারেও দেখতে পাবেন না। অবশ্য আপনাকে ছদ্মবেশে আসতে হবে। কি করে কি করতে হবে সে-সব মেজদা আপনাকে জানাবেন।

ইতি

মালা।"

চিঠি পড়েই বুঝলুম যে এ মালশ্রীর চিঠি।

আমাদের ভিতর কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহিলাটি কে, মাদ্রাজী না মারাঠী?" নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "চিঠি শুনে কি মনে হল যে, ও চিঠি কোনো কাছা-কোঁচা-দেওয়া মেয়ের হাত থেকে বেরোতে পারে? দুপাতা ইংরেজি পড়ে মাতৃভাষাও ভুলে গিয়েছ নাকি?"

"না, তা ভুলি নি। কিন্তু কোনো বাঙালি মেয়ের মালশ্রী নাম কখনো শুনি নি। এমন-কি, হাল-ফ্যাশানের নভেল-নাটকেও পড়ি নি।"

"সে নিজের নাম নিজে রাখে নি, রেখেছে তার বাপ-মা।"

"মেয়েটি কার মেয়ে?"

"রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান।"

বাপের নাম শুনে আমরা অনেকেই হাসি আর রাখতে পারলুম না। আমাদের হাসি দেখে ও শুনে নীল-লোহিত মহা চটে বললেন, "বীরবলী ভাষা পড়ে পড়ে যদি সাধুভাষা ভুলে না যেতে, তা হলে আর অমন করে হাসতে না। এ ঋষভ সংগীতের ঋষভ, বাঙলায় যাকে বলে রেখাব। নূরনগরের রাজপরিবারের ছেলেমেয়েদের নামকরণ করা হয় সংগীতাচার্যদের উপদেশমত। মালশ্রীর পিসিদের নাম হচ্ছে জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী, আর তার পিসতুতো মেজদাদার নাম হচ্ছে নটনারায়ণ, আর বড়দাদার নাম ছিল দীপক। গান-বাজনার যদি ক খ জানতে তা হলে এগুলি যে সব বড়ো বড়ো রাগরাগিণীর নাম, তা আর আমাকে তোমাদের বলে দিতে হত না। বনেদী পরিবারের ছেলের নাম কি হবে পাঁচু, আর মেয়ের নাম পাঁচি?"

নীল-লোহিতের এ বক্তৃতা শুনে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে এ পরিবারে সংগীতের যথেষ্ট চর্চা আছে?" নীল-লোহিত বললেন, "রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী। তাঁর তুল্য বাজখাঁই গলা কোনো গাঁজাখোর ওস্তাদেরও নেই।" রসিকলাল উত্তর করলেন, "আমরা গান-বাজনার ক খ না জানি— এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁই হয়ে থাকে।" এ কথা শুনে আমরা কোনোমত প্রকারে হাসি চেপে রাখলুম এই ভয়ে যে নীল-লোহিত আমাদের হাসি দ্বিতীয়বার আর সহ্য করতে পারবেন না। নীল-লোহিত বললেন, "কথায় কথায় যদি বস্তাপচা রসিকতা কর, তা হলে আমি আর কথা কইব না।"

অনেক সাধ্য-সাধনার পর নীল-লোহিত মালশ্রীর স্বয়ম্বরের গল্প বলতে রাজি হলেন, on condition আমরা কেউ টুঁ শব্দ করব না। নীল-লোহিত আরম্ভ করলেন, "তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার সব উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি। এ হচ্ছে বিলেতি নভেল পড়ার ফল। গল্প যাক চুলোয়, তার আশ-পাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই তোমরা দেখতে চাও। সে যাই হোক, এখন আমার গল্প শোনো।"

—মালশ্রীর মেজদাদা অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের ভাগ্নে আমার একজন বাল্যবন্ধু। রূপেন্দ্রের বিশ্বাস তিনি বড়ো সুপুরুষ। একবার নটনারায়ণকে গিয়ে দেখে আসুন, চেহারা কাকে বলে; তার উপর সে আশ্চর্য গুণী। নাচে

গানে তার তুল্য গুণী amateurদের ভিতর আর দ্বিতীয় নেই। আর তার কথাবার্তা শুনলে রসিকলাল বুঝতেন যথার্থ সুরসিক কাকে বলে।

রাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন নটনারায়ণের সুপারিশে আমি মালশ্রীর প্রাইভেট টিউটার হই। ইংরেজি সে আমার কাছেই শিখেছে। তেরো থেকে ষোলো এই তিন বৎসর সে আমার কাছে পড়ে যেরকম ইংরেজি শিখেছে সে ইংরেজি তোমরা কেউই জান না। আর তাকে এত যত্ন করে পড়িয়েছিলুম কেন জান? মেয়েটি সত্যিই ডানাকাটা পরী, তার উপর আশ্চর্য বুদ্ধিমতী। তার পর রাজাবাহাদুর আজ দু বৎসর হল দেশে চলে গিয়েছেন—আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে। ইতিমধ্যে তাঁদের আর-কোনো খবরই পাই নি, হঠাৎ ঐ চিঠি এসে উপস্থিত। সকালে চিঠি পেলুম, বিকেলেই মেজদার সঙ্গে দেখা করলুম। মালশ্রী নটনারায়ণকেও চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মেজদা, ব্যাপার কি?"

"রাজামামার খেয়াল।"

"এ খেয়ালের ফল দাঁড়াবে কি?"

"প্রকাণ্ড তামাসা।"

"সে তামাসা আমিও দেখতে চাই।"

"সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।"

"সেখানে যাই কি করে?"

"নামরূপ ভাঁড়িয়ে।"

"কি সেজে?"

"বর সেজে নয়।"

তার পর সে পরামর্শ দিলে যে, আমি দরওয়ান সেজে ও সভায় যেতে পারি। রাজাবাহাদুরের পুরোনো জমাদার রামটহল সিং জনকতক নতুন ভোজপুরি দরওয়ান সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় এসেছে; তাদের দলেই আমি ঢুকে যেতে পারি।

উদ্যোগপর্ব

তার পর দিন সকালে আমি মেজদার ওখানে হাজির হলুম। আমার নাম হল লীললাল সিং, আর নটনারায়ণ আমাকে এ দলের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করলে। সবরকম ভোজপুরি দেহাতি বুলি আমি বাঙলার চাইতেও অনর্গল বলতে পারি। আর 'করলবড়া'র জায়গায় ভুলেও আমার মুখ থেকে 'করলবাণী' বেরোয় না; কাজেই রামদুলাল সিং, রামঅবতার সিং, রামখেলাওয়ন সিং, রামদিন সিং, রামযশ সিং, রামভূপ সিং, রামদৎ সিং, রামগোলাম সিং, রামগোপাল সিং প্রভৃতি ভোজপুরি ছত্রীর দল আমাকে আর বাঙালি বলে চিনতে পারলে না। আমি জমাদার হয়েই দু বেটা মূর্তিমান পাপকে শুধু বিদেয় করলুম। কারণ ওংকারনাথ ব্রাহ্মণ ও বৈজনাথ ব্রাহ্মণকে দেখেই বুঝলুম যে, দু বেটাই মৃজাপুরি গুণ্ডা, দু বেটাই খুনে। দু পয়সার লোভে কাকে কখন চোরা ছোরা মেরে দেবে তার ঠিক নেই। আর ফলে আমার বদনাম হবে।

এই রামসিংদের সঙ্গে আমার দু দণ্ডেই ভাব হয়ে গেল, আর তাদের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে পড়লুম যে, সেই রাত্তিরে ট্রেনে রামগোলাম সিং ও রামগোপাল সিং তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলে। আমি দুজনকে কথা দিলুম যে, প্রথমে মুনিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক— তার পর আমার বিয়ের কথা ঠিক করা যাবে। তারা বললে, "ই বাৎ ঠিক হ্যায়।" Loyalty কাকে বলে দেখতে চাও তো এদের দেখো। সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু আজও যদি খবর দিই তো তারা সুতোপটি ময়দাপটি পাথুরেঘাটা দরমাহাটা— যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হাতের গোড়ায় যে হাতিয়ার পায় তাই নিয়ে ছুটে আসবে। আজও বড়োবাজারের গদিতে গদিতে ও পাথুরেঘাটার দেউড়িতে দেউড়িতে এ কথা প্রচার যে, বাঙলামে কোই মরদ হ্যায় তো হ্যায় লীললাল ব্রাহ্মণ। আমি যে ছত্রী নই, সে কথা তারা পরে জানতে পেরেছে, আর তার পর থেকেই আমার সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলে, "গোড় লাগি মহারাজ।"

আমি সদলবলে বিকেলে ট্রেনে উঠলুম থার্ড ক্লাসে, আর ফার্স্ট ক্লাসে উঠলেন আর-একদল, কারা তা চিনি নে। ভোর হতে না হতেই পীরপুর স্টেশনে পৌছলুম। রাত্তিরে অবশ্য গাড়িতে ঘুম হয় নি। আমাদের মুখে যেমন

সিগারেট, রামসিংদের মুখে তেমনি গাঁজার কলকে, মধ্যে মধ্যেই ধোঁয়া ছাড়ছে। তার উপর আবার গান। কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী, কেউ-বা আবার লাউনি। ভজনই এরা গায় ভালো, কারণ ভজনে তান নেই, আছে শুধু টান। তাদের মুখে ভজনগুলোই আমার লাগছিল ভালো। 'প্রভু অগুণে চিতে না ধরো' ভজনটা শুনে আমার মন ভক্তিরসে তেমন স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ওঠে নি, যেমন হয়েছিল 'সাহেব আল্লা করিম রহিম' এই ইসলামী ভজন শুনে। হিন্দু-মুসলমানের মনের গর্ভ-মন্দিরে যে একই দেবতা বিরাজ করছেন, এই-সব গানের প্রসাদে সে সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মোবারকবাদী কাকে বলে জান? শুভকর্মের শুভলগ্নে গান। ভক্তিরস অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং যখন এই বিয়ের গান ধরলে—

'হাস হাসকে ঘুঁঘট খোলে লালবনা
আম্মা মেরে টীকা দেখলে ভয়া লালবনা ॥'

তখন ঘরসুদ্ধ হাসির গর্‌রা পড়ে গেল! 'বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোটা দেখে নিয়েছে'— এ কথায় হাসবার যে কি আছে তা জানি নে, কিন্তু ঐ সূত্রে যে-সব দেহাতি রসিকতা শুনলুম তা তোমাদের না শোনাই ভালো। সে যাই হোক, ঘুম না হলেও রাতটা কেটেছিল ভালো। ব্যাপারটা হয়েছিল একদম musical soiree।

এতক্ষণ সকলে চুপ করে ছিল। অবশেষে আমাদের মধ্যে প্রধান গাইয়ে, বিশ্বনাথ ওস্তাদের সাগরেদ শ্রীকণ্ঠ বলে উঠলেন, "নীল-লোহিত, তুমি দেখছি গান-বাজনাতেও expert হয়ে উঠেছ। ভজনের সঙ্গে খেয়ালের তফাত কি, তাও তুমি জান।"

তিনি উত্তর করলেন, "তিন বৎসর তো আর কানে তুলো দিয়ে মালাকে পড়াই নি। ও বাড়িতে যে দিবারাত্র ওস্তাদি গান হয়। গানের expert গলা সাধলে হয় না, তার জন্য চাই কান সাধা।"

"মানলুম তাই। আর দরওয়ানরাও সব ওস্তাদি গান গায়! অবাক করলে।"

"ভালো। দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাতটা কি? দুজনেই

ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দুজনেই মুগুর ও সুর ভাজে। কেন, তুমি কখনো কোনো পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে দেখ নি? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ— যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।”

তার পর তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, “যা বললুম তার থেকে মনে ভেবো না যে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনোরূপ prejudice আছে কি ছিল। নিরক্ষর ও নিঃস্ব হলেও, মানুষের অন্তরে যে প্রেম ও ভক্তি আর দেহে জোর হিম্মত থাকতে পারে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে তোমরাও তা দেখতে পেতে। তোমরা তো হিস্টরি পড়েছ। সন সাঁতাওনকে গদড় কারা করেছিল? তোমাদের পূর্বপুরুষরা, না, এদের বাপ-ঠাকুরদারা? তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা কর, তার কারণ তোমরা জান না ছাতুর ভিতর কি মাল আছে। কালিদাস কি খেয়ে মেঘদূত লিখেছিলেন, ভাত না ছাতু?”

আমি বললুম, “হয়েছে, এখন গল্প বলো।”

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, “আমি তো তাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা বলতে দেও কই? গল্প শুনতে তোমরা শেখ নি, শিখবেও না, কারণ তোমরা চাও নিজের নিজের বিদ্যে দেখাতে— কেউ সংগীতের কেউ সাহিত্যের। এত সমালোচকের পাল্লায় পড়লে আমি তো আমি Shakespeareও তাঁর গল্প বলতে পারতেন না। কেউ-না-কেউ Calibanএর anthropology নিয়ে ঘোর তর্ক শুরু করত। যদি সত্যিই শুনতে চাও তো এখন শোনো— বিদ্যে গোলদিঘিতে গিয়ে জাহির কোরো।”

পীরপুর স্টেশন থেকে নূরনগর দশ মাইল রাস্তা। আমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাদের দলবলকে একবার drill করালুম, এবং তার পর সকলকে shoulder arms করে quick march করতে হুকুম দিলুম। আর-একখানি লরিতে ভাবী জামাইবাবুরা রওনা হলেন; অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে এসেছিলেন। হাজার হাজার নাকে বেসর-পরা চাষার মেয়ে দুপাশে কাতার দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করলে— “এ কিরকম হল, বরের দল চলেছে হেঁটে— আর তাদের তল্পীদাররা চেপেছে মোটরগাড়িতে! বোধ হয় মালপত্র হেপাজৎ

করে নিয়ে যাবার জন্যে।" এ ভুল যে তাদের হয়েছিল, তার কারণ আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মতো— আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন।

আমরা দুদলই রাজবাড়িতে একসঙ্গে পৌঁছলুম। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা, সে রাস্তায় আমাদের পায়ের সঙ্গে মোটর পাল্লা দিতে পারবে কেন? সেখানে গিয়েই জামাইবাবুরা রাজাবাহাদুরের guest-houseএ চলে গেলেন, আর আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যারাকে।

বাঁ পাশের ঘরগুলোতে আস্তানা করেছিল বাঙালি লাঠিয়ালরা। গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে। কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁতন করছে, কেউ বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে তো আঁচড়াচ্ছেই, কেউ আবার একমনে দাঁতে মিশি দিচ্ছে। সকলেরই পরনে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, কোমরে গোট, বাজুতে দাওয়া আর দোয়া-ভরা কবচ ও মাদুলি, আর কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা। বেটারা যেন সব নবাবপুত্তুর— কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান-দোখতা খেতে, আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে; তার পরেই নিরুদ্দেশ। বেটাদের বাড়ি হচ্ছে হয় নটীবাড়ি নয় শ্রীঘর— আর যেখানেই তারা যায়, সেইখানেই তো এ দুই ঘরবাড়ি আছে। এই-সব লাল-খাঁ কালো-খাঁদের বাঁয়ে রেখে, আমরা নিজের আড্ডায় গিয়ে ঢুকলুম।

দিনটে কেটে গেল হাতিয়ার শানাতে। কারণ রাজবাড়ি থেকে যে-সব ঢাল-তলোয়ার আমাদের দেওয়া হয়েছিল, সে-সব দুশো বৎসরের মরচে-ধরা। তাদের মরচে ছাড়াতেই প্রায় দিন কাবার হয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না, যদিচ রাজবাড়ি থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল। আমরা সকলে জলের ছিটে দিয়ে ছাতু তাল পাকিয়ে নিয়ে, গণ্ডা গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলুম। সন্ধে হয়-হয়, এমন সময় আমাদের ডাক পড়ল —স্বয়ম্বরসভা পাহারা দেবার জন্য। ভোজপুরিদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাত এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরিরা পাহারাওয়ালা।

সভাপর্ব

বিয়ের সভা বসেছিল ঠাকুরবাড়িতে, কারণ তার নাটমন্দিরে শ-পাঁচেক লোক হেলায় বসতে পারে। ঠাকুরবাড়িতে ঢোকবার আগে বাইরের উঠানে দেখি লাঠিয়ালরা সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ এক নতুন মূর্তি। এবার তারা সব কাপড় পরেছে, উত্তরবঙ্গের চাষার মেয়েদের মতো বুক থেকে ঝুলিয়ে, আর সে কাপড়ের ঝুল হাঁটু পর্যন্ত। সকলেরই ডান হাতে পাঁচ হাত লম্বা লাঠি, কারো কারো হাতে আবার পুঁটিমাছ-ধরা ছিপের মতো সরু সরু লম্বা সড়কি, তার মুখে ইস্পাতের ফলাগুলো জিভের মতো বেরিয়ে আছে। সে তো মানুষের জিভ নয়, সাপের দাঁত। আর সকলেরই বাঁ হাতে থাবাপ্রমাণ বেতের ঢাল। প্রথমে এদের দেখে চিনতেই পারি নি। মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মতো মাথা ঘিরে রয়েছে। শুনলুম, মাথার চুল দিনভর ময়দা দিয়ে ঘষে ঘষে ফুলিয়েছে। এই নাকি তাদের যুদ্ধের বেশ।

ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে দেখি নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আর সুমুখের ঠাকুরদালান খালি, শুধু দুধারে দুসার চেয়ারে বরবাবুরা বসে আছেন। একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড়ো বড়ো শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কর্মবীর', অন্যধারে একই ধাঁচে 'জ্ঞানবীর'। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্মবীর, ইংরাজিতে যাকে বলে sportsman; তাদের কারো হাতে রয়েছে ক্রিকেট-ব্যাট, কারো হাতে টেনিস-র‍্যাকেট, কারো হাতে boxing-gloves, কারো হাতে হকি-স্টিক, কারো হাতে ফুটবল। শুধু একজনের হাতে রয়েছে দেখলুম এক হাত লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তার পরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর— শুধু কারো Dর পিছনে আছে L, কারো L. T, কারো S. C.। কে কোন্ দলের লোক তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। দুদলেরই রূপ এক। ব্যাঙ আর ফড়িং এ দলেও ছিল, ও দলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন।

রাজাবাহাদুর— নাটমন্দিরে ঢুকতেই একটি উচ্চাসনে অর্থাৎ হাইকোর্টের জজের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর এক পাশে ছিল নটনারায়ণ, আর-এক

পাশে দেওয়ানজি। চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্যে যে গলিটা ছিল, আমি আমার দলবল নিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকলেরই মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা চাপকান, কোমরে তলওয়ার, আর পায়ে নাগরা জুতো; শুধু আমার মাথায় পাগড়ি ছিল ডাইনে নীল বাঁয়ে লাল, আর একমাত্র আমার তলওয়ারে ছিল হাতির দাঁতের বাঁট। আমরা প্রথমে গিয়েই সব single fileএ দাঁড়িয়ে salute করলুম। তার পরে এই বলে অভিবাদন করলুম, "জিয়ে মহারাজ, জিয়ে মোতিওয়ালা, দোস্ত বাহাল, দুষ্‌মন পয়মাল।" শুনে রাজা খুব খুশি হলেন। তার পরে নটনারায়ণ হুকুম দিলেন— "জমাদার লীললাল সিং, পাহারাকো বন্দোবস্ত করো।" আমি "জো হুকুম" বলে, ঠাকুরবাড়ির উত্তর দুয়ারে ছ জন, দক্ষিণ দুয়ারে ছ জন, পশ্চিম দুয়ারে ছ জনকে মোতায়েন করে দিলুম। আর আমি দাঁড়ালুম চণ্ডীমণ্ডপের নীচে, যেখানে মাথার উপরে বড়ো বড়ো ইংরেজি হরফে লেখা ছিল 'None but the brave deserve the fair'। আর রামরঙ্গিলা সিংকে রাজাবাহাদুরের সুমুখে খাড়া করে দিলুম। তার কারণ সে ছোকরা ছিল বহুৎ খপসুরৎ।

মিনিট-পাঁচেক পরে নটনারায়ণের হুকুমে একটা বাবরিচুলো ছোকরা-ভাণ্ডারী মহা শঙ্খধ্বনি করলে, আর তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলের দুয়ার দিয়ে মালশ্রী চণ্ডীমণ্ডপে হাজির হলেন বিয়ের কনে সেজে। দেখলুম তার বিশেষ কিছু বদল হয় নি, শুধু লম্বায় একটু বেড়েছে, আর গায়ের রঙ আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সঙ্গে আছেন একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো তেমনি ফ্যাকাসে— এক কথায় শ্রীমতী মূর্তিমতী dyspepsia। তাঁর হাতে একখানা সোনার থালার উপরে একটি বেল ফুলের গোড়ে মালা। পরে শুনেছি ইনি হচ্ছেন মিস বিশ্বাস, জাত খৃস্টান, পাস এম. এ., মালার নতুন মাস্টারনী। মালা এসে প্রথমে এক নজরে সভাটি দেখে নিলে, তার পর মিস বিশ্বাসকে কি ইঙ্গিত করলে। আর মিস বিশ্বাস একমুখ হেসে অগ্রসর হতে শুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি ব্যাটধারীর সুমুখে দাঁড়িয়ে মালশ্রীকে সম্বোধন করে বললেন, "এই বীরযুবকদের কুলশীলের পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। রাজা-বাহাদুর যে সমান ঘর থেকে সমান বরের আমদানী করেছেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এদের রূপ তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখো আর গুণ

আমার মুখে শোনো। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বাসু বোস, ওরফে দ্বিতীয় রঞ্জি। ঐ যে হাতে ব্যাট দেখছ, ওর স্পর্শে বল অসীমে চলে যায়। তুমি যদি ওঁকে বরণ কর তো উনি তার পর দিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন Lord's Cricket Groundএ ম্যাচ খেলতে। আর উনি যখন সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি করবেন তখন স্বয়ং রাজা ওঁর handshake করবেন, রানী তোমার।"

এ-সব শুনে মালশ্রী বললে, "Advance"

মিস বিশ্বাস অমনি দ্বিতীয় বীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য গোল্-কীপার ভূ-ভারতে আর নেই। ইনি বল ঠেকান শুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল উর্ধ্বশ্বাসে মরি-বাঁচি করে ছোটে, তখন এঁর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হয়ে যায়— অন্যের হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। তুমি যদি এঁকে বরণ কর তো ইনি তোমাকে ঐ অপূর্ব ও অমূল্য মাথায় করে রাখবেন।"

মালা আবার বললে, "Advance"

মিস বিশ্বাস তৃতীয় বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে শুরু করলেন, "ইনি হচ্ছেন ঘুসি ঘোষ। ঐ যে ওঁর দু হাত জোড়া দুটো পাঁওরুটি রয়েছে, ও bread নয়— stone। ও-রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙে আর দাঁতকপাটি লাগে। তুমি যদি এঁকে বরণ কর তা হলে ঐ রুটির অন্তরে যে রক্তমাংসের হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।"

আবার শোনা গেল— "Advance"

মিস বিশ্বাস চতুর্থ বীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "উনি হচ্ছেন নগা নাগ, the world-hockey-champion— আর তার লক্ষণ সব ওঁর দেহেই রয়েছে। ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম, সে কতকটা রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোলজাতীয় হকি-খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ লেগে। মহাবীরের রূপ এইরকমই হয়। তাদের দেহের গুণ রূপকে ছাপিয়ে ওঠে।"

জোর গলায় হুকুম এল— "Advance"

মিস বিশ্বাস পঞ্চম বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "এঁর নাম খঞ্জন

মিত্তির। Tennis groundএ ইনি খঞ্জনের মতো লাফিয়ে বেড়ান বলে লোকে এঁর পিতৃদত্ত নাম রঞ্জন খ'ণ্ডে খঞ্জন করেছে। এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের, তার কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মতো বলের দরকার নেই, কৃষ্ণের মতো ছলই যথেষ্ট। এ খেলায় muscle চাই নে, চাই শুধু nerve।"

মালা বললে, "Advance"

অতঃপর মিস বিশ্বাস লিপিবীরের স্বমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, "ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভঞ্জ, প্রসিদ্ধ 'তেজপত্রে'র সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজ পত্রের সহকারী সম্পাদক, সে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেন নি। তেজপত্র যে কতদূর তেজপূর্ণ, তা তো তুমি জান, কারণ তুমি তা পড়েছ। তার দু পত্র পড়লেই পাঠকের শিরায়-উপশিরায় ধমনীতে-উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়। তখন পাঠকের অন্তরে আর ধৈর্য থাকে না, উথলে ওঠে শুধু বীর্য। The pen is mightier than the sword— এ কথা যে সত্য তা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছে ওঁর হাতের ঐ কলমটি।"

মালা হুকুম করলে— "Forward"

মিস বিশ্বাস হাতে সোনার থালা ও ফুলের মালা নিয়ে শেষ কর্মবীর ও প্রথম জ্ঞানবীরের মধ্যে যে হাত-দশেক ব্যবধান ছিল, ধীরে ধীরে তা অতিক্রম করতে লাগলেন; এ দিকে মালশ্রী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তোর হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তার পর আমার বাঁ পাশে এসে আমার বাঁ হাত ধরে দাঁড়ালে। আর আমি আমার অসি খাপমুক্ত করতে বাধ্য হলুম। এ ব্যাপার দেখে সভাসুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তার পর হঠাৎ রামরঙ্গিলা ছোকরা চিৎকার করে তার ভাই বদ্রীকে জানালে, "মালা হামলোককা মিল গিয়া, আর এইসা তেইসা মালা নেই— একদম মোতিকো মালা।" অমনি রাম সিংদের দল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল— "জয় লীললাল সিংকো জয়!"

রাজাবাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমার দলবলের এই ক্ষত্রিয়োচিত জয়জয়কার শুনে তিনি বললেন, "ই বাৎ হো নেই সেক্তা।"

রামরঙ্গিলা অমনি বললে, "অগর হো নেই সেক্তা তো হুয়া কৈসে?"

আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললুম, "তোম চুপ রহো।" আর রাজাসাহেবকে সম্বোধন করে বললুম, "হুজুর, ইন্‌কো লেড়কপন্‌কা চঞ্চলতা মাপ কিজিয়ে।" অমনি আবার সব চুপ হয়ে গেল।

তখন রাজাবাহাদুর বীরের দলকে সম্বোধন করে বললেন, "হে বীরগণ এখন তোমাদের কর্তব্য করো। দরওয়ান-বেটার হাত থেকে মালাকে ছিনিয়ে নেও।"

এ কথা শুনে কর্মবীররা চুপ করে রইলেন, কিন্তু জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন উঠে বললেন, "মহাশয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনোই কর্তব্য নেই। আপনার মেয়ে তো আমাদের প্রত্যাখ্যান করে নি, করেছে কর্মবীরদের। ওঁরাই এখন যথাবিহিত করুন।"

কর্মবীররাও নড়বার চড়বার কোনো লক্ষণ দেখালেন না। শুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেলতে লাগলেন। লিপিবীরের ঠেলাতে অস্থির হয়ে খঞ্জন মিত্তির উঠে বললেন, "রাজাবাহাদুর, এ তো playground নয়— battle-field। আমরা নিরস্ত্র, ওরা সশস্ত্র ; আমাদের হাতে আছে শুধু ব্যাটবল, আর ওদের হাতে আছে তলওয়ার। এ অবস্থায় আমরা 'যুদ্ধং দেহি' বলতে পারি নে। এই দু মিনিট আগে শুনলুম— The pen is mightier than the sword ; তা যদি হয় তো তেজপত্রের সম্পাদক কলম হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ঐ প্রস্তাবে লিপিবীর মিস বিশ্বাসের পিছনে আশ্রয় নিলে।

এই-সব ব্যাপার দেখে শুনে মালা আমার কানে কানে বললে, "দেখলে বাবার ফরমায়েসী বীরের দল ?"

তার পর রাজাবাহাদুর বললেন, "দেখছি তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না, আমার মেয়ে আমিই উদ্ধার করব।" এর পর তিনি নটনারায়ণের কানে কানে কি বললেন। সে অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আর মিনিট-খানেকের মধ্যে লেঠেলের সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রাজাবাহাদুর বললেন, "যাও সরিতুল্লা, যাও। তোমরা গিয়ে ডাক ছাড়ো, তার পর যেমন যেমন দরকার হবে তেমনি হুকুম দেব।" সরিতুল্লা "হুজুর মালিক" বলে রাজাবাহাদুরের পায়ের ধুলো জিভে ঠেকিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে যাবামাত্র লেঠেলরা সকলে গলা মিলিয়ে "লা আল্লা ইল আল্লা মহম্মদ রসুল-উ-উ-উ-উ-ল" বলে ভীষণ জিগির

ছাড়লে, যেন মনে হল এইবার সভায় ডাকাত পড়বে। আর তাই শুনে রামসিংয়ের দল "সীতাপতি রামচন্দ্রজিকো জয়" বলে হুংকার দিয়ে উঠল। মনে হল, এইবার তুইদলে যুদ্ধ বাধে।

জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাতুরকে বললেন, "মহাশয় করছেন কি, একটা হিন্দু-মুসলমানের riot বাধাবেন নাকি? এমন জানলে তো এখানে কখনো আসতুম না, এখন বেরোতে পারলে বাঁচি। যা করতে হয় করুন, কিন্তু non-violent উপায়ে।" রাজাবাহাতুর উত্তর করলেন, "শান্ত উপায় অবলম্বন করতে আমি সদাই প্রস্তুত, অবশ্য তা যদি ক্ষাত্রধর্মের অবিরোধী হয়।"

আমি দেখলুম, আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা কিছু নয়। অমনি আমার দলবলকে হুকুম দিলুম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে। যেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি আমি আমার মাথার পাগড়ি ও কোমরের বেল্ট খুলে ফেললুম। রাজাবাহাতুর আমার দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "কে, নীল-লোহিত নাকি!" আমি বললুম, "আজ্ঞে আমি নীল-লোহিত শর্মা।" আমার পরিচয় পেয়েই বাস্থ বোস, ঘুসি ঘোষ, নেড়া দত্ত, নগা নাগ ও খঞ্জন মিত্র সমস্বরে চিৎকার করে উঠল— "Three cheers for the conquering hero"। তার পর হুর্‌রে হুর্‌রে শব্দে সভাগৃহ কেঁপে উঠল। দেখলুম এরা সত্যসত্যই sportsman বটে। এদের মধ্যে একমাত্র লিপিবীর ক্রোধকম্পান্বিত কলেবর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "এ মূর্খের দলে ঢোকাই আমার ভুল হয়েছিল। রাজাবাহাতুরের মতো বাঙালিদের আজও এ জ্ঞান হয় নি যে, গোঁয়ার ও বীর এক জিনিস নয়। যাই একবার কলকাতায় ফিরে, এ বিষয়ে একটি চুটিয়ে আর্টিকেল লিখব।" তিনি মনের আক্ষেপ এই কটি কথায় প্রকাশ করে দ্রুতপদে জ্ঞানবীরদের কাছে গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে তাদের কানে কি মন্ত্র দিতে লাগলেন।

একটু পরে রাজাবাহাতুর অতি ধীর গম্ভীর বুনিয়াদী গলায় বললেন, "আমার মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ং তোমাকে বরণ করেছে, তখন এ বিবাহে আমার কোনো ন্যায্য আপত্তি থাকতে পারে না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান আর মালশ্রী ক্ষত্রিয়-কন্যা; স্থতরাং এ বিবাহ কি শাস্ত্রসংগত হবে?"

আমি বললুম—

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখো পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখো পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ, তথা তথা এই রঙ্গ॥"

এ কথা শুনে জ্ঞানবীরদের দলের একজন দোজবরে D. L. দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "এ বিয়ে দিতে চান দিন, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এইটুকু শুধু জেনে রাখবেন যে তা সম্পূর্ণ illegal হবে। মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই। উদ্‌বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন, কারণ বিদ্যাসুন্দরকে কোনোমতেই ধর্মশাস্ত্র বলা যায় না। যদি এ বিষয়ে শেষ কথা আর সার কথা জানতে চান তো Sir Gurudasএর *Marriage & Stridhan* পড়ুন। আর ও বই পড়া আপনার নিতান্ত দরকার, কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু marriage নয়, স্ত্রীধনের কথাও রয়েছে।"

আমি জবাব দিলুম, "শাস্ত্রফাস্ত্র জানিও নে, মানিও নে। কারণ—

আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই॥
মোর মালা মোরে দেহ, মোর মালা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাকো তুমি, আমি যাই গেহ॥"

রাজাবাহাদুর আমার কথা শুনে থ হয়ে রইলেন। এর পর প্রমাণ পেলুম যে, পটলডাঙার পণ্ডিতেরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠের খেলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য, আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

রাজাবাহাদুর উভয়সংকটে পড়েছেন দেখে খঞ্জন মিত্তির চেঁচিয়ে বললেন, "অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসংগত। সুতরাং এ বিবাহ দিলে আপনার পণও রক্ষা হবে, জাতও রক্ষা হবে।"

রাজাবাহাদুর এই সুসংবাদ শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। D. L.টি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আইনের আর-এক ফেঁকড়া তুললেন। তিনি বললেন, "যদিচ ওরকম বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ, তবুও তা শাস্ত্রসংগত হতে পারে, যদি ওঁর পূর্ববিবাহিত স্ত্রী ব্রাহ্মণী হন।"

রাজাবাহাদুর অমনি আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "আজ্ঞে আমার প্রথম স্ত্রী তো আমি স্বয়ম্বর-সভা থেকে সংগ্রহ করি নি। সে শুধু ব্রাহ্মণী নয়, উপরন্তু কুলীন-কন্যা, লক্ষ্মীপাশার মেয়ে, সুতরাং সপত্নীতে আর আপত্তি নেই।" যেই এ কথা বলা, অমনি মালশ্রী আমার হাত ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে বাপের কাছে ছুটে গিয়ে বললে, "এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না, প্রাণ গেলেও নয়। স্বামী নিয়ে partnership business !"

আমি বললুম, "মালশ্রী, আমি বিপদে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি যে কার্তিক ছিলুম, সেই কার্তিকই আছি।"

মালশ্রী উত্তর করলে, "তা হলে সেই কার্তিকই থাকো। মিথ্যাবাদীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করব না, প্রাণ গেলেও নয়।"

আমি বললুম, "তাই সই, আমি চিরকুমারই থাকব। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর !"

মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললে, "আমিও চিরকুমারী হয়ে থাকব। এর পর আমি পুরুষ-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নারী-আন্দোলনে যোগ দেব।"

এ কথা বলেই সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

এর পর আমি সটান স্টেশনে চলে গেলুম, একলা হেঁটে নয়, মোটরগাড়িতে নটনারায়ণের সঙ্গে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "মালার কি হল ?"

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "সে খোঁজ তুমি করো-গে। আমি ঘটক নই।"

এর পর রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "আর মোতির মালাটা ?"

নীল-লোহিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "সেটি তোমার চাই নাকি ? তুমি দেখছি রামরঙ্গিলার মাসতুতো ভাই। মালা গেল তাতে দুঃখ নেই, মোতির মালা হারালো এইটিই হচ্ছে জবর ট্রাজেডি ! বাঙালি জাতটে হাড়ে ছিবলে। কোনো serious জিনিস তোমরা ভাবতেই পার না, বুঝতেও পার না। তোমাদের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে প্রহসন। যাও সকলে মিলে পড়ো গিয়ে 'বিবাহ-বিভ্রাট'।"

এই শেষ কথা বলে নীল-লোহিত কপালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মাথার ঘাম কি চোখের জল মুছতে মুছতে, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলুম। কারণ নীল-লোহিতের ধমক সত্ত্বেও ব্যাপারটাকে ট্রাজেডি বলে আমরা বুঝতে পারলুম না, আমাদের মনে হল, ওটি একটি roaring farce।

কার্তিক ১৩৩৮

ভূতের গল্প

আমি কখনো ভূত দেখি নি, আর যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কি যে দেখেছেন, তা বলতে পারেন না। তাঁদের কথা প্রায়ই অস্পষ্ট, তার কারণ, ভূত হচ্ছে অন্ধকারের জীব— তার কোনো কাটাছাঁটা রূপ নেই।

আমি একটি ভদ্রলোকের মুখে দিনতুপুরে রেলগাড়িতে যে অদ্ভুত গল্প শুনেছি, তার প্রধান গুণ এই যে, ব্যাপার যা ঘটেছিল, তার একটা স্পষ্ট রূপ আছে।

আমি কলেজ থেকে বেরিয়ে রেলরাস্তায় কন্‌ট্রাক্টরি কার্জে ভর্তি হই। ঐ ছিল আমার পৈতৃক ব্যাবসা। আমি একবার পারলাকিমেডি যাচ্ছিলুম। পারলাকিমেডি কোথায় জানেন? গঞ্জাম জেলায়। বি.এন্‌.আর.-এর বড়ো লাইন থেকে পারলাকিমেডি পর্যন্ত যে ফেঁকড়া লাইন বেরিয়েছে, সে লাইন তৈরির কন্‌ট্রাক্ট আমরাই নিই। আর তারই হিসেব-নিকেশ করতে সেখানকার রাজার ওখানে যাই।

গাড়ি যখন বিরহামপুর স্টেশনে পৌছল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। ঐ এগারোটা বেলাতেই মাথার উপরে আর চার পাশে রোদ এমনি খাঁ খাঁ করছিল যে, কলকাতায় বেলা তুটো-তিনটেতেও অমন চোখ-ঝলসানো রোদ দেখা যায় না। সে তো আলো নয়, আগুন। এরকম আলোয় পৃথিবীতে অন্ধকার বলেও যে একটা জিনিস আছে, তা ভুলে যেতে হয়।

গাড়ি স্টেশনে পৌছতেই একটি হৃষ্টপুষ্ট বেঁটেখাটো সাহেব এসে কামরায় ঢুকলেন। তিনি যে একজন বড়ো সাহেব তা বুঝলুম তাঁর উর্দি-পরা চাপরাশীদের দেখে। তুটি-একটি বাবুও সঙ্গে ছিলেন, মাদ্রাজী কি উড়ে চিনতে পারলুম না; কিন্তু তাঁদের ধরন-ধারণ দেখে বুঝলুম যে, তাঁরা হচ্ছেন সাহেবের আফিসের কেরানী। কারণ তাঁরা সাহেবের জিনিসপত্র সব গাড়িতে উঠল কি না দেখতে প্লাটফরমময় ছুটোছুটি করছিলেন আর মধ্যে মধ্যে কুলিদের পিঠে ও মাথায় চড়টা-চাপড়টা লাগাচ্ছিলেন। অবশেষে গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে সঙ্গীটিকে দেখে আমার একটু অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। কারণ, তাঁর চেহারাটা ঠিক বুল-ডগের মতো— তার উপর তাঁর মুখটি ছিল আগাগোড়া সিঁতুরে লেপা। আমি ভাবলুম, রোদে তেতে মুখ এরকম লাল হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরেই হুইস্কির বোতল খুলে একটি গ্লাসে প্রায় আট আউন্স

ঢেলে, তার সঙ্গে নামমাত্র সোডা সংযোগ করে এক চুমুকে তা গলাধঃকরণ করলেন।

তার পর ঠোঁট চেটে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, যে, "Will you have some?" আমি বললুম, "No, thank you।" এ কথা শুনে তিনি বললেন, "There is not a drop of headache in a gallon of that. It is pucca Perth— my native place।"

আমি ও হুইস্কি এত নিরীহ শুনেও যখন তাঁর অমৃতে ভাগ বসাতে রাজি হলুম না, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "Don't you drink?"

আমি বললুম, "I do, but I drink brandy।"

এ মিথ্যে কথা না বললে, আমাকে তাঁর এক গেলাসের ইয়ার হতে হত। আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, "Damned constipating stuff, bad for one's liver. However, don't drink too much।"

এর পর তিনি আমাকে pucca Perthএর রসাস্বাদ করতে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। নিজেই তাঁর মেজাজ ঝালিয়ে নিতে যখন-তখন ঢুকঢাক আরম্ভ করলেন। আমি যখন বেলা দুটোয় গাড়ি থেকে নেমে যাই তখন তিনিও তাঁর খালি বোতল গাড়ির জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন, আর-একটি নূতন বোতলের মাথার রাঙতার পাগড়ি খুলতে বসে গেলেন।

লোকটা দেখলুম বেজায় মদ খায় বটে, কিন্তু বে-এক্তিয়ার হয় না। হুইস্কির প্রসাদেই হোক, আর যে কারণেই হোক, তিনি ক্রমে মহা-বাচাল হয়ে উঠলেন ও আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন; অর্থাৎ সে গল্পের আমি হলুম শ্রোতা-মাত্র, আর তিনি হলেন বক্তা।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন যে, তিনিও এ অঞ্চলের একজন বড়ো সরকারি এঞ্জিনিয়ার। আর কার্যসূত্রে তিনি ও দেশে কি কি দেখেছেন আর তাঁর জীবনে কি কি অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে, সে সম্বন্ধে নানারকম খাপছাড়া ও এলোমেলো বক্তৃতা করলেন। দেখলুম, লোকটা শুধু মধুরসের নয়, মধুর রসেরও রসিক।

গঞ্জাম ছাড়িয়েই মাদ্রাজ। আর মাদ্রাজে নাকি দেদার অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে আছে। যদিচ পথে-ঘাটে যাদের দেখা যায়, তারা সব যেমন কালো, তেমনই কুৎসিত। তবে যারা A. I. সুন্দরী, তারা সব অসূর্যম্পশ্যা। আর

এই-সব গুপ্তরত্নদের সন্ধান দিতে পারে, আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে শুধু P. W. D.র বড়ো বড়ো মাদ্রাজি কন্ট্রাক্টররা। সেইসঙ্গে তিনি বললেন যে, তুমি যখন একজন বাঙালি কন্ট্রাক্টর, তখন তুমি যদি এ দেশে প্রেম করতে চাও তো তোমার তা করতে হবে ঐ-সব কালো কুলি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে— সে প্রেমের ভিতর কোনো রোমান্স নেই, আর আছে নানারকম বিপদ। তার পর তাঁর অনেক প্রেমের কাহিনী শুনলুম। দেখলুম ভদ্রলোকের জীবনে যা যা ঘটেছে, সবই রোমান্টিক। কিন্তু তার বর্ণনা বিষম realistic। সেই-সব মাদ্রাজী হেলেন-ক্লিওপেট্রাদের কথা সত্য কিম্বা সাহেবের সুরাস্বপ্ন, তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু তার একটি গল্প সত্য বলেই মনে হল, আর সেইটেই আজ বলব। গল্প সাহেব বলেছিলেন, ইংরেজিতে, আর আমি বলব বাঙলায়। আমি তো আর কিপলিং নই যে, মাতালের মুখের ভূতের গল্প দা-কাটা ইংরেজিতে আপনাদের কাছে বলতে পারব।

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা

আমি যখন বিলেত থেকে চাকরি পেয়ে প্রথম এ দেশে আসি, তখন এ অঞ্চলের একটি জঙ্গুলে জায়গা হল আমার প্রথম কর্মস্থল।

কাজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরি করা, আর সেইসঙ্গে আমার পূর্বে যিনি এ কাজে ছিলেন, অর্থাৎ মি. রোজার্স, তাঁর কবরের উপর একটি স্মৃতিমন্দির খাড়া করা। এখানে চাকরি করতে এসে নাকি অনেক এঞ্জিনিয়ার আর বাড়ি ফেরে নি— কবরের ভিতর চলে গেছে।

আমি কতক হেঁটে, কতক ঘোড়ায়, বহু কষ্টে কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি, চার পাশে শুধু ঘোর জঙ্গল, আর মধ্যে মধ্যে ছোটো ছোটো নেড়া পাহাড়। আর যেখানে একটু সমান জমি আছে, সেখানেই দু-চার ঘর লোকের বসতি। আর এই-সব স্থানীয় লোকেরাই জঙ্গল কাটে, মাটি খোঁড়ে, রাস্তায় কাঁকর ফেলে, আর দুরমুস দিয়ে পিটিয়ে তা দুরস্ত করে।

একটি দুশো ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর ছিল একটি P. W. D. বাংলো। সে বাংলোটির তিন কাল গেছে আর এক কাল আছে। শুনলুম সেখানেই আমাকে থাকতে হবে। সঙ্গে থাকবে আমার আদি-দ্রাবিড় চাকরবাকর আর দুজন স্থানীয় চৌকিদার। আমার বাসস্থান দেখে মন দমে গেল।

কোথায় Perth আর কোথায় এই ভূতপ্রেতের শ্মশান!

সে যাই হোক, ঘরে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত্তিরে ডিনারের পর শুতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন চৌকিদার এসে বললে যে, "শোবার আগে নাবার ঘরের দুয়োরটা ভালো করে বন্ধ করবেন, ও ঘরে একটি বাতি রাখবেন। এখানে কত-কিছুর ভয় আছে। আর রাত্তিরে কেউ যদি আপনার ঘরে ঢোকে তো আমাদের ডাকবেন। আমরা এই বারান্দাতেই শুয়ে থাকব।"

শোবার ঘরে ঢোকবার আগে এমনিতেই আমার গা ছম্‌-ছম্‌ করছিল, তার উপর চৌকিদারের কথা শুনে গা আরো ভারী হয়ে উঠল। পা যেন আর চলে না। শেষটায় ঘরে ঢুকে দুয়োর বন্ধ করলুম, তার পর বিছানার পাশে টেবিলের উপর একটি ছোট্ট ল্যাম্প ও রিভলভার রেখে শুয়ে পড়লুম।

রাত দুটো পর্যন্ত ঘুম হল না, নানারকম ভাবনা-চিন্তায়— যে ভাবনা-চিন্তার কোনোরূপ মাথা-মুণ্ডু নেই। তার পর যেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, অমনি একটা খট্‌খট্‌ আওয়াজ শুনে জেগে উঠলুম। প্রথমে মনে হল, নাবার ঘরের কবাট হয় বাতাসে নড়ছে, নয় ইঁদুরে ঠেলছে। এ দেশে এক-একটা ইঁদুর এক-একটা বেড়ালের মতো।

তার পর যখন দেখলুম শব্দ আর থামে না, তখন বিছানা থেকে উঠে রিভলভার হাতে নিয়ে নাবার ঘরের দরজা খুলে দিলুম।

খুলেই দেখি, একটি স্ত্রীলোক। চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু কানে দুটি বড়ো বড়ো প্রবাল গোঁজা, আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখের বালা। মাথার বাঁ দিকে চুড়ো বাঁধা ছিল, আর পরনে এক হাত চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। এ মূর্তি দেখে আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সে আমাকে দেখে হেসে বললে, "তোমার ও পিস্তল দেখে আমি ভয় পাই নে। গুলি আমার গায়ে লাগবে না। আমি কেন এখানে এসেছি জান? তুমি যার বদলী এসেছ, আমি ছিলুম সেই রাজাসাহেবের রাজরানী। এই হচ্ছে আমার ঘর, এই হচ্ছে আমার বাড়ি। আমি ঐ খাটে শুতুম, আর ঐ চৌকিতে বসে কাঁচের গেলাসে বিলেতি আরক খেতুম। এক কথায় আমি রানীর হালে ছিলুম। তার পর রাজাসাহেব একবার ছুটি নিয়ে বিলেত গেল, আর ফিরে এল মোমের পুতুলের মতো একটি বিলেতি মেম নিয়ে।

আর আমাকে দিলে সরিয়ে। সাহেব কিন্তু আমাকে মাস-মাস খরচার টাকা পাঠিয়ে দিত।

"তার মাসখানেক পর সে মেমটি একদিন হঠাৎ মারা গেল, অথচ তার কোনোরকম ব্যারাম হয় নি। রাজাসাহেব তাঁর স্ত্রী কিসে মারা গেল, ভেবে পেলেন না। তার পর তাঁর চৌকিদার তাঁর কানে কি মন্তর দিলে। তাতেই ঘটল সর্বনাশ। ও বেটা ছিল আমার দুষমন।

"মেমটি মারা যাবার কিছুদিন পরে যখন দেখলুম সাহেব আর আমাকে ডেকে পাঠালে না, তখন আমি মনে করলুম, সাহেবের কাছে নিজেই ফিরে যাই। সে আমাকে আবার নিশ্চয়ই ফিরে নেবে। রাজাসাহেবকে আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি তো জানতুম। দিনটে কুলি-মজুর নিয়ে কাটাতে পারলেও, রাত্তিরে আমাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

"যে রাত্তিরে ফিরে এলুম এই নাবার ঘর দিয়ে, রাজাসাহেব তোমারই মতো পিস্তল হাতে করে এসে আমাকে দেখবামাত্রই গুলি করলে। আর ঐ দু বেটা চৌকিদার আমার লাস জঙ্গলে ফেলে দিলে।"

এই কথা বলে সে ঘরের ভিতর তাকিয়ে বললে, "ঐ দেখো, রাজা-সাহেব আসছে।" আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, খাটের পাশে ছ ফুট লম্বা একটি ইংরেজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে। মরা মানুষের মতো তার ফ্যাকাসে রঙ, আর শরীরে আছে শুধু হাড় আর চামড়া। আর খাটে ধবধবে কাপড়ের মতো সাদা একটি ইংরেজ মেয়ে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে বললে, "ও পিশাচী এখনো মরে নি। ও এখনো বেঁচে আছে। ঐ আমার স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে। নতুন সাহেব এসেছে শুনে এখানে এসেছে আবার তার স্কন্ধে ভর করতে। আর ভর ও নির্ঘাত করবে; কারণ ও জাদু জানে। ওর হুইস্কির চাইতেও সাদা চামড়ার উপর টান বেশি। আর তুমি যদি ওর রূপের আগুনে পুড়ে মরতে না চাও— যেমন আমি মরেছি— তবে এখনিই ওকে গুলি করো।"

এ কথা শুনে ব্লু-ভেনাস উত্তর করলে, "মিথ্যা কথা। আমি ওর স্ত্রীকে মারি নি। ও-ই আমাকে মেরেছে, তার পর নিজে মদ খেয়ে মরেছে।"

সাহেবটি আমাকে বললেন, "আমার কথা শোনো, ছোঁড়ো তোমার রিভলভার— আর দেরি নয়।"

এই-সব দেখেশুনে ভয়ে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, আর আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। তাই আমি না ভেবেচিন্তে রিভলভার ছুঁড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতল মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল, আর বাতিও নিভে গেল।

গোলমাল শুনে চৌকিদাররা লণ্ঠন হাতে করে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। আমি তাদের বললুম যে, "ঘরে চোর ঢুকেছিল, তাই আমি পিস্তল ছুঁড়েছি।" তারা একটু হাসলে, তার পর সমস্ত বাড়ি আর তার চারপাশ খুঁজে কাউকেও দেখতে পেলে না। তখন বুঝলুম যে, রাত্তিরে আমার ঘরে যা হয়েছিল, সে ভূতের কাণ্ড। তার পর থেকেই আমি আর একা শুতে পারি নে, শুলেই ঐ ব্লু-ভেনাস চোখের সুমুখে এসে খাড়া হয়, আর আমি অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাই। অবশ্য এখন আর সে আসে না, কিন্তু তার স্মৃতিই আসে তার রূপ ধরে।

এর পর সাহেব এই বলে তাঁর বলা শেষ করলেন যে—"শেষটায় যাতে একা শুতে না হয়, তার জন্য বিয়ে করলুম। আমার স্ত্রী Pucca Perth, ঘোর খৃস্টান ও সম্পূর্ণ নির্ভীক। সে ভূতে বিশ্বাস করে না, করে শুধু ভগবানে। আর আমি ভগবানে বিশ্বাস করি নে, কিন্তু ভূতে করি। আমরা এঞ্জিনিয়াররা সব scientific men, ধর্মের রূপকথা হেসে উড়িয়ে দিই, আর শুধু তাই বিশ্বাস করি, যার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাই। এই-সব কারণে এ গল্প আমি মুখ ফুটে আমার স্ত্রীর কাছে বলতে পারি নি এই ভয়ে যে, আমার কথা সে হেসে উড়িয়ে দেবে।"

এঞ্জিনিয়ার সাহেবের গল্প শুনে আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে blue devil, D. T.র প্রসাদে।— কিন্তু তাঁর মুখে ভীষণ আতঙ্কের চেহারা দেখে চুপ করে রইলুম। তার পরেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম।

আমি অবশ্য এই সাদা-কালো ভূতের মারাত্মক প্রণয়-কলহের রোমান্টিক কাহিনী বিশ্বাস করি নি ; কিন্তু সে রাত্তিরে পারলাকিমেডির ডাক-বাংলোর চৌকিদারকে আমার ঘরে শুইয়েছিলুম।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

দিদিমার গল্প

এ গল্প আমি শুনেছি আমার সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু নীলাম্বর মজুমদারের কাছে। তিনি শুনেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছে। নীলাম্বরের বয়স যখন দশ, তখন তাঁর দিদিমার বয়স সত্তর, আর এই সময়ই দিদিমা নীলাম্বরকে এই গল্পটি বলেন। গল্পের ঘটনা যে সত্য, তার প্রমাণ নীলাম্বরের দিদিমা ছিলেন নিরক্ষর, অতএব কোনো বই থেকে তিনি এ গল্প সংগ্রহ করেন নি। আর রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া অন্য বিষয়ে ছেলেদের গল্প বলা সে কালে মেয়েদের অভ্যাস ছিল না। তবে যদি কোনো বিশেষ ঘটনা তাঁদের মনে গাঢ় ছাপ রেখে যেত— এমন যদি কিছু ঘটত যা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারতেন না, তা হলে কখনো কখনো সে কথা ছেলেদের বলতেন। এরকম ঘটনা এ কালে বোধ হয় ঘটে না। কিন্তু আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালি-সমাজে ঘটা অসম্ভব ছিল না। কি ধর্মের, কি অধর্মের, সেকেলে জোর এ কালে নেই।

নীলাম্বরদের গ্রামে একটি প্রকাণ্ড ভিটে পড়ে ছিল, তার অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা, আর একপাশে ছিল মস্ত একটি দিঘি। নীলাম্বর জানত যে তাদের মজুমদার-বংশেরই একটি উচ্ছন্ন পরিবারের বাস্তুভিটের এগুলি ধ্বংসাবশেষ। এককালে নাকি ধনেজনে তারাই ছিল গ্রামের ভিতর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। বাড়ির বুড়ো চাকরদের কাছে শিশুকাল হতে নীলাম্বর এই পরিবারের ঐশ্বর্য ও পূজাপার্বণ ক্রিয়াকর্মের জাঁকজমক ধুমধামের কথা শুনে এসেছে। কি কারণে তাদের এমন দুর্দশা ঘটল ও বংশলোপ হল, তা জানবার জন্য নীলাম্বরের মহা কৌতূহল ছিল।

সে একদিন তার দিদিমাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "এ হচ্ছে ধর্মের শাস্তির ফল।"

নীলাম্বর বললে, "ব্যাপার কি হয়েছিল বলো।"

২

দিদিমা বললেন—

ঐ-যে পড়ো ভিটে দেখছ যা এমনি জঙ্গলে ভরে গেছে যে দিনের বেলায়ও বাঘের ভয়ে লোক সে দিক দিয়ে যায় না, আর যেখানে শুধু পাঁচ

হাত লম্বা বন্দুক দিয়ে বুনোরা কখনো কখনো শুয়োর শিকার করে, ঐ ছিল তোমাদের পরিবারের সব চাইতে বড়ো জমিদার স্বরূপনারায়ণের বাড়ি। তিনি নবাব সরকারের চাকরি করে অগাধ পয়সা করেছিলেন। তা ছাড়া লোককে বিচার করা ও তাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতাও, গৌড়ের বাদশার সনন্দের বলে, তাঁর ছিল বলে শুনেছি। যদিচ তাঁর রাজা খেতাব ছিল না, রাজার সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর ছিল, এমন-কি, মানুষকে কোতল করবারও। ঐ-যে প্রকাণ্ড দিঘি দেখতে পাও যা আজ পানায় বুজে গেছে, ওটি শুনতে পাই তাঁর কয়েদীদের দিয়ে কাটানো। আমি অবশ্য তোমাদের বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসে বড়ো তরফের সৈন্যসামন্ত কিছুই দেখি নি, কারণ তখন আর নবাবের আমল নেই— হয়েছে ইংরাজের আমল। জমিদারেরা সব হয়ে পড়েছে শুধু জমির মালিক, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়। তবে আমি যখন এ বাড়িতে আসি, তখনো বড়ো তরফের খুব রবরবা সময়, দাসদাসী পাইক-বরকন্দাজ গুরুপুরোহিত আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রায় শতাধিক লোক ও-বাড়ি সরগরম করে রেখেছিল। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় ওখানে পাশা খেলার আড্ডা বসত আর গ্রামের যত নিষ্কর্মা বাবুর দল বড়ো বাড়িতে গিয়ে জুটত, আর রাত দুটো-তিনটেয় আড্ডা ভাঙলে ওখানেই আহার করে বাড়ি ফিরত। তার পর হত বাড়ির মেয়েদের ছুটি। এরই নাম নাকি সেকেলে জমিদারি চাল।

৩

সে যাই হোক, আজও এদের ভিটে বজায় থাকত আর ও পরিবারের মোটা ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা থাকত, যেমন তোমাদের আছে, যদি-না ঐ বংশে একটি কুলাঙ্গার জন্মাত। ভৈরবনারায়ণ স্বরূপনারায়ণের প্রপৌত্র। প্রকাণ্ড শরীর, ছোট্ট মাথা, টিয়াপাখির মতো ঠোঁট-ঢাকা নাক, বসা চোখ— ভৈরবনারায়ণ ছিল মূর্তিমান পাপ। সে ছেলেবেলা থেকে কুস্তি লাঠিখেলা তলওয়ার-খেলা সড়কি-চালানো ছাড়া আর কিছুই করে নি। ফলে তার শরীরে ছিল শুধু বল, আর ছিল না দয়ামায়ার লেশমাত্র। পূজার সময় সে পাঁঠাবলি মোষবলি নিজহাতেই দিত, আর মোষবলির পর সে যখন রক্তে নেয়ে উঠত তখন তার কি আনন্দ, কি উল্লাস! গরিব লোকের উপরে তার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না। কারণে-অকারণে সে লোককে মারপিট করত— যেন ভগবান তাকে হাত

দিয়েছেন আর-পাঁচজনের মাথা ভাঙবার জন্য। গাঁ-সুদ্ধ লোক— গাঁ-সুদ্ধ কেন দেশ-সুদ্ধ লোক— তাকে ভয় করত, কারণ তার লোককে খুন করতেও বাধত না। তার সঙ্গী ছিল লাল খাঁ, কালো খাঁ, সরিৎউল্লা ফকির, আর ময়নাল। চার জনেই নামজাদা লেঠেল, আর চার জনই বেপরোয়া লোক। লাল খাঁ, কালো খাঁ ছিল জাতসিপাই— আর যার নুন খায় তার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সরিৎউল্লা ফকির ছিল অদ্ভুত লোক। সে একবার সাত বৎসরের জন্য জেল খেটে বেরিয়ে হল ফকির। তার পরনে ছিল আলখাল্লা, আর গলায় ছিল নানা রঙের কাঁচের মালা। এদানিক কোথাও কাজিয়া বাধলেই সে ফকিরি সাজ ছেড়ে লেঠেলি বেশ ধরত। আর ফকির-সাহেব সড়কি ধরলেই খুন। ময়নাল ছিল নেহাৎ ছোকরা। বছর-আঠারো বয়েস, সরিৎউল্লার সাগরেদ, আর অদ্ভুত তীরন্দাজ। তার তীর যার রগে লাগত, তারই কর্মশেষ। আর তাঁর মন্ত্রী ছিল জয়কান্ত চক্রবর্তী, ওবাড়ির কুল-পুরোহিত। তিনি ভৈরবনারায়ণের সকল রকম দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দিতেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা ছিল যে, মজুমদারবংশে এতকাল পরে একটি দিক্‌পাল জন্মেছে— এই ছোকরাটি বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। এই লেঠেল ও পুরোহিত ছিল তার ইয়ার-বক্‌শি। এত যথেচ্ছাচারের ফলে যে সে জেলে যায় নি, তার কারণ তখন এ অঞ্চলে বিশ ক্রোশের ভিতরও একটি থানা ছিল না।

৪

তার উপর তিনি ছিলেন মহা দুশ্চরিত্র। ভৈরবনারায়ণের দৌরাত্ম্যে গেরস্তর ঝি-বৌদের ধর্ম রক্ষা করা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিল— অবশ্য তাদের দেহে যদি চোখ পড়বার মতো রূপ থাকত। আর কামার-কুমোর জেলে-কৈবর্তদের মেয়েদের গায়ে রঙ না থাক্‌, কখনো কখনো খাসা রূপ থাকে। তিনি কোথায় কার ঘরে সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে দিবারাত্র তার সন্ধান নিজে করতেন আর অপরকে দিয়ে খোঁজ করাতেন, এবং ছলে-বলে-কৌশলে তাকে হস্তগত করতেন। এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ই ছিলেন তাঁর একসঙ্গে দূত আর মন্ত্রী। বাপের একমাত্র সন্তান— ছেলেবেলা থেকে যা-খুশি তাই করেছেন, কেননা তাঁর যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দেবার কেউ ছিল না; তার পর দেহে যখন যৌবন এসে জুটল, তখন ভৈরবনারায়ণ হয়ে

উঠলেন একটি ঘোর পাষণ্ড। ছেলের চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ভৈরবনারায়ণের মা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে, ছেলের কখন কি বিপদ ঘটে। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় তাঁকে বোঝালেন যে, বনেদি ঘরের ছেলেদের এ বয়সে ওরকম ভোগতৃষ্ণা হয়েই থাকে, পরে সে আবার ধীর শান্ত ও ঋষিতুল্য ধার্মিক হয়ে উঠবে; যৌবনের চাঞ্চল্য যৌবনের সঙ্গেই চলে যাবে। তিনি কিন্তু এ কথায় বড়ো বেশি ভরসা পেলেন না, তাই খুঁজেপেতে একটি বছর-চৌদ্দ বয়সের ফিটু গৌরবর্ণ মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিলেন। মহালক্ষ্মীর রূপের ভিতর ছিল রঙ। ছোটোখাটো মানুষটি, নাক চাপা, চোখ দুটি বড়ো বড়ো, কিন্তু রক্তমাংসের নয়— কাঁচের। তিনি ছিলেন গোঁসাইয়ের মেয়ে, জমিদারের নয়, নিতান্ত ভালোমানুষ— যেন কাঠের পুতুল। আর তাঁর ভিতরটা ছিল কাঠের মতোই অসাড়।

৫

এরকম স্ত্রীলোক দুর্দান্ত স্বামীকে পোষ মানাতে পারে না, বরং নিরীহ স্বামীকেই বিগড়ে দেয়। বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ভৈরবনারায়ণের পরস্ত্রীহরণ রোগের কিছু উপশম হয়েছিল। তাঁর মা মনে করলেন, ওষুধ খেটেছে। কিন্তু মার মৃত্যুর পর থেকেই ভৈরবনারায়ণ আবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। মহালক্ষ্মী তাঁর স্বামীর পরস্ত্রী-টানাটানির বিরুদ্ধে একদিনের জন্যও আপত্তি করেন নি, এমন-কি, মুহূর্তের জন্য অভিমানও করেন নি। তাঁর মহাগুণ ছিল তাঁর অসাধারণ ধৈর্য। তাঁর ঐ বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে কখনো রাগে আগুনও বেরোয় নি, দুঃখে জলও পড়ে নি। তিনি ছিলেন হয় দেবতা, নয় পাষাণ। তবে তাঁর শরীরে যে মানুষের রক্ত ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মহালক্ষ্মীদিদি ছিলেন ঘোর ধার্মিক, দিবারাত্র পুজা-আর্চা নিয়েই থাকতেন। কত চরিত্রের কত নামের ঠাকুরদেবতাকে যে তিনি ধূপদীপনৈবেদ্য দিয়ে পুজো করতেন, তার আর লেখাজোখা নেই। তাঁর কারবারই ছিল দেবতাদের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে নয়। কে জানে দেবতা আছেন কি নেই, কিন্তু মানুষ যে আছে, সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। শুধু দিদি জানতেন— দেবতা আছে, আর মানুষ নেই। ফলে তাঁর স্বামীও হয়ে উঠলেন তাঁর কাছে একটি জাগ্রত দেবতা। যে লোককে পৃথিবীসুদ্ধ

লোক ঘৃণা করত, একমাত্র তিনি তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করতেন। অবশ্য ভৈরবনারায়ণকে তিনি ধূপদীপ দিয়ে পুজো করতেন না, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাঁর স্ত্রীধর্ম। স্বামীর সকল দুষ্কর্মের তিনি নীরবে প্রশ্রয় দিতেন, অর্থাৎ তিনিও হয়ে উঠলেন সরিৎউল্লা ফকির ও পণ্ডিতমহাশয়ের দলের একজন। অবশ্য তিনি কখনো কোনো বিষয়ে মতামত দেন নি, তার কারণ কেউ কখনো তাঁর মত চায় নি। তার পর যে ঘটনা ঘটল, তাতেই হল ও পরিবারের সর্বনাশ। সে ব্যাপার এতই অদ্ভুত, এতই ভয়ংকর যে, আজও মনে করতে গায়ে কাঁটা দেয়।

৬

ভৈরবনারায়ণ একদিন বাড়ির ভিতরে এসে দেখেন যে, পুজোর ঘরে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে বসে টাটে ফুল সাজাচ্ছে। তার বয়েস আন্দাজ ষোলো কি সতেরো। তার রূপের কথা আর কি বলব, যেন সাক্ষাৎ দুর্গাপ্রতিমা। মেয়েটিকে দেখে ভৈরবনারায়ণ দিদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? দিদি উত্তর করলেন, "অতসীকে চেন না? ও যে সম্পর্কে তোমারই ভগ্নী, সর্বানন্দ মজুমদারের ছোটো বোন; যার জন্য দেশবিদেশে বর খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু মনোমত কুলীন বর পাওয়া যাচ্ছে না। সর্বানন্দ বলে, অমন রত্ন যার-তার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না। আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি টাটে ফুল সাজাবার জন্য। ও যেমন সুন্দর শিব গড়ে, তেমনি সুন্দর টাট সাজায়।" এ কথা শুনে ভৈরবনারায়ণ বললেন, "তা হলে কাল ওকে আমার জন্য শিব গড়তে আর ফুল সাজাতে বোলো।" দিদি বললেন, "আচ্ছা।"

অতসী পরদিন সকালে এসে অতি যত্ন করে, অতি সুন্দর করে ভৈরবনারায়ণের পুজোর সব আয়োজন করলে। তার পর সেই মূর্তিমান পাপ এসে পুজোর ঘরে ঢুকে, ভিতর থেকে দুয়োর বন্ধ করে দিলে। মহালক্ষ্মীদিদি বাইরে পাহারা রইলেন। ভৈরবনারায়ণ যখন ঘণ্টাখানেক পরে পুজো শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন দিদি ঘরে ঢুকে দেখেন যে অতসী বাসী ফুলের মতো একদম শুকিয়ে গিয়েছে, আর শিব মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর ঘরময় টাটের ফুল-নৈবেদ্য সব ছড়ানো রয়েছে। দিদিকে দেখে অতসী অতি ক্ষীণস্বরে "আমাকে ছুঁয়ো না" এই কথা বলে, ধীরে ধীরে বড়ো বাড়ি

থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে চলে গেল। আর সেখানে গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। সে বিছানা থেকে সে আর ওঠে নি। এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি। তিন দিন পরে অতসী মারা গেল। আর গ্রামের যেন আলো নিভে গেল। কারণ রূপে-গুণে হাসিতে-খেলাতে অতসী এ গ্রাম আলো করে রেখেছিল। সমস্ত মজুমদার-পরিবারের মাথায় বজ্রাঘাত হল, আর সকলের মনেই প্রতিহিংসার আগুন জলে উঠল। শুধু মহালক্ষ্মীদিদির পূজা-আর্চা সমানে চলতে লাগল। স্বর্গের লোভ বড়ো ভয়ংকর লোভ। এই লোভেই তিনি ভীষণ পতিব্রতা স্ত্রী হয়েছিলেন। সকলেই চুপচাপ রইলেন, সর্বানন্দ কি করে দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝড় আসবার পূর্বে আকাশ-বাতাসের যেমন থম্‌থমে ভাব হয়, এ গ্রামের ভাব সেইরকম হল।

সর্বানন্দ ছিলেন ভৈরবনারায়ণের ঠিক উল্টো প্রকৃতির লোক। তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ— সাক্ষাৎ কার্তিক; তার উপরে ঘোর শৌখিন। গেরোবাজ লোটন লক্কা সিরাজু মুখ্‌খি ইত্যাদি হরেকরকম পায়রার তদ্‌বির করতেই তাঁর দিন কেটে যেত। তিনি শ্যামা পাখিকে ছোটো এলাচের দানা ঘিয়ে ভেজে নিজ হাতে খাওয়াতেন। এলাচ খেলে নাকি শ্যামার গানের লজ্জত বাড়ে। তার উপরে তিনি দিবারাত্র গানবাজনা নিয়েই থাকতেন। আর নিজে চমৎকার সেতার বাজাতেন। এর ফলে তিনি চারপাশের ছোটোবড়ো সব জমিদারদের মহা প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। তিনি না থাকলে কারো নাচগানের মজলিস জমত না। বাই খেমটা -মহলে তাঁর পসার নাকি একচেটে ছিল। সর্বানন্দের কিন্তু এ দুর্ঘটনায় বাইরের কোনো বদল দেখা গেল না। সেই হাসিমুখ, সেই মিষ্টি কথা, সেই ভালোমানুষী হালচাল। শুধু তিনি গানবাজনা ছেড়ে দিলেন। আর তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু বড়োনগরের বড়ো জমিদার কৃপানাথ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে, থাকে প্রাণ যায় প্রাণ কবুল করে দুই বন্ধুতে ভৈরবনারায়ণের ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন। যে রাগ সর্বানন্দের বুকে এতদিন ধোঁয়াচ্ছিল, তার থেকে আগুন জলে উঠল। আর সেই আগুনে ভৈরবনারায়ণের সর্বস্ব জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গেল।

৮

ক্রমে ভৈরবনারায়ণ ও সর্বানন্দের লেঠেলরা কাজিয়া শুরু করলে। ফলে এ গ্রাম হয়ে উঠল ভদ্রলোকদের নয়, লেঠেলের গ্রাম। গ্রামের সকলেই ছিলেন ভৈরবনারায়ণের বিপক্ষে, সুতরাং তাঁরা নানারকমে সর্বানন্দের সাহায্য করতে লাগলেন। এমন-কি, আমাদের মেয়েদেরও কাজ হল সর্বানন্দের জখ্‌মী লেঠেলদের শুশ্রূষা করা। আমি নিজের হাতেই কত-না লেঠেলের সড়কির ঘায়ে ঘিয়ের সলতে পুরেছি। এই তো গেল আমাদের অবস্থা। আর প্রজাদের দুঃখের কথা কি বলব। যত টাকার টান হতে লাগল, তাদের উপর অত্যাচার তত বাড়তে লাগল। ভৈরবনারায়ণের প্রজারা জুলুম আর সহ্য করতে না পেরে সব বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তখন তিনি জমিদারি বন্ধক দিয়ে কেঁয়েদের কাছে ঋণ করতে শুরু করলেন। আর নিজে কাপ্তেন সেজে লেঠেলদের দলপতি হয়ে লড়াই চালাতে লাগলেন।

তার পর একদিন রাত্তিরে সর্বানন্দ ও কৃপানাথের লেঠেলরা ভৈরবনারায়ণের বাড়ি আক্রমণ করলে। তখন বর্ষাকাল ; সমস্ত দিন ছিপছিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভৈরবনারায়ণ এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর দলবল সব গিয়েছিল সর্বানন্দের মফস্বল-কাছারি লুঠতে। তিনি বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চড়ে খিড়কির দুয়োর দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সর্বানন্দের লেঠেলরা বড়োবাড়ির দরজা-জানালা ভেঙে, বাড়িতে ধনরত্ন যা ছিল সব লুঠে নিল।

বাড়ির একজন লোক পুজোর আঙিনা দিয়ে পালাতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল। সর্বানন্দের হুকুমে তাকে ধরে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেওয়া হল। লোকে বলে, এ বলি সর্বানন্দ নিজহাতেই দিয়েছিলেন, লোকটাকে ভৈরবনারায়ণ বলে ভুল করে। এ কথা আমি বিশ্বাস করি ; কারণ সর্বানন্দ শৌখিন হলেও, তার বুকে ছিল পুরুষের তাজা রক্ত।

যে ব্যাপার শুরু হয়েছিল স্ত্রীহত্যায়, তার শেষ হল ব্রহ্মহত্যায়। এর পর ও বংশ যে উচ্ছন্নে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। স্বামীর অধর্ম ও স্ত্রীর ধর্ম— এ দুয়ের এই শাস্তি।

৯

দিদিমার এ গল্প শুনেও নীলাম্বরের কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না। সে জিজ্ঞাসা করলে, "এর পর ভৈরবনারায়ণ কি করলেন?" দিদিমা বললেন, "এর পর ভৈরবনারায়ণ আর দেশে ফেরেন নি। লোকমুখে শুনেছি, তিনি কিছুদিন পরে এক ডাকাতের দলে ধরা পড়ে চিরজীবনের জন্য দায়মাল হয়েছেন— লাল খাঁ, কালো খাঁ, সরিৎউল্লা ফকির ও ময়নাল ছোকরা সমেত। দেশ যখন শান্ত হল, তখন আবার সর্বানন্দ মনের সুখে সেতার বাজাতে লাগলেন; যদিচ এই-সব দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, আর তাঁর রূপলাবণ্য সব ঝরে পড়েছিল— যেন শরীরে কি বিষ ঢুকেছে।

"ভৈরবনারায়ণও গেলেন, বড়োবাড়ির সুখের পায়রাও সব উড়ে গেল। ঐ পড়ো বাড়িতে পড়ে রইলেন শুধু মহালক্ষ্মীদিদি আর একটি পুরানো দাসী। আর দিদি ঐ রাবণের পুরীতে একা বসে একমনে দিবারাত্র তুলসীকাঠের মালা জপ করতে শুরু করলেন। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, সর্বানন্দের মনের আগুন একেবারে নেবে নি।

"তবে সর্বানন্দ ব্রহ্মহত্যা করে যে আবার স্ত্রীহত্যা করে নি, সে শুধু তোমার ঠাকুরদাদার খাতিরে। মহালক্ষ্মীকে সকল বিপদ থেকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। তোমার ঠাকুরদাদার ধারণা ছিল যে মহালক্ষ্মী পাগল— একেবারে বদ্ধ পাগল। দিদি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি হাতের শাঁখাও ভাঙেন নি, পাছে তাঁর স্বামীর অমঙ্গল হয়। ভৈরবনারায়ণ যে কবে কোথায় মারা গেলেন, সে খবর আমাদের কেউ দেয় নি। তার পর মহালক্ষ্মীদিদি মারা যাবার পর যে ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়, তাতেই এই পাঁচমহল বাড়ি একেবারে ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। আর সেখানে রয়েছে জঙ্গল, আর বাস করছে বাঘ ও শুয়োর। এরাই এখন ভৈরবনারায়ণের বংশরক্ষা করছে।

"ভালো কথা, আশা করি মহালক্ষ্মীদিদি মরে স্বর্গে যায় নি, কেননা সেখানে গেলে যে অতসীর সঙ্গে দেখা হবে।"

আষাঢ় ১৩৩৯

অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি

কলেজে আমার সহপাঠীদের মধ্যে অবনীভূষণ রায় ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু; অর্থাৎ আমি ছিলেম তাঁর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। প্রথম-যৌবনে পাঁচজনের মধ্যে একজন সমবয়স্ক যুবক যে কেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে, তা বলা কঠিন। কারণ অনুরাগ কিম্বা ভক্তির ভিতর একটা অজানা জিনিস আছে। আমরা সে অনুরাগ বা ভক্তির যখন কারণ নির্দেশ করতে চাই, তখন আমরা সেই-সব কথাই ব্যক্ত করি যা আর-পাঁচজনের কাছে প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমার বিশ্বাস— অন্তত অনুরাগের মূলে এমন-একটা অনির্দিষ্ট কারণ থাকে, যা ঠিক ধরাছোঁয়ার বস্তু নয়; অতএব তা অপরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েও দেওয়া যায় না; অবশ্য অবনীভূষণের শরীরে এমন কটি স্পষ্ট গুণ ছিল, যা কারো চোখ এড়িয়ে যেত না। প্রথমত, অবনীভূষণ ছিলেন অতিশয় প্রিয়দর্শন, উপরন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় ভদ্র। বনেদি ঘরের ছেলের দেহে ও চরিত্রে যে-সব গুণের সদ্ভাব আমরা কল্পনা করি, অবনীভূষণের দেহে ও মনে সে গুণই পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁর তুল্য ধীর ও অমায়িক যুবক আমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। আর ধনীর সন্তানের চরিত্রে যে-সব ছার গুণের নিত্য সাক্ষাৎ পাওয়া যায়— যথা মূর্খোচিত দাম্ভিকতা সর্বজ্ঞতা অনবস্থচিত্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি— সে-সবের লেশমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করে নি, যদিচ অবনী ছিলেন একাধারে বনেদি বংশের ও বড়োমানুষের ছেলে— রায়নগরের বড়ো জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়ের একমাত্র সন্তান; সেকালে কলেজে আমরা প্রায় সকলেই ছিলাম রোমান্টিক প্রকৃতির যুবক। একমাত্র অবনীভূষণের মনে romanticismএর ছাপ কখনো পড়ে নি, ছোপও ধরে নি। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তাঁর কোনোরূপ কৌতূহল, কোনোরূপ মায়া ছিল না; এমন-কি, কোনো মনগড়া সুন্দরীর সঙ্গে তিনি একদিনের জন্যও লভে পড়েন নি। কিসে দেশের অসংখ্য নিরক্ষর নিঃসহায় রোগক্লিষ্ট লোকদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিধান করা যায়, এই ছিল তাঁর প্রধান এবং একমাত্র ভাবনা। অতএব এ ভাবনায় যে তিনি সিদ্ধিলাভ করবেন, তা নিঃসন্দেহ।

এই-সব কারণে আমি আন্দাজ করেছিলুম যে অবনীভূষণ একদিন বাঙলার জমিদারদের মুখোজ্জ্বল করবেন। অবনীর একটি প্রধান গুণ ছিল তাঁর একাগ্রতা।

উপরন্তু ইচ্ছা কার্যে পরিণত করবারও তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ছিল। আমাদের পাঁচজনের মতো তাঁর পেটে কিঞ্চিৎ বিদ্যা ছিল, পরোপকার করবার বাসনা ছিল, তার উপর তাঁর ছিল অর্থসামর্থ্য— যা আমাদের পাঁচজনের ছিল না। আর তাঁর পারিবারিক সঞ্চিত অর্থ তিনি যে আমোদ-আহ্লাদে অপব্যয় করবেন না— সে বিষয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

অবশ্য আমরা অনেকেই নানারূপ শুভসংকল্প নিয়ে কলেজ থেকে বেরোই, কিন্তু জীবনে সে সংকল্প কার্যে পরিণত করতে পারি নে। সামাজিক জীবনকে আমাদের মনোমত পরিবর্তন করা যে আমাদের পক্ষে অসাধ্য না হোক দুঃসাধ্য —দুদিনেই তা বুঝতে পারি বলে আমাদের কর্মজীবনকে সামাজিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই ব্রতী হই। আর যিনি যতটা খাপ খাওয়াতে কৃতকার্য হন, তিনিই ততটা কৃতিত্ব লাভ করেন। দুঃখের বিষয় অবনীভূষণ সামাজিক জীবনের স্রোত উজান বহাতে পারেন নি— শুধু তাই নয়, নিজের জীবনকে অদ্ভুত ট্রাজেডিতে পরিণত করেছিলেন। কি কারণে, সেই কথাটা আজ বলব।

কলেজের যুগটা পার হলেই আমরা পাঁচজনে নানাস্থানে নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ি; কর্মজীবনই আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এম. এ. পাস করবার পর অবনীভূষণ স্বস্থানে ফিরে গেলেন, আর আমি গেলুম পশ্চিমের এক শহরে স্কুলমাস্টারি করতে। বছর-তিনেক তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, তাঁর কাছে কোনো চিঠিপত্রও পাই নি। তার পর একদিন হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে আদেশ পেলুম রায়নগরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে। তাঁর সংকল্পিত ডিস্‌পেন্‌সারি ও স্কুলঘর তৈরি হয়ে গিয়েছে; বাকি আছে শুধু উপযুক্ত মাস্টার ও ডাক্তার সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে অবনীভূষণকে একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। তাঁর এই চিঠি পেয়ে সেকালের সব কথা আবার মনে পড়ে গেল, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সব কীর্তি দেখবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মাল। ফলে আমি পুজোর ছুটিতে রায়নগরে গেলুম। স্কুল চালানো সম্বন্ধে তাঁকে দুটো একটা পরামর্শ দেবার মতলবও আমার ছিল।

গিয়ে দেখি, অবনীভূষণ সেই কলেজের ছোকরাই আছেন। তিনি এ যাবৎ বিবাহ করেন নি, কারণ তিনি দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও চিকিৎসার

সুব্যবস্থা না করে বিবাহ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ইতিমধ্যে স্কুল ও ডিস্‌পেন্‌সারির বাড়ি দুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সে দুটি তো পাড়াগেঁয়ে স্কুল ও ডাক্তারখানা নয়— রাজপ্রাসাদ। দেখলুম দেশবিদেশ থেকে সব কারিগর আনিয়ে এই অট্টালিকা দুটিকে অলংকৃত করা হয়েছে। আমি ব্যাপার দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম লক্ষ্য করে অবনীভূষণ বললেন— ছেলেবেলা থেকে beautyর মধ্যে বর্ধিত না হলে লোক যথার্থ সুশিক্ষিত হয় না।

তাঁকে সৌন্দর্যের উপাসক হতে শিখিয়েছেন তাঁর নতুন friend, philosopher and guide প্যারীলাল। এ ভদ্রলোক রায়পরিবারের একটি পুরোনো আমলার ছেলে, অবনীভূষণের জ্ঞাতি সম্পর্কে অগ্রজ। গ্রামেই বাড়ি, কিন্তু থাকেন বেশির ভাগ বিদেশে, এবং মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। শুনলুম ইনি বি. এ. পাস করে নানাস্থানে নানারকম কাজ করেছেন। প্রথমে জয়পুরে স্কুলমাস্টারি, তার পরে কাশীতে কবিরাজি, তার পরে আউধে কোনো তালুকদারের মোসাহেবি। তার পর বহুকাল ধরে করেছেন তীর্থভ্রমণ অর্থাৎ দেশপর্যটন। যখন যে কাজ করেছেন, তাতেই তিনি সুখ্যাতি লাভ করেছেন; কিন্তু কোনো কাজেই বেশিদিন লিপ্ত থাকতে পারেন নি। বছরে একবার পেশা পরিবর্তন না করলে তাঁর মনের শান্তি থাকত না। আসল কথা এই যে, লোকটা ছিলেন জন্ম-ভবঘুরে ও লক্ষ্মীছাড়া। তবে তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। তাঁর মুখেচোখে যেন বুদ্ধির বিদ্যুৎ খেলত। তার উপর তাঁর ছিল নানাবিদ্যায় সহজ অধিকার। ইংরেজি তিনি ভালোই জানতেন, আর সংস্কৃতে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তার উপর তিনি ছিলেন অতি সদালাপী। আর্ট বল, সংগীত বল, হিন্দুশাস্ত্র বল— সব বিষয়েই তিনি চমৎকার কথা বলতেন। আর্ট ও ধর্মই ছিল তাঁর কথোপকথনের প্রধান বিষয়— অর্থাৎ সেই দুই বিষয়, আমাদের স্কুলকলেজে যা আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছে। আর তিনি ছিলেন চমৎকার সেতারী। সেতার নাকি তিনি অপরকে শোনাবার জন্য নয়, নিজে শোনবার জন্যই বাজাতেন। তিনি সেতার শিক্ষা করেছিলেন জনৈক সন্ন্যাসীর কাছে, আর তাঁর গুরু নাকি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, পরের মনোরঞ্জনার্থ বাজালে কেউ আর সংগীতসাধনা

করতে পারে না; কারণ তখন সে পেশাদার ওস্তাদ হয়ে পড়ে। অপরপক্ষে কর্মজীবনের প্রতি প্যারীলালের ছিল অগাধ অবজ্ঞা। এরকম লোকের বশীভূত হলে কেউই আর কর্মজীবনে কৃতী হতে পারে না। আর অবনীভূষণকে তিনি যে জাদু করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-সব দেখেশুনে আমার ভয় হল যে, অবনীভূষণের সামাজিক হিতসাধনের খেয়াল হয়তো বেশিদিন থাকবে না। কেননা আর-পাঁচজনের কাছে শুনলুম, প্যারীলাল অত্যন্ত অসামাজিক প্রকৃতির লোক— একেবারে বেপরোয়া। প্যারীলাল যে philosopher তা নিঃসন্দেহ, অবনীর friendও হতে পারেন, কিন্তু guide হিসাবে সর্বনেশে। কেননা তিনি ছিলেন, genius বিগড়ে গেলে যা হয়, তাই।

৪

আমি চলে আসবার পর অবনীভূষণের স্কুল ও ডাক্তারখানা খোলা হল এবং ভালোভাবেই চলতে লাগল প্যারীলালের তত্ত্বাবধানে। অবনীভূষণের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর বন্ধুর শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ঢের নতুন নতুন idea আছে, যা তিনি ইতিপূর্বে ছাত্রদের ও রোগীদের উপকারার্থে পরের স্কুল-কলেজে ডাক্তারখানায় প্রয়োগ করবার সুযোগ পান নি। তিনি ডাক্তার ও মাস্টারদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিলেন। প্যারীলাল ডাক্তারদের শিক্ষাশাস্ত্র সম্বন্ধে ও মাস্টারদের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতে শুরু করলেন, কারণ তাঁর মতে দেহ বাদ দিয়ে মানুষের মন গড়া যায় না, আর মন বাদ দিয়েও তার দেহ গড়া যায় না। এ-সব উপদেশ, কি ডাক্তারবাবুদের কি মাস্টারবাবুদের কারো বিরক্তিকর হয় নি, কেননা তাঁর মুখের কথা ছিল একরকম বশীকরণ মন্ত্র। বুদ্ধির এরকম বিচিত্র এবং অদ্ভুত খেলা তাঁরা পূর্বে আর কখনো দেখেন নি।

বছরখানেক না যেতেই অবনীভূষণ বিবাহ করলেন। অবনীভূষণের স্ত্রী ছিলেন যেমন সুন্দরী, তেমনি ভালো মেয়ে। বিবাহের পরেই অবনীভূষণের জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠল তাঁর স্ত্রী। পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি যে একরকম অপূর্ব জীব, এবং তাদের ভিতর যে একটা বিশ্বজোড়া রহস্য আছে— অবনীভূষণ তাঁর স্ত্রীর সংসর্গে এসে এই সত্যটি প্রথমে আবিষ্কার করলেন। ক্রমে তিনি

তাকে মনে মনে একটি দেবতা করে তুললেন। এই প্রতিমার নিত্যপূজা উপাসনা ধ্যানধারণাই হল তাঁর জীবনের নিত্যকর্ম। বলা বাহুল্য, তাঁর স্কুল ও ডাক্তারখানার ভার তিনি সম্পূর্ণ ডাক্তার ও মাস্টারদের হাতে ন্যস্ত করলেন; এবং তিনি তাঁর স্ত্রীর শিক্ষা ও রূপের অনুশীলনেই তাঁর সকল মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন। লোকে বলতে আরম্ভ করলে যে, তিনি ঘোর স্ত্রৈণ হয়ে পড়েছেন; কারণ তিনি কারো সঙ্গে আর মেলামেশা করতেন না। যে লোক শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়েছিলেন এবং জন্মাবধি একমাত্র চাকরবাকর আমলাফয়লা মাস্টার ও ডাক্তারের হাতে লালিতপালিত হয়েছেন, তাঁর অন্তরে একটি রক্তমাংসের মানুষের রক্তমাংসের ভালোবাসার বুভুক্ষা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিল। এ তো হবারই কথা। তাঁর একমাত্র বন্ধু প্যারীলাল ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান হয়েছিলেন। বোধ হয় আবার কোনো নূতন বিদ্যা শিখতে কোনো নূতন গুরুর সন্ধানে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

৫

অবনীভূষণের দেহ ও মনে তাঁর স্ত্রীর প্রতি আসক্তি একটা দমকা জ্বরের মতো এসে পড়েছিল। বছরখানেক পর সে জ্বর আস্তে আস্তে ছাড়তে আরম্ভ করলে। তাঁর দুকূল-ছাপানো প্রেমের জোয়ারে যখন ভাঁটা ধরতে আরম্ভ করলে, তখন প্যারীলালের একটা পুরোনো কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। প্যারীলাল একদিন তাঁকে বলেছিলেন যে, "নিত্যপূজা হচ্ছে ধর্মমনোভাবের প্রধান শত্রু। কারণ নিত্যপূজাটা ক্রমে একটা শারীরিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়, আর তখন মন ধর্ম থেকে অলক্ষিতে সরে যায়, আর লোকে ঐ অভ্যাসটাকেই ধর্ম বলে ভুল করে।" অবনীভূষণ কথাটাকে প্রথমে রসিকতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবিষ্কার করলেন যে, প্যারীলালের কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। তাঁর মনে হল যে, তাঁর স্ত্রী-দেবতার পূজা-ব্যাপারটা ক্রমে প্রেমের একটা মন্ত্রপড়া ও ঘণ্টানাড়ার ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে, আর তিনি তাঁর আসল কর্তব্যগুলি উপেক্ষা করছেন। স্কুল ও হাসপাতালের উন্নতিকল্পে তিনি শুধু টাকা দিচ্ছেন, মন দিচ্ছেন না। আর টাকা যে দিচ্ছেন, সে শুধু অনায়াসে তা দিতে পারেন বলে। আর এ অর্থও তাঁর স্বোপার্জিত নয়— উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্বপুরুষের নিকট প্রাপ্ত। প্যারীলাল তাঁকে বলে

গিয়েছিলেন, "দেখো যেন এ কর্তব্য থেকে কখনো ভ্রষ্ট হোয়ো না।" প্যারীলাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব শুনে প্রথমে হেসে বলেছিলেন যে, "অবনীভূষণ, তুমি যা করতে চাও সে বস্তু কী, জান? লাঙল ঠেলবার যন্ত্রকে কলম ঠেলবার যন্ত্রে পরিণত করবার কারখানা। কিন্তু এ কারখানা খুলতে তুমি যখন কৃতসংকল্প হয়েছ, তখন তাই করাই তোমার কর্তব্য। কর্তব্য পালন করার ভিতর কোনো সুখ নেই। কিন্তু সুখ নেই বলেই কর্তব্যসাধন হচ্ছে নিজের ক্ষুদ্র অহং-এর বন্ধন থেকে লৌকিক মুক্তির সহজ উপায়। কারণ মানুষের লৌকিক কর্তব্যগুলি তার মনের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়; সে সীমা অতিক্রম করলেই মানুষের মন অসীমের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ে, আর তখন তার কর্মজীবন ব্যর্থ হয়।"

'লৌকিক মুক্তি'র অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় প্যারীলাল বলেছিলেন যে, "এ যুগে যুগধর্ম অনুসারে সবিকার সমাজব্রহ্মে লীন হওয়াই পরম পুরুষার্থ—নির্বিকার পরব্রহ্মে নয়।"

প্যারীলালের কথাটা কতটা সত্য আর কতটা রসিকতা তা না বুঝলেও স্ত্রৈণ হওয়াটাই যে পরম পুরুষার্থ নয়, এ কথাটা অবনীভূষণ হৃদয়ঙ্গম করলেন, এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও ডাক্তারখানার উন্নতিসাধন করাই যে তাঁর মুখ্য কর্তব্য, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন।

৬

এর পর অবনীভূষণ আবার তাঁর স্কুল ও ডাক্তারখানার মাজাঘসার কাজে পুরোদমে লেগে গেলেন। নূতনত্বের মধ্যে এই হল যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে-সব বিষয় শিক্ষা দিতেন, সেই-সব বিষয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কিছুদিনে আবার আবিষ্কার করলেন যে, এ কর্তব্যপালনে তাঁর সুখও নেই, সন্তোষও নেই, সম্ভবত সার্থকতাও নেই। তাঁর স্ত্রী যেরকম একাগ্রমনে তাঁর কাছে পাঁচরকম লেখাপড়া শিখতেন, স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একজনেরও সে মন নেই, সে আগ্রহ নেই। ক্রমে তাঁর জ্ঞান হল যে, তিনিও যেমন শিক্ষাদান করা শুধু একটা অপ্রিয় কর্তব্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন, ছেলেরা শিক্ষালাভটাও তেমনি একটি অপ্রিয় কর্তব্য হিসেবে গ্রাহ্য করে নিয়েছে। তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো মনের টান নেই। ফলে তাঁর পক্ষে শিক্ষাদান

করাটাও যেমন নিরানন্দ ব্যাপার, ছেলেদের পক্ষে শিক্ষালাভ করাটাও তেমনি নিরানন্দ ব্যাপার, এবং সেইসঙ্গে তাঁর মনে হল যে, প্যারীলাল যে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়েছেন, তার কারণ বোধ হয় তিনি যেদিন বুঝলেন ও-জাতীয় শিক্ষার ভিতর কোনো আনন্দ নেই— না মাস্টারদের না ছাত্রদের, সেদিন থেকে এ ব্যাপারের দিকে পিঠ ফিরিয়েছেন। ছাত্রদের মনে যদি তাঁর স্ত্রীর মতো শিক্ষালাভের জন্য আকুলতা থাকত, তা হলে শিক্ষা দেবার একটা সার্থকতা থাকত। এর থেকে তাঁর মনে হল যে, শিক্ষা যথার্থ নিতে পারে মেয়েরা, আর দিতে পারে পুরুষে। এর পর তিনি নিশ্চয়ই একটি Girls' School প্রতিষ্ঠা করতেন, যদি না তাঁর মনে পড়ে যেত যে, প্যারীলাল বলেছিলেন, সব মেয়ে তাঁর স্ত্রীর প্রকৃতির নয়— অনেকে বরং তার উল্টো প্রকৃতির।

৭

অবনীভূষণ ক্রমে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে, স্কুলমাস্টারি করার ভিতর অপরের কোনো সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর নেই। সুতরাং স্কুল তাঁর সমানভাবেই চলতে লাগল, শুধু তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেন। এ কাজ তিনি অনায়াসেই করতে পারলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর স্কুলের একটি অবৈতনিক এবং উপরি মাস্টার।

আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাসপাতালের মোহও কেটে গেল। ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে দুটি বিষয় সম্বন্ধে তার জ্ঞানলাভ হল— এক রোগ আর দ্বিতীয় মৃত্যু। মানুষের রোগযন্ত্রণা আর তার পর মৃত্যু তাঁর মনকে নিতান্ত অভিভূত করে ফেলল। বিশেষত তাঁর স্কুলের সব চেয়ে ভালো ছেলে শ্রীশংকর যখন বসন্তরোগে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে মারা গেল, তখন তাঁর মন ঘোর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তাঁর মনে হল, তাঁর স্ত্রীও একদিন হয়তো ঐ ভাবে অকস্মাৎ মারা যেতে পারে। এ কথা মনে উদয় হবামাত্র তাঁর কাছে পৃথিবীটা একটা মহাশ্মশানে পরিণত হল, যার নীচে শুধু ছাই আর উপরে ধোঁয়া। পৃথিবীতে মৃত্যু আছে জেনেও মানুষে যে কি করে হেসে-খেলে কাজকর্ম করে বেড়ায়, এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়োই অদ্ভুত মনে হল। প্যারীলাল হয়তো তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে এ

সত্যের উপলব্ধি করেছিলেন। তাই প্যারীলালের মতে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির দুটিমাত্র উপায় আছে— এক আর্ট, আর-এক ধর্ম। কারণ এ দুটি বস্তুই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, এবং মর্তকেও অমৃতলোকে পরিণত করে। এর পর অবনীভূষণ মনস্থির করলেন যে, তিনি ধর্মের শরণাপন্ন হবেন— যে ধর্মকে তিনি এতদিন উপেক্ষা করে আসছিলেন। অতএব তিনি আদ্যোপান্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করবেন সংকল্প করলেন। এ শাস্ত্রের সন্ধানও তাঁকে প্যারীলাল দিয়েছিলেন। ভাগবত তাঁর লাইব্রেরিতেই ছিল, কিন্তু সে বই আর তাঁর পড়া হল না।

৮

এই সময় একটি এমন ঘটনা ঘটল যাতে করে অবনীভূষণের মনের ও জীবনের গতি নূতন পথে চলে গেল। এ নূতন পথ সর্বনাশের পথ।

রায়নগরের সন্নিকট কৃষ্ণপুরে জমিদার কামদাপ্রসাদের কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অবনীভূষণ কৃষ্ণপুরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন বলছি এই কারণে যে, কামদাপ্রসাদের জীবনযাত্রা ছিল সেকেলে ধরনের। দেশের ও দশের জন্য নূতন কিছু করা কামদাপ্রসাদ একদিনের জন্যও নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন নি। তাঁর জীবন ছিল পুরোমাত্রায় বিলাসীর জীবন। তিনি বারোমাস গাইয়ে বাজিয়ে মোসাহেব ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা পরিবৃত থাকতেন— অর্থাৎ তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ ছিল আমোদপ্রমোদের চর্চা। অথচ সামাজিক লোকের তিনি অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন ; কারণ তিনি প্রজাদের উপর কখনো অত্যাচার করেন নি, কাউকে কখনো রূঢ় কথা বলেন নি, গরিবদুঃখী গুরুপুরোহিতকে যথেষ্ট দান করতেন ; এবং কন্যাদায় মাতৃদায় -গ্রস্ত নিঃস্ব গৃহস্থদের মুক্তহস্তে সাহায্য করতেন। কামদাপ্রসাদের এই-সব হালচাল অবনীভূষণ মোটেই পছন্দ করতেন না। তদ্ব্যতীত এই বিলাসী জীবনকে ভয় করতেন। বিশেষত প্যারীলাল তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, বিলাসিতার একটা বিষম নেশা আছে, এবং যে লোক এ জীবনে অভ্যস্ত নয় ও যার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত নয়, বিলাসের নেশা তাকে সহজেই পেয়ে বসে ; যেমন যে লোক মদ্যপানে অভ্যস্ত নয়, এক গেলাসেই তার মাথায় চড়ে যায়, আর তখন দ্বিতীয় গেলাসের পিপাসা তার অদম্য হয়ে

ওঠে। এ সত্বেও তিনি এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাধ্য হলেন, কেননা কামদাপ্রসাদ তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক, উপরন্তু আত্মীয়।

৯

এই বিবাহবাসরে বিখ্যাত বাইজি বেনজীরের মুখে একটি মহ্লারের ঠুংরি শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তার গানের মৃদু টান ও সূক্ষ্ম তানগুলি তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে তার একটি রুদ্ধ দ্বার খুলে দিলে, এবং সেইসঙ্গে একটি আনন্দময় জগৎ তাঁর মনের দেশে আবির্ভূত হল। তাঁর মনে হল যে, প্যারীলালের হাতে পড়লে সেতারের যে-সব অতিকোমল মিড় প্রাণকে স্পর্শ করত, বেনজীরের গলায় তদনুরূপ সূক্ষ্ম মিড় সব অধিষ্ঠান করেছে। প্যারীলাল বলতেন যে— সংগীতের স্থূলদেহ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে, আর তার সূক্ষ্মশরীরই আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। তাই সংগীত যখন আমাদের কানের কাছে মুমূর্ষু হয়, তখন তা আমাদের প্রাণের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কারণ পৃথিবীতে যা ব্যক্ত তা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, যা অব্যক্ত তা মনের বিষয়, আর যা অর্ধব্যক্ত তা যুগপৎ ইন্দ্রিয় ও মনের অর্থাৎ প্রাণের বিষয়। অবনীভূষণ মনে মনে স্বীকার করলেন যে, প্যারীলালের কথা সত্য। কিন্তু প্যারীলালের সেতার তো তাঁর মনকে কখনো এ ভাবে স্পর্শ করে নি, কোনো নূতন আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে নি। এর কারণ বোধ হয় স্ত্রীকণ্ঠের মধ্যে এমন কোনো রহস্য আছে যা তারের যন্ত্রে নেই। সব স্ত্রীলোক যে এক প্রকৃতির জীব নয়, এ কথা তিনি প্যারীলালের মুখে পূর্বেই শুনেছিলেন। এইবার স্পষ্ট অনুভব করলেন যে, স্ত্রীজাতির মোহিনীশক্তিও বিচিত্র এবং নানামুখী। বেনজীরও ছিল সুন্দরী, কিন্তু তার রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে তার আর্ট। অবনীভূষণের বিশ্বাস হল যে, আর্ট হচ্ছে সেই বস্তু যা প্রকৃতির প্রচ্ছন্নরূপ প্রকাশ করে।

এর পর বেনজীরের সঙ্গে অবনীভূষণের কি কথাবার্তা হল জানি নে। কিন্তু এই কথোপকথনের ফলে বেনজীর বিবাহান্তে আর কলকাতায় ফিরে গেল না; রায়নগরে অবনীভূষণের Guest Houseএ এসে অধিষ্ঠিত হল। আর অবনীভূষণও নিত্য তার সংগীতসুধা পান করতে লাগলেন। ফলে বেনজীর তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী হয়ে উঠল। তাঁর স্ত্রী হল তাঁর ধর্মপত্নী,

আর বেনজীর তাঁর রূপপত্নী।

১০

বেনজীর অবশ্য কুলবধূ ছিল না। সে ছ মাস পরেই চলে গেল। মজলিস, বহুশ্রোতা ও সমজদারের বাহবার অভাব অবনীভূষণের অর্থ পূরণ করতে পারল না; অবনীভূষণ তখন দ্বিতীয় সুধাপাত্রের জন্য পিপাসিত হয়ে উঠলেন; ফলে দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়, তৃতীয়ের পর চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে তাঁর পাত্রের পর পাত্র আমদানি হতে লাগল। আমাদের মতে তিনি একেবারে অধঃপাতে গেলেন। শেষটায় তাঁর দশা এই হল যে, তিনি শ্যাম্পেনের সাধ ধেনোয় মেটাতে আরম্ভ করলেন।

কিন্তু দিনের পর দিন তিনি মনের শান্তিও হারাতে লাগলেন। স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্তি তাঁর দেহমনের যে একটা বিশ্রী অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে, সে বিষয়ে মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। কারণ অবনীভূষণ যতই অধঃপাতে যান-না কেন, তাঁর কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পায় নি, এবং মনের সুপ্রবৃত্তিগুলি একেবারে নির্মূল হয় নি। তাঁর এই নূতন মত্ততা তাঁর সমস্ত মনকে অভিভূত করতে পারে নি। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এই সময়ে বেড়েছিল বৈ কমে নি। কারণ, এ কথা তিনি জানতেন যে, তাঁর নবপ্রণয়িনীর দল কেহই শ্রদ্ধার পাত্রী নন, আর এদের কারো কাছ থেকে তিনি যথার্থ ভালোবাসা পান নি। অথচ তিনি এই-সব রক্তমাংসের পুতুলদের মায়া কাটাতে পারতেন না। তাঁর মন নিজের প্রতি ধিক্কারে ভরে উঠল। এ অবস্থায় তাঁর মনে হল যে যদি কেউ তাঁকে এ পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে পারেন তো সে প্যারীলাল। কিন্তু প্যারীলাল যে কোথায় কোন্ দেশে তার সন্ধান কেউ জানে না। অতঃপর তিনি প্যারীলালের শুভাগমনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

১১

এ দিকে অবনীভূষণের চরিত্রের যত অবনতি ঘটতে লাগল, তাঁর স্ত্রীর মনের চরিত্র তত তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে ফুটে উঠতে লাগল; তাঁর স্বামীদেবতা অপদেবতায় পরিণত হওয়ায় তাঁর মন অবশ্য অত্যন্ত পীড়িত হল, কিন্তু এই

পীড়াই তাঁর চরিত্রের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তুললে। অবনীভূষণের স্ত্রীপূজা তিনি কখনোই প্রফুল্লমনে গ্রাহ্য করতে পারেন নি। তিনি জানতেন তিনি মানুষ— দেবতা নন। এবং পরকে ভালোবাসা ও পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করবার প্রবৃত্তিও মানবধর্ম। তিনি কোনোকালেই স্বামীর কাছ থেকে পূজা চান নি, স্বামীকেই পূজা করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া স্বামীস্ত্রীতে কপোত-কপোতীর মতো মুখে মুখ দিয়ে বসে থাকাটা তাঁর কোনোকালেই মনোমত ছিল না। তিনি চাইতেন কাজ করতে, আর-পাঁচ জনের সেবা করতে। তাঁর স্বামীর এই স্ত্রীমোহটা তাঁর কাছে চিরদিনই বিপজ্জনক মনে হত। ধনীর সন্তানের বনিতাবিলাস তাঁর কাছে মনে হত তাদের কর্মহীনতার একটা বিশেষ প্রকাশমাত্র; আর এ বিলাস কাকে যে কোন্ বিপথে টেনে নিয়ে যাবে কে বলতে পারে? তবে অবনীভূষণ যে আর-পাঁচ জন ধনী ব্যক্তির জাত নন, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। সুতরাং আর-পাঁচ জন অপদার্থ লোকের কপালে যে দুর্দশা ঘটে, অবনীভূষণ যে সেরূপ দুর্দশাপন্ন হবেন, সে ভয় তাঁর ছিল না। তাই অবনীভূষণের চরিত্রবিকারের পরিচয় পেয়ে তিনি নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লেন ও ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করলেন। এর ফলে তাঁর মনে নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য জন্মলাভ করলে। তিনি ছিলেন মানবী, হয়ে উঠলেন দেবী। তখন তাঁর প্রশান্ত স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টি যার উপরে পড়ত তাকেই পবিত্র করে তুলত।

এ-সব কথা আমি অবনীভূষণের মুখেই শুনেছি— কী অবস্থায় আর কী সূত্রে, তা পরে বলছি।

১২

অনেকদিন অবনীভূষণের কোনো খবর পাই নি, নিইও নি। ইতিমধ্যে আমি স্কুলমাস্টারি থেকে প্রফেসারি-পদে প্রমোশন পাই, আর ছেলে-পড়ানো ছাড়া অপর কোনো বিষয়ে মন দেবার অবসর ছিল না। হঠাৎ একদিন অবনীভূষণের কাছ থেকে আবার এই চিঠি পাই—

“আমি এখন নিতান্ত একা হয়ে পড়েছি। জানই তো আমি নিঃসন্তান, তা ছাড়া আমার স্ত্রীও ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমিও সংসার ত্যাগ করব মনে করেছি, কিন্তু তার পূর্বে বিষয়সম্পত্তির একটা সুব্যবস্থা করতে চাই যাতে আমার পৈতৃক ধনের আর-পাঁচ জনে সদ্ব্যবহার করতে পারে। এ বিষয়ে

আমি তোমার পরামর্শ চাই। তুমি যদি একবার এখানে এসো তো বড়ো ভালো হয়।"

এ চিঠি পেয়ে আমি কদিনের ছুটি নিয়ে রায়নগর গেলুম। গিয়ে দেখি অবনীভূষণের চেহারা এতটা বদলে গিয়েছে যে তাঁকে দেখে আমাদের সেই কলেজি বন্ধু বলে আর চেনবার জো নেই। তাঁর শরীর অসম্ভব রকম শীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে পড়েছে— আর তাঁর চোখে একটা আলেয়ার আলো থেকে থেকে জ্বলে উঠছে ও নিবে যাচ্ছে।

তিনি আমাকে দেখবামাত্রই তাঁর চরিত্রবিকারের ইতিহাস বললেন, যে ইতিহাস আমি পূর্বেই তোমাদের বলেছি। তার পর যখন তিনি অধোগতির চরম দশায় উপস্থিত হয়েছেন, তখন হঠাৎ একদিন প্যারীলাল এসে উপস্থিত হলেন। তিনি এসেই অবনীকে দেখে হেসে বললেন, "তুমি নাকি এখন রাজা প্রিয়ব্রতের মতন মনে মনে বলছ—

অহো অসাধ্বনুষ্ঠিতং যদভিনিবেশিতোঽহমিন্দ্রিয়ৈরবিদ্যারচিতবিষমবিষয়ান্ধ-কূপে তদলমলমমুষ্যা বনিতায়া বিনোদমৃগং মাং ধিগ্ধিগিতি গর্হয়াঞ্চকার !"

তাঁর কথা শুনে অবনী অবাক হয়ে গেল দেখে তিনি বললেন, "ভাগবতে পড় নি যে, পরম লোক-হিতৈষী প্রিয়ব্রত রাজা প্রজার অশেষ হিতসাধন করে শেষটায় বনিতার বিনোদ-মৃগ হয়ে নিজেকে এই বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তার পর ভগবদ্‌ভক্তির প্রসাদে এই বনিতাবিলাসরোগ-মুক্ত হয়েছিলেন। তোমার মনে যখন ধিক্কার জন্মেছে, তখন তুমিও এ রোগ থেকে মুক্ত হবে; তবে ভগবদ্‌ভক্তির কৃপায় নয়, কারণ তোমার মতো লোকের মনে ভগবদ্‌ভক্তি উদ্রেক করা অতি কঠিন। তোমার পক্ষে যা প্রয়োজন, সে হচ্ছে তান্ত্রিক সাধনমার্গ। যে প্রবৃত্তি তোমাকে এ পথে নিয়ে গিয়েছে, সে প্রবৃত্তির চরম সার্থকতা লাভ করলেই তুমি এ রোগ থেকে মুক্ত হবে। এ বিশ্বের অন্তরে একটি নায়িকা আছেন, এ বিশ্ব যাঁর স্থূলদেহ; আর পৃথিবীর নায়িকামাত্রই তাঁর অংশাবতার। তাঁর দর্শনলাভ করলেই তোমার রূপপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হবে। এ-সব হয়তো তুমি বিশ্বাস করছ না, কারণ, এ দর্শনস্পর্শন জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারবহির্ভূত। কিন্তু এ কথা তো মান যে, মানুষের অন্তরে একটি অধঃচৈতন্য আছে? তেমনি তার অন্তরে একটি উর্ধ্বচৈতন্যও আছে। আমরা যাকে আর্ট ও ধর্ম বলি, তা এই উর্ধ্বচৈতন্যগোচর। রক্তমাংসের সম্পর্ক

অধঃচৈতন্যের সঙ্গে ও রূপের সম্পর্ক ঊর্ধ্বচৈতন্যের সঙ্গে। আর দেশকালের অতীত এই নায়িকার ঊর্ধ্বচৈতন্যেই দর্শনলাভ ঘটে ; আর এ সাধনমার্গে তুমি নায়িকাসিদ্ধ হবে। আমি যে এ সিদ্ধিলাভ করি নি, তার কারণ এক পক্ষ ধরে কঠোর ব্রহ্মচর্য আমি পালন করতে পারি নি। আমার বিক্ষিপ্তচিত্ততা আমার সকল সাধনা ব্যর্থ করেছে। তাই আমি সংসারে অনাসক্ত, কিন্তু কোন্‌ অপার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্ত, তা ঠিক জানি নে।"

প্যারীলালের কথায় অবনীভূষণ কী সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা আর আমাকে বললেন না। তাঁর কথার ভাবে বুঝলুম যে, কোনোরূপ বীভৎস প্রক্রিয়া তাঁকে করতে হয় নি, যা করতে হয়েছিল তা আগাগোড়া মানসিক প্রক্রিয়াই। শুধু এই পর্যন্ত বললেন যে, মাসাবধি কাল কোনো স্ত্রীলোকের মুখদর্শন তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেই নাকি সাধকের নখদর্পণে সেই দেশকালের অতীত নায়িকার মূর্তি স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

অবনীভূষণ একাগ্রমনে এ সাধনা করেছিলেন। এমন-কি, তাঁর স্ত্রী কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর ব্রতভঙ্গ করেন নি। যেদিন তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল, সেইদিনই তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। স্ত্রীর মুখাগ্নি করে এসে তিনি নখের বস্ত্রাবরণ মুক্ত করে দেখেন যে, নখদর্পণে তাঁর স্ত্রীর অপরূপ সুন্দর ও করুণ দিব্যমূর্তি ফুটে উঠেছে।

এ ছবি নাকি ধুলেও যায় না, অথচ অপর কেউই তা দেখতে পায় না, এক স্বয়ং সাধক ব্যতীত।

এ-সব কথা শুনে মনে হল যে, অবনীভূষণ বনিতাবিলাসরোগ-মুক্ত হয়ে উন্মাদ হয়েছেন, আর সেইসঙ্গে প্রমাণ পেলুম যে, প্যারীলাল শুধু বশীকরণের নয়, মারণ-উচাটনেরও মন্ত্র জানেন; কারণ, অবনীভূষণের উন্মাদ আর স্ত্রীর অকালমৃত্যু, দুই-ই প্যারীলালের মন্ত্রতন্ত্রের ফল।

এর পর অবনীভূষণকে কোনোরূপ সাংসারিক উপদেশ দেওয়া বৃথা জেনে আমি বললুম, "তোমার ধনসম্পত্তি তুমি তোমার মন্ত্রদাতা গুরুর হাতেই সমর্পণ করো, তিনি তার সদ্‌ব্যবহার করবেন।" উত্তরে অবনী বললেন, "এ প্রস্তাব আমি প্যারীলালের কাছে করেছিলুম; তিনি তা শোনবামাত্রই প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে, 'ডান হাতে যদি কাঞ্চন ধরি তো বাঁ হাতে আবার

কামিনী এসে পড়বে, আর এ উভয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ার চাইতে অসীমের মধ্যে দিশেহারা হওয়া শতগুণে ভালো, কিন্তু শ্রেয় নয়।'

অবনীভূষণের এ কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলুম ; কারণ বুঝলুম যে, প্যারীলালের মুখের কথা শুধু paradox নয়, লোকটা স্বয়ং একটি জীবন্ত paradox !

ফাল্গুন ১৩৩৯

নীল-লোহিতের আদিপ্রেম

কি কুক্ষণেই নীল-লোহিতের হামবড়ামির গল্প পাঁচজনের কাছে বলেছিলুম। তার পর থেকেই যাঁর সঙ্গে দেখা হয় তিনিই আমার মুখে নীল-লোহিতের আর-একটি গল্প শুনতে চান। সে গল্প বলা যে কত কঠিন তা নীল-লোহিতের admirerরা একবারও ভাবেন না। প্রথমত নীল-লোহিতের গল্প শুনেছি বহুকাল পূর্বে, এখন তা উদ্ধার করতে স্মৃতিশক্তির উপর বেজায় জবরদস্তি করতে হয়। কারণ নীল-লোহিতের বাজে কথা সব পলিটিক্স বা ধর্মের লাখ কথার এক কথা নয়, যা শোনবামাত্র মনে গেঁথে যায় আর কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। সুতরাং আমার বন্ধুবরের রূপকথার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডারে হাতড়ে বেড়ানোর চাইতে গল্প নিজে বানিয়ে বলা ঢের সহজ। তবে গল্প যদি আমি বানিয়ে বলি তা হলে তাতে কেউ কর্ণপাত করবেন না। কারণ সে গল্পের ভিতর বীররসও থাকবে না, মধুররসও থাকবে না। এর কারণ আমি বাঙালি। আমরা অবশ্য মরি, কিন্তু সে মৃত্যু ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, রোগশয্যায়; আর আমরাও ভালোবাসায় পড়ি, কিন্তু সে শুধু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে, সঙ্গদোষে বা গুণে। পরিণয় হচ্ছে আমাদের বাধ্যতামূলক প্রণয়শিক্ষার সনাতন ইস্কুল। আর সে স্ত্রীও আমাদের সংগ্রহ করতে হয় না, গুরুজনেরা সংগ্রহ করে দেন— কিঞ্চিৎ দক্ষিণাসমেত। অপরপক্ষে নীল-লোহিত ছিলেন বীররস ও আদিরসের অবতার। নীল-লোহিতের আত্মকাহিনী আগাগোড়া অলীক হলেও, তাঁর সকল কাহিনীর ভিতর একটা জিনিস ফুটে উঠত— সে হচ্ছে তাঁর মুক্ত আত্মা। আজ তাঁর একটা ছোট্টগল্প মনে পড়ছে, সেইটে আপনাদের কাছে বলতে চেষ্টা করব। আশা করি এর পর নীল-লোহিতের আর কোনো গল্প আপনারা শুনতে চাইবেন না। আজগুবি কথারও একটা সীমা আছে।

২

সেদিন আমাদের সভায় আমাদের বন্ধু উদীয়মান কবি শ্রীভূষণ মন খুলে বক্তৃতা করছিলেন, আর আমরা পাঁচজনে নীরবে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলুম। সে বক্তৃতার বিষয় ছিল অবশ্য প্রেম। শ্রীভূষণ বহু ইংরেজ কবির কাব্য থেকে দেদার কোটেশানের সাহায্যে প্রমাণ করছিলেন যে, প্রেম বস্তুটি হচ্ছে মূলহীন ফুলের

বিনিসুতোর মালা। শ্রীভূষণের ভাষার ভিতর এতটা প্রাণ ছিল যে, প্রেমনামক আকাশকুসুমের অশরীরী গন্ধে আমরা ঈষৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলুম। একমাত্র মেডিকেল কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র অনিলচন্দ্রের মুখ দেখে মনে হল যে, শ্রীভূষণের কবিত্ব তাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীভূষণ থামবামাত্রই অনিল বলে উঠলেন যে, মানুষে যাকে প্রেম বলে সে বস্তুটি একটি শারীরিক বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়; আর তা যে নয়, তা অনুবীক্ষণের সাহায্যে সকলকেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। ওর বীজ আমাদের দেহের glandএর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে। আর সেইজন্যই লোকের মনে কৈশোরেই প্রেম জন্মায়, তার পূর্বে নয়; কারণ বালকের দেহে প্রেমের বাহন glandএর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। নীল-লোহিত শ্রীভূষণের কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছিলেন, কিন্তু অনিলের কথা শুনে একেবারে চটে উঠে বললেন, "তোমাদের শাস্ত্রে বলে নাকি যে, ছোটো ছেলে প্রেমিক হতে পারে না? অথচ আমি যখন প্রথম প্রেমে পড়ি, তখন আমার বয়স কত জান? সবে পাঁচ বৎসর।"

অনিল বললেন, "কি! পাঁচ বৎসর?"

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "তুমি যদি আমার বিলেতিদস্তুর জীবনচরিত লিখতে চাও তা হলে বলি— তখন আমার বয়েস পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিন। যদি জানতে চাও যে আমি ঠিক বয়েস জানলুম কি করে? জানলুম এইজন্যে যে, যেদিন আমি প্রেমে পড়ি সেইদিন আমি মাকে গিয়ে আমার জন্মতিথি কবে, জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমার ঠিকুজির সঙ্গে পাঁজিপুঁথি মিলিয়ে, আঁক কষে আমার ঠিক বয়েস বলে দিলেন।"

নীল-লোহিতের এ কথা শুনে আমরা সকলে চুপ করে থাকাই সংগত মনে করলুম। শুধু শ্রীভূষণ বললে যে, চণ্ডীদাস লিখেছেন—

জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি অন্তরে রহিল মোর,
থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে, জ্বালার নাহিক ওর।

চণ্ডীদাসের উক্তি যে সত্য— নীল-লোহিত তার প্রমাণ। নীল-লোহিত প্রতিবাদ করে বললেন যে, চণ্ডীদাসের কথা সত্য হত, যদি তিনি ঐ ব্যাধি শব্দটা ব্যবহার না করতেন। অনিল পাছে ঐ ব্যাধি নিয়ে একটা তর্ক বাধায়, এই ভয়ে আমি প্রস্তাব করলুম যে, প্রেম জিনিসটে ব্যাধি কি না, তা নিয়ে পরে তর্ক করা যাবে; এখন নীল-লোহিতের আদিপ্রেমের উপাখ্যান শোনা যাক।

অমনি নীল-লোহিত তাঁর বর্ণনা শুরু করলেন।

৩

নীল-লোহিত এই বলে তাঁর গল্পের সূত্রপাত করলেন যে, এ গল্প তোমাদের বলতুম না, কারণ প্রেম যে কি বস্তু তা যারা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে তারা পাঁচজনের কাছে প্রেমের ব্যাখ্যান করে না; করে তারাই, যারা প্রেমের শুধু নাম শুনেছে, কিন্তু রূপ দেখে নি— যথা আধ্যাত্মিক কবিরা আর দেহতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিকেরা। এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ তোমরা হাতে হাতেই পেলে। কবি শ্রীভূষণ প্রেমকে এত উঁচুতে ঠেলে তুললেন যে দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তার সাক্ষাৎ মেলে না; আর বৈজ্ঞানিক অনিলচন্দ্র তাকে এত নিচুতে নামালেন যে চোখে অনুবীক্ষণের চশমা এঁটেও তার সন্ধান পাওয়া যায় না। আজ তোমাদের কাছে যে আমার প্রেমের হাতেখড়ির কথা বলছি, সে শুধু এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মুখ বন্ধ করবার জন্য। এখন ব্যাপার কি ঘটেছিল শোনো।

আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলুম একটি পাড়াগেঁয়ে শহরে। পাড়াগেঁয়ে শহর কাকে বলে জান? সেই লোকালয়— যা শহরও নয়, পাড়াগাঁও নয়। ও হচ্ছে একরকম কাঁঠালের আমসত্ত্ব। একটি পাড়াগেঁয়ে শহর দেখলেই বোঝা যায় যে, তা একটা পুরানো শহরের ভগ্নাবশেষও নয়; তার অতীতও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। যদি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, থানা ও জেলখানা, বিদ্যালয় ও অবিদ্যালয় থাকলেই একটা মান্ধাতার আমলের পল্লিগ্রাম শহর হয়ে ওঠে তো আমার জন্মস্থানও শহর ছিল। কারণ সেখানে জজও ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটও ছিল, দারোগাও ছিল, স্কুলমাস্টারও ছিল। আর স্কুল ছিল দুজাতের— অর্থাৎ মেয়েদের আর ছেলেদের। কোন্‌টি যে কি, তা দেখলেই চেনা যেত। ছেলেদের স্কুল ছিল কোঠাবাড়ি, আর মেয়েদের চালাঘর। এর কারণও স্পষ্ট। ছেলেদের পড়ানো হত জজ ম্যাজিস্ট্রেট উকিল দারোগা বানাবার জন্য; আর মেয়েদের পড়ানো হত কেন, তা মা-গঙ্গাই জানেন। অবশ্য এ প্রভেদ এখন ততটা চোখে পড়ে না, কারণ একালে ছেলেরা হয়ে পড়েছে সব মেয়েলি, আর মেয়েরা পুরুষালি।

৪

আমার বয়েস পাঁচ বৎসর হতেই আমাকে একটি বালিকাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল। বিদ্যালয়টি ছিল আমাদের বাড়ির কাছে; ভিতরে শুধু একটি মাঠের ব্যবধান ছিল। এ বিদ্যালয়ের শুধু একটিমাত্র ক্লাস ছিল, কারণ একটি বড়ো আটচালার একটিমাত্র ঘরে স্কুল বসত। মাথার উপর ছিল খড়ের চাল, আর চারপাশে দরমার বেড়া। আর ছাত্রীরা বসত সব ছেঁড়া মাদুরের উপর। মাস্টার কি মাস্টারনী কেউ ছিল কি না মনে পড়ে না। তবে এইটুকু মনে আছে যে আমরা সকলে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতুম; কিন্তু কি যে সেখানে পড়েছি, তার বিন্দু-বিসর্গও মনে নেই। সম্ভবত সেখানে পড়ার চাইতে লেখাটাই বেশি হত। আমি অবশ্য এ স্কুল ছেড়ে ছেলেদের স্কুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম, কারণ ছেলেদের স্কুলে গেলে পাঁচজন ছেলের সঙ্গে মারামারি করা যায়, পাঞ্জা কষা যায়; কিন্তু এ স্কুলে পরস্পর পরস্পরকে শুধু চিমটি কাটত। আমাকে বালিকা-বিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দেবার কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় এমন-একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে কেউ আমাকে আর সে স্কুল ছাড়াতে পারলেন না। আমাদের স্কুলে পুরানো ছাত্রী নিত্য ছেড়ে যেত, আর নূতন ছাত্রী নিত্য ভর্তি হত। আমার বয়েস যখন পাঁচ বৎসর, পাঁচ মাস, পাঁচ দিন ঠিক সেইদিন একটি নূতন ছাত্রী আমাদের স্কুলে এল, যাকে দেখবামাত্রই আমি তার প্রেমে পড়ে গেলুম। এর মূলে ছিল— আলংকারিকেরা যাকে বলে পূর্ববাসনা।

৫

এ কথা শুনে অনিলচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না, নীল-লোহিতের কথায় বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মনের নতুন ভাবকে তুমি সেই মুহূর্তেই প্রেম বলে চিনতে পারলে? নীল-লোহিত বললে, "অবশ্য এ জাতীয় মনোভাব তো আর বই পড়ে শিখতে হয় না, ঠেকেই শিখতে হয়। প্রেমে পড়া আমার সহজ প্রবৃত্তি। এর পর আমি বছরে অন্তত দুবার করে প্রেমে পড়েছি, কিন্তু সে-সবই হচ্ছে আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। পূর্বের সঙ্গে পরের যা-কিছু প্রভেদ, সে শুধু ছোটোবড়ো typeএর। অনেকের বিশ্বাস যে, ছোটো ছেলের কোনো স্পষ্ট অনুভূতি নেই, আছে শুধু বয়স্ক

লোকের। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমার বয়েস যখন ছ বৎসর, তখন আমার একটি আত্মীয় মারা যান। সেদিন আমার চোখে পৃথিবীর যে নতুন চেহারা দেখা দিয়েছিল, তার পরে পরিবারে যত বার মৃত্যু ঘটেছে, প্রতিবারেই সেই চেহারা দেখেছি। মরে শুধু একজন লোক, আর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী যেন জনশূন্য হয়ে যায়, রোদ খাঁ খাঁ করে, আকাশের আলোর ভিতর একটা বিশ্রী ঔদাস্যের ভাব আসে, আর চার পাশের লোকজন সব ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। মৃত্যু ও প্রেম সম্বন্ধে ছেলে-বুড়োর কোনো অধিকারী-ভেদ নেই। কিন্তু মানুষে মানুষে ঢের প্রভেদ আছে। সকলেই মরে, কিন্তু সকলেই আর প্রেমে পড়ে না। তাই ডাক্তারের কথা যেমন সর্বলোকগ্রাহ্য, প্রেমিকের কথা তেমনি ডাক্তারি শাস্ত্রে অগ্রাহ্য।" এই বক্তৃতার পর অনিলচন্দ্র আর রা কাড়লেন না।

৬

এর পর শ্রীভূষণ বললেন যে, তোমার প্রেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবান্তর ঘটেছিল তার বর্ণনা কর তো তা হলেই বোঝা যাবে ব্যাপারখানা কি ঘটেছিল।

নীল-লোহিত বললেন, "তুমি যে-সব বিলেতি বচন শোনালে, তার সঙ্গে আমার কথা মিলবে না। ইংরেজরা প্রেমে পড়লে তাদের মনের অবস্থা কি হয় জানি নে, তবে তারা যা লেখে তার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। আমার বিশ্বাস তারা প্রেম করে অনিলের শাস্ত্র-মতে, আর তা ব্যক্ত করে শ্রীভূষণের ভাষায়। আমার যা হয়েছিল, তা অবশ্য desire of the moth for the star নয়। কারণ আমিও moth নই, সেও star ছিল না। এক কথায়, প্রেমে পড়বামাত্র আমি যেন প্রথম জেগে উঠলুম, তার আগে ঘুমিয়ে ছিলুম। সেইদিন প্রথম আবিষ্কার করলুম যে, তেলাকুচোর রঙ লাল। হঠাৎ দেখি পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠল, আকাশের রোদ চন্দ্রালোক হয়ে এল, চারি দিকের যত আলো সব হেসে উঠল, আর ঐ মেয়েটির চোখে আশ্রয় নিলে। কি সুন্দর সে আলো, আর তার অন্তরে কি গভীর অর্থ! তার চোখ দুটি প্রথমে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তার পর আমার উপর যেই পড়া, সেই চঞ্চল চোখ একেবারে স্থির হয়ে গেল, আর তার পল্লব কিঞ্চিৎ নত হয়ে এল। আমি বুঝলুম যে সেও আমার প্রেমে পড়েছে। যেমন এক হাতে তালি বাজে না, তেমনি এক পক্ষেও প্রেম হয় না। আমি ভালোবাসলুম, কিন্তু সে বাসলে

না— এমন যদি হয় তা হলে সে একটা হা-হুতাশের ব্যাপার হয়ে ওঠে, তাকেই ব্যাধি বলা যেতে পারে। আমাদের উভয়ের মনে যা জন্মাল সে হচ্ছে যথার্থ প্রেম— তাই উভয়ের মন একসঙ্গে নীরব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

৭

এ প্রেমের কোনো ইতিহাস নেই ; কেননা সেইদিন আর পরের দিন ছাড়া তার সঙ্গে আমার জীবনে আর কখনো দেখা হয় নি। কেন, তা পরে বলছি। তবে তার স্মৃতি আমার জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

আমি এমন কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো প্রেমে পড়ি নি যার মুখে আমি তার চেহারা দেখতে পাই নি। বর্ণ তার ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, গড়ন ছিপছিপে, নাক তোলা, আর চোখ সাত রাজার ধন কালামানিকের মতো। আমি চিরজীবন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর যখনই তার ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখনই আবার প্রেমে পড়েছি। এই কারণেই আমি বলেছি যে, আমার সব নতুন প্রেম আমার সেই আদিপ্রেমের reprint মাত্র। যখনই কোনো নতুন প্রেমে পড়েছি তখনই পৃথিবী একেবারে উল্টে-পাল্টে গিয়েছে, ডুমুরের ফুল ফুটেছে, অমাবস্যায় জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশকুসুমের গন্ধ চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমার মনে হয়েছে যেন আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, আর তার আগে ঘুমিয়ে ছিলুম। এই আদিপ্রেমের কৃপায় কোনো ইংরেজ কিংবা জাপানি অথবা ইহুদি মেয়ের প্রেমে কখনো পড়ি নি। কারণ ইংরেজের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম নয়, চুনের মতো সাদা ; জাপানির নাক তোলা নয়, চাপা ; আর ইহুদিদের নাক হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা। এখন আমাদের কি কারণে বিচ্ছেদ ঘটল, তা শোনো।

৮

তার পর নীল-লোহিত বললেন যে, পরের দিন বালিকা-বিদ্যালয় থেকে তাঁর ইংরেজি স্কুলে বদলি হবার কথা ছিল ; কিন্তু তিনি বালিকা-বিদ্যালয়রূপ স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট হতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁর মা নিলেন তাঁর পক্ষ, আর

বিপক্ষ হলেন তাঁর বাবা। এ দুজনের মধ্যে অনেক বকাবকি হল; শেষটায় নীল-লোহিতের জেদই বজায় রইল। তার বাবা, 'এটার ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়ে জন্মানো উচিত ছিল'— এই কথা বলে মার সঙ্গে তর্কে ক্ষান্ত দিলেন। তর্কে বাবা কোথায় মার কাছে পেরে উঠবেন?

পরদিন সকালবেলায় নীল-লোহিত যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখেন যে, মেয়েটি আগেই এসে যথাস্থানে একটি মাদুরের উপরে যোগাসনে বসে আছে, আর তার কালো কালো চোখ দুটি কি যেন খুঁজছে; তাঁকে দেখবামাত্রই সে চোখ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো হয়ে গেল।

নীল-লোহিত অমনি তাঁর স্লেট নিয়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে ক খ লিখতে বসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে মেয়েটির যা-কিছু কথাবার্তা হল সে শুধু চোখে চোখে, মুখের ভাষায় নয়। চোখের আলাপ যখন খুব জমে উঠেছে তখন হঠাৎ একটা বন্দুকের বেজায় আওয়াজ হল। অমনি ছাত্রীরা সব চমকে উঠে ভয়ে হাঁউমাঁউ করতে আরম্ভ করলে, আর সেই মেয়েটি নীল-লোহিতের দিকে সকাতরে চেয়ে রইল। সে চাহনির ভাবটা এই যে, গুলির হাত থেকে আমাকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে তো সে তুমি। এই সময়ে নীল-লোহিতের চোখে পড়ল যে, দরমার বেড়া ফুটো করে একটা গোলাপী রঙের গুলি সোজা মেয়েটির দিকে ছুটে আসছে।

নীল-লোহিত আর তিলমাত্র দ্বিধা না করে বাঁ হাত দিয়ে স্লেটখানি মেয়েটির মুখের সুমুখে ধরলেন আর গুলিটি স্লেট ভেদ করে বেরবামাত্র ডান হাত দিয়ে সেটি চেপে ধরলেন। তখন সে গুলির তেজ কমে এসেছে, তাই সেটি নীল-লোহিতের মুঠোর মধ্যে রয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বেড়ায় আগুন ধরে গিয়েছে, মেয়েরা সব ডুকরে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, আর বাইরে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। এমন সময়ে নীল-লোহিতের বাবা একটা দোনালা বন্দুক হাতে করে স্কুলে এসে উপস্থিত। তিনি এসেই প্রথমে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা করলেন, এবং পরে ব্যাপার কি হয়েছিল তা গৃহস্বামীকে বললেন। নীল-লোহিতের বাবার অভ্যাস ছিল বাড়ির সুমুখে পুকুরে একটা ছিপি-আঁটা বোতল ভাসিয়ে দিয়ে সেই বোতলকে গুলি মারা— চোখের নিশানা ও হাতের তাক ঠিক রাখবার জন্য। সেদিন গুলিটে বোতলের গা থেকে ঠিকরে বেঁকে বিপথে চলে এসেছে। অবশ্য পথিমধ্যে তার তেজ

অনেকটা মরে গিয়েছিল, তবুও নীল-লোহিত যদি সেটিকে না আটকাত তা হলে গুলিটি অন্তত ঐ মেয়েটির কপালে চিরদিনের জন্য একটি আধুলি-প্রমাণ হোমের ফোঁটা পরিয়ে যেত।

তার পর তিনি নীল-লোহিতের পিঠ চাপড়ে বললেন যে, 'তুমি ছেলে বটে, বাপকো বেটা।'

মেয়েটি অমনি তার কচি হাত দুখানি জোড় করে নীল-লোহিতকে ভক্তিভরে প্রণাম করলে। এর পর তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

এই ঘটনার পরে গৃহস্বামী তাঁর আটচালায় বালিকা-বিদ্যালয় বসবার অনুমতি আর দিলেন না। ফলে সেইদিনই বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা সকলে নীল-লোহিতের আদিপ্রেমের কাহিনী শুনে না হোক, আদিবীরত্বের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলুম।

এখন আপনারা বিচার করুন, এ গল্পের কোনো মানে-মোদ্দা আছে কি না।

ফাল্গুন ১৩৩৯

অ্যাডভেঞ্চার : জলে

আমার জনৈক বন্ধু একটি খাসা ভূতের গল্প লিখেছেন যা পড়ে মনে ভয় হয় না, হয় স্ফূর্তি। আর শেষে বলেছেন— এটি গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

গল্পের সঙ্গে সত্য ঘটনার সম্পর্ক কি, এ নিয়ে অবশ্য মহা তর্ক আছে। কেউ বলেন, আর্ট সত্য ঘটনাকে অনুসরণ করে; আবার কেউ বলেন, সত্য ঘটনা আর্টকে অনুসরণ করে। এর থেকে বোঝা যায়, আর্ট যে সত্যের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়, এ জ্ঞান সকলেরই আছে। অপরপক্ষে, সত্য কথা ও আর্ট যে এক জিনিস নয়, এ কথাও লোকে মানতে বাধ্য।

আমি এখন একটি সত্য ঘটনার কথা বলব। লোকে তাকে সত্য বলে গ্রাহ্য করে কি না, তাতে কিছু আসে যায় না; সেটি গল্প বলে পাঠকদের কাছে গ্রাহ্য হয় কি না, সেইটেই হচ্ছে বড়ো কথা। ঘটনা সত্য কি কল্পিত, সে বিচার গল্পখোররা করে না।

এ গল্প ভয়ের গল্প। ভয় আমরা সকলেই পাই— কেউ কম কেউ বেশি, এই যা তফাত। যেমন, অপরকে আমরা কখনো কখনো ভালোবাসি, বিশেষত সে অপর যদি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হয়— তবে, কেউ কম আর কেউ বেশি। এখানে আমি স্বজাতিরই পরিচয় দিলুম; কারণ স্ত্রীজাতির কাউকে ভালোবাসার গরজ আছে কি না, তা তাঁরাই বলতে পারেন।

প্রেম করাটা আমাদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ভয় পাওয়াটা তার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক। কারণ ভয় জিনিসটে বারোমেসে; অপর পক্ষে প্রেমের ফুল মরসুমে ফোটে। তাই গল্প প্রেমেরও হয়, ভয়েরও হয়। আর প্রেমের গল্পও জমিয়ে বলা যায়, ভয়ের গল্পও।

যে ভয়ের কাহিনী আজ বলব সংকল্প করেছি, আমি তার মুখ্য অধিকারী নই, উত্তরাধিকারী মাত্র। ভয় অবশ্য প্রথমে একজন পান, তার পর তার ছোঁয়াচ আর-পাঁচ জনের লেগেছিল। ভয় জিনিসটে সাহসের মতো কেবল ব্যক্তিগত নয়। দলে পড়ে ও-জিনিস বাড়ে কিম্বা কমে। যোদ্ধামাত্রেই কি নির্ভীক? না দলে পড়ে লোকে বীরপুরুষ হয়?

২

আমরা জনকয়েক বন্ধুতে মিলে একবার নিরুদ্দেশ জলযাত্রা করেছিলুম ; অর্থাৎ সকলে একসঙ্গে স্টিমারে ভেসে পড়ি, কোনো বিশেষ স্থানে যাবার জন্য নয়— জলপথে পূর্ববঙ্গ প্রদক্ষিণ করবার জন্য, এবং সে অঞ্চলের বড়ো বড়ো নদনদীর চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করবার জন্য। অবশ্য গভীর ও বিপুল জলরাশি দেখবার লোভ আমাদের অনেকেরই ছিল না, কারণ, এ দলের লিডারকে বাদ দিয়ে বাকি সকলেই সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারাপার করেছেন ; পৃথিবীর তিন ভাগ যে জল আর এক ভাগ স্থল, সে জ্ঞান জিয়োগ্রাফি পড়ে নয়, চোখে দেখে লাভ করেছেন ; আর কালাপানির রঙ যে হীরেকষের মতো নীল নয়, তুঁতের মতো সবুজ, তাও লক্ষ্য করেছেন। উনপঞ্চাশ বায়ুর ভীষণ আক্রমণে মহাসমুদ্রের বিরাট আস্ফালন আর বিকট কোলাহলের সঙ্গেও তাঁরা পূর্ব থেকেই পরিচিত।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন দুইজন জাপানি আর্টিস্ট, যাঁদের দেশে হয় অবিশ্রান্ত ভূমিকম্প, আর সমুদ্রে হয় তুমুল তুফান ; যে তুফানের ভিতর তাঁদের প্রতিবাসী চীনেরা নৌকো ভাসায় বোম্বেটেগিরি করবার জন্য। এঁরা অবশ্য এই তুফানের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে ভারতবর্ষে এসে পৌচেছিলেন।

জীবনে কখনো জলযাত্রা করেন নি শুধু আমাদের লিডারটি। বলা বাহুল্য যে, পাঁচজনে দল বাঁধলেই একজন তার দলপতি হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন অতি সুপুরুষ, অতি বলিষ্ঠ, অতি ভদ্র আর অতি বুদ্ধিমান ; উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি ধনী এবং অতি অমিতব্যয়ী। যেখানে আয় কম সেখানেই ব্যয়ের হিসেব, আয় যেখানে বেশি সেইখানেই বেহিসেব।

আমরা জাহাজে উঠেই আবিষ্কার করলুম, তিনি আমাদের রসদের এমনি সুব্যবস্থা করেছেন যে, তার প্রসাদে ভূ-প্রদক্ষিণ করা যায়। দেশি বিলেতি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়— কিছুই বাদ ছিল না। উপরন্তু তাঁর সঙ্গে জনৈক ডাক্তার ছিলেন, যিনি উক্ত জাহাজে একটি বটকৃষ্ণ পালের শাখা ডাক্তারখানা খুলেছিলেন। তার উপর তাম্বু, ক্যাম্পখাট প্রভৃতিও সংগ্রহ করতে তিনি ভোলেন নি। আমাদের ধনী বন্ধুটি Robinson Crusoe পড়েছিলেন। সুতরাং মাঝদরিয়ায় জাহাজডুবি হলে পদ্মার চড়ায় উঠে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হবে, তার ফর্দ করে সে-সব জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন। এই সতর্কতার ইংরেজি নাম কি hydrophobia ?

৩

আমি লিখতে বসেছি একটি গল্প— পূর্ববঙ্গের ভ্রমণকাহিনী নয়। তার কারণ, পূর্ববঙ্গের বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা পূর্ববঙ্গে যাই আর না যাই, পূর্ববঙ্গ এখন কলকাতায় এসেছে। দক্ষিণ কলকাতাও পূর্ববঙ্গের উপনিবেশ হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলে অবশ্য নদী নেই, কিন্তু লেক আছে। সুতরাং গল্পের ভূমিকা স্বরূপ যে দুটি-একটি কথা বলা আবশ্যক, শুধু তাই বলব।

আমরা কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ গিয়েছিলুম রেলে, গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ স্টিমারে, আর সেই স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর, তার পর চাঁদপুর থেকে বরিশাল; আর বরিশাল থেকে সুন্দরবন ঘুরে, বারাতলার মোহানা উৎরে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসি। এ যাত্রায় আমরা মাটির চেয়ে জল ঢের বেশি দেখেছি। এর কারণ, আমরা কিছু দেখতে বেরোই নি, বেরিয়েছিলুম স্ফূর্তি করতে— অর্থাৎ অনর্গল গল্প করতে ও হাসতে, যে গল্প ও যে হাসির মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু নদী কোথাও এত চওড়া নয় যে, একসঙ্গে তার দুকূল দেখা যায় না। শুধু মেঘনার মোহানা পাড়ি দেবার সময় আমাদের দলপতির মন একটু দমে গিয়েছিল ও মুখ একটু বিবর্ণ হয়েছিল সুমুখে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে জল থৈ থৈ করছে দেখে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, একখানি ছোটো দেশি নৌকাও এ অগাধ জলরাশি বুকে ঠেলে অবাধে নদী পার হচ্ছে, তখন তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় আমরা বরিশাল গিয়ে পৌছলুম। বরিশালের নীচে নদী আমার চোখে বড়ো সুন্দর লেগেছিল। আর মনে হচ্ছিল যে আমি যদি বরিশালবাসী হতুম, আর আমার পকেটে যদি জলে ফেলে দেবার পয়সা থাকত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই একটি Boat Club করতুম, আর বিলেত থেকে সেই জাতের বোট আনাতুম যার নাম Eights— যে বোটে চড়ে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বিদ্যার্থীরা বাচ খেলে। যদিচ কেম্ব্রিজের নদীকে নালা বলাই সংগত, কারণ Cam টলির নালার চেয়ে প্রশস্ত নয়। রাত দশটা-এগারোটায় বরিশাল ছাড়লুম, কিন্তু সে রাত্তিরে ঘুম হয় নি। থেকে থেকে ঝালকাঠি প্রভৃতি বন্দরে জাহাজ থামে, আর মহা হৈ হৈ আরম্ভ হয়। সে গোলমালে কুম্ভকর্ণেরও ঘুম ভেঙে যেত— আমাদের যে যাবে, সে তো ধরা কথা। অবশ্য আমার সহযাত্রীরা এ কদিন ঘুমের কাছেও ছুটি নিয়েছিলেন।

৪

পরদিন একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো নদীতে গিয়ে পৌঁছলুম, যার জল গঙ্গার মতো ঘোলা নয়, যমুনার মতো কালো। আর দেখলুম যে দেদার স্ত্রী-পুরুষ সেখানে ইংরেজিতে যাকে বলে mixed bathing, তাই করছে। আমি ছাড়া আমার বাদবাকি সহযাত্রীরা সেই নদীতে অবগাহন স্নান করলেন। যদিচ তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাঁতার জানতেন না, এবং ইতিপূর্বে কখনো জলে নামেন নি। ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁরা বুকজলে ঝাঁপাই ঝুরলেন— বোধ হয় পল্লীসুন্দরীদের ব্যক্তরূপ দেখতে, অথবা নিজেদের নাগরিক রূপ দেখাতে। যখন তাঁরা ডাঙায় উঠলেন, তখন দেখি যে ওঁদের চক্ষু সব জবাফুল, আর হাত-পা মড়ার মতো ফ্যাকাশে। ভূচর জন্তু হঠাৎ জলচর হলে, তাদের বুকের রক্ত সব মাথায় চড়ে যায়। ডাক্তারবাবু Vinum Gallicii নামক তান্ত্রিক ঔষধের সাহায্যে তাদের দেহে আবার রক্তচলাচল ফিরিয়ে আনলেন। সে যাই হোক, সমস্ত দিনটা ছোটো বড়ো মাঝারি নানা আকারের নানা নদী পেরিয়ে, সন্ধ্যার সময় সুন্দরবনের খালে ঢুকলুম। ট্রেন সুড়ঙ্গে ঢুকলে যেমন দেহমনের একটি অসোয়াস্তি ঘটে, আমার অবস্থাও হল তাই। খালের দু পাশে ঘোর বন নয়, ঘন জঙ্গল। অর্থাৎ গাছ নেই, আছে শুধু আগাছা। আর সে আগাছা বেজায় মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে, দেখতে প্রায় গাছের মতোই উঁচু। জলজ উদ্ভিদ যেন ডাঙায় চড়ে হঠাৎ নবাব হয়ে উঠেছে। দু পাশের গাছ সব সুপুরি গাছের মতো সরু সরু, কিন্তু তার কাণ্ডগুলি সুপুরির মতো মজবুত নয়, সজনে গাছের মতো জলভরা আর পত্রবহুল। আর সে-সব নলের মতো এমন ঘনবিন্যস্ত যে, তাদের ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসবার জো নেই। এ-সব খালে ঢুকে আমার দম আটকে আসতে লাগল। চলতি স্টিমারের গুণে একটু-আধটু হাওয়া পাওয়া যাচ্ছিল, তাই রক্ষে। মনে হচ্ছিল স্টিমার থামলেই হাঁপিয়ে মরব। জাহাজের searchlightএর পিচকারি জলপথের এই-সব চোরা অন্ধকারের গায়ে আলো ছিটিয়ে দিচ্ছিল আর বিদ্যুতের মতো চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। আমি অন্ধকারের জীব নই, আর বাতাস আমার প্রাণ। এ-সব tunnel থেকে কখন বেরোব জিজ্ঞেস করায়, সারেঙ বললেন, "খানিকক্ষণ পরেই বড়ো নদীতে গিয়ে পড়ব, আর বারদরিয়ার কোল ঘেঁষে যাব। তখন আর হাওয়ার জন্য ভাবতে হবে না। তখন বলবেন, এ হাওয়া থামলেই রক্ষে পাই।"

৫

খালের এই অসহ্য গুমট, উপরন্তু আমার সহযাত্রীদের অফুরন্ত গল্পগুজবে আমি নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম ; তাই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তখন রাত প্রায় বারোটা। কিন্তু ঘুম হল না। ঘণ্টা-দুয়েক আধঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে থাকবার পর আমার জনৈক সহযাত্রী এসে বললেন, "ওঠো, বাইরে চলো।" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন ?" তিনি উত্তর করলেন, "জাহাজ ডুবছে।" আমি বললুম, "আমি বিছানা ছেড়ে উঠছি নে, জাহাজ যদি ডোবে তো ডেকে বসেও ডুবব, আর ক্যাবিনে শুয়েও ডুবব। জাহাজ ডোবা তো আর ভূমিকম্প নয় যে, ঘর ছেড়ে বাইরে গেলে রক্ষে পাব।" আসল কথা, তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করি নি।

এ কথা শুনে, তিনি আর কিছু না বলে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে আর-একটি ছোকরা এসে অতি গম্ভীর স্বরে আদেশ করলেন, "উঠে বাইরে এসো।" আমি এঁকেও প্রশ্ন করলুম, "কেন ?" তিনি বললেন, "বাইরে এসে নিজেই বুঝতে পারবে কেন।"

আমি জানতুম এ ছোকরাটি বাজে ভয় পাবার ছেলে নয়, রজ্জুতে সর্প ভ্রম করা তার ধাতে নেই। তাই আমি আর কোনো আপত্তি না করে তার সঙ্গে বাইরে এলুম।

বাইরে এসে দেখি, টুকরো টুকরো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আর তাদের ফাঁক দিয়ে তারার মিট্‌মিটে আলো আকাশের বুকে ধুক্ ধুক্ করছে। এই ছিটেফোঁটা আলোর মিশ্রণে নৈশপ্রকৃতি একটি করাল মূর্তি ধারণ করেছে। বাঁ পাশে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, আর সেখান থেকে জোর হাওয়া এসে নদীর জলকে ওলটপালট করছে ও জাহাজ বেজায় roll করছে। সারেঙ বলেছিল এ-সব জাহাজের দোষই এই যে, এরা সব মাথাভারী— এরকম জাহাজ ডোবে না, উল্টে পড়ে। আকাশ বাতাস ও জলের অবস্থা দেখে বুঝলুম আমার সহযাত্রীরা কি কারণে ভয় পেয়েছেন। এ ভয় প্রকৃতির শক্তি দেখে ভয় নয়, রূপ দেখে ভয়।

ডেকের সুমুখে এসে দেখি, আমার সহযাত্রী সব সারবন্দী হয়ে বসে আছেন। সকলেরই গা খোলা, আর অনেকের হাতে পৈতে। আমরা অনেকেই ছিলুম জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সকলের গলায় পৈতে ছিল না। আমাদের দলপতির

আদেশে সকলেই গায়ত্রী জপতে বসে গিয়েছেন। আর যে দু-একজনের গায়ত্রীমন্ত্রে জন্মসুলভ অধিকার নেই তাঁরা সব দুর্গানাম জপ করছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হবামাত্রই আমার গায়ের জামা খুলতে হল, আর একশো আটবার গায়ত্রী জপ করবার হুকুম হল। আমি তাই করতে শুরু করলুম। জাপানি বন্ধু দুটি দেখি একটি ছোট্ট টেবিলের সুমুখে দু গেলাস হুইস্কি নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন, আর থেকে থেকেই অম্লানবদনে হুইস্কির সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো ও মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে নীরবে গলাধঃকরণ করছেন।

সারেঙ বেচারা হতভম্ব হয়ে সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজের বিপদ দেখে, না, যাত্রীদের ভয় দেখে? আর সুখানি একমনে হালের চাকা ঘোরাচ্ছে। আর-একজন খালাসী আমাদের লিডারের হুকুমে ওলন ফেলে বৃথা জল মাপছে ও মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে বলছে, "বাম মিলা নেই।"

আকাশের এই অদ্ভুত চেহারা দেখে আমারও মনে সোয়াস্তি ছিল না, তার পর আমার সহযাত্রীদের মুখে ও চোখে ভয়ের চেহারা দেখে আমার সে অসোয়াস্তি ভীষণ ভয়ে পরিণত হল। হৃদয়ের রক্তচলাচল slow হল কি fast হল বলতে পারি নে, কিন্তু তার মামুলি চাল ছিল না। তবে তাঁদের মন্ত্রপাঠ শুনে সেইসঙ্গে হাসিও পাচ্ছিল। পরে শুনেছি আমাদের দলপতি সারেঙ, সুখানি আর খালাসীদেরও নামাজ পড়তে আদেশ করেছিলেন। তাতে তারা রাজি হয় নি, বে-বখত বলে। ভাগ্যিস তারা রাজি হয় নি; যদি হত তা হলে আরবি ও সংস্কৃত মন্ত্রের খিচুড়ি ভগবানের কাছে গ্রাহ্য হত কি না জানি নে, কিন্তু আমার কানে তো সহ্য হত না। আর আমি তা হলে জাপানি বন্ধুদের দলে গিয়ে ভর্তি হতুম ও লঙ্কামরিচসনাথ হুইস্কি পান করতে শুরু করতুম, পৈতে হাতে করে বিলেতি মদকে গায়ত্রীমন্ত্রের সাহায্যে শোধন করে নিয়ে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা মাতলার মোহানা পার হলুম, আর বারদরিয়া অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর আমাদের চোখের সুমুখ থেকে অন্তর্ধান হল। অমনি সকলে বিপদ কেটে গেল বলে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বিপদ যে কিসের কেটে গেল তা আমি বুঝতে পারলুম না, কারণ, মাথাভারী জাহাজ যদি কচ্ছপের মতো উল্টে পড়ত, তা হলে তা নদীতেই ডিগবাজি খেত, সমুদ্রে নয়। সে যাই হোক, আমাদের দলপতি ডাক্তারবাবুকে কানে কানে কি

উপদেশ দিলেন, তিনি অমনি জাহাজের নীচের তলায় চলে গেলেন, আর মিনিট-পাঁচেক পরে ফিরে এলেন। তখন তাঁর হাতে আর hypodermic syringe নেই ; আছে শুধু এক তাড়া নোট। আমাদের দলপতি আমাকে বললেন, "ঐ টাকা-কটি সারেঙকে বকশিস্ দাও।" আমি গুণে দেখি পাঁচখানি দশ টাকার নোট আছে। সারেঙকে বললুম, "হুজুর তোমাকে এই বকশিস্ দিয়েছেন, কারণ, তুমি প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বোটং।"

এ কথা শুনে সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল। শুধু সুখানি বেচারা মুখ হাঁড়ি করে রইল, প্রাণপণ চাকা ঘুরিয়েও বকশিস্ পায় নি বলে। বিপদ আমাদের কিছু ঘটে নি, ঘটলে এ গল্প আমি তোমাদের কাছে বলতে পারতুম না। কারণ গ্রীক পণ্ডিতরা বহুকাল পূর্বে আবিষ্কার করেছেন যে, জলমগ্ন লোক tell no tales। বোধ হয় এই সত্য আবিষ্কার করবার ফলে অ্যারিস্টটেল আদি বৈজ্ঞানিক বলে গণ্য।

তোমরা মনে ভাবতে পার যে, এ গল্প ভয়ানক রসের নয়, হাস্য-রসের। কিন্তু মনে রেখো যে, ভয় কেটে গেলেই মানুষের মুখে হাসি বেরোয়। আর ভয় জিনিসটে অনেক সময় অকারণ ঘটে। আমরা যাকে প্রেম বলি, তা ভয়েরই স্বজাত। আর এই দুই মনোভাবই কেটে গেলে comic হয়ে উঠে। যদি কেউ বলেন এ গল্পের ভিতর গল্প নেই ; তা হলে বলি, গল্প না থাক্ তার চাইতে বড়ো জিনিস moral আছে। আর সে moral হচ্ছে, মাঝে মাঝে ভয় পেয়ো, নইলে তোমাদের মনে ধর্মভাব জেগে উঠবে না।

[আশ্বিন] ১৩৪০

ট্রাজেডির সূত্রপাত

আমি একদিন কাগজে দেখলুম যে, তরুণেন্দ্রনাথ রায় এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফার্স্ট হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে আমি মহা সুখী হলুম। কারণ তরুণ আমার আকৈশোর বন্ধু নৃপেন্দ্রনাথ রায়ের বড়ো ছেলে। ছোকরাটিকে আমিও পুত্রের মতো স্নেহ করতুম। তাকে আমি বাল্যকাল থেকেই জানি, আর সে সব হিসেবেই ভালো ছেলে হয়ে উঠেছিল। তার তুল্য সুস্থ সবল ও সুন্দর ছেলে, লেখাপড়ায় যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়— তাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। তরুণ দেখতে তার বাপের মতো সুন্দর নয়। তরুণের মুখে নাক-চোখ অবশ্য মাপজোকের হিসেবে নৃপেনের চাইতে ঢের বেশি correct ছিল ; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে, নৃপেনের রূপের ভিতর এ-সবের অতিরিক্ত কি-একটা পদার্থ ছিল, যা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। এ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ বোধ হয় সকলেই দেখেছেন যাদের পাথরের মূর্তিতে তাদের আসল রূপ ধরা পড়ে না ; যদি কোথাও ধরা পড়ে তো সে গুণীর হাতের ছবিতে। কারণ এ জাতীয় রূপের যা প্রধান গুণ— তার আকর্ষণী শক্তি, সে গুণ বোধ হয় দেহের নয়, মনের। সে যাই হোক, আমি স্থির করলুম যে, দুপুরবেলা স্নানাহারের পর নৃপেনকে congratulate করতে যাব। তাঁর ছেলে যে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম পদ লাভ করেছে, এতে তিনি অবশ্য মহা আহ্লাদিত হয়েছেন। বিশেষত তিনি যখন নিজে একজন প্রফেসার, আর তরুণের তিনিই ছিলেন প্রাইভেট টিউটর তখন তাঁর ছেলের এই পাসের গৌরবে তিনিও অর্ধেক ভাগীদার।

আমি সেইদিনই বিকেলে নৃপেনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু আমার বন্ধুর কথাবার্তা শুনে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। দেখলুম তরুণের কৃতিত্বে তিনি অবশ্য সুখী হয়েছেন ; কিন্তু আমি যতটা উত্তেজিত হয়েছিলুম, তিনি ততটা হন নি। বরং তাঁকে দেখে ঈষৎ মন-মরা বলেই মনে হল। নৃপেন স্বভাবতই ঘোর মজলিসি লোক। তিনি নানা বিষয়ে গল্প করতে ভালোবাসতেন, আর তাঁর নিজের গল্পের রস নিজে উপভোগ করতেন বলে তাঁর শ্রোতারাও তা সমান উপভোগ করত। তিনি অবশ্য চিরজীবন বই-পড়া ও বই-পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ করেন নি ; কিন্তু আর পাঁচজনের

সঙ্গে আলাপে তিনি পুঁথিগত বিদ্যেকে পাশ কাটিয়ে যেতেন। তাঁর আলাপের অন্তরে বিদ্যার বাচালতা ছিল না বলেই তাঁর কথাবার্তা আমাদের এত ভালো লাগত। কিন্তু সেদিন কেন জানি নে, তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন যে, "পাস করাকে আমি খুব একটা বড়ো জিনিস মনে করি নে, এর পর তরুণ জীবনে কি করবে সেই কথাই ভাবছি।" আমি বললুম, "তার কর্মজীবনের পথ তো এখন পরিষ্কার হল। এর থেকে আশা করা যায় যে, তাকে ভিক্ষে করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে না।" নৃপেন বললেন, "সে ভাবনা আমার নেই। কিন্তু এই স্কুল-কলেজের পড়া বিদ্যে আমাদের ভিতরের আসল মানুষটিকে স্পর্শ করে না। মানুষের অনেকরকম প্রবৃত্তিকে শুধু ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জীবনের সঙ্গে পরিচয় হবার পর কখন্ কোন্ প্রবৃত্তি জেগে উঠবে তা কে বলতে পারে? আর তখন সমস্ত মুখস্থ বিদ্যে এক মুহূর্তে ভেসে যায়। তখন মানুষ প্রকৃতির হাতে খেলনা মাত্র হয়ে ওঠে।"

নৃপেনের কথাবার্তা সেদিন যে একটু অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে হয়েছিল ইংরেজিতে যাকে বলে cynical। তাঁর মুখ থেকে paradox নিত্য নির্গত হলেও, সে-সব paradox আমরা রসিকতা হিসেবেই ধরে নিতুম। কিন্তু সেদিনকের paradoxগুলোর ভিতর থেকে কি যেন একটা অপ্রিয় সত্য উঁকি মারছিল; আর মনকে চিন্তাকুল করে তুলছিল।

তা ছাড়া তিনি মধ্যে মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন; যেন শুধু একটা কথাই ভাবছেন, অথচ সে ভাবনার বিষয় আমার কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখতে চান। শ্রোতা যখন অন্যমনস্ক হয়, তখন অবশ্য তাঁর সঙ্গে আলাপ সংক্ষেপে সারতে হয়।

আমি বিদায় নেবার জন্য উস্‌খুস্ করছি দেখে তিনি বললেন, "আমার মনটা আজ প্রকৃতিস্থ নেই।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার ছেলের পাসের খবর শুনে তোমার মন বিগড়ে গেল নাকি?"

"না, একখানা বই পড়ে।"

"বই পড়ে?"

"হাঁ, বই পড়ে।"

"কি বই?"

"Bergsonর *Rire*।"

"ফরাসীতে *Rire* মানে 'হাসি', নয় ?"

"হাঁ, তাই।"

"হাসির কথা পড়ে তোমার কান্না এল ?"

"তার কারণ, তিনি কমেডির আলোচনা করতে গিয়ে ট্রাজেডি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলেছেন। তাঁর মোদ্দা কথা এই যে, ট্রাজেডির বীজ আমাদের সকলের অন্তরেই আছে। কথাটা আমার মনে লেগেছে। কারণ আমি নিজে এক সময় এমন পথে পা বাড়িয়েছিলুম, যে পথে আর অগ্রসর হলে শুধু আমার নয়, আর-পাঁচজনের জীবনকেও ট্রাজেডি করে তুলতুম।"

এ কথা শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, "তুমি তো আজীবন নৈতিক বাঁধা পথে চলে এসেছ ; এক, মাথায় অকস্মাৎ বাজ ভেঙে পড়া ছাড়া তোমার জীবনে আর কি ট্রাজেডি ঘটতে পারে ?"

নৃপেন্দ্র একটু হেসে উত্তর করলে— কোনো ট্রাজেডি ঘটে নি, কিন্তু ঘটতে পারত। আমি অবশ্য সংসারের বাঁধা পথেই সোজা চলেছি ; কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে, ও পথ জীবনের একমাত্র পথ নয়। চলতে গেলেই দেখা যায় যে, আশেপাশে অনেক ছোটোখাটো অলিগলি আছে, যা কখনো কখনো মনকে টানে। মনে হয় ঐ গলিপথে যেন কোনো অপরূপলোকে গিয়ে পৌঁছনো যায়, আর সে-সব পথে নিজের প্রকৃতি অনুসারে স্বাধীনভাবে চলা যায়, সমাজবন্ধন ছিন্ন করে। অথচ এই-সব পথেই ট্রাজেডি ঘটে। এখন বলি ঘটনা কি ঘটেছিল। আমি এইরকম একটি পথে পা বাড়িয়েছিলুম, কিন্তু ঘটনাচক্রে এগোতে পারি নি ; নইলে আমার জীবন একটা মস্ত ট্রাজেডি হয়ে উঠত। শুধু সাংসারিক জীবনটাই যে ভেস্তে যেত তাই নয়— আমার মানসিক জীবনেও ঘোর অরাজকতা ঘটত। সেই কথা মনে করে আমার মন আজ এমন অস্থির হয়ে উঠেছে। তাইতেই আমার কথাবার্তা ও ব্যবহার তোমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছে। অবশ্য আমাদের ঠিক স্বভাবটা যে কি, তা আমরা নিজেই জানি নে তো আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা তা কি করে জানবে ? যখন কোনো অবস্থাবিশেষে তা হঠাৎ ফুটে বেরোয়, তখন নিজের স্বভাবের সাক্ষাৎকার লাভ করে মানুষ নিজেই অবাক হয়ে যায়।

এখন ব্যাপার কি হয়েছিল বলছি, শোনো। সেটি মন খুলে কাউকে না

বললে, মনের শান্তি আবার ফিরে পাব না। রোমান ক্যাথলিকেরা বলে, confession করায় পাপ ক্ষয় হয় ; এই কথাটিই Freud এ যুগে বৈজ্ঞানিক হিসেবে বলেছেন। সাইকো-অ্যানালিসিসের অর্থ, রোগীকে কৌশলে confession করিয়ে নিতে পারলেই সে রোগমুক্ত হয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের একই মত ; তফাত এই যে, ধর্মমত সাইকোলজির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর বৈজ্ঞানিক মত physiologyর উপরে। ভালো কথা, কোথায় দেহ শেষ হয়, আর মন আরম্ভ হয়, তার পাকা সীমানা কি কেউ নির্ণয় করতে পেরেছেন ?— এ অবশ্য ফিলজফির সমস্যা, কিন্তু আমরা জীবনে নিত্যই দেখতে পাই যে, আমাদের মনোভাব ও ব্যবহার দেহমন দুয়ের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এ-সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তোমার কাছেও এ confession করতে আমি ইতস্তত করছি। কাজেই বাজে কথা বলে আসল কথার ভূমিকা করছি।

তোমার মনে থাকতে পারে যে, বছর-সাতেক আগে আমি একবার ইস্টারের ছুটিতে দেহ ও মনের হাওয়া বদলাতে কার্শিয়ং যাই। তখন আমার বয়েস পঁয়তাল্লিশ ও তরুণের বয়েস প্রায় ষোলো। কার্শিয়ং যাই বিশেষত এই কারণে যে, জায়গাটা দার্জিলিংএর মতো ঠাণ্ডা নয়, উপরন্তু দার্জিলিংএর মতো সেখানে যাত্রীর ভিড় নেই। তাই আমি rest-cureএর লোভে ঐ গিরিশিখরেই আশ্রয় নেই। বলা বাহুল্য, আমার কোনোরূপ cureএর প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল শুধু restএর। যদিও তখন আমার মাথার চুল পাকতে আরম্ভ করেছে তবুও আমার রক্তমাংসের দেহ যৌবনের জের টেনে চলেছে।

কার্শিয়ং গিয়ে আমার দৈনিক কাজ হল, খাই দাই আর ঘুরে বেড়াই। অবশ্য সেখানে ঘুরে বেড়াবার বেশি জায়গা নেই। তাই আর সকলে যা করে, আমিও তাই করতে আরম্ভ করলুম ; অর্থাৎ সকালে মেল আসবার সময় একবার স্টেশনে হাজির হতুম, কলকাতা থেকে কে কে দার্জিলিং যাচ্ছে তাই দেখবার জন্য। আর বিকেলে আর একবার হাজির হতুম, কে কে কলকাতায় ফিরছে তাই দেখবার জন্য। দার্জিলিং-যাত্রীদের গমনাগমনটাই কার্শিয়ংএর প্রধান দৃশ্য ; কারণ সেখানকার একঘেয়ে জীবনে এই সূত্রেই দিনে দুবার বৈচিত্র্য ঘটে।

একদিন স্টেশনে আমার কলেজের একটি ভূতপূর্ব ছাত্র রমেনের সঙ্গে দেখা

হল। ছোকরাটি আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় ছিল ; কেননা প্রথমত সে ছিল প্রিয়দর্শন, তার উপরে সে মন দিয়ে পড়াশুনা করত। তার ধরনধারণ একটু মেয়েলি গোছের ছিল ; ফলে কলেজের খেলোয়াড়-দল তাকে পছন্দ করত না, কিন্তু প্রফেসাররা করত। সে ছোকরা কার্শিয়ংএই নামল ও আমাকে দেখে খুব খুশি হল। বললে, সে শুধু দুদিনের জন্য এখানে এসেছে তার মার সঙ্গে দেখা করতে ; আবার পরশুই ফিরে যাবে। তার পর আমাকে তাদের বাড়ি একবার যেতে অনুরোধ করলে। তার মা নাকি আমার পরিচয় লাভ করে বড়ো খুশি হবেন ; আর তা ছাড়া এখানে শুধু তার মা ও ছোটো বোন আছেন, আমি তাঁদের একটু তত্ত্বাবধানও করতে পারব। তার মার শরীর অসুস্থ, তাই তিনি কার্শিয়ংএ থাকেন। চাকরবাকর ব্যতীত বাড়িতে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই ; তাই ছোকরাটি কলকাতায় তাদের জন্য উদ্‌বিগ্ন থাকে। আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলে সে একটু নিশ্চিত থাকতে পারবে। তার পর সে আমার বাসার ঠিকানা জেনে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন সকালে রমেন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হল। আর তার সঙ্গে আমি তাদের বাড়িতে তার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলুম। গিয়ে দেখি বাড়িটি মন্দ নয়, ছোট্টো কিন্তু দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করবার পর রমেনের মা বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলুম, তিনি প্রায় আমার সমবয়সী।

যৌবনে বোধ হয় সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু হয় ডিস্‌পেপসিয়া নয় অপর কোনো নাছোড়বান্দা রোগে নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝলুম যে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা আছে ; এবং তাঁর মতামত সবই, ইংরেজিতে যাকে বলে, advanced। বোধ হয় রুগ্‌ণ শরীরে ঘরে বসে বই পড়ে পড়ে তাঁর মনটাই অসামাজিক হয়ে গিয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, "কতদিন আপনার এখানে থাকা হবে?" আমি উত্তর করলুম, "আরো মাসখানেক।" তখন তিনি বললেন যে, "আপনার যদি কোনো অসুবিধে না হয় তো ইতিমধ্যে আমার মেয়েকে ঘণ্টাখানেক করে ইংরেজি পড়ালে বড়ো ভালো হয়। তার বয়স প্রায় ষোলো, সে এবার ম্যাট্রিক দেবে। আর রমেনের কাছে শুনেছি যে ইংরেজি আপনি অতি চমৎকার পড়ান। আপনার কাছে পড়ে শুনতে পাই ছেলেরা সাহিত্যরসের আস্বাদ পায়। আমার মেয়ে

ম্যাট্রিক পাস করে কিনা তার জন্য আমি মোটেই কেয়ার করি নে ; তার অন্তরে যাতে সাহিত্যের প্রতি একটু টান জন্মায় আমি তাই চাই।" আমি ভদ্রতার খাতিরে তাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম। কিন্তু মনে মনে বললুম, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে— এই হিমালয়ে বেড়াতে এসেও আবার পড়ানো !'— মা রমেনকে বললেন, "প্রতিমাকে ডেকে আনো তো।"

প্রতিমা যখন ঘরে এসে ঢুকল, তখন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। এ যে সাক্ষাৎ প্রতিমা ! কিন্তু এ প্রতিমার মূর্তি দেবীমূর্তি নয়, মানবীমূর্তি। বাঙালির ঘরে যে এমন অপরূপ সুন্দরী জন্মলাভ করতে পারে তা আমি কখনো কল্পনাও করি নি। মাথায় সে তার দাদার চাইতেও একটু উঁচু, অথচ তার প্রতি অঙ্গ সুডৌল নিটোল। আর চোখ পটলচেরা বটে, কিন্তু সে চোখের সৌন্দর্য শুধু তার আকার অথবা পরিমাপের উপরে নির্ভর করে না ; তার ভিতর প্রাণের কি এক রহস্য ছিল যা আমরা ঠিক জানি নে, কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা জানে। রক্তমাংসের দেহের রূপের ভিতর যে মাদকতা আছে তা যে statueর ভিতর নেই, এ সত্য আমি সেই মুহূর্তে প্রথম আবিষ্কার করলুম।

সেদিন মায়েতে ছেলেতে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা আমার মনে নেই ; কারণ আমি অপর কারো প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি নি, অপরের কথাবার্তায় মনোযোগও দিতে পারি নি।

প্রতিমাকে দেখে যে আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ হয়েছিল, তা অবশ্য নয় ; আমি শুধু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম, আমার মন বাইরের চারি দিক থেকে আলগা হয়ে পড়েছিল।

এই পর্যন্ত মনে আছে যে, স্থির হল আমি তার পরদিন থেকেই প্রতিমাকে ইংরেজি কবিতা পড়াব। আর এইটুকু মনে আছে যে, সেদিন আমি সমস্ত দিন একলা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলুম, আর সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে শুধু দিবাস্বপ্ন দেখেছিলুম।

তার পরের দিন থেকেই আমার অধ্যাপনা শুরু হল। রমেনের উপদেশমত *Golden Treasury*র চতুর্থ ভাগ থেকে প্রতিমাকে কতকগুলি কবিতা পড়াবার ভার আমার ঘাড়ে পড়ল। প্রতিমার মা চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাবার মারফত ইংরেজি সাহিত্যের রুচি তাঁর মেয়ের মনে জাগাতে। এতেই

হল মুশকিল্। প্রথমত, প্রতিমা ইংরেজি ভাষা এতদূর জানত না, যাতে করে সে ইংরেজি কবিতার সাহিত্যরস আস্বাদ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের কবিতা। প্রেম করবার বয়স আমি বহুদিন হল উত্তীর্ণ হয়েছি, আর প্রতিমার মনে প্রেমের প্রবৃত্তি আজও জন্মায় নি। সুতরাং এ বিষয়ে আমিও তার উপযুক্ত শিক্ষক নই, সেও উপযুক্ত ছাত্রী নয়। সে যে নয়, প্রথম দিনের আলাপেই তার পরিচয় পেলুম। দেখলুম নানা বিষয়ে তার কৌতূহল আছে, জানবার ইচ্ছে আছে; কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। সে দেহে না হোক মনে এখনো বালিকা, স্ফুটনোন্মুখ কলিকামাত্র। তার পর দুদিনেই বুঝলুম যে, মেয়েটির দর্শন লাভ করে অবধি আমার ভিতরে একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটেছে। আমার মন আর আত্মবশে নেই। যেন সে মন রূপলোকে উঠে গেছে, যে-লোকে মর্তের কোনো বিধিনিয়ম নেই; আমি যে-সব বিধিনিয়ম জীবনে ও মনে এতদিন গ্রহণ ও পালন করে এসেছি, আর যাদের সাহায্যে নিজেকে একরকম গড়ে তুলেছি, সে-সব বিধিনিষেধের বন্ধন আমার শিথিল হয়ে এসেছে। সংক্ষেপে প্রতিমার সুমুখে বসে তার চোখের আলোতে মানবসমাজ যে শুধু পারিবারিক সমাজ নয়, সে সত্য প্রত্যক্ষ করলুম। এ সমাজের বাইরে যে একটা আনন্দ ও বেদনার জগৎ রয়েছে, তার সন্ধান পেলুম। দুদিন না যেতেই আমার মনের অকারণ চঞ্চলতা, অজানা আনন্দ ও তার সঙ্গে অজানা ভয়— এই-সব অস্পষ্ট মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বুঝলুম যে, আমি এই মেয়েটির ভালো-বাসায় পড়েছি। এ সেই জাতীয় ভালোবাসা যা প্রথমযৌবনে মানুষের মন কখনো কখনো অভিভূত করে; আর এ ভালোবাসার বেগ এত তীব্র যে, তার মুখে আমার ধর্মজ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান, সব ভেসে গেল। আমি নিজের কাছেও আমার এই মনের কথাটি গোপন রাখতে প্রাণপণে চেষ্টা করলুম। কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না; বরং আমার মনের কথাটি প্রতিমাকে বলবার একটি অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমার মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললে। আমার এ বয়সে এ মনোভাব হওয়া যতদূর সম্ভব ridiculous, আর সে কথাটি প্রতিমাকে বলা তার চাইতে বেশি ridiculous, তা অবশ্য আমি জানতুম। তৎসত্ত্বেও আমি মন স্থির করলুম যে, কথাটি প্রতিমাকে বলে তার পর পলায়ন করব। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে তার পর যে কোথায় যাব, কি করব, তা

অবশ্য একবার ভাবিও নি। তার পরদিন আমি প্রতিমাকে বললুম্ যে, "আমি তাকে আর পড়াতে আসব না।" সে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?" আমি উত্তর করলুম, "শেলীর সে কবিতাটি কি তোমার মনে আছে?" প্রতিমা বললে, "কোন্‌টি?"

আমি বললুম,

"One word is too often profaned
For me to profane it.
One passion too falsely disdained
For thee to disdain it."

সে wordটি কি তা জান, কিন্তু সে passionটি কি তা অবশ্য জান না। সুতরাং সে wordটি তোমার কাছে profane করব না, কারণ তুমি আমার passionটি disdain করবে।"

আমার মুখে এ কথা শুনে প্রতিমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল; সে এক মুহূর্তে মনেও বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠল, কুঁড়ি যেমন এক মুহূর্তে ফুটে ফুল হয়। যেন ঐ love কথাটির অন্তরেই কী মন্ত্রশক্তি আছে। এর পর আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম, বাসায় ফিরে যাবার জন্য। প্রতিমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর জিজ্ঞাসা করলে, "তা হলে কাল থেকে আর আসবেন না?"

আমি বললাম, "আমার তো ইচ্ছে তাই।"

প্রতিমা বললে, "যদি আসতে ইচ্ছে হয় তো পড়াতে আসবেন।"

এই কটি কথা বলে, সে দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলে গেল।

এ কথা তার অন্তরের বালিকা বললে, কিম্বা নবজাত কিশোরী বললে, বুঝতে পারলুম না। তাই এর পর কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম।

আসবামাত্র একখানি Urgent Telegram পেলুম, Tarun seriously ill, come at once.

আমার ছেলের মৃত্যু-আশঙ্কা আমার প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে দিলে। সেইদিন বিকেলের ট্রেন ধরেই কলকাতায় ফিরে এলুম।

ভেবে দেখো তো ও পথে যদি অগ্রসর হতুম তো কি ট্রাজেডি ঘটত।

"তোমার দেখছি একটা মস্ত ফাঁড়া উতরে গেছে। আশা করি, ও মনো-

ভাবের এখন লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই ?”

“এ ঘটনার স্মৃতি এখন আমার মনে দগ্ধসূত্র সংস্কারের মতো রয়েছে। সে ছাইয়ের অন্তরে এখন আগুন নেই।”

“তুমি ভাবছ যে তরুণের ভাগ্যেও একদিন এরকম বিপদ ঘটতে পারে ? কিন্তু সে বিপদ সে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে।”

“কি উপায়ে ?”

“যদি কখনো সে অস্থানে প্রেমে পড়ে তা হলে তুমিও seriously ill হয়ে পোড়ো। তা হলেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।”

আমার এ উক্তির ভিতর অবশ্য একটু বিদ্রূপ ছিল ; কারণ তাঁর জীবনের অসম্পূর্ণ ট্রাজেডি যে তাঁর অন্তরের গোপন ট্রাজেডিতে পরিণত হয় নি, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নি। তবে আশা করি এ confessionএ তিনি তাঁর মনের শান্তি ফিরে পাবেন।

ভাদ্র ১৩৪০

মন্ত্রশক্তি

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না, কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র পড়ে নয়— মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পুব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে। পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ির দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত-দুপুরে পেতেন— ধোঁয়ার মতো যাঁর ধড় আর কুয়াশার মতো যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙিনা— যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেন নি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দার, তার সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কী চেহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ ফুটের উপর লম্বা, পাকা দাড়ি, গোঁফ-ছাঁটা। সে ছিল ওদিকের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনীকে এক-হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন-না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি— ও হাতে নিলে কোনো লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে ও না বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস— চর্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যাবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মতো আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার করেই দু পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ

আদেশ আমাকে করবেন না।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “তা হলে তুমি লাঠি খেলতে জান না?”

সে উত্তর করলে, “হুজুর, জানতুম ছোকরা বয়েসে, তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি, লক্‌ড়িও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি ; তা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি নে ; কিন্তু হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “কেন এরকম দিব্যি করেছিলে?”

ঈশ্বর বললে, “ছেলেবেলায় এরা-সব খেলা শিখত। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লক্‌ড়ি, কি সড়কিতে আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে আমি কোনো মন্তর-তন্তর শিখেছি— তারই গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হুজুর, মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে ; তবে আমার যা ছিল তা এদের কারো ছিল না। সে জিনিস হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে তার হাতের লাঠি-সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারত না, আর শুধু মার খেত। শেষটায় এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে আমাকে কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে।

“তার পর একদিন এরা রাতদুপুরে আমার বাড়ি চড়াও হয়ে আমাকে বিছানা থেকে তুলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, কালীবাড়ি নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে আমাকে বলি দেবার উদ্যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, ‘তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করো যে আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হলে তোমাকে ছেড়ে দেব।’ হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি ; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁই নি। কথা সত্যি কি মিথ্যে— ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।”

৩

মিছু আমাদের বাড়ির লেঠেলের সর্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে?"

সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলি নি— আর, কখনো বলবও না।"

তার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয় তো এমন পাকা লেঠেল হল কি করে?"

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে তো যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না, ঠাকুরদাস কামার অত বড়ো মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে; আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করি নে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন কমে এসেছে— যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয় তা হলে দেখতে পাবেন যে বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ করে বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মতো অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কি ছেলেখেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে, আর তার ঝাঁকড়া চুল একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘষে ফুলিয়ে তুললে; তার পর মাটিতে জোড়াসন হয়ে বসে পাঁচ মিনিট ধরে বিড় বিড় করে কি বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব চিৎকার করে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে, আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।" ঈশ্বর এ-সব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর যখন সে উঠে দাঁড়ালে, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বলছে, আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মতো।

৪

ঈশ্বর বললে, "প্রথম এক-হাত লকড়ি নিয়েই ছেলেখেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক-হাত খেলে, তাকে যদি হারাতে পার তা হলে আমি তোমাকে লক্ড়ি খেলা কাকে বলে তা দেখাব।" তার পরে একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতোই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি, বাঁ হাতে তার ছোট্ট একটি বেতের ঢাল, আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লক্ড়ি। খেলা শুরু হল। এক মিনিটের মধ্যেই দেখি— কামালের লক্ড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লক্ড়ি হাতে ধরে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?" এ কথা শুনে মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লক্ড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে, "তোমার হাতের লক্ড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লক্ড়ির দাগ বসিয়ে দেব।"

এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে দুজনের লক্ড়ি বিদ্যুৎবেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটায় মনিরুদ্দির লক্ড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল; আর দেখি, মনিরুদ্দির সর্বাঙ্গে লাল লাল দাগ, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বললে, "ধর্ বেটা সড়কি।"

ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিয়ো না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ তো কাজিয়া নয়— আপসে খেলা। আর এই কথা মনে রেখো, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।"

এর পর সড়কি খেলা শুরু হল। সড়কির সাপের জিভের মতো ছোটো ছোটো ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয়, আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কিরকম করে, কারণ সড়কির ফলা তো সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' বলে চিৎকার করে উঠল।

৫

তখন তাকিয়ে দেখি তার কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে।

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত

থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা হলে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না। ও চায়— হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে গেল, আর সমস্বরে 'মার বেটাকে' বলে চিৎকার করে তারা বড়ো বড়ো লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড়ো লাঠি দু হাতে ধরে আত্মরক্ষা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দুজনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে। তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল; কারো মাথাও ফেটে গিয়েছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি, কাউকেও এক ঘা মারি নি। ওদের গায়ে মাথায় যে দাগ দেখছেন— সে-সব ওদেরই লাঠির দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় গিয়ে পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের— ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম ও বেটা জাদু জানে। এখন তো দেখলেন যে আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাত জোড় করে বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানি নে। তবে সড়কি-লাঠি ধরবামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার উপর ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠি খেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই— যথা সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে তিনিই দিগ্‌বিজয়ী হন যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই, তাঁরা জানেন না। আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।

আশ্বিন ১৩৪১

যখ

শ্রীমান্ অলকচন্দ্র গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

যখ কাকে বলে, জান? সংস্কৃতে যাকে বলত যক্ষ, তারই বাঙলা অপভ্রংশ হচ্ছে যখ। আমাদের মুখে যে শুধু যক্ষ যখ হয়ে গিয়েছে তাই নয়, তার রূপগুণও সব বদলে গিয়েছে। সংস্কৃতে যক্ষের রূপ কী ছিল আমি জানি নে। তবে এইমাত্র জানি যে, সে যুগে লোকে তাদের ভয় করত। কারণ তাদের শক্তি ছিল অসীম, অবশ্য মানুষের তুলনায়। আর যার শক্তি বেশি, তাকেই লোকে ভয় করে। যক্ষরা ছিল মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি এক শ্রেণীর অদ্ভুত জীব; এক কথায়, তারা ছিল অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু। তাদের একটি গুণের কথা সকলেই জানে। তারা ছিল সব ধনরক্ষক। তাই যক্ষের ধন কথাটা এ দেশে মুখে মুখে চলে গিয়েছে।

বাঙলাদেশে যক্ষ জন্মায় না। তাই যখ লোকে বানায়— ধনের রক্ষক হিসেবে। ধন সকলেই অর্জন করতে চায়, কিন্তু কেউ কেউ অর্জিত ধন রক্ষা করতে চায় চিরদিনের জন্য; এক কথায়, ধনকে অক্ষয় করতে চায়। মানুষ চিরকালের জন্য দেহকেও রক্ষা করতে পারে না, ধনকেও নয়। যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করাই হচ্ছে বাঙলায় যখসৃষ্টির উদ্দেশ্য। এ দেশের কোটিপতিরা কি উপায়ে যখ সৃষ্টি করতেন জান?

তাঁরা সোনার মোহর ভর্তি বড়ো বড়ো তামার ঘড়া আর সেইসঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ বালককেও একটি লোহার কুঠরিতে বন্ধ করে দিতেন। বালক বেচারা যখন না খেতে পেয়ে মরে যেত, তখন সে যখ হত আর কোটিপতির সঞ্চিত ধন রক্ষা করত। ধন আজও লোকে রক্ষা করে। শুনতে পাই Bank of Franceএ কোটি কোটি মোহর মজুত রয়েছে, আর তার রক্ষার জন্য বিজ্ঞানের চরম কৌশলে তালাচাবি তৈরি করা হয়েছে; আর সে ধনাগার রয়েছে পাতালে। এর কারণ বেচারা ফরাসীরা যখ-দেওয়া-রূপ সহজ উপায়টি জানে না।

আমি একবার একটি যখ দেখেছিলুম— কোথায়, কখন, কি অবস্থায়, তার ইতিবৃত্ত একটি গল্প আকারে প্রকাশ করেছি। সে গল্পটি শুনলে গ্রীক আলংকারিক

আরিস্টটল বলতেন যে, সেটি একটি কাব্য; কেননা তার অন্তরে আছে শুধু terror and pity। অবশ্য বাঙলাদেশের কাব্যসমালোচকদের মত সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ বাঙালিরা গ্রীক নয়, আর গ্রীক হতেও চায় না; হতে চায় ইংরেজ। সে যাই হোক, আমার আহুতি নামক সে গল্পটি সম্বন্ধে বাঙালি সমালোচকের মত কি, তা শুনে তোমাদের কোনো লাভ নেই— কেননা সে গল্পটি তোমাদের পড়তে আমি অনুরোধ করব না। সেটি ছোটোছেলের গল্প হলেও ছোটোছেলেদের পাঠ্য নয়।

আজ যে যখের গল্পটি তোমাকে বলব, সে গল্প আমি শুনেছি পরের মুখে; আর এ গল্পটির ভিতর আর যাই থাক্‌, পিলে-চমকানো ভয় নেই।

আমি নিজে পথিমধ্যে যখ দেখে এতটা ভয় পাই যে যখন বাড়ি গিয়ে উঠলুম, তখন আমার দেহের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রিতে উঠে গিয়েছে। একে জ্যৈষ্ঠ মাস, আকাশে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি, তার উপর ম্যালেরিয়ার দেশ, তার উপর মনের উপর বিভীষিকার প্রচণ্ড ধাক্কা— এই-সব মিলে আমার নাড়ীকে যে ঘোড়দৌড় করাবে তাতে আশ্চর্য কি? বাড়ি গিয়েই বিছানা নিলুম, আর সাতদিন সেখান থেকে নড়ি নি। আমার চিকিৎসার ভার নিলেন জনৈক পাড়াগেঁয়ে কবিরাজ। তাঁর ওষুধ হল দুটি— লঙ্ঘন আর পাচন। সে পাচন যেমন সবুজ তেমনি তিতো। লঙ্ঘনের চোটে ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করত; তাই সেই পাচন, ওষুধ হিসেবে নয়, রোগীর পথ্য হিসেবে গলাধঃকরণ করতুম। আমার বিছানার পাশে সমস্ত দিন হাজির থাকতেন রমা ঠাকুর। আর এই শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর মুখে এ গল্প শুনেছি।

আগে দু কথায় রমা ঠাকুরের পরিচয় দিই; কারণ তিনি ছিলেন যেমন গরিব, তেমনি ভালো লোক। তাঁর পুরো নাম রমাকান্ত নিয়োগী ঠাকুর। এঁরই পূর্বপুরুষরা পূর্বে আমাদের গ্রামের মালিক ছিলেন। পরে নিয়োগী বংশ ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়। শেষটায় এঁদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন একমাত্র রমা ঠাকুর। তিনি একা বাস করতেন একখানি খোড়ো ঘরে। কখনো বিবাহ করেন নি, ফলে তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। তিনি অবশেষে হয়েছিলেন আমাদের কুলদেবতার পূজারী। আমাদের কুলদেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন জঙ্গম ঠাকুর— কোনো শরিকের বাড়ি পালাক্রমে থাকতেন দুদিন, কোনো বাড়িতে-বা তিনদিন। ঠাকুরের ভোগ খেয়ে ও দক্ষিণা নিয়েই তাঁর

অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত; আর উপরি সময় তিনি পাঁচজনের শুশ্রূষা করতেন। লোকটি আকারে ছোটোখাটো; তাঁর বর্ণ শ্যাম, আর মাথার চুল একদম সাদা। এমন নিরীহ, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক হাজারে একটি দেখা যায় না। তাঁর নিজের কোনো কাজ ছিল না, কিন্তু পরের অনেক ফাই-ফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমা ঠাকুরকে আমার যখ-দর্শনের গল্প বললুম। তিনি সে গল্প শুনে আমাকে ভরসা দিলেন যে কিছু ভয় নেই, তুমি দুদিনেই ভালো হয়ে উঠবে; যখ তোমার আমার মতো লোকের হন্তারক নয়। তবে আমার গল্প তিনি সত্য বলেই মেনে নিলেন; কেননা রমা ঠাকুরও একবার দিন-দুপুরে নয়, রাত-দুপুরে যখ দেখেছিলেন। আর তিনি যে জলজ্যান্ত যখ দেখেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরেজি পড়েন নি, সুতরাং যা দেখতেন যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজি পড়েছি, সুতরাং যা দেখি-শুনি তাতে বিশ্বাস করি নে। আমার থেকে থেকেই মনে হত যে, আমি যখ-টখ কিছুই দেখি নি; পাল্কির ভিতর হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। ওষুধই যে শুধু স্বপ্নলব্ধ হয় তা নয়; কখনো কখনো স্বপ্নলব্ধ গল্পকবিতাও পাওয়া যায়। তা যে হয়, তা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই জানতে পাবে। এখন নিয়োগী ঠাকুরের গল্প শোনো। শুনতে কিছু কষ্ট হবে না, কেননা গল্পটি ছোট্ট গল্প। এত ছোট্ট যে একটি ছোটো এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায়। রমা ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন— নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন? আমি বললুম, না।

তিনি বললেন, তা জানবেন কি করে? আপনি দু-পাঁচ বছরে একবার বাড়ি আসেন, আর দু-পাঁচদিন থেকেই চলে যান। নন্দীগ্রাম এখান থেকে দু-পা। এই দক্ষিণের বিলটে পেরিয়ে তার পর মাঠটার ওপারে বাঁয়ে ভেঙে যে পথটা পাওয়া যায়, সেই পথটায় কিছুদূর গেলেই নন্দীগ্রামে পৌছানো যায়। এখান থেকে মাত্র পাঁচ ক্রোশ রাস্তা।

বছর-তিনেক আগে আমার একবার নন্দীগ্রামে যাবার দরকার ছিল। দরকার আর কিছুই নয়— সেখানে গেলে খালি-হাতে আর ফিরতে হত না। সে গ্রামের অধিকারী বাবুরা দেবদ্বিজে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, যদিচ তাঁরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের দ্বারস্থ হলে টাকাটা-সিকেটা মিলত।

আমি স্থির করলুম, কোজাগর পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন তো সিদ্ধি খেতেই হয়, আর সমস্ত রাত জাগতেও হয়। তাই মনে করলুম যে, ঘরে বসে রাত জাগার চাইতে এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়ব— আর হেসে-খেলে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যাব। রাত এগারোটায় বেরোলেও ভোর হতে না হতে নন্দীগ্রামে পৌঁছব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রাত্তিরে একা এই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করল না?

তিনি হেসে উত্তর করলেন, ভয় কিসের, চোর-ডাকাতের? জানেন না, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়? চোর-ডাকাত আমার নেবে কি? গলার তুলসীকাঠের মালা, না, গায়ের নামাবলী? তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা ডাকাতি করে তারা সব আপনাদেরই মাইনে-করা লেঠেল। তারা আমাকে ছোঁবে না, সঙ্গে হীরাজহরৎ থাকলেও নয়। ভয় অবশ্য বাঘের আছে, কিন্তু তারাও আমাদের মতো গরিব ব্রাহ্মণদের ছোঁয় না। আমাদের শরীরে আছে হাড় আর চামড়া আর দু-তিন ছটাক রক্ত, কিন্তু রস একেবারেই নেই। বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য। সে যাই হোক, রাত এগারোটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লুম। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খঞ্জনার ধারে গিয়ে পড়লুম। খঞ্জনা কখনো দেখেছেন? চমৎকার নদী। রশি দু-তিনের চাইতে বেশি চওড়া নয়— কিন্তু বারো মাস তাতে জল থাকে, আর সে জল বারো মাস টল্‌টল্ করছে, তক্‌তক্ করছে। এই খঞ্জনার ধার দিয়েই সোজা নন্দীগ্রাম যেতে হয়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোয় গাছপালা সব হাসছে; আর আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ানো। আমি মহা স্ফূর্তি করে চলেছি, ক্রমে পালপাড়ার সুমুখে গিয়ে উঠলুম। পালপাড়া বলে এখন কোনো গ্রাম নেই, কিন্তু তার নাম আছে। সমস্ত গ্রাম বনজঙ্গলে গ্রাস করেছে। শুধু এ গ্রামের সেকালের ধনকুবের সনাতন পালের আধক্রোশজোড়া ভাঙা বাড়ি পালদের উড়ে-যাওয়া টাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় নদীর মধ্যে থেকে একটি গানের সুর আমার কানে এল। গানের সুর বোধ হয় ভাটিয়ালী। বাঁশির মতো মিষ্টি তার আওয়াজ। সে গান

শোনবামাত্র মন উদাস হয়ে যায়, আর চোখে আপনা হতেই জল আসে। জীবনের যত আক্ষেপ যেন সে গানের মধ্যে আছে।

একটু পরে দেখি— পাঁচটি তামার ঘড়া উজান বেয়ে ভেসে আসছে, আর তার উপরে একটি ছেলে জোড়াসন হয়ে বসে গান করছে। সে যেন সাক্ষাৎ দেবপুত্র! ধবধবে তার রঙ, কুঁদে কাটা তার মুখ, পায়ে তার সোনার মল, হাতে সোনার বালা ও বাজু, গলায় সাতনলী হার। বুকে ঝুলছে সোনার পৈতে। পরনে রক্তের মতো লাল চেলি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। একটু লক্ষ্য করে দেখলুম, যা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সোনার অলংকার নয়— সোনার সাপ। আর সেই দেববালকের কোলে রয়েছে একটি ছোট্ট ছেলের কঙ্কাল। তখন বুঝলুম, এটি হচ্ছে একটি যখ। আর মনে পড়ল ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে পরম বৈষ্ণব সনাতন পাল একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে যখ দিয়েছিলেন, সে তাঁর ধন রক্ষা করেছিল কিন্তু তাঁর বংশ নির্বংশ করেছিল।

আমি সনাতন পালের পোড়ো বাড়ির সুমুখে দাড়িয়ে একদৃষ্টে এই দিব্যমূর্তি দেখছিলুম আর একমনে এই পাগল-করা গান শুনছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে কষ্টিপাথরের মতো কালো এক টুকরো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে। অমনি চার দিক অন্ধকার হয়ে গেল। এই ঘোর অন্ধকারে সেই-সব তামার ঘড়া আর সেই দেববালক অদৃশ্য হয়ে গেল— আর তার গানের সুরও আস্তে আস্তে আকাশে মিলিয়ে গেল। অমনি সেই মেঘও কেটে গেল, আর দিনের আলোর মতো ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব আবার হেসে উঠল।

তখন দেখি, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, যেন আমার রক্তমাংসের শরীর পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

খানিকক্ষণ পরে আমার দেহমন ফিরে এল, আর নিশিতে-পাওয়া লোক যেভাবে হাঁটে সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য ওঠবার আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে পৌঁছলুম।

কিন্তু এই যখ দেখার কথা কাউকেও বলি নি। কারণ এ কথা মুখে মুখে প্রচার হলে হাজার লোক খঞ্জনায় নেমে পড়ত, ঐ তামার ঘড়ার তল্লাসে। অবশ্য তাতে তাদের জলে ডোবা ছাড়া আর কিছু ফল হত না। সে-সব ঘড়া ডুবুরিরা উপরে তুলতে পারত না— মধ্যে থেকে তারা খঞ্জনার ফটিক জল

শুধু ঘুলিয়ে দিত। আর যদি তারা সেই মোহরভরা ঘড়া তুলতেই পারত, তা হলে আরো সর্বনাশ হত। কারণ ঐ-সব ঘড়ায় পোরা প্রতি মোহরটি সোনার সাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সাপ যখের গায়ের গহনা, কিন্তু মানুষে ছোঁবা মাত্র মারা যায়।

রমা ঠাকুরের গল্পও শেষ হল, আর পিসিমা এক বাটি পাচন নিয়ে এসে হাজির হলেন।

এ গল্প যেমন শুনেছি তেমনি লিখছি। আশা করি এই পাড়াগেঁয়ে গল্প তোমাদের কাছে পাড়াগেঁয়ে কবিরাজী পাচনের মতো বিস্বাদ লাগবে না।

কার্তিক ১৩৪১

ঘোষালের হেঁয়ালি

সেদিন সন্ধ্যায় একা বাড়ি বসে ছিলুম। শরীরটে ছিল মাদা, তার উপর সেদিন পড়েছিল একটু বেশি শীত। তাই বাড়ি থেকে না বেরোনই শ্রেয় মনে করলুম।

এ সময় বেকার বাড়ি বসে থাকাটা আমার পক্ষে ঈষৎ বিরক্তিকর। এ দেশে কোনো evening paper নেই যার মারফত দুনিয়ার টাটকা খবর পাওয়া যায়; যে খবরের জন্য আমরা কেউ ব্যস্ত নই, তবুও যা আমরা পড়ি। তাই বসে বসে একখানি futurist নভেলের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। দু-চার পাতা উল্টেই মনে হল, বাংলার তরুণ সাহিত্যের কোনো future নেই।

এমন সময় বেহারা এসে খবর দিল— "একঠো বাবু আপকো সাথ মুলাকাত করনে আয়া।" আমি বললুম, "বাবুকো আনে বোলো।" যদিচ এ অসময়ে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল বুঝতে পারলুম না। সে যাই হোক, বাবুর আগমন-সংবাদ শুনে খুশি হলুম। কেননা বুঝলুম যে, আগন্তুকটি যিনিই হন, তাঁর সঙ্গে হয় কাজের, নয় বাজে কথা কয়ে এই ফাঁকা সময়টা ভরিয়ে দিতে পারব।

ভদ্রলোকটি ঘরে ঢোকবামাত্র বুঝলুম, তিনি বিল সাধতে আসেন নি। কারণ তাঁর পরনে সাদা কাগজের মতো ধবধবে খদ্দরের জামা ও ধুতি, গায়ে ধুপছায়ারঙের মুর্শিদাবাদী বালাপোষ, আর মাথায় খদ্দরের গান্ধী-টুপি। দেখে মনে হল, তিনি হয়তো স্বরাজের জন্য চাঁদা সাধতে এসেছেন। যদি তাই হয় তো ভাবী স্বরাজের অনেক খবর পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক টুপিটি খুলতেই দেখি তিনি স্বয়ং ঘোষাল। কারণ তার হচ্ছে সেই জাতের স্বপ্রকাশ চেহারা যা একবার দেখলে জীবনে আর ভোলা যায় না।

কথাপীঠ

আমি তাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করেই জিজ্ঞাসা করলুম, "কি খবর?"

ঘোষাল উত্তর করলে, "unemployed।"

"রায় মশায়ের সঙ্গে তোমার কি ফারকৎ হয়ে গিয়েছে?"

"না। যা হয়েছে, তাকে একরকম judicial separation বলা যেতে পারে।"

"Divorce নয়?"

"না। তবে যে-কোনো মুহূর্তে আমি তাঁকে তালাক দিতে পারি। ব্যাপার কি ঘটেছে তা পরে বলব। আগে কাজের কথাটা সেরে নেওয়া যাক। আমি স্বরাজ-দলে ভর্তি হতে চাই।"

আমি ঘোষালের মুখে এ প্রস্তাব শুনে বুঝলুম কথাটা নেহাত বাজে। সে বলতে চায় গল্প। আর এ প্রস্তাব তার গল্পের ভূমিকা মাত্র, ও সে ভূমিকা G. B. S.-এর নাটকের ভূমিকার মতো, যার আস্থায়ীর সঙ্গে অন্তরার কোনো সম্বন্ধ নেই। তা হলেও ঐ বিষয়েই আলাপ শুরু করলুম। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "সেইজন্যই বুঝি খদ্দরমণ্ডিত হয়েছ?"

"অবশ্য। মুখপাত্র তো দুরস্ত চাই। তা ছাড়া দেশই তো বেশ গড়ে। নব রাশিয়া গড়েছে লাল কুর্তা, আর নব ইতালি কালো কুর্তা।"

"তথাস্তু। এখন দেশের কাজে এত লোভ কেন?"

"ও কাজটা sinecure বলে।"

"তুমি বলতে চাও কিছু না করারই অর্থ দেশের কাজ করা?"

"আমার মতো অকর্মণ্য লোকের পক্ষে তাই। স্বরাজের কেষ্টবিষ্টুদের অবশ্য অগাধ খাটুনি। তাঁরা আলেয়ার মতো নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। আজ জ্বলে উঠছেন পুরুষপুরে, কাল কামাখ্যায়। আর আমরা 'Hail! holy light!' বলে সেই উদ্‌ভ্রান্ত আলোর পিছনে ছুটছি। এখন আপনার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্য চাই— পয়সার নয় মুখের কথার।"

"এ দলের বড়োকর্তাদের কাছে না হোক, উপকর্তাদের কাছে গিয়ে তোমার প্রস্তাব জানাতে হবে?"

"আপনার মুখের কথা রসিকতা বলে উপেক্ষিত হবে। রসিকতা কর্মক্ষেত্রে অগ্রাহ্য।"

"তবে কি সার্টিফিকেট লিখে দেব?"

"মাফ করবেন। আপনি তো লিখবেন যে ঘোষাল একজন জাতগুণী, চমৎকার টপ্পা-গাইয়ে, আর নিত্য নতুন স্বরচিত গল্প বলতে পারে। আপনি কি জানেন না যে, গান ও গল্প স্বরাজ্যে থাকবে না?"

"তবে থাকবে কি?"

"বক্তৃতা আর তার স্বরলিপি, অর্থাৎ খবরের কাগজ।"

"তবে আমাকে কি তোমার application লিখে দিতে হবে?"

"দরখাস্ত আমি নিজেই লিখব। স্বরাজের ভাষা আমি জানি। সে ভাষা তো দেশি মনের তাঁতে বোনা বস্তাপচা বিলেতি শব্দ।"

"তবে কি চাও ?"

"As regards my qualifications সম্বন্ধে কি লিখব, সেই বিষয় আপনার পরামর্শ চাই। যে মার্কার qualificationএর কিঞ্চিৎ বাজার-দর আছে সে qualificationএর কথা লিখতে ভয় হয়।"

"কেন বলো তো ?"

"সেই qualificationএর কথা একবার মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছিল, তার ফলেই তো আমার এই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা।"

"হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপার কি হয়েছিল স্পষ্ট করে বললে বুঝতে পারি। সত্য কথা বলতে হলে তোমার ভবিষ্যৎ কস্মিন্‌কালেও ছিল না, এখনো নেই ; কেননা তুমি সামাজিক ও সাংসারিক জীব নও। সমাজে তোমরা হচ্ছ সব উদ্‌বৃত্তের দল। সুতরাং তুমি কোনো দলে ভর্তি হও আর না হও, তাতে কিছু আসে যায় না— তোমারও নয়, সমাজেরও নয়।

"তোমার গত চাকরি কি করে ছুটিতে পরিণত হল, তাই জানবার কৌতূহল আমার হচ্ছে।"

মুখবন্ধ

"আচ্ছা, সেই নিকট-অতীত কাহিনী বলছি।"

এই বলে ঘোষাল চেয়ারের উপর জোড়াসন হয়ে বসে ইংরাজিতে বললেন, "Beastly cold. May I have a drop of—"

"What will you have— whisky or brandy ?"

"Cognac, s'il vous plais ?"

আমি বেহারাকে একটি brandy-peg আনতে হুকুম দিলে ঘোষাল বললে, "Merci, monsieur!"

আমি প্রশ্ন করলুম, "Vous parlez francaise, monsieur ?"

"Pardon, monsieur, ও অপরাধ আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। এই Cognacই ঐ ফরাসি বুলি টেনে এনেছে। Cognacএর সঙ্গে 'if you please' কি খাপ খেত ? আর 'thank you'এর মতো মিছে কথা কি

কোনো ভাষায় আছে ?"

এ কৈফিয়তে আমি হেসে উঠলুম, সঙ্গে সঙ্গে সেও। বেহারা brandy-pegটির সঙ্গে soda সংযোগ করতে উদ্যত হলে ঘোষাল বললে,"ও ব্র্যাণ্ডিটুকুকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিন। আমি হিন্দুধর্ম রক্ষা করে পানাহার করি। জাত যায় সোডায়, ব্র্যাণ্ডিতে নয়।"

"Unfiltered water ?"

"সে তো গঙ্গামৃত্তিকা। আমি চাই ইন্‌ভাগান্ত বিলেতি ঔষধ দিয়ে শোধন-করা গঙ্গার জল— যার নাম কলের জল।"

তার পর সজল ব্র্যাণ্ডি একচুমুকমাত্র গলাধঃকরণ করে ঘোষাল তার কাহিনী বলতে শুরু করবার পূর্বে দু কথায় তার মুখবন্ধ করলেন। তিনি বললেন, "এ উপন্যাস নয়, ইতিহাস। এর রস অতি ফিকে— গঙ্গাজলি ব্র্যাণ্ডির মতো। সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। আশা করি রায়মশায়ের সভার নবরত্নদের সব মনে আছে— যথা পণ্ডিতমশায়, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি।"

"হাঁ, আছে।"

"তা হলে শুনুন।"

কথামুখ

"একদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর ঘরে বসে বিশ্রাম করছি, অর্থাৎ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় গীতা পড়ছি—"

"তুমি কি আবার গীতাপাঠ কর নাকি ?"

"করি। অবসর-বিনোদনের জন্য নয়, পণ্ডিতমশায়ের আদেশে আমার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছিল, তার পর এই শ্লোকটি পড়বামাত্র জেগে উঠলুম—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

"ও শ্লোকের অর্থ কি বুঝলে ?"

"এর অর্থ ঘুমের ঘোরে বোঝা যায়, কিন্তু জেগে অপরকে বোঝানো যায় না। ও শ্লোকটা 'We are such stuff as dreams are made on'-এর সগোত্র।"

"তুমি Shakespeare পড়েছ নাকি ?"

"টেমপেস্ট ও হ্যামলেট-এর সুভাষিতাবলী তো মুখে মুখেই চলে। ও-সব কি আর বই পড়ে শিখতে হয় ?"

"তার পর ?"

"এমন সময় দুয়োর ঠেলে কে ঘরে প্রবেশ করলে ; বই থেকে মুখ তুলে দেখি 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' সখীরানী সুমুখে দাঁড়িয়ে। তার চোখেমুখে লেগে রয়েছে অর্ধস্ফুট হাসি। ও মূর্তি দেখলে স্বতই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়— অরালা কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে—"

"এ দেবীটি কে ?"

"এ রমণী দেবী নয়, বোষ্টমের মেয়ে। তার পিতৃদত্ত নাম শ্যামদাসী। সখীরানী নাম আমি দিয়েছি, রানীমার প্রিয় সখী বলে। রানীমা তাকে বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে এনেছেন, তার বাল্যবন্ধু বলে। প্রায় তার সমবয়সী, বছর দুত্তিনের বড়ো হবে। এ বাড়িতে তার কাজ হচ্ছে রানীমার কাছে গল্প করা, কীর্তন গাওয়া ও চৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ সব তাঁকে পড়ে শোনানো, আর রানীমার নেপথ্যবিধান করা। কিন্তু রাজবাড়ি এসেও তার চাল বিগড়ে যায় নি। সে পরনপরিচ্ছদে আহার-বিহারে বোষ্টমী কায়দা পুরো বজায় রেখেছে। তার পরনে একখানি চাঁপাফুলের রঙের তসরে শাড়ি, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসী কাঠের মালা, নাকে রসকলি, একরাশ ঢেউখেলানো চুল কপালের ডান ধারে চুড়ো করে বাঁধা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটি জীবন্ত ছবি। রাধিকা একবার অভিমান করে কৃষ্ণকে বলেছিলেন যে, 'আপনি হইয়ে শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।' শ্রীনন্দের নন্দন যদি হঠাৎ মেয়ে হয়ে যেতেন, তা হলে তাঁর রূপ হত ঠিক সখীরানীর মতো।"

সখীরানীর দৌত্য

তাকে দেখে আমি একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, "এ অবেলায় তোমার হঠাৎ আগমনের কারণ কি ?"

"আমি নিজের গরজে আসি নি, এসেছি মীনারানীর দূত হয়ে।"

"মীনাক্ষী দেবীর, থুড়ি, রানীমার কী হুকুম ?"

"আজ সন্ধেয় তোমাকে গানগল্প করতে হবে তাঁর সভায়।"

"সে সভা কিরকম সভা ?"

"মেয়ে-মজলিস।"

"সে মজলিসে বোধ হয় নিষ্পুরুষ নাটকের অভিনয় হয় ?"

"ধরে নাও যে তাই হয়।"

"শুনেছি পুরাকালে কোনো বীরপুরুষ 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্।' আমাকেও দেখছি তাঁর পদানুসরণ করতে হবে।"

"কী বলছ, ভাষায় বলো।"

এ কথা শুনে আমি বললুম, "তুমি দেখছি এখন কথায় কথায় সংস্কৃতের ফোড়ন দাও।"

"এ অভ্যাস হয়েছে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গদোষে। নইলে আমার ফরাসি বিদ্যা যদ্রূপ, সংস্কৃত বিদ্যাও তদ্রূপ। এক বর্ণ গাইতে না পারলেও যে লোক খাঁ-সাহেবের সহবৎ করেছে, সে কি শ্রুতি কপচায় না ?"

সে যাই হোক, কথাটা বাঙলায় বুঝিয়ে দেবার পর সখীরানী বললেন, "তুমি যে বীরপুরুষ নও, তা আমি জানি। দুবেলা ঐ মুগুর ভেঁজে তোমার বুক চওড়া হয়েছে, কিন্তু বুকের পাটা হয় নি। তবে ভয় নেই। তোমাকে ঘোড়াও চড়তে হবে না, একাও যেতে হবে না। পণ্ডিতমশায় থাকবেন তোমার প্রহরী। আর রায়মশায়ের অন্দরমহল গহন বন নয়, ফুলের বাগান।"

"তা হলে সেখানে গিয়ে দেখব—

'কোন ফুল জপত হরিনাম,
কোন ফুল ফুকারে অলি অলি'।"

"ও দুই কাজ করা ছাড়া মেয়েদের আর উপায় কি ? প্রথমে অলি অলি, শেষে হরি হরি। সে যাই হোক, তোমাকে আজ একটি সাদাসিধে গল্প বলতে হবে, যা মেয়েরা বুঝতে পারে। রায়মশায়ের আড্ডায় যে-সব গল্প বল তা শুনলেই আমার বলতে ইচ্ছে যায়— এহ বাহ্য, আগে কহো আর।"

"কেন ?"

"তার দু-আনা গল্প, আর পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা তর্ক— অর্থাৎ বাক্যি।"

"আচ্ছা গল্পটা যথাসাধ্য সাদা করব, তবে সিধে হবে কি না বলতে পারি নে।"

"যাক, তাতে কিছু আসে যায় না। গুটি-দুচ্চার ভালো ভালো গানও

শোনাতে হবে।”

“আচ্ছা, তা হলে কীর্তন গাইব, যা মেয়েরা বুঝতে পারে। যথা ‘প্রাণবঁধুর সনে কথা কইতে পেলেম না’।”

“না, কীর্তন নয়।”

“কেন?”

“কীর্তন তুমি আমার মতো গাইতে পারবে না। ধরো ঐ গানটার ভিতর যত মনের আক্ষেপ প্রকাশ করতে হবে আখর দিয়ে নয় সুরের টান টেনে। নইলে কীর্তন হয়ে পড়ে নেড়া গান।”

“তুমি বলতে চাও নেড়ানেড়ির গান। যথা, আমি চাপান দিলুম ‘যদি গৌর চাস, কাঁথা নে ধনী’; আর তুমি উতোর গাইলে, ‘এ পুজোতে ঝুমকো দিবি, তবে ঘরে রব’।”

“এ কীর্তনে অবশ্য আবদার আছে, আক্ষেপ নেই। আর তা ছাড়া ও-সব ভাবের কীর্তন নয়, অভাবের সং-কীর্তন। ও সংপনা এ দরবারে চলবে না।”

“তা হলে আমাকে কী গাইতে হবে?”

“হিন্দি।”

“তোমাকে যে কটি গান শিখিয়েছি, তারই মধ্যে দুয়েকটি?”

“হ্যাঁ। ‘গোরে গোরে মুখপর’ও চলবে, ‘চমেলি ফুলি চম্পা’ও চলবে।”

“তুমি বলতে চাও সে মজলিসে ‘গোরে গোরে মুখ’ও থাকবে, ‘চমেলি ফুলি চম্পা’ও থাকবে— তবে কথা হচ্ছে, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কে?”

“খেয়ালের ভারি তো তাল! আমি খঞ্জনিতে ঠেকা দেব এখন। তোমার তাল আমি সামলে নেব।”

“তা হলে আমি নির্ভয়ে গাইতে পারব।”

“আচ্ছা, তবে আসি। মেয়েদের সন্ধে-আহ্নিক হয়ে যাবার পর রাধানাথ শিকদের এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।”

“আচ্ছা, হুকুম ঠিক তামিল করব। ইতিমধ্যে দুর্গানাম জপ করি।”

“মধ্যে মধ্যে মার নাম স্মরণ করা ভালো, বিশেষত চিরকুমারের পক্ষে।”

সখীরানীর গুণাগুণ

আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি যে, সখীরানী আমার পূর্বপরিচিত। এ বাড়িতে

তার গতিবিধি ছিল অবাধ। তার তুল্য স্বাধীন জেনানা আমি আর-একটিও দেখি নি। সে বোষ্টমের মেয়ে তাই মনুর বিধিনিষেধের সে তোয়াক্কা রাখত না। সংসারে তার কোনোরকম বন্ধন ছিল না; কারণ সে কুমারীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়। উপরন্তু সে সুন্দরী ও গুণী। তার যে রূপ আছে, সে তা জানত; কারণ না জানবার তার উপায় ছিল না। আর সে কীর্তন গাইত চমৎকার। তার পর সে ছিল আমার শিষ্যা। রানীমার ইচ্ছায় আর রায়মশায়ের আদেশে আমি তাকে হিন্দিগান শেখাতুম— টপ্পাঠুংরি নয়, সাদাসিধে মামুলী গান; অর্থাৎ সেই-সব গান যা আজও বাতিল হয় নি, যদিচ লোকে সেগুলো নবাবী আমল থেকে গেয়ে আসছে। আমি তাকে তান শেখাই নি, পাছে তার গলার অপূর্ব টান নষ্ট হয়। সুরের প্রাণ তার কাঁপুনির উপর নির্ভর করে না; করীকর্ণের মতো অবিরত চঞ্চল হওয়া প্রাণের একমাত্র লক্ষণ নয়।

আমি পূর্বেই বলেছি রানীমার নাম হচ্ছে মীনাক্ষী দেবী। শ্যামদাসী তাঁকে আজন্ম মীনা বলেই ডেকে এসেছে; এ বাড়িতে এসে শুধু তার পিছনে রানী জুড়ে দিয়েছে। কারণ গবর্নমেণ্টে রায়মশায়কে রাজা খেতাব না দিলেও এ দেশের লোকে তাঁকে রাজাবাবুই বলত। সে যাই হোক, আমি সখীরানীর প্রস্তাব শুনে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেননা আমি জানতুম যে, এই মজলিসে একজন উপস্থিত থাকবেন, যাঁর সুমুখে কী ব্যবহারে, কী কথা-বার্তায়, পান থেকে চুন খসলেই সভা বন্ধ হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "তিনি কে?"

ঘোষাল বললেন, "তিনি এই রাজপুরীর পুরদেবতা।"

"মানবী না পাষাণী?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য।"

সখীসমিতি

সন্ধের পর রাত যখন আটটা বাজে, পণ্ডিতমশায় আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে রায়মশায়ের প্রিয় খানসামা রাধানাথ শিকদার। রাধানাথ আমাদের ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে চলল। বার-বাড়ি এবং অন্দরমহলের মধ্যস্থ মহলটি হচ্ছে পুজার মহল। পশ্চিমে প্রকাণ্ড পুজার দালান, তার সুমুখে নাটমন্দির, আর তিন পাশে প্রশস্ত ভোগের দালান; সব আগাগোড়া সাদা

মার্বেলে মোড়া— পবিত্রতার নিদর্শন।

আমাদের পথপ্রদর্শক আমাদের দুজনকে নিয়ে গিয়ে নাটমন্দিরে একখানি গালিচার উপর বসালে। তাকিয়ে দেখি, ঠাকুরদালান স্ত্রীজাতি নামক উপদেবতায় গুলজার। শুনলুম এঁরা সবাই ব্রাহ্মণকন্যা— রায়মশায়ের কুটুম্বিনী। আর দাসী-চাকরানীরা বসেছে সব নাটমন্দিরের ডাইনে বাঁয়ে ভোগের দালানের বারান্দায়। প্রথমেই চোখে পড়ে এ দুই দলের বর্ণের পার্থক্য। যাক, সে স্ত্রীরাজ্য আর বর্ণনা করব না, তা হলে পুঁথি বেড়ে যাবে। ছায়া পিছনে ফেলে আলোর দিকে ফিরে দেখি যে, ঠাকুরদালানের সামনে প্রথমেই বসে আছেন রানীমা, তাঁর বাঁয়ে তাঁর তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সখীরানী। রানীমাকে এই প্রথম দেখলুম। দিব্যি সুশ্রী, যেন একটি ননীর পুতুল— 'ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়'।

মূর্তিমতী আনন্দলহরী! এর চেয়ে তাঁর বিষয় বেশি কিছু বলবার নেই।

তাঁর ডাইনে বসে আছেন একটি বিধবা—the woman in white। ইনি হচ্ছেন এ পুরীর পুরদেবতা। তাঁর রূপ বাঙলা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কারণ এ তরল ভাষার কোনো সংহত গাঢ়বন্ধরূপ নেই। সংস্কৃত কবি হয়তো বলতেন— 'তড়িল্লেখা তন্বী তপনশশিবৈশ্বানরময়ী'।

ঠাকুরানী

এই সংস্কৃত বচন আউড়েই ঘোষাল বললেন, "আর চার ড্রাম, liquor glass-এ। এখন আমি স্বর বদলে নেব, নইলে এ ইতিহাস কাব্য হয়ে উঠবে— অর্থাৎ প্রলাপ।"

চার ড্রাম একটা বুড়ো আঙুলের মতো গেলাসে এল; এক চুমুকে গেলাসটি খালি করেই ঘোষাল আবার তার গল্প আরম্ভ করলে—

যে মহিলাটির রূপবর্ণনা করতে পারি নি, এখন তার গুণবর্ণনা করি। তাঁর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী, এ বাড়িতে তিনি ঠাকুরানী নামেই পরিচিত। তার কারণ তিনি রায়মশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের শ্যালক হরিসত্য শর্মা ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিবাহের পর থেকে তিনি এই বাড়িতেই বাস করছেন, বিদেহ আত্মার মতো; কেননা তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সকলে পায় না। অথচ তিনি হয়ে উঠেছেন এ পরিবারের হর্তাকর্তাবিধাতা। এরই নাম নীরব প্রভুত্ব। এক কথায়,

সকলেই ছিল তাঁর বশীভূত ; হয়তো তাঁর রূপের জ্যোতিই ছিল তাঁর বশীকরণ-মন্ত্র, নয় তো তাঁর অন্তরের কোনো এক্স-রে।

উপরন্তু তিনি ছিলেন বিদুষী। বিয়ের বছরখানেক পরে তাঁর স্বামীবিয়োগ হয়, তার পর থেকেই তিনি বিদ্যাচর্চা শুরু করলেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুপণ্ডিতা। পণ্ডিতমশায় ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তিনি বিধবার আচার 'ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, যদিচ শাস্ত্রে তাঁর কোনোরূপ ভক্তি ছিল না। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে শুনেছি, কিছুদিন বেদান্তচর্চা করে তিনি তাঁকে বলেন যে, ও আধ্যাত্মিক ধূমপানে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতমশায় তখন বলেন যে, তবে কাব্যামৃতরসাস্বাদ করুন। তার পর থেকেই শুরু হল রামায়ণ, কালিদাস ও ভবভূতির চর্চা। এ-সব কাব্য-ইতিহাস চর্চা করেও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন নি। তিনি নাকি বলতেন যে, যা হওয়া উচিত তার কথা একরঙা, আর সে রঙও জলা। যা হয়, তাই বিচিত্র। এর পর থেকে তিনি ইংরাজি শিখেছেন, আমিও পণ্ডিতমশায়ের অনুরোধে এ শিক্ষার কিছু সাহায্য করেছি। এই মেয়ে-মজলিসে তিনিই ছিলেন আমার গল্পের একমাত্র বিচারক। তিনি হাসলে সকলে হাসতেন, তিনি গম্ভীর হলে সকলে গম্ভীর হতেন— শুধু সখীরানী ছাড়া। কেননা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে ছিল শ্যামদাসীর সাত খুন মাপ। শুধু তাঁরা উভয়ে সমবয়সী বলে নয়, কতকটা সহধর্মী বলেও বটে।

প্রফেসর

তার পর মুখ ফিরিয়ে দেখি পাশে একটি মহা বেরসিক বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখে একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ভদ্রলোকটি কে?"

"রায়মশায়ের তৃতীয় পক্ষের শ্যালক— নাম ভৃঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য, প্রফেসর বলেই এখানে গণ্য ও মান্য। তিনি একজন ডবল এম. এ.— প্রথম পক্ষে পিওর ম্যাথমেটিক্সের, দ্বিতীয় পক্ষে মিক্সড ফিলজফির। মিক্সড ফিলজফি এইজন্য বলছি যে, তিনি হিন্দুদর্শন ও বিলেতিদর্শন তেলের সঙ্গে জলের মতন বেমালুম মিলিয়ে দিয়েছিলেন। সে মিশ্রদর্শন উজ্জ্বলনীলমণি ছাড়া আর কেউ গলাধঃকরণ করতে পারত না। এই অতিবিদ্যের ফলে তিনি সত্য কথা ছাড়া আর কিছু

বলতেন না। সত্য কথা যে অপ্রিয় হতে পারে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অপ্রিয় কথামাত্রই সত্য হতে বাধ্য, আর সে কথা যত অপ্রিয় হবে, তত বেশি সত্য হবে। ফলে তিনি একটি মহা ক্রিটিক হয়ে উঠেছিলেন— প্রায় আপনারই জুড়ি। আমি একদিন রায়মশায়ের আড্ডায় গল্পচ্ছলে বললুম যে, কৃষ্ণ কদমতলায় একা দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন, আর সেই বংশীধ্বনি শুনে এক দিক থেকে রাধিকা আর-এক দিক থেকে চন্দ্রাবলী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন, তার পর পাঁচজনে মিলে মহা-গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। প্রফেসর অমনি নাক সিঁটকে মন্তব্য করলেন যে, দুই আর একে তিন হয়, পাঁচ হয় না। এ বিষয়ে দেখি রায়মশায় থেকে দেওয়ানজি পর্যন্ত সকলেই একমত। তখন আমি বললুম— শ্রীকৃষ্ণ যে একে তিন আর তিনে এক। আমার জবাব শুনে রায়মশায় বললেন, 'বহুত আচ্ছা!'— ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি একাধারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নন?— তাই তাঁর লীলাখেলা হচ্ছে এক দিকে সৃষ্টি আর-এক দিকে প্রলয়। প্রফেসর বললেন যে, একে তিন ধর্মে হতে পারে, অঙ্কে হয় না। আমি বললুম— গণিতেও হয়, কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন বীজগণিতের X, তাঁকে বিন্দুও করা যায়, তেত্রিশকোটিও করা যায়।— এর থেকে বুঝতে পারছেন, তিনি কত বড়ো ক্রিটিক!"

কথারম্ভ

সে যাই হোক, রানীমার মুখপাত্র হয়ে সখীরানী আদেশ করলেন যে, আজ একটি আজগুবি গল্প বলো। প্রফেসর অমনি বলে উঠলেন যে, "ঘোষাল-মহাশয় যা বলবেন, তাই আজগুবি হবে।" আমি সখীরানীকে সম্বোধন করে বললুম, "শুনলে তো আমি যা বলব তাই আজগুবি হবে, সেই ভরসায় আমি গল্প শুরু করছি।" প্রফেসর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন যে, "ঘোষাল যা বলবে তা শুধু গল্পই হবে— অর্থাৎ গল্প হবে না; তার ভিতর দর্শন বিজ্ঞান কিছুই থাকবে না; ওরকম গল্প একালে চলে না। এ যুগে কাব্য হচ্ছে শাস্ত্রের বেনামদার।"

আমি বললুম, "তা যদি হয় তো পণ্ডিতমশায় গল্প বলুন, তার পরে আমি শাস্ত্রচর্চা করব।"

এ কথা শুনে সখীরানী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও মায় ঠাকুরানী। ফলে তাঁদের দন্তরুচিকৌমুদীতে আকাশবাতাসও

হেসে উঠল।

তার পর সখীরানী আবার আদেশ করলেন—“এখন গল্প বলো, কাল বৈঠকখানায় বসে তর্ক কোরো।”

আমি মনে করেছিলুম, গল্প বলব অচেতন প্রেমের। কিন্তু বেগতিক দেখে শেষটা নেহাৎ বেপরোয়া গল্প শুরু করে দিলুম। তার পত্তন করলুম চীনদেশে। কল্পনাকে দিলুম দেশের ঘুড়ির মতো উড়িয়ে, আর সেই চীনেমাটির দেশের ফুল ফল ও নরনারীর বাঁকা চেহারার বর্ণনা করলুম। সে-সবই এড়ো, সবই তেরচা, চীনেদের চোখের মতো। বলা বাহুল্য, প্রফেসর কথায় কথায় আমার ভুল ধরতে লাগলেন, জিয়োগ্রাফি এবং বটানি ইত্যাদির। অতঃপর আমি তখন বললুম যে, আমি বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে তো এখানে উপস্থিত হই নি, আমি এসেছি রূপকথা বলতে। রূপকথার রাজ্য ম্যাপে কোথায় আছে? আমার কথার রূপ আছে কি না, তার বিচারক মা-লক্ষ্মীরা ও স্বয়ং সরস্বতী।

কথার অপমৃত্যু

তার পর, আমি আমার চীনে নায়ককে উপস্থিত করলুম। নায়কের যেরকম রূপগুণ অলংকার শাস্ত্রমতে থাকা উচিত, তার অবশ্য সে-সব ছিল। তার চোখ ছিল, যে চোখ দিয়ে সে দেখতে পারত; কান ছিল, যে কান দিয়ে সে শুনতে পারত; আর যদিও চীনে, তবু তার নাক ছিল। নায়কের রূপবর্ণনা করবার পর আমার অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম যে, সে চীনদেশের পাস-করা মুখস্থবাগীশ ম্যাণ্ডারীনদের মতো স্থূলদেহ ও স্থূলবুদ্ধির লোক নয়, একটি মানুষের মতো মানুষ। এতেই হল যত গোল! প্রফেসর চটে উঠে বললেন যে—“নিজে কখনো স্কুলকলেজে পড় নি বলে তুমি ফাঁক পেলেই বিদ্বান লোকদের বিদ্রূপ কর।” আমি একটু বেসামাল হয়ে বললুম, “আমিও স্কুলে পড়েছি।”

“কলেজে?”

“আজ্ঞে তাও।”

“পাস তো কখনো কর নি?”

“আজ্ঞে তাও করেছি।”

“কি পাস করেছ?”

"এম. এ.।"

"কোন্ বিষয়ে?"

"প্রথমে মিক্সড ম্যাথমেটিক্স, পরে পিওর ফিলজফি।"

"কোন বৎসর?"

"ক্যালেণ্ডারে আমার নাম পাবেন না। ঘোষাল আমার ছদ্মনাম।"

"চুরি করে জেলে গিয়েছিলে বুঝি? বেরিয়ে এসে, পুনর্জন্ম লাভ করে ঘোষাল রূপ ধারণ করেছ?"

"হয়তো তাই। আমি জাতিস্মর নই, পূর্বজন্মের পাতা ওল্টাতে পারব না।"

এর পরে তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন যে, "আমি মিথ্যাবাদী ও চোরের সঙ্গে এক আসনে বসি নে।"

আমি বললুম, "যদভিরোচতে।"

উপসংহার

এর পরেই তিনি সরোষে চলে গেলেন। ঠাকুরানী আদেশ দিলেন যে, আজকের মতো সভা বন্ধ। পণ্ডিতমশায় আর আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলুম। তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অবাক, আর আমি নির্বাক।

তার পর রাত যখন সাড়ে দশটা, সখীরানী আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন যে, "ঠাকুরানী আপনাকে ডাকছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এত রাত্তিরে কিসের জন্য?"

"সে গেলেই বুঝতে পারবেন।"

"তবু?"

"শ্যালাবাবু রেগে রায়মশায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে যে, তুমি ভদ্রমহিলাদের সামনে তাঁকে গায়ে পড়ে অপমান করেছ। রায়মশায় তাই শুনে মহা চটে— তোমার উপর নয়, শ্যালাবাবুর উপর— রানীমার কাছে গিয়ে তাঁর ভ্রাতার উপর ঝাল ঝাড়ছিলেন। মীনারানীও তোমার দিক নিলেন দেখে ক্ষণে-রুষ্ট ক্ষণে-তুষ্ট রায় উল্টা রেগে বললেন যে, "ঘোষালটাকে আজই বাড়ি থেকে বার করে দেব।" মীনারানী বললেন, "তার আগে একবার ঠাকুরানীর মত জেনে নাও।" অমনি তিনি ঠাকুরানীর মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ফলাফল ঠাকুরানীর কাছেই শুনতে পাবে।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। তোমার রায় কি?"

"ও রসিকতাটা না করলেই ভালো হত। প্রফেসরের যে অজীর্ণ বিস্থায় মাথা ঘুরে গেছে তা আমরা সকলেই জানি— এমন-কি, মীনারানীও। তাঁর মত— তোমার কথা সত্যও হতে পারে, রসিকতাও হতে পারে। কিন্তু তুমি ও কথা বলে ভালোই করেছ। মানুষের ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। এখন ঠাকুরানীর মত কি, তা তুমি তাঁর কাছে গেলেই শুনতে পাবে। আমি জানি নে।"

আমি "আচ্ছা" বলে আবার ঠাকুরবাড়িতে ফিরে গেলুম, কারণ শুনলুম, তিনি সেখানে আমার জন্ম অপেক্ষা করছেন। ঠাকুরানী আমাকে আসন গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়ে ধীরে শান্তভাবে বললেন, "আমার বিশ্বাস তুমি সত্য কথা বলেছ, কেননা তুমি যে কৃতবিদ্য, তা প্রত্যক্ষ। ছদ্মবেশ গায়ে যত সহজে পরা যায়, মনে তত সহজে নয়। মন জিনিসটে হাজার ঢাকতে চাইলেও যখন-তখন বেরিয়ে পড়ে।

"তুমি বোধ হয় জান যে, মীনা আমার আত্মীয়া। যখন দেখলুম যে বিপত্নীক রায়মশায়ের তৃতীয় পক্ষ করতে আর তর সয় না, আর বাল্যবিবাহেও তাঁর আপত্তি নেই, বিধবাবিবাহেও নয়— তখন বাল্যবিধবাবিবাহরূপ যুগপৎ অধর্ম থেকে তাঁকে রক্ষা করবার জন্ম মীনাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করলুম। এ কাজ ভালো করেছি কি না জানি নে। সনাতন ধর্মের বিধি-নিষেধ সকলের পক্ষে ভালো হতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে নয়। কোনো কোনো রমণীর স্বধর্ম হচ্ছে ফুটে ওঠা, আর শাস্ত্রের ধর্ম হচ্ছে তাকে ফুটতে না দেওয়া। তাতেই এ জাতীয় স্ত্রীলোকের জীবন হয় প্রাণহীন শরীরধারণ মাত্র। এ কথা অবশ্ব ভৃঙ্গেশ্বর বোঝে না। কারণ সে জীবনের মূলও জানে না, ফুলও জানে না। তার বিস্থে হচ্ছে জীবনের ভাষা ভুলে তার বানান শেখা। সে যাই হোক, তোমায় আজ শেষ রাত্তিরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে। কাল সকালে যেন কেউ তোমার দেখা না পায়। এতে তোমারও মর্যাদা রক্ষা হবে, ভৃঙ্গেশ্বরেরও শিক্ষা হবে।

"রায়মশায় তোমার ছ মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন; পুরো মাইনেয়। তুমি যেখানে যাও, যেখানে থাক, শ্বামদাসীকে চিঠি দিয়ে জানিও, আর আমাদেরও যদি কিছু বলবার থাকে তো শ্বামদাসী তোমাকে জানাবে।

"দেখো, আমার বিশ্বাস কলেজ ছেড়ে, সংসারে ঢুকেই তোমার জীবনে কোনো একটা ট্রাজেডি ঘটেছিল, আর সেই থেকে তোমার জীবনযাত্রার মোড় ফিরে গেছে। তুমি যে জীবনটাকে প্রহসনরূপে দেখতে ও দেখাতে চাও, সে হচ্ছে ঐ ট্রাজেডির বাহ্য আবরণ মাত্র।

"আজ তবে এসো। শ্যামদাসী পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে।"

আমি বাসায় ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরে শ্যামদাসী এসে যথেষ্ট টাকা দিয়ে বললে, "বিদেশে কখনো যদি কোনো বিপদে পড় আমাকে জানিও, ঠাকুরানী তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি চলে গেলে এ পুরী নিরানন্দপুরী হবে।"

তার পর থেকেই তীর্থভ্রমণ করছি, অর্থাৎ নানা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরশু শ্যামদাসীর একখানি চিঠি পেয়ে কাল কলকাতায় এসেছি। এ দিকে শ্যামদাসীও আজ উপস্থিত হয়েছেন। আজ রাত্তিরের ট্রেনেই নাকি মকদমপুর রওনা হতে হবে। আমার সেখানে পদবৃদ্ধি হয়েছে, সে বাড়িতে আমি এখন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। ঠাকুরানীকে শেখাতে হবে ইংরেজি, সখীরানীকে সংগীত ও মীনারানীকে অঙ্ক। ঠাকুরানী এখন আয়ব্যয়ের হিসাব তাঁর কাছে বুঝিয়ে দিতে চান, সেইজন্যই তাঁর তেরিজ-খারিজ শেখা দরকার। দেখেছেন, একবার কোয়ালিফিকেশনের কথা বলে কি মুশকিলেই পড়েছি। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলুম যে, দেশের কাজ করতে গেলে কি কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন ?

"তোমার বিপদটা কি ঘটল, তা তো বুঝতে পারছি নে।"

"একটি বালবিধবা আর একটি বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, আর-একটি স্বাধীনভর্তৃকা, এই তিনজনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষলে কি বিপদের সম্ভাবনা নেই ? সখীরানী তো আগেই বলেছে যে, আমার বুকের পাটা নেই। আমি তো আর শেলী নই যে, এ অবস্থায় এপিসাইকিডিয়ন লিখে পরে ত্রি-রানী সংগমে ডুবে মরব !"

"একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হয়তো দেখবে যে, এ তিনই এক।"

"অর্থাৎ তড়িল্লেখা, তপন ও শশী তিনই এক— অর্থাৎ আলো। কিন্তু ঐ তিনের মধ্যে এক যদি উপরন্তু বৈশ্বানরময়ী হন ?"

"সখীরানী তো আগেই বলেছে, ঠাকুরানী তোমাকে সকল বিপদ থেকে

রক্ষা করবেন।”

তার পর ঘোষাল বললে, “তবে আসি, সখীরানী অনেকক্ষণ আমার জন্য একা অপেক্ষা করছে।”

“কোথায় ?”

“রাস্তায় ট্যাক্সিতে।”

তার পর ঘোষাল “au revoir” বলে অন্তর্ধান হল।

শেষ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারলুম না যে, ঘোষালের গল্পটি সত্য কিম্বা সর্বৈব রসিকতা— অথবা অসম্বদ্ধ প্রলাপ।

আপনাদের কি মনে হয় ?

ভাদ্র ১৩৪২

বীণাবাই

সূত্রপাত

এ গল্প আমার ঘোষালের মুখে শোনা। এ কথা আগে থাকতেই বলে রাখা ভালো। নইলে লোকে হয়তো ভাববে যে এ গল্প আমিই বানিয়েছি। কারণ ঘোষালের গল্পের যা প্রধান গুণ, স্ফূর্তি— এ গল্পের মধ্যে তার লেশমাত্র নেই। এ গল্প বৈঠকী গল্প নয়, অর্থাৎ রায়মশায়ের বৈঠকখানায় বলা নয়— আমার ঘরে বসে নিরিবিলি একমাত্র আমাকে বলা। কোন্ অবস্থায়— বলছি।

আমি একদিন জনকতক বন্ধুকে আমার বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করি; আমার বন্ধুরা সকলেই সুশিক্ষিত ও গানবাজনার জহুরী। তাঁরা যে গাইয়ে-বাজিয়ে ছিলেন তা অবশ্য নয়; কিন্তু সকলেই সংগীতশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ। এর থেকে মনে ভাববেন না যে, তাঁরা সংস্কৃতভাষায় লিখিত সংগীতশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেছেন সেই-সব নিরক্ষর মুসলমান ওস্তাদের কাছ থেকে, যাঁরা সকলেই মিঞা তানসেনের বংশধর, আর এ বিদ্যে যাঁদের খানদানী।

আমি এ চা-পার্টিতে যোগ দিতে ঘোষালকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম— উদ্দেশ্য, বন্ধুবান্ধবকে ঘোষালের গান শোনানো। সেদিন সংগীতশাস্ত্রেরই চর্চা হল। ঘোষাল 'শরীর ভালো নেই' অজুহাতে গান গাইতে মোটেই রাজি হল না। ঘোষালের এই বেদস্তুর ব্যবহারে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। বন্ধুবান্ধবরা চলে গেলে পর ঘোষাল বললে, "আমি গান-বাজনার সায়েন্স জানি নে। জানি শুধু আর্ট। আর আমার বিশ্বাস এ ক্ষেত্রে সায়েন্স আর্ট থেকে বেরিয়েছে— আর্ট সায়েন্স থেকে বেরোয় নি। হার্মোনিয়মের অতিরিক্ত ধ্বনি আছে, অর্থাৎ অতিকোমল অতিতীক্ষ্ণ সুরও অবশ্য আছে। কিন্তু যা গানের প্রাণ, তা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সুর— আর এই অতীন্দ্রিয় সুরের সন্ধান যিনি জানেন তিনিই যথার্থ আর্টিস্ট। এই কারণেই আর্ট যে কী বস্তু, তা বুঝিয়ে বলা যায় না। আর্টের অভিধানও নেই, ব্যাকরণও নেই। সেকেলে শাস্ত্রীরা গড়তেন ব্যাকরণ— অর্থাৎ বিধি-নিষেধের ফর্দ। আর একেলে শাস্ত্রীরা লেখেন আর্টের অভিধান— অর্থাৎ ব্যাখ্যা।"

কথারম্ভ

আমি বললুম, "ঘোষাল, তোমার মতামত দার্শনিক হতে পারে, কিন্তু অবোধ্য। অনেক মাথা ঘামিয়ে বুঝতে হয়।"

ঘোষাল বললে, "আমার যা মনে হল, তাই বললুম। আমার কথা ঝুঁটো কি সাচ্চা সে বিচার আপনারা করবেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাই শুধু বলতে পারি ও বলি।

"এখন সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতার কথা শুনুন। এ বিষয়ে আমার পটুতা একরকম অশিক্ষিতপটুত্ব। আমি ছেলেবেলা থেকেই গান গাইতুম, কেননা গেয়ে আমি আনন্দ পেতুম; আর শ্রোতারাও শুনে আনন্দিত হতেন। সেকালে আমি কোনোরূপ শিক্ষার ধার ধারতুম না। এ বিষয়ে আমি ছিলুম শ্রুতিধর। একটি গান শোনবামাত্র তন্মুহূর্তে পাঁচজনকে তা শোনাতে পারতুম। এরই নাম বোধ হয় প্রাক্তন সংস্কার। পৃথিবীতে যে-বস্তু আনন্দঘন— তা স্বপ্রকাশ। ভাষায় এর ব্যাখ্যা করা যায় না। সংগীতের একমাত্র ভাষা হচ্ছে সুর— কথা নয়।

"তার পর আমি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি, তখন কাশীতে একটি বৃদ্ধ পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে গান শিক্ষা করি— আমার কণ্ঠস্বরকে আত্মবশে আনবার জন্য। বৃদ্ধ আজীবন শুধু পূজাপাঠ ও সংগীতচর্চাই করেছিলেন। গানের অন্তরে যে কী দিব্যভাব আছে, তার প্রথম পরিচয় পাই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রসাদে।

"তার পর আমি এ বিদ্যা শিক্ষা করি স্বয়ং সরস্বতীর কাছে।"

আমি বললুম, "ঘোষাল, কথা আজ তুমি বেপরোয়া ভাবে বলছ।"

তিনি উত্তর করলেন, "সত্য কারো পরোয়া করে না। আমার আসল শিক্ষাগুরু হচ্ছেন একটি অলোকসামান্যা রমণী; আর তাঁর নাম হচ্ছে— বীণাবাই। তিনি বাইজি ছিলেন না। যে অর্থে মীরাবাই বাই, তিনিও সেই অর্থে বাই। তিনি ছিলেন শাপভ্রষ্টা দেবী সরস্বতী। কোথায় ও কি সূত্রে তাঁর সাক্ষাৎলাভ করি, তা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বলছি।"

সুরপুর

আমি এ দেশে ও দেশে ঘুরে শেষটায় বুন্দেলখণ্ডের একটি ছোটো রাজার ছোটো রাজধানী— সুরপুরে গিয়ে উপস্থিত হই। আমি একে ব্রাহ্মণ, তার উপর

'গাবইয়া', তাই দুদিনেই রাজাবাহাদুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলুম। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা জয়দেবের একটি গান— 'ধীর-সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' আমি রাজাবাহাদুরকে শোনাই। তা শুনে তিনি মহা খুশি হলেন ও তাঁর সভাগায়ক রামকুমার মিশ্রের কাছে গান শিখতে আমাকে আদেশ করলেন! অবশ্য আমার খোরপোষের ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন বললেন।

মিশ্রজি ও-অঞ্চলের সর্বপ্রধান গাইয়ে। তিনি করেন যোগ-অভ্যাস আর সংগীতচর্চা। গুরুজি ছিলেন অতি সদাশয় ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি। রাজাবাহাদুরের অভিপ্রায়-অনুসারে তিনি আমাকে শিষ্য করতে স্বীকৃত হলেন, এবং আমাকে তাঁর কাছে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হবামাত্র তিনি বললেন, "প্রথমে তুমি আমার পালিত কন্যা বীণাবাইয়ের কাছে কিছুদিন শিক্ষা করো, তার পর আমি তোমাকে হাতে নেব। বীণাবাই শেষ রাত্তিরে উঠে জপতপ করেন, তার পর বীণা অভ্যাস করেন। সুতরাং প্রতিদিন প্রত্যূষে আমার বাড়িতে হাজির হোয়ো। আমি এ কয় বৎসর ধরে তাঁকে নিজে শিক্ষা দিয়েছি এখন তিনি আমার তুল্য গাইয়ে হয়ে উঠেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে, আমার চাইতে তাঁর গলা ঢের বেশি নাজুক ও সুরেলা। সে কণ্ঠ ভগবদ্দত্ত, সাধনালব্ধ নয়। সংগীতশাস্ত্রে তিনি এখন পারদর্শী। সেইজন্য তাঁর গান শাস্ত্রশাসিত নয়। যার ঐশ্বর্য আছে, সে কখনো বিধি-নিষেধের দাস হতে পারে না। এ কথা স্বয়ং শুকদেব বলে গিয়েছেন ভাগবতে। অন্যকে শেখানো তাঁর কাজ নয়, কিন্তু আমার অনুরোধ তিনি রক্ষা করবেন।"

দেবীদর্শন

তার পরদিন আমি প্রত্যূষে রামকুমারের দ্বারস্থ হলুম। একটি দাসী এসে আমাকে তাঁর সংগীতশালায় নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী; তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা শ্বেতবসনা। আর তাঁর কোলে একটি বীণা। এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্তমাংসে গড়া। আমার মনে হল এ রমণী বাঙালি। কেননা তাঁর মুখেচোখে 'নিমক' ছিল; সংস্কৃতে যাকে বলে লাবণ্য। কোনো বৈষ্ণব কবি এঁর সাক্ষাৎ পেলে বলতেন, 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়'; যে কথা কোনো হিন্দুস্থানী সুন্দরীর সম্বন্ধে বলা যায় না। আমাকে দেখে তিনি প্রথমে

একটু অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলেন ; যেন কোনো পূর্বস্মৃতি তাঁর মনকে বিচলিত করেছে। মুহূর্তে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি আমাকে হিন্দী ভাষায় প্রশ্ন করলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ ?"

আমি বললুম, "আমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি।"

এ কথা শুনে তিনি আমাকে নমস্কার করলেন। তার পর বললেন, "আপনি একটি গান করুন, সে গান শুনে আমি বুঝব আপনি সংগীতপ্রাণ কি না।"

আমি একটি তম্বুরা নিয়ে 'নৈয়া ঝাঁঝরি' বলে একটি আশাবরীর গান গাইলুম। এ গান আমার পূজারী ঠাকুরের কাছে শেখা। আমি গানটি সেদিন পুরো দরদ দিয়ে গেয়েছিলুম। একে বসন্তকাল, তার উপর উষার আলোক— আর সুমুখে ঐ দিব্যমূর্তি। তাই মনের যত আনন্দ, যত আক্ষেপ আমার কণ্ঠে রূপধারণ করেছিল। মনে হল, আমার গান শুনে তিনিও আনন্দিত হলেন।

তিনি বললেন "আমি গুরুজির আদেশ পালন করব। এর অর্থ এই নয় যে, আমি আপনাকে শিক্ষা দেব। আপনি নিজ চেষ্টায় শিক্ষিত হবেন।"

আমি প্রশ্ন করলুম, "এর অর্থ কি ?"

তিনি উত্তর করলেন, "আপনাকে সংগীতসাধনা করতে হবে। একের সাধনায় অপরে সিদ্ধ হতে পারে না। প্রত্যেককেই নিজে সাধনা করতে হয়। আমি শুধু আপনার কানে সংগীতের মন্ত্র দেব। সে মন্ত্রের সাধন আপনাকেই করতে হবে। দেখুন— হাত যন্ত্র বাজায় না, বাজায় প্রাণ ; গলা গান গায় না, গায় মন। আর প্রাণকে উদ্‌বুদ্ধ করা ও মনকে প্রবুদ্ধ করারই নাম সাধনা।"

পরিচয়

পরমুহূর্তেই দেবী মানবী হয়ে উঠলেন, এবং অসংকুচিত চিত্তে আমাকে বললেন, "আপনি তো বাঙালি ?"

"হাঁ।"

"বয়েস ?"

"পঁচিশ।"

"শিক্ষিত ?"

"ইংরাজি শিক্ষিত।"

"সংস্কৃত?"

"কালিদাসের কবিতা আমাকে অলকায় নিয়ে যায়।"

"এখানে কিজন্য এসেছেন?— বেড়াতে?"

"না। পথই এখন আমার দেশ। আর পথ-চলাই একমাত্র কর্ম।"

"তার অর্থ?"

"আমি দেশত্যাগ করেছি।"

"স্ত্রীপুত্র সব ফেলে এসেছেন?"

"আমি অবিবাহিত।"

"তা হলেও স্বদেশ-স্বজনের মায়া কাটালেন কি করে?"

"স্বেচ্ছায় কাটাই নি, কাটাতে বাধ্য হয়েছি।"

"কেন?"

"একটি নূতন মায়ার টানে পুরানো মায়ার সব বন্ধন ছিঁড়ে গিয়েছে।"

"সংগীতের মায়া?"

"না। সংগীতপ্রীতি আমার জন্মসুলভ। কিন্তু সংগীতের মায়া কাউকেও উদ্‌ভ্রান্ত করে না, উন্মার্গগামী করে না।"

এ কথা শুনে তাঁর মুখের উপর কিসের যেন ছায়া ঘনিয়ে এল। তিনি যুগপৎ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের ও মনের সে মেঘ কেটে যেতে মিনিট-পাঁচেক লাগল। তার পর তিনি বাঙলায় এই কটি কথা যেন আপন মনে বলে গেলেন— স্বর সংযত ও আত্মবশ, আর মুখশ্রীও নির্বিকার।

বীণাবাইয়ের স্বগতোক্তি

আমিও বাঙালি। ব্রাহ্মণকন্যা এবং শিক্ষিতা। ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করব না। আমার কৌতূহল অদম্য নয়। তা ছাড়া জানি, আপনি সে-সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। আমার কোথায় বাড়ি, আমি কোন্ বৃন্তচ্যুত, সে-সব বিষয়ে আপনিও আশা করি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। আপনারও নিশ্চয় বৃথা কৌতূহল নেই। এক বিষয়ে আমাদের উভয়ের মিল আছে। আপনাকে ও আমাকে দুজনকেই 'নইয়া ঝাঁঝরি'তে অর্থাৎ ফুটো নৌকাতে ভবসাগর পাড়ি দিতে হবে। এ যাত্রায় আমাদের একমাত্র সম্বল শুধু সংগীত, আর কাণ্ডারী—

'অবাঙ্‌মনসোগোচর' কেউ।

যদিচ আমি আপনার চাইতে বছর-চারেকের ছোটো, তবুও এখন থেকে আপনাকে তুমি বলে সম্বোধন করব। কেননা আপনি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। আমি তোমাকে আমার সংগীতসাধনার সতীর্থ করব। তাতেই হবে তোমার সংগীতশিক্ষা। আর-এক কথা, অপরের সুমুখে আমার সঙ্গে বাঙলায় কখনো কথা কোয়ো না। আর তুমি আমাকে 'বীণাবাই' বোলো না। কারণ, 'বাই' শব্দটা এ দেশে সম্মানসূচক, কিন্তু বাঙালির মুখে জুগুপ্‌সিত। তাই তুমি আমাকে 'বীণা বেন' বোলো। বোধ হয় জান, 'বেন' বোহিনের অপভ্রংশ।— না, না, তোমার কাছে আমি 'বীণা বেন'ও নই— আমি বীণা সেন। এ নামের সার্থকতা এই যে, আমি তানসেনের স্বজাত।

এই কথা বলেই তিনি একটু বক্রহাসি হাসলেন। আমি বুঝলুম, তিনি যথার্থই বাঙালির মেয়ে— প্রকৃতিসরলা ও বুদ্ধিমতী। আর তাঁর আলাপ, নর্মালাপ— অর্থাৎ লীলা-চতুর ও সবিভ্রম।

সুরপুর ত্যাগ

তার পর বছরখানেক ধরে বীণাবাই আমার কানে সংগীতমন্ত্র দিলেন— অর্থাৎ তাঁর সংগীতসাধনায় আমাকে দোসর করে নিলেন। আমি হলুম সংগীতসাধক আর তিনি উত্তরসাধিকা। কোনো একটা রাগ তিনি প্রথমে বীণে আলাপ করতেন, পরে কণ্ঠে। আর আমি যথাসাধ্য তাঁর অনুসরণ করতুম। এ শিক্ষা একরকম প্রদীপ থেকে প্রদীপ ধরিয়ে নেওয়া। আমি পূর্বে বলেছি এরকম অপূর্ব গান আমি জীবনে কখনো শুনি নি। আপনি মৃচ্ছকটিক নিশ্চয়ই পড়েছেন। চারুদত্ত ভাব রেভিলের গান শুনে যা বলেছিলেন বীণাবাইয়ের গান সম্বন্ধে তাই বলা যায়—

> তং তস্য স্বরসংক্রমং মৃদুগিরঃ শ্লিষ্টঃ চ তন্ত্রীস্বনং
> বর্ণানামপি মূর্চ্ছনান্তরগতং তারং বিরামে মৃদুম্।
> হেলাসংযমিতং পুনশ্চ ললিতং রাগ দ্বিরুচ্চারিতং
> যৎ সত্যং বিরতেঽপি গীতসময়ে গচ্ছামি শৃণ্বন্নিব॥

সে বৎসরটা ছবি ও গানের লোকে দিবাস্বপ্নের মতো আমার কেটে গেল— কেননা বীণাবাই ছিলেন একাধারে চিত্র ও সংগীত।

তার পর গুরুজি একদিন অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করলেন। লোকে বললে, যোগীর যা হল, তা ইচ্ছামৃত্যু; আমরা যাকে বলি sudden heart-failure। গুরুজি তাঁর সর্বস্ব বীণাবাইকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বীণা বিষয়সম্পত্তি সব গুরুজির ভাই হরিকুমার মিশ্রকে প্রত্যর্পণ করলেন; শুধু রাজকোষে তাঁর নিজের যে টাকা মজুত ছিল, তাই নিতে রাজি হলেন— গুরুজির ইচ্ছামত কাশীতে একটি সরস্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার অভিপ্রায়ে। তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; আমি তোমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করি; আর জানই তো কারো না কারো উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাই হচ্ছে স্ত্রীধর্ম। আমি অবশ্য তাঁর সহযাত্রী হতে স্বীকৃত হলুম। কেননা তাঁর প্রতি আমার ছিল পরাপ্রীতি— নামান্তরে ভক্তি।

কাশীবাস

কাশীতে আমাদের সঙ্গী ছিলেন বসন্তরাও মৃদঙ্গী, হরিকুমারজি (কাকাবাবু), হিম্মত সিং ও ত্রিবেণী সিং— সুরপুরের রাজবাড়ির দুজন বিশ্বস্ত রক্ষী— ও বীণার সেই বুন্দেলখণ্ডী দাসীটি।

সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, একটি সরস্বতীর মূর্তি গড়তে ও মন্দির তৈরি করতে যে টাকা লাগবে বীণাবাইয়ের তা নেই। তখন কাকাবাবু প্রস্তাব করলেন যে, তিনি ও বীণাবাই দুজনে সংগীত-রসিকদের গানবাজনা শুনিয়ে নাজাই টাকা রোজগার করবেন। হরিকুমারজি ছিলেন একজন অসাধারণ ওস্তাদ। তাঁর যন্ত্র রুদ্রবীণা নয়— ক্ষুদ্র সেতার। তিনি করেছিলেন— গানের নয়— গতের সাধনা এবং এ বিষয়ে তাঁর ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব। গুরুজি বলতেন —ভাইসাহেব সংগীতের প্রাণের সন্ধান করেন নি, কিন্তু তার বহিরঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন। তাই তাঁর সংগীতে শক্তি আছে, শ্রী নেই; তান আছে, প্রাণ নেই। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ওস্তাদমহলে তাঁর পায়ে সকলেই নিজের মাথার পাগড়ি রেখে দিত।

ঠিক হল— তাঁরা কারো বাড়ি গাইতে বাজাতে যাবেন না। লোকে তাঁদের যথেষ্ট দক্ষিণা দিয়ে তাঁদের বাড়ি এসে বীণার গান ও ভাইসাহেবের সেতার শুনে যাবে। বীণাবাই হপ্তায় একদিন, শুধু রবিবারে, দর্শন দেবেন। কিন্তু এ ব্যাবসা খুলতে হবে কাশীতে নয়— কলকাতায়; কেননা বাঙালিরা

সংগীতের জন্য মেহন্নত করে না, কিন্তু পয়সা খরচ করে। বসন্তরাও কলকাতায় গিয়ে একটি সরু গলির ভিতর একটি পুরোনো প্রাসাদ ভাড়া নিলেন, যার সংলগ্ন কতকগুলো একতলা ছোটো ছোটো কামরা ছিল ; বোধ হয় সেকেলে কোনো ধনী ব্যক্তির আমলাদের থাকবার ঘর। আমরা সদলবলে সেই বাড়িতে এসে আড্ডা গাড়লুম ও ব্যাবসা খুললুম। পয়সা তো দেদার আসতে লাগল। শ্রোতারা হল দু দল— অর্থাৎ যারা সংগীতের স'ও জানে না, অথচ সংগীতের মুরুব্বি ; আর অপর দল— যারা সেতার পিড়িং পিড়িং করতে পারে আর শাস্ত্রের বুলি আওড়ায়। মুরুব্বিরা মুগ্ধ হত বীণার গান শুনে না হোক, ছবি দেখে ; আর গুণধররা অবাক হত সেতারীর তরল অঙ্গুলির বিচিত্র লীলা দেখে। তিনি যার সাধনা করেছিলেন— সে সেতারের হঠযোগ।

বীণার যাত্রাভঙ্গ

মাসখানেক পরে একদিন রবিবার সন্ধেয় আমরা পগ্‌গধারীর দল আসরে বসে আছি, আর বীণাদেবী আমাদের মধ্যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের মতো বিরাজ করছেন। একটু দূরে জনকতক গুণী ও ধনী শ্রোতা বসে আছেন। বসন্তরাও তখন মৃদঙ্গে মেঘ ডাকাচ্ছেন, হাতের কলকব্জা সব খেলিয়ে নেবার জন্য। এমন সময় হিম্মত সিং নীচে থেকে উপরে এসে বললে— পাশের বাড়িতে একটি বাবুর ভারি অসুখ, তিনি বলে পাঠিয়েছেন যে মেহেরবানি করে গান-বাজনা যদি বন্ধ করেন তা হলে তিনি একটু ঘুমোতে পারেন। এ কথা শুনে শ্রোতাদের ভিতর থেকে একজন স্থূলকায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধনী বলে উঠলেন— "তিনি মরুন আর বাঁচুন, আমাদের আনন্দোৎসব চলবে।" এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বীণাদেবী আগুন হয়ে উঠলেন ও আমাকে হুকুম করলেন— "ঘোষাল, তুমারা পাগড়ি উতারো আওর নিচু যাকে পুছকে আও— বাঙালি লোক কেয়া মাঙতা। বাঙলা বোলনেকো তুমারা আদত হ্যায়।" আমি তখনই আমার পাগড়ি বসন্তরাওয়ের হাতে দিয়ে নীচে নেমে গেলুম ; আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলুম। বীণাদেবী হুকুম করলেন, "বাঙলামে বোলো, সবকোই সম্‌ঝেগা।" আমি বললুম, "প্রার্থনা ভদ্রলোক আপনাকে জানাবেন, কেননা আপনি স্ত্রীলোক— আমাদের উপর তাঁর ভরসা নেই। এই পাশের একতলা বাড়ির ভাড়াটেবাবু নাকি সাংঘাতিক ব্যারামে ভুগছেন। উপরে গান-বাজনা নীচের

রোগীর কানে অসহ্য গোলমালের মতো ঠেকছে।"

এ কথা শুনে বীণাদেবী বললেন, "ঘোষাল, তুমি সামনের ফটক দিয়ে যাও, আমি পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি।" সেই আমলাবাবুটির সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত হলুম, পিঠপিঠ অন্য সিঁড়ি দিয়ে বীণাদেবীও নেমে এলেন। তার পর যা ঘটল, সে অদ্ভুত কাণ্ড; তা গল্পে মধ্যে মধ্যে হয়, জীবনে নিত্য হয় না। কারণ কথার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি অসীম।

নটবরের নিবেদন

বীণাদেবীকে দেখবামাত্র সেই আমলাবাবুটি "কে, দিদিমণি!" বলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালেন।

বীণাও গদ্‌গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "নটবর চট্টরাজ, কার অসুখ?"

"বড়োবাবুর।"

"কি, দাদার?"

"আজ্ঞে তাঁরই।"

"রোগ কি?"

"ডাক্তাররা তো বলেন, এ রোগে লোক আজ আছে কাল নেই।"

"এখানে কেন এসেছ? বড়োবাবুর চিকিৎসার জন্য? সঙ্গে কে আছে?"

"পুরোনো চাকরবাকর, আমি আর বড়ো-বৌঠাকরুন।"

"বৌঠান কোথায়?"

"এই পাশের ঘরে আছেন।"

বীণা এ কথা শুনে আমাকে বললেন, "ঘোষাল, উপরে যাও ও কাকাবাবুকে বলো শ্রোতা-বাবুদের সব বিদায় করে দিতে— আর তাদের টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দিতে। তুমি যাবে আর আসবে।" আমার মনে হল তিনি দুরন্ত চিত্তচাঞ্চল্য সামলে নেবার জন্য মুহূর্তের জন্য আমাকে সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর আদেশ হরিকুমারজিকে জানিয়ে সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে আবার নেমে এলুম। দেখি বীণাদেবী যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন চিত্র-পুত্তলিকার মতো। মনে হল— দুঃখে ও লজ্জায় তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছেন। আমি আসবামাত্র তিনি বললেন, "চলো বড়োবৌয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি— আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না। ভালো কথা, ব্যাপার দেখে ও শুনে

তোমার কি মনে হচ্ছে?”

“আমার মনে হচ্ছে— নীচে অন্ধকার, উপরে আলেয়ার আলো; নীচে রোগ-শোক, উপরে নাচ-গান। এরই নাম সুবিন্যস্ত সমাজ।”

বীণা এ কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার পর বললেন, “যাও নটবর, বৌঠানকে গিয়ে বলো যে, দোতলার ‘বিবিজি’ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।”

বীণার স্বজন

ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, সুমুখে একটি শ্বেতপাথরের প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছেন— প্রায় আমার মতো লম্বা; পরনে একখানি লালপেড়ে উজ্জ্বল গরদের শাড়ি, বীণাদেবীর ধাঁচেই সুমুখে কোঁচা ও বাঁ কাঁধে আঁচল দিয়ে পরা। এ মূর্তি জমাট অহংকারের মূর্তি; আর সে অহংকার যেমন দৃপ্ত তেমনি দীপ্ত। বীণাকে দেখে তিনি একটু চমকে উঠলেন। পরমুহূর্তে বীণা যখন তাঁকে প্রণাম করতে অগ্রসর হল, তখন তিনি বললেন, “আমাকে ছুঁয়ো না, কেননা ছুঁলে আবার স্নান করতে হবে।”

বীণা দু পা পিছু হটে বললে, “আমাকে চিনতে পারছ না?”

“না। কে তুমি?”

“বীণা।”

“কোন্ বীণা?”

“তোমার ননদ বীণা।”

“আমার তো কোনো ননদ নেই। সে বীণা মরে গিয়েছে।”

“আমি মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি এখন তোমার কাছে অস্পৃশ্য। বহুকালের অভ্যাসের দোষে প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলুম। যাক এ-সব কথা। বাড়িতে কার অসুখ?”

“আমার স্বামীর।”

“কি অসুখ?”

“হার্ট ডিসিস।”

“কেমন আছেন?”

“খানিকক্ষণ আগে বুকে ভয়ংকর ব্যথা ধরেছিল। এখন একটু ভালো।

তবে ডাক্তাররা বলেন, angina বড়ো 'ট্রেচারাস্'।"

"এখানে এসেছ বুঝি বড়োবাবুর চিকিৎসার জন্ত ?"

"লোকে বলে— শ্মশান পর্যন্ত চিকিৎসা।"

"এ গোয়ালে উঠেছ কেন ?"

"চৌরঙ্গিতে বাড়ি ভাড়া করবার সামর্থ্য নেই বলে। এখন বড়োবাবু নিঃস্ব।"

"তোমরা নিঃস্ব ! তোমাদের জমিদারি তো একটা খণ্ডরাজ্য।"

"তালুক-মুলুক সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।"

"কিসে ?"

"দেনার দায়ে।"

"তোমাদের তো ঋণ ছিল না।"

"যা আগে ছিল না, এমন অনেক জিনিস ইতিমধ্যে হয়েছে।"

"যেমন তোমার ননদের মৃত্যু।"

"হাঁ ; আর তার পিঠপিঠ ঋণ।"

"আমার মৃত্যুর সঙ্গে দাদার ঋণের কি সম্বন্ধ ?"

"ভগ্নীর মৃত্যুর পরেই দাদা ঘোর বদান্ত হয়ে উঠলেন। বাঙলার যত সদনুষ্ঠানে দু হাতে দান করতে লাগলেন ; আর তার জন্ত ঋণ করতে শুরু করলেন। বাঙলায় তো সদনুষ্ঠানের অভাব নেই ; আর এ শ্রাদ্ধের অগ্রদানীরও অভাব নেই।"

"ঋণ কেন ?"

"আমরা তো সা-মহাজনের বংশে জন্মাই নি। তহবিলে মজুত টাকা ছিল না বলে।"

"আচ্ছা বড়োবাবু তো নিঃস্ব হয়েছেন। ছোটোবাবু ?"

"তিনি এখন জেলে।"

"খোকা জেলে !"

"ছোটোবাবুর কাছে রিভলভার ছিল বলে সরকার তাকে ইণ্টার্ন করেছে ; কিন্তু সে ভুল করে। কেননা ছোটোবাবু রিভলভার সংগ্রহ করেছিলেন মাস্টারমশায়ের দেখা পেলে তাঁকে গুলি করবে বলে।"

"তারও কোনো আবশ্যক ছিল না। মাস্টারমশায়কে তাঁর হিন্দুস্থানী চেলার দল অনেকদিন হল গুলি করেছে।"

"কেন, তাদের তিনি কী সর্বনাশ করেছিলেন ?"

"কিছু করেন নি, কিন্তু সর্বনাশ করবেন এই ভয়ে।"

"এই ভয়ের কারণ কি ?"

"তিনি নাকি আসলে পুলিসের গোয়েন্দা— এই সন্দেহের জন্য। বোধ হয় এ সন্দেহের মূল ভয়। তিনি অতিমানুষ না হলেও অমানুষ ছিলেন না।"

"রাখো রাখো— তাঁর হয়ে ওকালতি! এখন বুঝছি ছোটোবাবুকে কে ধরিয়ে দিয়েছে। তিনিই তো ছোটোবাবুর কানে বিপ্লবের মন্ত্র দিয়েছিলেন। তিনি আর কিছু না করুন, আমাদের পরিবারে সব দিক থেকেই বিপ্লব ঘটিয়েছেন।— তার পর বীণার কি হল ?"

বীণার জেরা

"সে আজও বেঁচে আছে।"

"আর বাইজির ব্যাবসা নিয়েছে।"

"হাঁ, তাই।"

"টাকার অভাবে ?— তার তো যথেষ্ট টাকা নটবরের জিম্মায় আছে। একখানি পোস্টকার্ড লিখলে পত্রোত্তরে সে তা পেত। আমরা তো জান তার স্ত্রীধন ছোঁব না— মরে গেলেও নয়।"

"তার টাকার অভাব নেই।"

"তবে শখ ?"

"ধরে নেও তাই।"

"বলিহারি যাই বীণার শখের! সুন্দরী যুবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার চমৎকার ব্যাবসা! ধিক্ তার শিক্ষাদীক্ষায়!"

"বীণা বিধবা নয়।"

"এর অর্থ কি ?"

"সেনমশায়ের সঙ্গে তার কখনো বিবাহ হয় নি।"

এ কথা শুনে বৌঠাকুরানী আমার প্রতি কটাক্ষ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইনি কে ?"

"আমার গুরু-ভ্রাতা।"

"কিসের গুরু ?"

"সংগীতের। গুরুজির মৃত্যুর পর ইনি আমার স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন।"

"অজ্ঞাতকুলশীল ?"

"না, ব্রাহ্মণসন্তান। আর শীল ?— এঁর দেহমনে পশুত্বের লেশমাত্র নেই।"

এই কথা শুনে সেই ঋজুদেহ পাষাণ-প্রতিমা নুয়ে আমাকে নমস্কার করলেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলুম। তার পর বৌঠান বীণাকে বললেন, "তুমি সধবাও নও, বিধবাও নও, পুনর্ভূও নও। তবে তুমি কি ?"

বীণার আত্মকথা

বীণা উত্তর করলে, "বলছি। ঘোষাল, তুমিও শোনো।"

তার পর ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন, "আমি কুমারী।"

"কুমারী !"

"অনাঘ্রাত পুষ্প।"

"তুমি !"

"হাঁ, আমি। মাস্টারমশায়কে কখনো স্পর্শ করি নি, স্বপ্নেও নয়।"

"অর্থাৎ তুমি কুলত্যাগ করেছ, কিন্তু জাত বাঁচিয়েছ ?"

"ব্রাহ্মণত্বের অহংকার তোমার মতো আমারও আছে; কিন্তু জাতিধর্মে আমার ভক্তিও নেই, ভয়ও নেই।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করি নে। তুমি বলতে চাও— তোমার দেহ রক্ত-মাংসে গঠিত নয় ?"

"তুমি পাষাণে গড়া হতে পার, কিন্তু আমি শুধু রক্তমাংসে গড়া; জীবন্ত রক্তমাংসেরও রুচি-অরুচি আছে। প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক অপ্রবৃত্তিও তেমনি স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি অবশ্য দমন করা যায়, কিন্তু অপ্রবৃত্তি দমন করবার যদি কোনো সদুপায় থাকে তো আমার জানা নেই।"

এ কথা শোনবার পর বৌঠাকুরানী মুষড়ে গেলেন। তাঁর ভাবান্তর ঘটল; তাঁর মুখ থেকে তাচ্ছিল্যের বজ্র-লেপের মুখোশ যেন খসে পড়ল। তিনি বললেন, "বীণা, তোমার শরীর কেমন আছে ?"

"ভালোই।"

"তোমারও না হার্ট একটু বিগড়েছিল ?"

"সেটুকু বেগড়ানো এখনো আছে। মাঝে মাঝে palpitation এখনো হয়।

ও বস্তু একবার বেগড়ালে মেরামত করা যায় না। এই খানিকক্ষণ আগে বুক বেজায় ধড়াস ধড়াস করছিল ; এখন হৃৎপিণ্ডটা আর ততটা লাফাঝাঁপি করছে না, তাই যাই দাদাকে দেখে আসি। ঘোষাল, তুমি উপরে যাও। আমার দলবলকে এখনই দেশে ফিরে যেতে বলো। আর কাকাবাবুকে বলো যে, তাঁর কাছে আমার যে টাকাকড়ি আছে, তা তাঁকেই দিলুম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাড়ি খালি করা চাই।"

"আচ্ছা" বলে আমি উপরে গেলুম, আর বীণা তাঁর দাদার শোবার ঘরে গেলেন। বৌঠান কোনো বাধা দিলেন না।

দলবল বিদায়

আমি উপরে গিয়ে হরিকুমারজি ওরফে কাকাবাবুকে বীণার ইচ্ছা জানালুম। বীণা তাঁর সমস্ত টাকা হরিকুমারজিকে দান করেছেন শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন— সে যে অনেক টাকা! তার পর তিনি একটু ভেবে বললেন, বাইজির ইচ্ছা পূর্ণ করব ; ঐ টাকা দিয়ে আমি স্বরপুরে সরস্বতীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করব। তার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাদের সব জিনিসপত্র নিয়ে হাবড়া স্টেশনে তারা চলে গেল ; রেখে গেল শুধু বীণার বীণা, আর তার সুসজ্জিত শোবার ঘরের জিনিসপত্র আমার জিম্মায়। তার পর আমাদের ঠিকা চাকরকে দিয়ে ঝাঁট দিয়ে ঘরদোর সব সাফ-সুত্‌রো করে রাখলুম। কারণ জানতুম বীণা দেবী ময়লা দুচক্ষে দেখতে পারেন না— এমন-কি, দেয়ালের কোণে এক টুকরো ঝুলও নয়।

ঠিক সাড়ে নটার সময় নটবর চট্টরাজ উপরে এসে জিজ্ঞাসা করলে,"ঘরদোর তো সব খালি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ?" আমি বললুম, "চোখেই তো দেখতে পাচ্ছেন।" তিনি বললেন, "বড়োবাবুকে আমরা উপরে নিয়ে আসব। ডাক্তারবাবু তাঁকে নড়বার অনুমতি দিয়েছেন এবং এখনো হাজির আছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "বড়োবাবু এখন কিরকম আছেন ?" নটবর বললে, "ডাক্তারবাবু বলেন, আজকের ফাঁড়া কেটে গেছে। আপনিও আসুন, আমাদের একটু সাহায্য করতে হবে।" আমি বললুম, "চলো।" নটবর বললে, "আমার কাছে দিদিমণির বিস্তর টাকা আছে। দিদিমণি সে টাকা আপনাকে দিতে বলেছেন।"

"আমাকে !"

"হাঁ, আপনাকে। বড়োবাবুর চিকিৎসার খরচ চালাতে। খরচ আমিই দেব, ও তার হিসাব রাখব। টাকাকড়ির ঝক্কি দিদিমণি আর পোয়াতে পারবেন না। তা ছাড়া পৈতৃক ধন ভাইয়ের জন্য ব্যয় হবে— এ তো হবারই কথা। বিশেষত বড়োবাবু দেবতুল্য লোক। বড়োমানুষের ঘরে এমন পুণ্যের শরীর দেখা যায় না। আর দিদিমণির তিনি তো শুধু ভাই নন— উপরন্তু শিক্ষাগুরু। ওঁরা দুজনে অভিন্নহৃদয়।"

আমরা পাঁচজনে ধরাধরি করে খাটসুদ্ধ বড়োবাবুকে উপরে নিয়ে এলুম, গঙ্গা-যাত্রীর মতো। বড়োবাবুকে এই প্রথমে দেখলুম। অতি সুপুরুষ। মুখে রোগের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু আভিজাত্যের ছাপ। তাঁর সঙ্গে এলেন ডাক্তারবাবু, আর বীণা দেবী; বৌঠানও এলেন— যদিচ তিনি প্রথমে একটু ইতস্তত করেছিলেন।

চাকরবাকর প্রথমেই চলে গিয়েছিল; শেষে ডাক্তারবাবুও 'আর ভয় নেই' বলে বিদায় হলেন। একটা টিপায়ের উপর দুটো ওষুধের শিশি রেখে গেলেন— একটি বড়োবাবুর জন্য, অপরটি বীণা দেবীর জন্য। দুটিই heart-tonic, কিন্তু এক ওষুধ নয়।

বীণা বললেন, "আমার ওষুধটা আমার ঘরে রেখে এসো; পাছে ভুল করে একের ওষুধ অন্যকে খাওয়ানো হয়। আজ আমাদের মাথার ঠিক নেই। আর আমার বীণাটা নিয়ে এসো। আজ আমাদের শিবরাত্রি, তোমারও। সমস্ত রাত্রি উপবাস ও জাগরণ।" আমি ওষুধটা রেখে বীণাটি নিয়ে এলুম। বীণা বললেন, "দাদা, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি বীণার মৃদু গুঞ্জনে।" তার পর বৌঠানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রাগ আলাপ করব ?" তিনি উত্তর করলেন, "ঝিমন্ত পরজ।" বীণা একটু হেসে বললে, "তুমি তো গান-বাজনায় আমার সর্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী; মন দিয়ে শোনো তালের হ্রস্বদির্ঘ্য ও সুরের ষত্বণত্বের জ্ঞান আমার হয়েছে কি না। এ বিষয়ে spelling mistakes তো তোমার কান এড়িয়ে যাবে না।"

তার পর বীণা বীণায় পরজ আলাপ করলেন— অতি মৃদুস্বরে, অতি বিলম্বিত লয়ে। এমন বাজনা আমি জীবনে আর কখনো শুনি নি। বীণার অন্তরে যে এত কাতরতা, এত বৈরাগ্য থাকতে পারে তা আমি কখনো ভাবি নি। আধ

ঘণ্টার মধ্যেই বড়োবাবু ঘুমিয়ে পড়লেন।

বৌঠান বললেন, "বীণা, তোমার সাধনা সার্থক!" বীণা বললেন, "বৌঠান, তুমি দাদাকে পাহারা দেও। আমি ভিতরে যাচ্ছি ঘোষালের সঙ্গে একটু হিসেব-কিতেব করতে। ঘোষাল হচ্ছেন আমার নটবর— অর্থাৎ খাজাঞ্চী।"

বীণার ফিলজফি

ভিতর-বাড়ির বারান্দায় যাবামাত্র বীণা বললেন, "মনে আছে, আজ আমাদের শিবরাত্রি— অর্থাৎ নির্জলা উপবাস ও নির্নিমেষ জাগরণ। সমস্ত রাত্রি জোড়াসন হয়ে বসে থাকতে পারব না, পিঠ ধরে আসবে। তুমি খানিকক্ষণ আগে বলেছিলে যে সমাজের একতলায় অন্ধকার আর দোতলায় আলেয়ার আলো। কথাটা খুব ঠিক। তবে একতলা মনে করে দোতলা স্বর্গ, আর দোতলা ভাবে একতলা নরক। দুটোই সমান illusion। আমি কিন্তু দোতলার জীব। তাই আমার চাই আলো আর বাতাস, আর চাই পিঠে আশ্রয়, বুকে আঁচল আর মুখে সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুর ভাষা। আরো অনেক জিনিস চাই, যার ফর্দ দিতে গেলে রাত কেটে যাবে। জানি এ-সবই কৃত্রিম। তাতে কি যায় আসে— আমাদের জীবন, সমাজ ও সভ্যতা সবই কি কৃত্রিম নয়?— সে যাই হোক, আমার ঘর থেকে দুখানা cushion chair নিয়ে এসো।"

আমি একখানির পর আর একখানি গদি-মোড়া চেয়ার নিয়ে এলুম, যাতে বসে আরাম আছে। তার পর বীণা বললেন, "চুপ করে কি জাগা যায়? বিশেষত মন যখন অশান্ত। ভালো কথা— বিলেতি দেহতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব নিশ্চয়ই জান। Palpitation হয় বুকের দোষে, না বুকের ভিতরে যে মন লুকোনো আছে, সেটি বিগড়ে গেলে? তুমি বলবে— ও দুই কারণেই। সেই ঠিক কথা। দেহ ও মন তো পরস্পর নিঃসম্পর্কিত নয়। আর ঐ দুয়ে মিলে তো তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ। এই স্পষ্ট কথাটি ভুললেই আমরা হয় আধ্যাত্মিক, নয় দেহাত্মিক, নয় দেহাত্মবাদী হয়ে উঠি। আমি অবশ্য দেহাত্মবাদী নই। মনের সঙ্গে দেহের পার্থক্য আমি জানি। কিন্তু ঠিক কোথায় দেহ শেষ হয় আর মন আরম্ভ হয়, তা জানি নে।"

বীণার খেয়াল

এর পরই বীণা কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বৌঠানকে কিরকম দেখলে ?"

"স্বয়ং সিংহবাহিনী।"

"সে তো স্পষ্ট। সুন্দরী ?"

"সে তো স্পষ্ট। ইংরেজিতে যাকে বলে queenly beauty। সেই রঙ, সেই কপাল, সেই নাক, সেই ঠোঁট, সেই চিবুক, সেই স্থির দৃষ্টি। এ তো আগাগোড়া দৃঢ়তা ও প্রভুত্বের স্বপ্রকাশ রূপ।"

"আর সেই সঙ্গে দাসীত্বের। সিঁথির সিঁদুর কি তোমার নজরে পড়ে নি ? ও কিসের নিদর্শন ? দাসীত্বের ; সেই দাসীত্বের— যা স্ত্রীলোকে স্বেচ্ছায় বরণ করে।"

আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, "তোমার কথা শুনতে আমি আসি নি, এসেছি আমার কথা তোমাকে শোনাতে। স্বামী অবশ্য দেবতা। সেই স্বামী যিনি হৃদয়ের গর্ভমন্দিরে স্বপ্রতিষ্ঠিত, আর যাঁর দেবদাসী হওয়া স্ত্রীধর্ম। দাসী কেউ কাউকে করতে পারে না। আমরা কখনো কখনো স্বেচ্ছাদাসী হই। যাক ও-সব কথা। ঐ সিঁথের সিঁদুর আমার চোখে বড়ো সুন্দর লাগে আর পরতে বড়ো লোভ হয়— অর্থাৎ এখন হচ্ছে। যাও আমার ঘরে, আয়নার টেবিলের ডানধারের দেরাজে সিঁদুরের কৌটো আছে— নিয়ে এসো ; একবার পরে দেখব আমাকে কত সুন্দর দেখায়।"

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠবামাত্র বীণা বললেন, "ক্ষেপেছ। আমি সিঁথের সিঁদুর পরব ? আমি যে চিরকুমারী, যেমন তুমি চিরকুমার।— তুমি সিগারেট খাও ?"

"খাই।"

"ঐ আয়নার উপর এক টিন 555 আছে, নিয়ে এসো। আমি তোমার জন্য কিনে আনিয়েছি চট্টরাজকে দিয়ে। আমি বকে যাব আর তুমি নীরবে সিগারেট ফুঁকবে।"

বীণার প্রলাপ

আমি সিগারেটের টিন ঘর থেকে এনে পাশে রাখলুম। বীণা বললেন—

"আমি আজ প্রলাপ বকব, আর জানই তো প্রলাপের কোনো syntax নেই। স্থতরাং আমার বকুনি হবে সাজানো কথা নয়— এলোমেলো কথা। সে বকুনি শুনে পাছে তুমি ঘুমিয়ে পড় সেই ভয়ে তোমার হাতে সিগারেট দিয়েছি। এ জলন্ত সিগারেট হাতে ধরে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না, অগ্নিকাণ্ড হবার ভয়ে।— এখন আমার প্রলাপ শোনো। আমার জীবন বিশৃঙ্খল কেন জান? আমি কখনো কারো দাসী হতে পারি নি— অর্থাৎ কাউকেও ভালোবাসতে পারি নি। দাদাকে আমি অবশ্য প্রাণের চাইতেও ভালোবাসি —তাঁর সঙ্গে আমি অভিন্নহৃদয়। কিন্তু এ ভালোবাসা নৈসর্গিক ও অশরীরী। এ হচ্ছে এক বৃন্তে ছুটি ফুলের সৌহার্দ্য, যে সৌহার্দ্যের বন্ধন ফুলে ফুলে নয়, উভয় ফুলের সঙ্গে একই মূলের।

"আর মাস্টারমশায়?— তিনি শিখেছিলেন শুধু উচাটনের মন্ত্র, তা ছাড়া আর কিছু নয়। হিপনটিজমের ঘোর কদিন থাকে? তাঁর নীরস স্বভাবের ছোঁয়াচ লেগে আমি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। তার পর একটি পথ-চলতি লোকের স্থকুমার স্পর্শেই অহল্যা আবার মানবী হয়ে উঠল। আমার শুষ্ক হৃদয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটল। কেবলমাত্র যুথী জাতি মল্লিকা মালতী নয়, অর্থাৎ যে-সব কুসুম পূজায় লাগে শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নববসন্তের অগ্নিবর্ণ কিংশুক, হৃদয়ের অন্তঃপুরে আযৌবন অবরুদ্ধ নবজীবনের সম্ভমুক্ত কামনার জবাকুসুম। এখন উপমার ও সংস্কৃতের আব্রু খুলে ফেলে বলি, আমি তাকে প্রথম ভালোবাসি ও প্রথম থেকেই।

"এই বাঙলা কথাটা মুখে আনতে অপ্রবৃত্তি হয়। কেননা ওর চাইতে সস্তা কথাও আর নেই। অথচ ওর চাইতে দামী কথাও আর নেই। সস্তা তার কাছে, যে ও-কথার অর্থ জানে না; আর যে জানে, তার কাছে অমূল্য। সে ব্যক্তি পরম স্থন্দর— দেহে ও মনে। আর তার অন্তরে পশুর অস্ত্রতন্ত্র নেই, আছে শুধু জাদুকরী বীণার তার। এ কথা আজ বলছি কেন জান?— এই পারিবারিক বিভ্রাটের বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি আজ জেগে উঠেছি, নিজেকে চিনতে পেরেছি। আজ আত্মগোপন করা হবে বৃথা মিথ্যাচার।"

বীণার মুক্তি

এর পরে বীণা বললেন, "যাও ঘোষাল, আমার বীণাটি নিয়ে এসো— আর ওষুধের শিশিটাও। এখন আমার বুকের ভিতর হৃদয়টা তাণ্ডবনৃত্য করছে। যদি বীণার বশীকরণ মন্ত্রে নৃত্যকে বশীভূত করতে না পারি তা হলে ওষুধ খেয়ে হৃদয়টা সায়েস্তা করব।"

আমি বীণার ঘর থেকে ওষুধ ও বীণা দুই নিয়ে এলুম।

আমি ফিরে আসবামাত্র "শ্বসিত কম্পিত পীনঘনস্তনী" বীণা নিজের হৃদয়কে "শান্ত হ পাপ" এই আদেশ করে আমাকে বললেন, "তোমার মুখে একটি কথা শুনতে চাই; তার পর বীণা বাজাব, তার পর ওষুধ গলাধঃকরণ করব। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই— যার মায়ায় তুমি উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী হয়েছিলে, সে মায়াবিনী কি তোমাকে আমার চাইতেও বেশি মুগ্ধ করেছিল?— না, তা হতেই পারে না। আমার মোহিনী শক্তি আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান।

"এখন বীণাটি দেও। তোমাকে এই শেষ রাত্তিরে একটি আশাবরী শোনাব, যা আমার বীণার মুখে কখনো শোন নি।"

এই বলে তিনি বীণাটি বুকে তুলে নিয়ে 'নৈয়া ঝাঁঝরি' বীণার মুখ দিয়ে আমাকে শোনালেন। এ বাজনা শুনে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তাই আমার মনে পড়ল— "মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে।"

বাজানো শেষ হলে বীণা বললেন, "এই গানটি তোমার মুখে প্রথম শুনি, আর বীণার মুখে এই শেষ শুনলে। হৃদয়ের এই উদ্দাম তোলপাড় ওষুধে আর থামবে না; আর যখন থামবে, একেবারেই থামবে। এই হচ্ছে আমার Premonition। তুমি আমার পাণিগ্রহণ করে, I mean হাত ধরে, আমাকে স্নমুখের চৌকাঠটা পার করে দেও।"

আমি তার হাত ধরে শোবার ঘরের চৌকাঠটি পার করে দিলুম। বীণা ঘরে ঢুকেই বললে, "যতগুলো বাতি আছে সব জ্বেলে দেও— আমার বড়ো ভয় করছে।"

সব বাতি জ্বেলে আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কিসের ভয়?"

বীণা বললে, "মৃত্যুভয়।"

তার পর যেমন শোওয়া অমনি 'বীণা হি নামা সমুদ্রোত্থিতং রত্নম্' অকূল

সাগরে নিমগ্ন হল। 'অন্তর্হিতা যদি ভবেদ্বনিতেতি মন্যে।' আর আমি জীবন নামক 'নৈয়া ঝাঁঝরি'তে ভেসে বেড়াচ্ছি; যাদের ধন আছে মন নেই, সেই-সব দোতলার জীবদের মোসাহেবি করছি; যারা আমোদ ও আনন্দের প্রভেদ জানে না সেই-সব সমজদারদের মজলিসী গান শোনাচ্ছি, আর নিত্যনতুন সত্যমিথ্যা গল্প বানিয়ে বলছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "এ গল্প সত্য, না মিথ্যা?"

ঘোষাল বললে, "এক সঙ্গে দুই।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ— গল্প সায়েন্স নয়, আর্ট।"

আষাঢ় ১৩৪৪

ঝোট্টন ও লোট্টন

যে কালের কথা বলছি, তখন আমি বাংলাদেশের কোনো একটি শহরে বাস করতুম— কলকাতায় নয়।

পাড়াগেঁয়ে শহরে নানা অভাব থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিসের অভাব নেই— অর্থাৎ জমির। শহরের ভিতরে না হোক বাইরে দেদার জমি পড়ে আছে— জঙ্গল নয়, ধানের খেত। আর সেই-সব ধান-খেতকে কেউ কেউ প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়িতে পরিণত করেছেন। আমি যে বাড়িতে বাস করতুম সেটা ছিল সেই জাতের বাড়ি।

সে বাড়িতে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি-গোছ একটা মস্ত আস্তাবল ছিল— বসতবাড়ির গা ঘেঁষে নয়, দু-তিন রশি তফাতে বড়ো রাস্তার ধারে। সে আস্তাবলে ছিল মস্ত একটা গাড়িখানা, তার দু-পাশে দুটি ঘোড়ার থান, আর তার ওপাশে সইস-কোচম্যানদের সপরিবারে থাকবার ঘর। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে গাড়িও ছিল না, ঘোড়াও ছিল না, মানুষও থাকত না। ছিল শুধু ইঁদুর ও ছুঁচো, টিকটিকি ও আরসোলা; আর সেখানে যাতায়াত করত গো-সাপ ঢোঁড়া-সাপ আর গিরগিটি, যাদের দেখবামাত্র আমাদের নীরব ও নিরীহ বিলেতি শিকারী কুকুরটা তন্মুহূর্তে বধ করত; অথচ তাদের মাংস খেত না। সে ছিল ইংরেজরা যাকে বলে real sportsman। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'— এ উপদেশ তাকে দেওয়া ছিল নিষ্প্রয়োজন; কারণ ফলনিরপেক্ষ হত্যাই ছিল তার স্বধর্ম।

২

একদিন সকালে আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলুম সেই পোড়ো আস্তাবলে কে মহা চিৎকার করছে। কানে এল আমাদের মালী চিনিবাসের গলার আওয়াজ। সে তারস্বরে "নিকালো নিকালো" বলে চেঁচাচ্ছে। বুঝলুম, যার প্রতি এ আদেশ হচ্ছে, সে পশু নয়— মানুষ।

এই গোলমাল শুনে আমি ও আমার এক আত্মীয়, উপেনদা দুজনে সেখানে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি আস্তাবলে গাড়িখানার মেঝেয় দুটি লোক বসে

আছে। দুজনেই সমান অস্থিচর্মসার, আর দুজনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই হোক, তারা শুকিয়ে-মুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে। তারা যে চিনিবাসের কথা অমান্য করছে, তার কারণ তাদের নড়বার চড়বার শক্তি নেই। এমন কঙ্কালসার মানুষ জীবনে আর কখনো দেখি নি। তারা যে এখানে চলে এল কি করে, তা বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় আকাশ থেকে পড়েছিল।

উপেনদা এদের দেখবামাত্র চিনিবাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বেরিয়ে যাও" বলে চিৎকার করতে লাগলেন। আমি ও-দুজনকেই থামালুম। আমি মনিব, সুতরাং আমি এক ধমক দিতেই চিনিবাস চুপ করলে। আর যদিও আমি তখন ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, আর উপেনদা বি. এ. পড়েন, তবু তিনি জানতেন যে মা আমার কথা শোনেন, তাঁর কথা উপেক্ষা করেন। তিনি ভাবতেন তার কারণ অন্ধ মাতৃস্নেহ, কিন্তু আসলে তা নয়। তার যথার্থ কারণ, মা ও আমি উভয়েই এক প্রকৃতির লোক ছিলুম। অপর পক্ষে উপেনদার মতে, নিজের তিলমাত্র অসুবিধে করে অপরের জন্য কিছু করা অশিক্ষিত নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

সে যাই হোক, আগন্তুক দুটিকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম যে তারা দুজনে 'দেশ্‌কা' ভাই। কিন্তু কোন্ দেশ যে তাদের দেশ, তা তারা বলতে পারে না; কারণ তাদের নাকি "কুছ্‌ ইয়াদ নেই।" তাদের আছে শুধু পেটে ক্ষিধে, আর মনে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে। তারা আসছে বহুদূর থেকে, আর দুদিন আমাদের এখানে থাকতে চায়; আর তাদের নাম ঝোট্টন ও লোট্টন। আমি সব দেখে শুনে বললুম, "আচ্ছা, তুমলোক হিঁয়া রহেনে সক্‌তা।" তার পর মার কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিলুম। উপেনদা মাকে ভয় দেখালেন যে ও-দুজন ডাকাত, আর এসেছে আমাদের বাড়ি লুটে নিয়ে যেতে। মা হেসে বললেন, "যেরকম শুনছি তাতে ওরা ভূত হতে পারে, কিন্তু ডাকাত কিছুতেই নয়।"

৩

ফলে ঝোট্টন ও লোট্টন আমাদের আস্তাবলেই থেকে গেল। মা ওদের দুবেলা খাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন ও দুদিন পরে ডাক্তারবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন এদের চিকিৎসা করতে অনেক দিন লাগবে, তাই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। চিনিবাস পরদিনই তাদের দুজনের হাত ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু হাসপাতাল তখন ভর্তি, তাই সেখানে

তাদের স্থান হল না। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু চিনিবাসকে বললেন— রোজ সকালে একবার করে এদের নিয়ে এসো, নিত্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেব। ঝোট্টন রোজ যেতে রাজি হল, কিন্তু লোট্টন বললে সে রোজ অত দূর হাঁটতে পারবে না। চিনিবাস তখন প্রস্তাব করলে যে, সে লোট্টনকে পিঠে করে রোজ হাসপাতালে নিয়ে যাবে ও ফিরিয়ে আনবে। আর বাস্তবিকই দিন-পনেরো ধরে সে তাই করলে। লোট্টন দু-পা দিয়ে চিনিবাসের কোমর জড়িয়ে ধরত, আর দু-হাত দিয়ে তার গলা। চিনিবাসের এই কার্য দেখে আমরা সকলেই অবাক হতুম। মা বলতেন— চিনিবাস মানুষ নয় দেবতা।

এত করেও কিছু হল না। লোট্টন একদিন রাত্রে শুয়ে সকালে আর উঠল না। চিনিবাসই তার সৎকারের সব ব্যবস্থা করলে। লোট্টনকে মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে, সে পোড়াতে নিয়ে গেল; একা নয়, আর জন-তিনেক জাতভাই জুটিয়ে। মা তার খরচ দিলেন এবং চিনিবাসকে ভালো করে বকৃশিশ দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু এ বিষয়েও উপেনদা তাঁর আপত্তি জানালেন। তাঁর কথা এই যে, লোট্টনের সব খাবার চিনিবাস খেত, আর লোট্টন না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি চিনিবাসকে লোট্টনের খাবার খেতে দেখেছ?" তিনি বললেন, "না, লোট্টনের মুখে শুনেছি।" মা আর কিছু বললেন না।

৪

তার পর সন্ধেবেলায় চিনিবাস লোট্টনের মুখাগ্নি করে ফিরে এল; এসে ঝোট্টনের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। চিনিবাসের চিৎকার শুনে আমি আর উপেনদা আস্তাবলে গেলুম। গিয়ে দেখি চিনিবাস এক-একবার তেড়ে তেড়ে ঝোট্টনকে মারতে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। তার চেহারা ও রকম-সকম দেখে মনে হল, চিনিবাস শ্মশান থেকে ফেরবার পথে তাড়ি খেয়ে এসেছে। শেষটায় বুঝলুম যে ব্যাপার তা নয়। লোট্টনের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, তাই নিয়ে হচ্ছে ঝগড়া। ঝোট্টন বলছে যে, সে যখন লোট্টনের ভাই, তখন সেই ওয়ারিশ। আর চিনিবাস বলছে যে, লোট্টন মরবার আগে তাকে বলে গিয়েছিল যে— আমার যা-কিছু আছে তা তোমাকে দিয়ে গেলুম।

লোট্টনের থাকবার ভিতর ছিল একখানি কম্বল, আর একটি লোটা। ঝোট্টন কম্বল দিতে রাজি ছিল, কিন্তু লোটাটি কিছুতেই দেবে না বললে। কম্বলটি বেজায় ছেঁড়াখোঁড়া, তবে লোটাটা ছিল ভালো। আমি ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলুম। তবে এ মামলার বিচারটা একদিনের জন্য মুলতবি রাখলুম।

৫

তার পরদিন সকালে চিনিবাস এসে বললে যে, কাল রাত্তিরে ঝোট্টন লোটাটা নিয়ে ভেগেছে, আর ফেলে গিয়েছে সেই ছেঁড়া কম্বলখানা। চিনিবাস রাগের মাথায় আরো বললে, "ও শালা চোর হ্যায়, উস্‌কো রাস্তামে পকড়কে মারকে ও-লোটা হাম লে লেগা।"

এ কথায় উপেনদাও রেগে তাঁর হিন্দিতে জবাব দিলেন— "তুমি চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়া থা, না পেয়ে এখন ঝোট্টনকে খুন করতে চাতা হ্যায়। ঐ লোটার লিয়ে তুমি লোটনকো পিঠে করে হাসপাতাল যাতা আতা থা। আর তার মরবার পরও লোট্টনের জাত-বিচার নেই করকে তার মড়া কাঁধে করেছ। তোমি মানুষ নেহি হ্যায়— পশু হ্যায়।"

চিনিবাস জিজ্ঞেস করলে, "মুর্দা কোন্ জাত হ্যায় বাবুজি?"

এর পর চিনিবাস ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল— উপেনদার কটু কথা শুনে নয়, হারানো ধন লোটার দুঃখে।

ইতিমধ্যে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন— এত দুঃখ কিসের?

চিনিবাস বললে, "হামারা জরুকো বোল্‌কে আয়া যো একঠো আচ্ছা লোটা লা দেগা। বেগর লোটা ঘর যানেসে উস্‌কা সাথ লড়াই হোগা। ও ভি হামকো মারেগা, হাম ভি উস্‌কো মারেগা। ওঠো ছোটা জাতকে ঔরৎ হ্যায়, উস্‌কো মারনেসে ও ভাগেগা। তব্ হামারা ভাত কোন্ পাকায়গা? হাম ভুক্‌সে মরেগা।"

এ বিপদের কথা শুনে মা বললেন, "আমি তোমাকে একটা নতুন ঘটি কিনে দেব।"

এ আশা পেয়ে চিনিবাস শান্ত হল।

সমস্যা

এ অকিঞ্চিৎকর ঘটনার গল্প আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এই যে— মা বলেছিলেন চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা। আর উপেনদা বলেছিলেন সে মানুষ নয়, পশু। আমি বহুকাল বুঝতে পারি নি, এঁদের কার কথা সত্য। এখন আমার মনে হয় যে, চিনিবাস দেবতাও নয় পশুও নয়— শুধু মানুষ; যে অর্থে ঝোট্টন-লোট্টনও মানুষ, তুমি-আমিও মানুষ।

আপনারা কি বলেন?

শ্রাবণ ১৩৪৪

মেরি ক্রিস্‌মাস

প্রথম যৌবনে বিলেত গেলে প্রায় সকলেই লভে পড়ে। যারা পড়ে না, তারা দেশে ফিরে এসে বড়োলোক হয়। আমিও পড়েছিলুম। শিশুদের যেমন হাম একবার না একবার হয়, বিলেত গেলে এদেশী নবকিশোরদেরও তেমনি এ জাতীয় চিত্তবিকার ঘটে।

এরূপ কেন হয়— তার বিচার বিজ্ঞান-শাস্ত্রীরা করুন। আমি শুধু যা হয়, তাই বলছি।

এ ঘটনার কারণ অবশ্যই আছে। আমরা গল্প-লেখকেরা যদি সে কারণের বিষয় বক্তৃতা করি, তা হলে সাইকোলজি, ফিজিয়োলজি এবং উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে একসঙ্গে মিলিয়ে ও ঘুলিয়ে যে শাস্ত্র বানানো হয়েছে— যার নাম সেক্সোলজি— তারও অনধিকারচর্চা করব।

এ-সব বিদ্যের পাঁচমিশেলি ভেজাল উপন্যাসে চলে, বিশেষত শেষোক্ত উলঙ্গ শাস্ত্রের ; কিন্তু ছোটো গল্পে চলে না, কেননা তাতে যথেষ্ট জায়গা নেই।

আমরা বিলেত নামক কামরূপ-কামাখ্যায় গিয়ে যে ভেড়া বনে যাই এ কথা শুনে আশা করি কুমারী পাঠিকারা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। বিলেতি মেয়েরা যে রূপে দেশি মেয়েদের উপর টেক্কা দিতে পারে, তা অবশ্য নয়। রাস্তাঘাটে যাদের দুবেলা দেখা যায়, তাদের নিত্য দেখে নারীভক্তি উড়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে দলে পুরু। অবশ্য বিলেতে যারা সুন্দরী তারা পরমাসুন্দরী— মানবী নয়, অপ্সরী। সুখের বিষয় এই অপ্সরীদের সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ বাঙালি যুবকদের ঘটে না। আর আমরাও সে দেশে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে উদ্‌বাহু হই নে।

আমি পূর্বে বলেছি যে, অধিকাংশ দেশি যুবক বিলেতে প্রেমে পড়ে। কিন্তু সকলেই আর কিছু বিলেতি মেয়েদের বিয়ে করে না। নভেল-পড়া দেশি মেয়েরা বোধ হয় বিশ্বাস করেন যে, মানুষ প্রেমে পড়লেই শেষটায় বিয়ে করা স্বাভাবিক। অবশ্য এরকম কোনো বিধির বিধান নেই। প্রেমে পড়াটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ও হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষণ। অপর পক্ষে বিবাহটা হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের মূল ভিত্তি। লোকে প্রেমে পড়ে অন্তরের ঠেলায়— আর বিয়ে করে বাইরের চাপে। প্রেমের ফুল বিলেতি

নভেলে বিবাহের ফলে পরিণত হতে পারে, কিন্তু জীবনে প্রায় হয় না। জীবনটা রোমান্স নয়, তাই তো রোমান্টিক সাহিত্যের এত আদর।

আমি বিলেতে প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিলেতি মেয়েকে বিয়ে করি নি; করেছি দেশে ফিরে দেশের মেয়েকে, আর নির্বিবাদে সস্ত্রীক সমাজের পিতলের খাঁচায় বাস করছি। কপোত-কপোতীর মতো মুখে মুখ দিয়েও নয়, ঠোক্‌রাঠুক্‌রি করেও নয়। কিন্তু সেই আদিপ্রেমের জের বরাবরই টেনে এনেছি— অন্তত মনে।

জনৈক উর্দু বা ফারসি কবি বলেছেন, "উন্‌সে বুতানং বাকী অস্ত্"। অর্থাৎ অন্তরের মনসিজ ভস্ম হয়ে গেলেও, সেই ছাইয়ের অন্তরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বাকি আছে। আমরা হিন্দুরা হলে বলতুম, দগ্ধসূত্রে সূত্রের সংস্কার থাকে। আমার মনে ঐ জাতীয় একটা ভাব ছিল। কখনো কখনো গোধূলিলগ্নে যখন ঘরে একা বসে থাকতুম, তখন তার ছায়া আমার সুমুখে এসে উপস্থিত হত, তার পর অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। বছর চার-পাঁচ আগে শীতকালে বড়োদিনের আগের রাতে মনে হল, সেই বিলেতি কিশোরীটি আমার শোবার ঘরে লুকোচুরি খেলছে— এই আছে, এই নেই। সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না, জেগে স্বপ্ন দেখলুম। স্ত্রীকেও জাগালুম না। সে রাত্তিরে আমার জ্বর হয় নি, কিন্তু বিকার হয়েছিল।

পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হল, দেহ ও মন দুইই সমান বিগড়ে গেছে, আর বিকারের ঘোর তখনো কাটে নি।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি অসুখ করেছে?"

"কেন?"

"তোমাকে ভারি শুকনো দেখাচ্ছে।"

"কাল রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি বলে।"

"তবে কি আজ বেলা সাড়ে নয়টায় থিয়েটারে যাবে?"

"যাব। আর বাড়ি ফিরে দুপুরে নিদ্রা দেব।"

থিয়েটারে যেতে রাজি হলুম— সে আমার শখের জন্য নয়, স্ত্রীর শখের খাতিরে।

আমরা বেলা সাড়ে নটার সময় চৌরঙ্গীর একটা থিয়েটারে গেলুম— কলকাতার শৌখিন সাহেব-মেমদের গান শোনবার জন্য। সে গানবাজনা

শুনে মাথা আরো বিগড়ে গেল। একে বিলেতি গানবাজনা, তার উপর সে সংগীত যেমন বেসুরো তেমনি চিৎকারসর্বস্ব। আমি পালাই পালাই করছিলুম। আমার মন বলছিল— 'ছেড়ে দে মা, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।'

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের বাঁ পাশের সারের প্রথম চেয়ারে বসে আছে আমার আদি-প্রণয়িনী। এ যে সে-ই, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সেই গ্রীসিয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু জাদু। একে দেখে আমার মাথা আরো ঘুলিয়ে গেল। আমার মনে হল— এ হচ্ছে optical illusion; গত রাত্তিরের অনিদ্রা, তার উপর এই বিকট সংগীতের ফল।

একটু পরে থিয়েটারের পরদা পড়ল— কিছুক্ষণ বাদে উঠবে। অমনি সেই বিলেতি তরুণী উঠে দাঁড়ালেন ও আমাকে চোখ দিয়ে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। আমিও আমার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর অনুসরণ করলুম।

বাইরে গিয়ে আমি প্রথমে সিগারেট ধরালুম। তার পর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "আমাকে চিনতে পারছ?"

"অবশ্য। দেখামাত্রই।"

"এতকাল পরে?"

"হাঁ। এতকাল পরেও। আমাকে চিনতে পেরেছ?"

"তোমার তো বিশেষ কোনো বদল হয় নি। ছিলে ছোকরা, হয়েছ প্রৌঢ় এই যা বদল। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। যাক ও-সব কথা। তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"কি কথা?"

"তোমার পাশে কে বসেছিল?"

"আমার স্ত্রী।"

"তোমার আর কিছু না থাক্, চোখ আছে। কতদিন বিয়ে করেছ?"

"বিলেত থেকে ফিরেই, অল্পদিন পরে।"

"আমাকে বিয়ে করলে না কেন?"

"জানি নে। করলে কি হত?"

"তোমার জীবন আরামের হত না। কিন্তু তোমার স্ত্রীর মতো আমারও

আজ রূপ থাকত, প্রাণ থাকত।"

"কেন তুমি তো যেমন ছিলে তেমনি আছ।"

"তার কারণ তুমি তো আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছ তোমার স্মৃতির ছবি।"

"তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি নে।"

"পারবে আমি চলে যাবার সময়।"

"কখন চলে যাবে ?"

"ঐ সিগারেটের পরমায়ু যতক্ষণ, আমার মেয়াদও ততক্ষণ। ও যখন পুড়ে ছাই হবে, তোমার পূর্বস্মৃতিও উড়ে যাবে। তখন দেখবে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরের প্রকৃত রূপ।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "এ রূপ-পরিবর্তনের কারণ কি ?"

"আমি বহুরূপী।"

"তা জানি, কিন্তু সে মনে। দেহেও কি তাই ? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।"

"কবেই বা তুমি বুঝতে পেরেছ ? Prologueএর রূপ আর epilogueএর রূপ কি এক ? তা জীবন-নাটক কমেডিই হোক আর ট্রাজেডিই হোক।"

"তোমার জীবন-নাটক এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি ?"

"গোড়ায় কমেডি, আর শেষে ট্রাজেডি।"

"কথা কইবার ধরন তোমার দেখছি সমানই আছে।"

"তুমি কখনো আমাকে ভালোবাস নি। ভালোবেসেছিলে আমার কথাকে। তাই তুমি আমাকে বিয়ে কর নি। পুরুষমানুষ মেয়ে-পুতুলকে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু গ্রামোফোনকে নয়।"

"আর তোমার কাছে আমি কি ছিলুম ?"

"আমার খেলার সাথি।"

"কোন্ খেলার ?"

"ভালোবাসা-বাসি পুতুল-খেলার। তুমি যখন বিলেত থেকে চলে এলে, তখন দু-চারদিন দুঃখও হয়েছিল— পুতুল হারালে ছোটো ছেলে-মেয়েদের যে-রকম দুঃখ হয়।"

"তার পর আমার কথা ভুলে গিয়েছিলে ?"

"হাঁ, ততদিন যতদিন জীবনটা কমেডি ছিল। আর যখন তা ট্রাজেডি হয়ে দাঁড়াল, তখন আমার মনে তুমি আবার ফিরে এলে।"

"এর কারণ ?"

"সুখে থাকতে আমরা অনেক কথা ভুলে যাই। দুঃখে পড়লেই পূর্বসুখের কথা মনে পড়ে।"

আমি বললুম, "হেঁয়ালি ছাড়ো। ব্যাপার কি ঘটেছিল বলো।"

সে উত্তর করলে— "অত কথা বলবার আবশ্যক নেই। দু কথায় বলছি। তুমি চলে আসবার পরে আমিও বিবাহ করেছিলুম— একটি ধনী ও মানী লোককে। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে আমি একটি পুতুল। পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আমি স্ত্রীলোক হলেও মানুষ। আর আমিও আবিষ্কার করলুম যে, তিনি পুরুষ হলেও সমাজের-হাতে-গড়া একটি পুতুল মাত্র। কাজেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার পর থেকেই সামাজিক ও সাংসারিক হিসেবে আমার অধঃপতন শুরু হল। তার পর দুঃখকষ্টের চরম সীমায় পৌঁচেছিলুম। আর সেই সময়েই তোমার স্মৃতি আবার জেগে উঠল, জলে উঠল। এখন আমি সুখদুঃখের বাইরে চলে গিয়েছি। আবার যখন দেখা হবে সব কথা বলব।"

"আবার দেখা কবে ও কোথায় হবে ?"

"কবে হবে জানি নে। তবে কোথায় হবে জানি। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে। সে দেশে ঘড়ি নেই। কালের অঙ্ক সেখানে শূন্য— অর্থাৎ অনন্ত। সে হচ্ছে শুধু কথার দেশ।"

এর পর সে বললে, "ঐ যে তোমার স্ত্রী তোমাকে খুঁজতে আসছে। আমি সরে পড়ি।"— এই কথা বলবার পরে, পুরাকালে শূর্পনখা যেমন এক মুহূর্তে পরমাসুন্দরীর রূপ ত্যাগ করে ভীষণ রাক্ষসীমূর্তি ধারণ করেছিল, সেও তেমনি নবরূপ ধারণ করে আমার সুমুখে দাঁড়াল। সেটি একটি জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা, পরনে তালিমারা ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক। অথচ তার মুখে চোখে ছিল তার পূর্বরূপের চিহ্ন। যদিচ তার চোখের রঙ এখন ভায়োলেট নয়— ঘোলাটে, আর তার নাক গ্রীসিয়ান নয়, ঝুলে পড়ে রোমান হয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখছি, এমন সময় আমার স্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে রোদে দাঁড়িয়ে কি করছ, তোমার না অসুখ করেছিল ?"

আমি বললুম, "একটা বুড়ি মেম আমাকে এসে জ্বালাতন করছিল ভিক্ষের

জন্য। এই মাত্র চলে গেল।"

"কই আমি তো কাউকে দেখলুম না, বুড়ি কি ছুঁড়ি কোনো মেমকেও। সকাল থেকেই দেখছি কেমন মনমরা হয়ে রয়েছ। সমস্ত রাত্রি ঘুমোও নি, তার উপরে এই দুপুর রোদে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছ। চলো বাড়ি যাই, নইলে তোমার ভির্মি লাগবে।"

"যো হুকুম। চলো যাই।"

"ভালো কথা, আজ তোমার হয়েছে কি?"

"আজ আমার Merry Christmas।"

আশ্বিন ১৩৪৪

ফার্স্ট ক্লাস ভূত

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি, ইস্কুলে পড়তে। কলকাতার ইস্কুল যে মফস্বলের চাইতে ভালো, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। সব ইস্কুলই তেড়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই শিক্ষিত হয় না ; আর যদি কেউ হয়, তা নিজগুণে— শিক্ষা বা শিক্ষকের গুণে নয়। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসবার মাস-তিনেক পরে হঠাৎ সারদাদাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদাদাদা কি হিসেবে আমার দাদা হতেন তা আমি জানি নে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম-সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ি ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মতো দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা-না-একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-ওর বাড়িতে অতিথি হয়েই তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন, আর সব জায়গাতেই আদরযত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ তার উপর কথায়-বার্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হন, মামা হন, দূর সম্পর্কের শালা হন, ভগ্নীপতি হন— সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারো কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটি বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটির নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদাদাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশি হলুম, যদিও ইতিপূর্বে তাঁকে কখনো দেখি নি, তাঁর নামও শুনি নি। আমাদের মনে হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোনো বন্ধুবান্ধবও ছিল না— যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটানো যায়। আর ইস্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাত্তাই-ছেলেদের কথাবার্তার রস কলকাতার দুধের মতোই ছিল— নেহাত জোলো।

সারদাদাদা রোজ সন্ধেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সারদা যা বলে তার ষোলো-আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাই নি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদাদাদা বেশির ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা আমরা মার কাছে ফাঁস করি নি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা নাকি রাত্তিরে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে ভয় পেতেন, তার পর বাবা তাঁর প্রিয় তামাক-ওয়ালার আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। পাছে মা সারদাদাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মার কাছে এ গল্পসাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া কলকাতা শহরে তো ভূতের ভয় নেই। রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ি— জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাক্‌, হল্লা দেদার আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসে না। সারদাদাদা শুধু সেই-সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি তো শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব-ভূত দেখেন নি?"

সারদা-দা উত্তর করলেন— "দেখব কোত্থেকে? সাহেবরা তো আর এ দেশে মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে? দেখো ট্রেনে এত বড়ো বড়ো কলিসান হয়, যাতে হাজার হাজার দেশি লোক মরে; কিন্তু তাতে কোনো সাহেব মরেছে এমন কথা কি কখনো শুনেছ?"

"তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে?"

"সব ফিরিঙ্গি। তবে দু-চারজন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছি নে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয় তাদের দেখা আমরা পাই নে।"

"কেন?"

"এ দেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে চড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়।"

"আমরা সেই সাহেব-ভূতের গল্প শুনতে চাই।"

সারদা-দা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা, বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বোলো না।"

"কেন?"

"কি জানি আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই! মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই।"

এর পর সারদাদাদা বললেন—

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া স্টেশনে যখন পৌছলুম, তখন গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে, পরের স্টেশনে নেমে থার্ড ক্লাসে ঢুকব। গাড়ি তো ছাড়ল, অমনি বাথরুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগ্‌লির মতো। আর তার সর্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরোচ্ছে, আর সে বিলেতি মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে, "কালা আদমি নিচু যাও।" আমার তখন ভয়ে নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, "হুজুর আভি কিস্তরে নিচু যায়েগা? দুসরা স্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে।" তিনি বললেন— "ও নেহি হো সক্‌তা। তোমারা কাপড়া বহুত ময়লা আর তোমারা দেহ্‌ মে বহুত বদ্‌বু। গোসলখানামে যাকে তোমারা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আওর হুঁই বৈঠ্‌ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোসলখানাসে নিক্‌লিয়ো। হাম যো বোল্‌তা আভি করো, জান্‌তা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায়?" আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম, অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দমকা হাওয়া এসে কাপড়চোপড় সব উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় হুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে আমার প্রতি শুয়োর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি হি করে কাঁপছি, সর্বাঙ্গে এক টুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড়োসাহেব মদ

খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন।

মাঝপথে গাড়ি হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামল। ক্লিক্ করে একটা আওয়াজ হল— ছিট্‌কিনি খোলবার আওয়াজ। তার পর গাড়ি ফের চলতে লাগল। পাশের ঘরে টুঁ শব্দ নেই; তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা করলুম। ও সর্বনাশ! বড়োসাহেব স্নানের ঘরের দুয়োরের ছিট্‌কিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধকূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ি বর্ধমানে এসে পৌছল, আর আমি বাথরুমের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা থাকে কপালে ভেবে 'কুলি' 'কুলি' বলে চিৎকার করতে লাগলুম। তার পর একজন কুলি এসে, ছিট্‌কিনি খুলে, আলো জেলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল। শেষটায় স্টেশনমাস্টারবাবু এসে— "ভূত নেহি হ্যায়, চোর হ্যায়" বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে প্ল্যাটফরমের উপর টেনে নিয়ে গেল।

স্টেশনবাবু বললেন, "শিগ্‌গির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে। যদি কোনো মেমসাহেব হঠাৎ এসে উলঙ্গমূর্তি দেখে মূর্ছা যান তা হলে আমার চাকরি যাবে।" একজন যাত্রী আমাকে একটি শাড়ি দিলে, সেই শাড়িখানি পরে আমি স্টেশনবাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন যে রেলের বড়োসাহেব এখন সিমলায়; তা ছাড়া এ ট্রেনে কোনো সাহেব আসেও নি, কোথাও নেমেও যায় নি।

এখন বুঝলুম, যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়— সাহেবের ভূত।

তার পর স্টেশনবাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম একপত্তন মার হল, তার পর দারোগাবাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকেও বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে পড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর; আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত। তিনি গাড়িতে ভূতের উপদ্রবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি ছিলেন ঘোর থিয়োজফিস্ট।

কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না। ভগবান ও ভূত এ দুয়ের অস্তিত্ব বে-আইনী। অগত্যা তিনি আমাকে এক মাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তার পর আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে— গাঁজা খাও তো খেয়ো; কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনো বিনা টিকিটে ট্রেনে চোড়ো না; বিশেষত তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্স্ট ক্লাসে তো নয়ই।

আমি বললুম, "হুজুর, গাঁজা আমি খাই নে।"

তিনি বললেন, "গাঁজাখোর বলেই তো তোমাকে লঘু দণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ করতুম।"

এখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাস ভূতের কথা তো শুনলে। এদের তুলনায় পাড়া-গেঁয়ে ভূতেরা ঢের বেশি সভ্য।

আশ্বিন ১৩৪৪

সল্পগল্প

এ গল্প আমি আমার আকৈশোর বন্ধু কুমার-বাহাদুরের মুখে শুনেছি। যাঁকে আমি কুমার-বাহাদুর বলছি, তিনি রাজপুত্র ছিলেন না; ছিলেন শুধু একটি পাড়াগেঁয়ে মধ্যবিত্ত জমিদারের একমাত্র সন্তান। তাঁর নাম ছিল কুমারেশ্বর, তাই কলেজে তাঁর সহপাঠীরা মজা করে তাঁকে কুমার-বাহাদুর বলে ডাকতেন। এই নামটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

শুধু কুমার নামটা কেমন নেড়া নেড়া শোনায়— ওর পিছনে 'বাহাদুর' লেজুড়টা জুড়ে দিলে নামটাও যেমন ভরাট হয়, কানও তেমনি সহজে তা গ্রাহ্য করে; কেননা, কান তাতে অভ্যস্ত।

কুমার-বাহাদুরও এই ডাকনামে কোনো আপত্তি করেন নি। পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা কে প্রত্যাখ্যান করে— বিশেষত যে জিনিস দাম দিয়ে কিনতে হয়, তা অমনি পেলে কে না খুশি হয়?

যদিও তিনি জানতেন যে, ও নামের ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে; যে খোঁচা— যাদের খেটে খেতে হবে তারা, যাদের তা করতে হবে না তাদের গায়ে বিঁধিয়ে সুখ পায়। ও একরকম কথার চিম্‌টি কাটা।

কুমার-বাহাদুরের sense of humour দিব্যি সজাগ ছিল, তাই তিনি ছোটোখাটো অনেক কথা ও ব্যবহার— ঈষৎ বিরক্তিকর হলেও ছোটো বলেই হেসে উড়িয়ে দিতেন; যেমন আমরা গায়ে মাছি বসলে, তাকে উড়িয়ে দিই। পরশ্রীকাতরতার উৎপাত মানুষমাত্রকেই উপেক্ষা করতে হয়, নইলে মানবসমাজ হয়ে উঠত একটা যুদ্ধক্ষেত্র। বলা বাহুল্য শ্রী মানে শুধু রূপ নয়, গুণও বটে; শুধু লক্ষ্মী নয়, সরস্বতীও বটে।

তিনি বি. এ. পাস করবার পরে, অর্থাৎ কলেজ ছাড়ার পর বেশির ভাগ সময় দেশেই বাস করতেন। পাড়াগাঁয়ে নাকি সময় দিব্যি কাটানো যায়— শিকার করে ও বিলেতি নভেল পড়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পয়লা নম্বরের বন্দুক ও নভেল শুধু বিলেতেই জন্মায়। সেইসঙ্গে জমিদারি তদারক করতেন। দেশে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিত, তখন তিনি তীর্থযাত্রা করতেন— ঠাকুর দেখবার জন্য নয়, ঠাকুরবাড়ি দেখবার জন্য। দেবদেবীর ভক্ত তিনি ছিলেন না; ছিলেন architecture-এর অনুরক্ত। এও একরকম বিলেতি শখ। তাঁর

জমিদারির আয়ে এ-সব শখ সহজেই মেটাতে পারতেন। আর কলকাতায় যখন আসতেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা করতেন। কেননা, ইতিমধ্যে আমি হয়ে উঠেছিলুম তাঁর friend, philosopher and guide।

কিছুদিন পূর্বে কুমার-বাহাদুর হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন যা কথাবার্তা হল— তাই আজ বলছি। এই কথোপকথনকেই আমি পূর্বে বলেছি— গল্প। কিন্তু তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর যার নায়ক স্বয়ং তিনি, সে ঘটনা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তা অবলম্বন করে একটি ছোটো গল্পও গড়ে তোলা যায় না। তবে তিনি তাঁর মনের গোপন কথা এত মন খুলে বলেছিলেন যে, আমার মনে সেটি গেঁথে গিয়েছে। কুমার-বাহাদুর তুচ্ছ জিনিসকে উপেক্ষা করতেন, কিন্তু সেদিন দেখলুম তিনি একটি তুচ্ছ ঘটনাকে খুব বড়ো করে দেখেছেন, বোধ হয় সেটি নিজের কীর্তি বলেই।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন আছ?"

"ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। শরীর ভালো কিন্তু মন খারাপ।"

"মন খারাপ কিসে হল?"

"অর্থাভাবে।"

"তোমার অর্থাভাব!"

"হাঁ, তাই। এখন থেকে আমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে— এই ভয়ে মনটা মুষড়ে গিয়েছে।"

"তোমাকে ভিক্ষে করতে হবে!"

"ভয় নেই! তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসি নি। তুমি সাহিত্যিক, দেবে কোত্থেকে?"

"রসিকতা করছ?"

"না, আমি সত্যসত্যই প্রায় নিঃস্ব হয়েছি। এখন বেঁচে থাকতে হলে, পরের অনুগ্রহে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে— যার শ্রুতিকটু নাম হচ্ছে ভিক্ষে করা। যদিচ অনেকেই তা করে। কেউ করে সরকারের কাছে মানভিক্ষা; কেউ করে রমণীর কাছে প্রেমভিক্ষা; আবার কেউ করে গুরুর কাছে জ্ঞানভিক্ষা। আমি মনে করেছি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে এখন থেকে করব মুষ্টিভিক্ষা।"

"আচ্ছা, তা যেন হল, তোমার সম্পত্তি কি সব উড়িয়ে দিয়েছ ?"

"না, গোরু এখনো গোয়ালে আছে, কিন্তু দুধ দেয় না। অর্থাৎ জমিদারির স্বত্ব আছে, কিন্তু উপস্বত্ব নেই।"

"কারণ ?"

"Economic depression।"

"তা হলেও তো কর্জ করতে পার।"

"কর্জ দেয় ধনীলোকে, আর নেয় ধনীলোকে। ও একরকম স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে জুয়োখেলা। ভিক্ষে করে শুধু গরিব লোকে ; আর আমি এখন গরিব হয়েছি। সুতরাং ও জুয়োখেলায় যোগ দেবার আমার আর অধিকার নেই। যে সম্পত্তি আজ আছে, তা হয়তো সদর খাজনার দায়ে কাল বিকিয়ে যাবে। এমন সম্পত্তি রেহান রেখে কে কর্জ দেবে ? আর তা ছাড়া মহাজনদের অবস্থাও তথৈবচ।"

"তা হলে ধারও করতে পারবে না ?"

"না। কর্জের পথ বন্ধ বলেই তো ভিক্ষের পথ ধরব মনে করছি। ইংরেজিতে একটা মহাবাক্য আছে— Beg, borrow or steal।"

"তাই বুঝি beg করাটাই শ্রেয় মনে করেছ ?"

"উপায়ান্তর নেই বলে। যদিচ জানি তাতে বিশেষ কোনো ফল হবে না। সামাজিক লোকের ভিতর fraternity নেই। Equalityও নেই, পরে হবে যখন তারা libertyতেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। Dictator মানুষকে লেশমাত্র liberty দেন না।"

"তা হলে borrow করতে পারবে না, beg করেও কোনো ফল হবে না। তবে করবে কি ?"

"Steal আমি করব না। জন্মের মধ্যে কর্ম একবার করেছিলেম, তাতেই মনটা তিতো হয়ে রয়েছে।"

"চুরি করেছিলে তুমি !"

"হাঁ। এখন সেই চুরির মামলা শোনো।"

২

আমি সেকালে একবার দার্জিলিং যাচ্ছিলুম— পুজোর পর বোধ হয় অক্টোবর মাসের শেষ হপ্তায়। পাগ্‌লা ঝোরার কাছে এসে দেখি, সে যেন বাস্তবিকই ক্ষেপেছে— লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, গর্জাচ্ছে— আর আমাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। শুনলুম ট্রেন আর বেশি দূর এগোতে পারবে না। রেলের রাস্তা নাকি অতিবৃষ্টিতে খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। এ গাড়ি ছেড়ে খানিকটা হেঁটে মহানদীতে গিয়ে অন্য গাড়িতে উঠতে হবে। করতে হলও তাই। খানিক ক্ষণ বাদে নামতে হল, তার পর জলকাদার ভিতর দিয়ে আধ মাইল পথ পদব্রজে উত্তীর্ণ হয়ে মহানদীতে এসে আর-একটি খালি গাড়িতে চড়লুম। আমি একা নয়— সঙ্গে ছিল অনেক সাহেব মেম।

সে গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখি জনৈক পল্টনী সাহেব আগেভাগে সেখানে অধিষ্ঠান হয়েছেন। এতে অবশ্য আমি খুশি হলুম না। মেমেরা যেমন কালা আদমীদের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠতে ভালোবাসেন না— আমরাও তেমনি সাহেবসুবোদের সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে আসোয়াস্তি বোধ করি। রঙের তফাতে যে মানুষে মানুষে কত তফাত হয়, তা তো তুমি জান। কিন্তু অগত্যা সেই গাড়িতেই উঠে পড়লুম। সেটা ছিল ফার্স্ট ক্লাস, আর আমার পকেটেও ছিল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট। এক পা কাদা নিয়ে ঢুকতে ঈষৎ ইতস্তত করছিলুম। কিন্তু চোখে পড়ল যে সাহেবটির পদযুগলও তদবস্থ। তাঁর পা আমার চাইতে ঢের বড়ো, জুতোও সেই মাপের; সুতরাং কর্দমাক্ত হয়েছে তদনুরূপ। ট্রেনে চড়ার পর মাঝপথে গাড়ি থেকে নেমে কিছুদূর পায়ে হেঁটে, আবার নতুন গাড়িতে চড়া কষ্টকর না হলেও বিরক্তিকর। আগের গাড়িতে মালপত্র যেমন সুব্যবস্থিত থাকে, পরের গাড়িতে *ঠিক* তা থাকে না; সবই ভেস্তে যায়। যা ছিল চড়বার গাড়িতে, তা মালগাড়িতে চলে যায়; আর কোনো কোনো জিনিস মালগাড়ি থেকে বসবার গাড়িতে বদলি হয়। এতেই মন খিঁচড়ে যায়। ছোটোখাটো অসুবিধে আসলে মস্তবড়ো অসুবিধে। আমি মুখের ঘাম মুছতে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটি রুমাল বার করতে গিয়ে দেখি সেটি অদৃশ্য হয়েছে। তাই কি করি— ভিজে মুখ ভার করে বসে থাকলুম। চারি পাশ কুয়াশার খদ্দরে ঢাকা; তাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার চোখে পড়ল না। যদিচ এই পথটুকুর চেহারা অতি

চমৎকার। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড গাছ, যাদের একটিরও নাম জানি নে; অথচ দেখতে বড়ো ভালো লাগে। পৃথিবীতে অনেক জিনিসের নামই তার রূপ দেখতে দেয় না। কার্সিয়ং পৌঁছবার কথা বেলা এগারোটায়— কিন্তু বেলা একটা বেজে গেল, তখনো গাড়ি সে স্টেশনে পৌঁছল না। সেদিন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেজায়। একে বেলা হয়েছে, তার উপর আধ মাইল কাদার মধ্যে পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়েছে। তাই কার্সিয়ং পৌঁছেই স্টেশনে রেস্তোরাঁতে খেতে গেলুম। এক পেট মাছমাংস খেয়ে যখন গাড়িতে ফিরে এলুম, তখন গাড়ি ছাড়বার বড়ো দেরি নেই। গাড়িতে ফিরে এসে দেখি আমার সিগারেট-কেসে একটিও সিগারেট নেই— ইতিমধ্যে সব ফুঁকে দিয়েছি। আর আমি রেস্তোরাঁ থেকেও সিগারেট কিনি নি, কারণ আমি জানতুম আমার হ্যাণ্ডব্যাগে একটি পুরো সিগারেটের টিন আছে। শুধু ভুলে গিয়েছিলুম যে— হ্যাণ্ডব্যাগটি হারিয়েছে। একটি সিগারেটের অভাবে আমার প্রাণ আই-ঢাই করতে লাগল। সিগারেটের নেশা গাঁজাগুলিচরসভাঙের মতো নয়, কিন্তু নেশা মানে যদি মৌতাত হয়— তা হলে এ মৌতাত ইয়াদী। যদি মনে হল যে সিগারেট খাব, তখন তা না পেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। চোখে পড়ল সুমুখের বেঞ্চে সাহেবের একটি খোলা টিন আছে, আর সাহেব তখনো গাড়িতে এসে ঢোকেন নি, রেস্তোরাঁতে বসে হুইস্কি পান করছেন। এই সুযোগে আমি অনেক ইতস্তত করে সাহেবের টিন থেকে একটি সিগারেট চুরি করলুম। আর গাঁজার কল্কেয় গেঁজেল যে ভাবে দম দেয়, সেই ভাবে কষে দম দিয়ে দু চার টানে সিগারেটটি ফুঁকে দিলুম। তার কারণ সাহেব এসে যদি দেখেন যে সিগারেট খাচ্ছি, তা হলে হয়তো আমার চুরি বমাল ধরা পড়বে। যদিচ ধোঁয়া দেখে অথবা শুঁকে কেউ বলতে পারে না সিগারেটটি কার। কিন্তু অন্যায় কাজ করলে এমনি অনর্থক ভয় হয়। তা যে হয়, তা সেকালের লোকরাও জানতেন। মৃচ্ছকটিকে শর্বিলক বসন্তসেনার গহনা চুরি করে এমনি অকারণ ভয় পেয়েছিল; তার স্বগতোক্তি এই— স্বৈর্দোষৈর্ভবতি হি শঙ্কিতো মনুষ্যঃ। লোকে বলে চুরি বিদ্যে বড়ো বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও— চুরি করলে ভদ্রলোকের মনের শান্তিভঙ্গ হয়। সে যাই হোক, আমি ধোঁয়ার শেষ ঢোক গিলেছি, এমন সময় সাহেবটি এসে তাঁর স্থান অধিকার করলেন। যখন

তিনি খানাপিনা করে ফিরে এলেন, তখন দেখি তাঁর যে মুখ ছিল সাদা তা হয়েছে লাল— ক্রোধে নয়, মদে। তিনি ফিরে এসেই তাঁর টিন থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "try one of mine ; you may like it."

আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম যে, "আমি নিজে থেকেই চা'ব মনে করেছিলুম।"

"কেন?"

"আমার সিগারেটের টিন হারিয়ে গেছে— আর আমি বসে বসে আঙুল চুষছি।"

"কি সর্বনাশ! দেও তোমার কেস্— আমি সেটি ভরে দিচ্ছি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর দান প্রসন্নমনে গ্রহণ করলুম।

গাড়ি দার্জিলিঙের অভিমুখে রওনা হলে পর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হল— প্রধানত দার্জিলিঙের আবহাওয়ার বিষয়। কথায় কথায় শিকারের কথা এসে পড়ল। আমিও অকারণ পশুপক্ষী গুলি করে মারি শুনে, তিনি আমাকে তাঁর জাতভাই মনে করে মহা খাতির করতে লাগলেন। আর বললেন, "তোমরা যদি সব শিকারী হয়ে ওঠ, তা হলে বাঙালিরা আমাদের কাছে অত নগণ্য হয়ে থাকবে না।" আমি বললুম, "তার আর সন্দেহ কি?" যদিচ মনে মনে তাঁর কথায় সায় দিলুম না।

আর-একটু এগিয়ে দেখি যে, টুং ও সোনাদার মধ্যে রাস্তা এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল, আর সদ্য মেরামত হয়েছে। তাই ট্রেন পা টিপে টিপে চলতে আরম্ভ করলে। আগে ছুটেছিল ঘোড়ার মতো এখন তার হল গজেন্দ্রগমন। পাহাড়ী মেয়েরা দশবারো মণ ওজনের পাথর সব পিঠে ঝুলিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে আসছে ও পথের ধারে জড় করছে— আর সেই সঙ্গে মহা ফুর্তি করে গান গাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে এদের এই ব্যবহার দেখছি দেখে সাহেব বললেন, "এরা সব সিপাহীদের মা, বোন ও স্ত্রী। এদের হাড় এত মজবুত না হলে কি বেঁটেখাটো গুর্খারা এমন মজবুত সিপাহী হতে পারত?"

তার পর একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের পাহাড়ী মেয়ে গাড়ির কাছে এসে বললে, "সাহাব, একঠো সিগারেট মাঙতা।" সাহেব তিলমাত্র দ্বিধা না করে তাকে একটি সিগারেট দিলেন। মেয়েটি অমনি আহ্লাদে হেসেই অস্থির।

তার পর সাহেব বললেন, "পাহাড়িদের আর-একটা মস্ত গুণ এই যে, এরা ছিঁচ্‌কে চোর নয়। আমি কার্সিয়ঙে গাড়িতে একটা খোলা টিন রেখে গিয়েছিলুম এই ভরসায় যে, এরা তার একটিও ছোঁবে না। ছিঁচ্‌কে চুরিতে ওস্তাদ হচ্ছে উড়েরা— coward-এর জাত কিনা।"

কথাটা আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধল, কিন্তু আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলুম না যে, আমিও তো তাই করেছি। বাধল আমার self-respectএ, কিন্তু মনে মনে নিজের উপর ঘোর অভক্তি হয়ে গেল।

তার পর থেকেই মনস্থির করেছি যে, যদি beg করতে হয় তাও স্বীকার; কিন্তু steal আর প্রাণ থাকতে করব না। চুরির সুবিধে এই যে, তা গোপনে করা যায়, আর beg করতে হয় প্রকাশ্যেই। শাস্ত্রে বলে, 'ন গুপ্তিরণৃতং বিনা'; এই তো মুশকিল। একবার চুরি করলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে তা গোপন রাখতে হয়। মিথ্যে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার ধাতে নেই— এক মজা করে ছাড়া। তাই এখন থেকে ভিক্ষে জিনিসটে এস্তমাল করব।

এই বলে তিনি একটু হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলেন, "সাহাব, একঠো সিগ্‌রেট মাঙতা।"

আমিও একটু হেসে তাঁকে একটি সিগারেট দান করলুম।

তিনি তার নাম পড়ে বললেন, "না থাক্। যে সিগারেট একবার চুরি করে খেয়েছি, সেই সিগারেট আবার ভিক্ষে করে খাব না।"

এর পর তিনি নিজের পকেট থেকে সোনার উপর নীল মিনে-করা একটি জমকালো কেস বার করে একটি সিগারেট নিজে নিলেন, অপরটি আমাকে দিলেন এই বলে—"Take one of mine; you may like it."

আমি সেটি নিয়ে তাঁর কেসটার উপর নজর দিচ্ছি লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "এটি আমি বেচব না, জমিদারি বিকিয়ে গেলেও যোগ্যপাত্রে দান করব—অর্থাৎ সেই লোককে, যে ওটি ব্যবহার করবে না, শুধু বাক্সে বন্ধ করে রাখবে।"

এই কথার পর তিনি নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে গাত্রোত্থান করলেন।

আমি বুঝতে পারলুম না তাঁর গল্প সত্য, না বানানো। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, কুমার-বাহাদুর যদি ফকিরও হন, ভিখারি তিনি কখনো হতে পারবেন না অমন দুগ্ধপোষ্য মন নিয়ে।

আষাঢ় ১৩৪৫

জুড়ি দৃশ্য

প্রথম ধাক্কা

আমি যখন নেহাৎ ছোকরা তখন কলকাতায় প্রথম পড়তে আসি। নেহাৎ ছোকরা বলছি এইজন্যে যে, তখন আমি তেরো পেরিয়েছি, কিন্তু চৌদ্দতে পৌঁছই নি।

থাকতুম কায়ক্লেশে বৈঠকখানাবাজার রোডে একটি ভাড়া-বাড়িতে। বাড়িটা মন্দ নয়, কিন্তু ছোটো।

ছেলেবেলা থেকে পাড়াগাঁয়ে যে বাড়িতে মানুষ হয়েছি, সে বাড়িতে ছিল দেদার পোড়ো জমি। সুতরাং বায়ুভুক আমাদের ভূমিশূন্য বাড়িতে কায়ক্লেশেই থাকতে হত।

বাবা তখন থাকতেন পশ্চিমে চাকরির খাতিরে।

একদিন বাবা না-বলা-কওয়া হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। আমরা তাঁকে দেখে খুশি হলুম, কিন্তু একটু চমকে উঠলুম। আদালত খোলা— এ অবস্থায় তিনি এলেন কি করে ও কিসের জন্যে বুঝতে পারলুম না। শুনলুম রানীমার এক জরুরি তার পেয়ে বাবা তিন-চার দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছেন। রানীমা ছিলেন আমাদের স্বজাত গেরস্তের মেয়ে, বাবার মাতৃস্থানীয়া। তাঁর জোর তলব তিনি অমান্য করতে পারেন না। আহারান্তে তিনি উত্তরবঙ্গের ট্রেনে চলে গেলেন আর পরদিনই ফিরে এলেন— রানীমার কাছে অজস্র ভর্ৎসনা খেয়ে। এ কথা এখানে উল্লেখ করবার কারণ এই যে, বাবা হাসিমুখে ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু মন ভার করে। বাবার অপরাধ দাদাকে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলেন। রানীমার মতে বিলেত যাওয়াও যা, আন্দামান যাওয়াও তাই। কালাপানি পার হয় শুধু কুলাঙ্গাররা।

২

তার পরদিন সকালে বাবা বললেন, "আজ বিকেলে জয়ন্তীবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাব।" পঁচিশ বৎসর পূর্বে তাঁর সঙ্গে বাবার শেষ দেখা।

জয়ন্তীবাবুর নাম আগে শুনেছি, কিন্তু তিনি কে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানতুম

না। তিনি আমাদের দূরসম্পর্কীয়ও কেউ নন। জয়ন্তীবাবু কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ। তিনি কলকাতার আদিবাসী, আমরা পদ্মাপারের বাঙাল।

বাবা কৈশোরে সেকালের হিন্দু কলেজে পড়তেন, তার পর প্রথম যৌবনে নিজেদের জমিদারি মামলা মোকর্দমার তদ্‌বির হাইকোর্টে করতেন, এবং সেই সঙ্গে রানীমারও। জয়ন্তীবাবু ছিলেন বাবার বড়ো ইংরেজ ব্যারিস্টারের বাবু, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়। বাবা তাঁকে বড়ো ভালো লোক বলেই জানতেন। যদিও সেই মামলায় বাবা সর্বস্বান্ত হন, তবুও জয়ন্তীবাবুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। বিশ-পঁচিশ বৎসর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি, তবুও বাবার মনে তাঁর সব পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। বোধ হয় রানীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার ফলে।

জয়ন্তীবাবুর কোন্ রাস্তায় বাড়ি বাবা তার নাম জানতেন, কিন্তু বাড়ির নম্বর জানতেন না। বিকেলে আমি ঠিকে গাড়িতে বাবার সঙ্গে শোভাবাজার স্ট্রীটে গেলুম। আমিই ছিলুম বাবার ইঁচড়ে-পাকা ছেলে, তাই আমিই হলুম তাঁর পথ-প্রদর্শক ; যদিচ সে অঞ্চলে আমি পূর্বে কখনো যাই নি, পরেও নয়। এ কালে আমাদের পলিটিক্যাল নেতারা যেমন মুক্তি কোন্ পথে জানেন না, অথচ আমাদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক হন !

৩

বাবা একখানা বাড়ি দেখে বললেন, এই জয়ন্তীবাবুর বাড়ি। বাড়িটি বড়ো এবং কেতা-দুরস্ত। পাড়ার লোককে জিজ্ঞেস করে শুনলুম বাড়ি এককালে ছিল জয়ন্তীবাবুর, এখন হয়েছে অন্যের। জয়ন্তীবাবু শুনলুম বেঁচে আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তা কেউ বলতে পারে না। পাড়ার একটি মুদি বলল, তাঁর ভাই কুলদাবাবু বিডন স্ট্রীটে থাকেন, তাঁর কাছে গেলেই জয়ন্তীবাবু কোথায় থাকেন জানতে পারবেন। মুদি-ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে কুলদাবাবুর বাড়ির ঠিকানা বলে দিলেন। তার পর একটু হাসলেন। আমরা ফিরতি বেলায় কুলদাবাবুর বাড়িতে গেলুম। মস্ত দোতলা বাড়ি, বিডন পার্কের ঠিক উল্টো দিকে। সে তো বাড়ি নয়, ইটের পাঁজা।

আমরা তার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সামনে যাকে দেখলুম তাকে কুলদাবাবুর কথা জিজ্ঞেস করতে সে একতলায় একটি কামরা দেখিয়ে দিল। আমি ঘরে

ঢুকেই চমকে উঠলুম। এমন এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরে যে মানুষ বাস করতে পারে, আমার পূর্বে সে জ্ঞান ছিল না। ঘরখানার যেন গলিত কুষ্ঠ হয়েছে। দেয়াল থেকে চুন-বালি সব খসে পড়েছে, আর মধ্যে মধ্যে বড়ো বড়ো ফোস্কার মতো ফুলে উঠেছে। আর দুর্গন্ধ অসাধারণ। সেকালে কলকাতা শহরে ঢুকতেই যে পাঁচমিশেলী গন্ধ নাকের ভিতর দিয়ে পেটে ঢুকত আর গা পাক দিয়ে উঠত, সেই গন্ধ যেন এ ঘরে জমাট বেঁধেছে। হাওয়া সে ঘরে দক্ষিণের জানালা দিয়ে ঢুকতে পারে, কিন্তু বেরোবার পথ নেই। মেঝে কেন ভিজে, বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় ইঁদুর ও ছুঁচোর প্রস্রাবে সিক্ত। মনে হল বাড়িটি রোগ ও মৃত্যুর ডিপো। এখানে মানুষ আসে মরতে, বাঁচতে নয়।

৪

তার পর তাকিয়ে দেখি যে, ঘরের এক কোণে দড়ি দিয়ে ছাওয়া একটি মড়াফেলা খাটিয়ার উপর লাল খেরো-মোড়া ইটের মতো তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে একটি ত্রিভঙ্গ লোক শুয়ে কিম্বা বসে ডাবা হুঁকোয় কষে দম মারছেন। প্রথমেই নজরে পড়ল, লোকটা আগে ছিল সুপুরুষ, এখন হয়েছে সেই জাতীয় কুপুরুষ যাকে দেখলে লোক আঁৎকে ওঠে।

আমাদের পায়ের আওয়াজ শুনে লোকটি চোখ বুঁজে নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে "কে ও" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

বাবা নিজের নাম বললেন। শুনে ভদ্রলোক উত্তর করলেন, "চৌধুরী মশায়! নমস্কার। ডান পাটা জখমী, তাই উঠে পায়ের ধুলো নিতে পারলুম না। মাফ করবেন। দাদার খোঁজে বোধ হয় এসেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই।"

"মামলা করবার শখ এখনো আছে? দাদা তো আপনাকে সর্বস্বান্ত করেছেন। এখন আবার কি নিয়ে মামলা?"

"আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি বটে, কিন্তু তার জন্যে দায়ী তো জয়ন্তীবাবু নন। তিনি ছিলেন অতি সৎ লোক।"

"আর সেই সঙ্গে ছিলেন অতি নির্বোধ। বোকা আর বজ্জাত দুই সমান সর্বনেশে জন্তু। দাদার সঙ্গে আমার তফাৎ কি জানেন? আমার রক্তে আছে

এলকোহল ও দাদার আছে আফিং।"

"ভয় নেই, আমি ফের মামলার তদ্‌বির করতে আসি নি, এসেছি শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আছেন কেমন?"

"শুনেছি মন্দ নয়। তাঁকে দেখি নি।"

"দেখেন নি কেন?"

"দেখতে পাই নে বলে। আমি এখন অন্ধ।"

"চোখ হারালেন কবে?"

"আন্দামানে।"

"আপনি আন্দামানে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলুম হাওয়া বদলাতে। আর সেখানে ছিলুম দশটি বৎসর। সম্প্রতি ফিরেছি, আর আছি এই রাজপ্রাসাদে।"

"এ ঘর তো রাজপ্রাসাদ নয়, অন্ধকূপ!"

"অন্ধের কাছে সবই Black-hole, যায় লাটসাহেবের নাচঘর।"

"তা ঠিক।"

"তাতে কোনো দুঃখ নেই। গতস্য শোচনা নাস্তি।"

"সেখানে দেখলেন কি?"

"নরক গুলজার।"

"আর?"

"দেশটা বিলেতের ছোটো ভাই।"

"অর্থাৎ?"

"সে দেশে জাতিভেদ নেই, বাল্যবিবাহ নেই, বহুবিবাহ নেই— আছে শুধু বিধবাবিবাহ। সব মেয়েরাই স্বয়ম্বরা হয়। বিয়ে সেখানে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যাঁরা দেশি সমাজকে বিলেতি সমাজ করতে চান— আন্দামান তাঁদের জ্যান্ত আদর্শ।"

"এ আদর্শ সমাজ থেকে আপনার কিছু লাভ হল?"

"লাভ হয়েছে এই যে, হারিয়ে এসেছি একটি পা, চোখ দুটি, মিষ্টি কণ্ঠ, মিষ্টি কথা আর ভগবানে বিশ্বাস।"

তার পর তিনি বললেন, "May I speak to you in English?"

"Certainly."

"Can you lend me five rupees ?"

"Of course."

"Payable when able "

"That is understood."

এর পর বাবা কুলদাবাবুকে পাঁচটি টাকা দিতে তিনি বললেন, "Thank you."

৫

নিমতলা ঘাটের সেই waiting-room থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, এবং ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠলুম জয়ন্তীবাবুর বাসায় যেতে হবে ভেবে। আমার পরিচিত সেই গলিটির মতো পচা ও নোংরা গলি কলকাতায় আর দ্বিতীয় ছিল না, এখনো বোধ হয় নেই। সে তো গলি নয়, একটি সুড়ঙ্গ বিশেষ। ঠিকে গাড়ি সে রাস্তায় কি করে ঢুকতে পারল, বুঝলুম না।

ইংরেজিতে বলে, Where there is a will there is a way। কোচম্যান মিঞা দুপাশের বাড়িতে ধাক্কা খেতে খেতে আমাদের জয়ন্তীবাবুর বাসায় পৌঁছে দিল।

একটি দাঁড়িগোঁফওয়ালা ভদ্রলোক দুয়োরে এসে আমাদের উপরের ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকেই আমার মনের মেঘ কেটে গেল। গলিটি যেমন কদর্য— ঘরটি তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে একখানি ধবধবে জাজিম পাতা, তার এক কোণে একটি ভদ্রলোক একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গলায় কাঠের মালা, নাকে তিলক, দাড়িগোঁফ কামানো, মাথার চুল পাকা। এমন বিষণ্ণ অবসন্ন নির্বিকার মূর্তি কদাচ দেখা যায়। তিনি একটি বিদরির ফর্সিতে তামাক খাচ্ছিলেন। বাবা আমাকে আস্তে আস্তে বললেন, "ইনিই জয়ন্তীবাবু।"

৬

জয়ন্তীবাবু বাবাকে দেখেই বললেন, "নমস্কার চৌধুরীমশায়! বসুন। কোমরে বাত, তাই উঠে পায়ের ধুলো নিতে পারলুম না। মাফ করবেন। কেমন আছেন?"

"দেখতে তো পাচ্ছেন।"

"শরীর দেখছি ভালোই আছে, কিন্তু সেকালের সে রূপ নেই। কী তেজস্বী চেহারা ছিল আপনার, সে তেজ আজ নেই।"

"তেজ-টেজ যা ছিল সব গেছে গভর্নমেণ্টের নোকরি করে। তাইতে ছেলেদের বলেছি, কখনো সরকারের চাকরি কোরো না। ও যন্ত্রের ভিতর পড়লে একদম পিষে যাবে।"

"তা হলে আপনার এখনো কিছু আছে। আমি তো জানতুম, আমরাই আপনাকে সর্বস্বান্ত করেছি।"

"সর্বস্বান্ত অবশ্য হয়েছি, কিন্তু তার জন্যে আপনারা দায়ী কিসে?"

"আমরাই তো আপনাকে ও-মামলা compromise করতে দিই নি। যদিচ কুলদা আপস-মীমাংসা করতে বলেছিল।"

"সে যাই হোক, এখনো ফোঁটা দেবার মাটি আছে। এখন আপনার এ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটল কি করে?"

"আমার বাসার ঠিকানা পেলেন কার কাছ থেকে?"

"আপনার ভাই কুলদার কাছে।"

"তার আস্তানায় গিয়েছিলেন কি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।"

"সে তো একটা বেশ্যা-ব্যারাক। কুলাঙ্গারটা আন্দামান থেকে ফিরে ঐ বাড়িতে ঢুকেছে এই বলে যে, old friendsদের ছেড়ে আর কোথাও থাকতে পারবে না। তাকে আর কারোর স্থান দেওয়া অসম্ভব। আর কেউ স্থান দিলেও সে তা নেবে না। সে বলে, ভদ্রসমাজের অমানুষদের কারো পোষা-কুকুর হয়ে থাকবে না। আন্দামান থেকে ও দুটি বিদ্যে শিখে এসেছে— চিৎকার করা ও গালিগালাজ দেওয়া, ইংরেজি ও বাঙলা— দু ভাষাতেই।"

"কুলদা তো ছিল অতি মিষ্টভাষী আর অতি ভদ্র।"

"আর চমৎকার গাইয়ে আর অতি বুদ্ধিমান। আন্দামান থেকে ও হারিয়ে এসেছে দুটি চোখ, মিষ্টি কথা ও মিষ্টি কণ্ঠ। তবে দুষ্ট বুদ্ধি সমানই আছে।"

"আমাকে তো কোনো গালিগালাজ করলে না। শুধু কথা অতি চেঁচিয়ে বললে।"

"আপনার কাছে কিছু টাকা চায় নি?"

"চেয়েছিল পাঁচ টাকা, আমি তা দিয়েছি।"

"না দিলে আপনার বাপান্ত করত। ও টাকায় সে মদ কিনে খাবে। সে যাই হোক, ও নিজেও ডুবেছে, আমাদেরও ডুবিয়েছে। মদ, মেয়েমানুষে প্রথমে মশগুল হয়ে পড়ল, এর জন্যে টাকা চাই। আর টাকা রোজগার করবার উপায় ঠাওরাল জাল-জুয়োচুরি, তাই করতে শুরু করল। ওর কথা ছিল, ডুবেছি না ডুবতে আছি— দেখি পাতাল কত দূর। শেষটায় পাতাল পর্যন্তই পৌঁছল, আর আমাকেও ডোবাল। তাই আমি আজ এখানে, আমার মেয়ের বাড়িতে। জামাই গরিব, কিন্তু অতি ভদ্র আর অতি ভালো লোক— স্কুলমাস্টার ও ঘোর ব্রাহ্ম। ঐ আমাকে প্রতিপালন করছে। স্কুল- মাস্টারিতে কিছু পায়, আমার মেয়ের হাতেও কিছু টাকা আছে— বিয়ের সময় আমারই দেওয়া। তাতেই চলে যায়।"

"আপনার কি পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেই, ঐ বিদরির ফর্‌সিটি ছাড়া ?"

"না, সব গেছে। আমি আফিং ধরেছি, তাই তামাক খেতে হয়। তাই সব গেছে, শুধু হুঁকোটি রেখেছি।"

এর পর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

৭

গাড়িতে আমরা উভয়েই চুপ করে রইলুম, সেদিনকার নতুন অভিজ্ঞতার ফলে।

বাবা বোধ হয় আমাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে অন্য কথা পাড়লেন। তিনি বললেন যে, "আমাদের দেশের বাড়িতে দেদার রুপোর গুড়গুড়ি ছিল, কিন্তু জয়ন্তীবাবুর ঐ বিদরির-কাজ-করা অষ্টধাতুর মতো এমন সুন্দর ফর্‌সি একটিও না। বাবা সেকালে অবিরাম হুঁকো টানতেন। একালে আমি যেমন অবিরাম সিগারেট টানি, অর্থাৎ একটি পুড়িয়েই আর-একটির মুখাগ্নি করি—। বাবাও অগ্নিহোত্রীর অগ্নির মতো কলকের আগুন নিবতে দিতেন না।"

আমি এ বিষয় কিছু উচ্চবাচ্য করলুম না, কেননা তখন আমার মনে বাবার পূর্ববন্ধুদের রূপ ও গুণ জাগছে।

কুলদাবাবুকে দেখে আমার হরিভক্তি উড়ে গিয়েছিল। জয়ন্তীবাবুকে দেখে সে ভক্তি ফিরে এল না। জয়ন্তীবাবু তিলক-কাটা একটি ছবি মাত্র। ফিকে জলরঙের ছবি, মানুষের আবরণের অর্থাৎ চামড়ার ছবি, মানুষের নয়। সে ছবি

মনকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। কিন্তু কুলদাবাবুর ছবি মানুষের চামড়ার ছবি নয়— চামড়ার পর্দা-মুখে মানুষের ছবি। আর দেহের মতো তার আত্মাও অন্ধ ও খঞ্জ— অথচ দুর্দান্ত। কি ভীষণ এই বেপরোয়া জীবটি! আমার মনে হয় যে আমরা সকলেই সমাজে যেন বাঁশবাজি করছি— একবার বেসামাল হলেই কুলদাবাবুর মতো পাতালে পড়ব।

এ দৃশ্য আমার মনকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল, যার রেশ আজও আমার মনে আছে। আর সেইজন্যেই এই গল্প লেখা।

দ্বিতীয় ধাক্কা

পূর্ব-বর্ণিত ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে মানবজীবনের সিনেমার আর-একটি দৃশ্য হঠাৎ আমার চোখে পড়ে যা আমার মনে একটি গভীর ছাপ রেখে যায়। ব্যাপার কি ঘটেছিল সেই কথাটি আমি বলব।

প্রথম দৃশ্যটি যখন দেখি তখন আমি হেয়ার স্কুলে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে পড়ি। দ্বিতীয় ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি প্রেসিডেন্সিতে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।

ইতিমধ্যে আমি আধা-কলকাত্তাই হয়ে যাই, যদিও ভাষাতে নয়—ব্যবহারেও নয়। কারণ আমি পদ্মাপারের বাঙাল হলেও বাঙালে ভাষা বলতুম না, বলতুম নদে-শান্তিপুরের ভাষা। তখন আমাদের সে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তবে কলকাতার কথা শুনে শুনে মুখের ভাষার টানটোন যে কিছু বদলায় নি —এমন কথা বলতে পারি নে।

আধা-কলকাত্তাই হয়ে গিয়েছিলুম বলছি এইজন্যে যে, ইতিমধ্যে আমার জনকতক কলকাতার বন্ধুবান্ধব জুটেছিল; খুব বেশি নয়— পাঁচ-ছজন মাত্র। তাঁরা সকলেই ছিলেন সুবর্ণবণিক। বলা বাহুল্য যে, তাঁদের ভাষা ও রসিকতা আমার কাছে অগ্রাহ্য ছিল। কারণ তাঁদের ভাষা ছিল বিকৃত, আর রসিকতা যেমন বাসি তেমনি পান্‌সে। ভাষার উপর অধিকার না থাকলে রসিকতা করা যায় না। আর আমার বন্ধুদের ভাষার পুঁজি খুব কম ছিল। এঁদের ভিতর একজন ছিলেন তিনি লেখাপড়ার কোনো ধার ধারতেন না, অপর পক্ষে ছিলেন গাইয়ে ও বাজিয়ে। তাঁর গলা ছিল হেঁড়ে, কিন্তু গাইতেন তালে ও মানে। আর তিনি বাজাতেন হার্মোনিয়াম সেতার এস্‌রাজ ও বাঁয়া-তবলা। তিনি

ছিলেন যথার্থ সংগীতপ্রাণ।

কলকাতায় আসবার পূর্বেই আমার সংগীতের নেশা হয়। ফলে তিনি আমার ঘনিষ্ঠবন্ধু হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আমি বহু গানবাজনার আড্ডাতে হাজ্‌রে দিতুম— এমন-কি, বস্তিতে খাপরার ঘরেও। সে যাই হোক, তিনি একটি যুবককে আবিষ্কার করলেন— সে বেহালা বাজাত ভালো।

আমার বয়েস যখন ষোলো, এ যুবকটির বয়েস তখন বিশ কি একুশ। তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন, পরন-পরিচ্ছদে শৌখীন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, কথাবার্তায় মিষ্টভাষী এবং ব্যবহারেও ভদ্র। আমি তাঁর নাম করব না, কেননা হয়তো তিনি এখনো বেঁচে আছেন, এবং সংগীত-জগতে গণ্যমান্য হয়েছেন। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধুটিকে একদিন তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন, ভালো করে তাঁর বেহালা শুনবার জন্যে। আমরা দুজনে দুপুর বেলা আহারান্তে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। সে বাড়ি কোন্ রাস্তায় তা বলব না, কিন্তু সেটি একটি বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী।

বাড়িটি বাইরে থেকে দেখতে একটু দৃষ্টিকটু। বাড়িটির গায়ের বালির আস্তর নেই, ইঁটগুলো সব দাঁত বার করে রয়েছে। দেখতে কেমন নেড়া-নেড়া লাগে। আমার বন্ধুটি পাঁচ মিনিট ধরে সজোরে সদর দরজার কড়া নাড়লেন। একটি হিন্দুস্থানী চাকর এসে আধা বাঙলায় আধা হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞেস করলে, "কাকে চান ?" যাঁকে চাই তাঁর নাম করতে সে বললে, "ছনু বাবুকে ? আচ্ছা, সামনে খাড়া রহো, হামি বাবুকে বুলিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। এই চাকরটির সঙ্গে ছিল গা-ঢাকা দিয়ে একটি স্ত্রীলোক, দেখতে পরমা সুন্দরী— 'জনু আঁচরে উজোর সোনা।'

কিছুক্ষণ পরে ছনু এসে উপস্থিত হলেন, আর মিনিট-পাঁচেক আমাদের যে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে তার জন্য মাফ চাইলেন ও বললেন যে, "এ বাড়িতে আমি ছাড়া তো আর পুরুষ-মানুষ নেই, তাই বার-দুয়োরে খিল ও শিকল দিয়ে রাখতে হয়। যে চাকরটি দেখলে, ঐ বুলাকি আমাদের দরওয়ান বেহারা সব— আর কে আসে না আসে মাও তা দেখতে চান।"

এর পর ছনুবাবুর সঙ্গে আমরা উপরে গেলুম। যে ঘরে ঢুকলুম সেটি যথেষ্ট প্রমাণসই, কিন্তু সে ঘরে এক টুকরোও আসবাব নেই। তার পর তাকিয়ে দেখি, ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি কাঠের চেয়ারের উপর একটি ভদ্রলোক

জোড়াসন হয়ে বসে আছেন। লোকটির বর্ণ গৌর, নাক চোখ সব নিখুঁত, নধর দেহ অনাবৃত ও বুকে এক গোছা ধবধবে পৈতে। তিনি চোখ বুজে ছিলেন। মনে হল যেন স্বয়ং মহাদেব ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন।

আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি মহা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ও?"

ছন্নু উত্তর করলে, "আমি।"

"কে—ছন্নু? তোমার সঙ্গে কে?"

"কেউ নয়।"

"দেখো, আমি কানা হয়েছি বলে তো কালা হই নি।"

"আমরা কানা হই নি কিন্তু কালা হব— দিবারাত্র আপনার চিৎকার শুনে।"

"কথা যে চেঁচিয়ে বলি, তার কারণ কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করে না, কেউ আমার কথার উত্তর দেয় না। ও একরকম অরণ্যে রোদন। চোখ যে গেছে— সে একরকম ভালোই হয়েছে। তোমার মার আমি মুখদর্শন করতে চাই নে। ঐ পাপমূর্তি যাতে দেখতে না হয় ভগবান সেইজন্য আমাকে অন্ধ করেছেন।"

"দেখুন, বাইরের লোকের কাছে মার উপর আপনার আক্রোশ অত তারস্বরে প্রকাশ করবেন না।"

"তবে যে বললে, তোমার সঙ্গে কেউ নেই? আমি তিনজন লোকের পায়ের শব্দ শুনলুম। তোমার সঙ্গীরা কে?"

"আমার দুটি বন্ধু।"

"ছোকরা?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে এসেছে কি করতে?"

"আমার বাজনা শুনতে।"

"ভারি তো বাজাও! যন্ত্র তো বেহালা, যা সাহেবরা বাজাতে পারে— বাঙালিতে পারে না। আমাদের কব্জির সে শক্তি নেই। আমি আগে সুরবাহার বাজাতুম, আর শৌখীন বাজিয়েদের মধ্যে সেরা ছিলুম। বাজাও তো পিলু বারোঁয়া? বাজাও তো একটি নটনারায়ণ— আস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারী পুরোপুরি?"

"আমি অবশ্য পিলু বারোঁয়া বাজাই— কিন্তু নটের ঘরের অনেক রাগরাগিণীও

বাজাই— যথা, কেদারা হাম্বীর ছায়ানট প্রভৃতি।”

“আর তোমার ঐ ছোকরা বন্ধুরা কোথায় শুদ্ধ মধ্যম ও কোথায় কড়ি মধ্যম লাগল ধরতে পারবে?”

“না পারলেও আশা করি সমগ্র রাগিণী শুনে মুগ্ধ হবে।”

“সত্য কথা বল্‌ ওরা তোর বোনদের গান শুনতে এসেছে। তোমার মা তো ছুঁড়ি দুটোকে তয়ফা-ওয়ালী বানাচ্ছেন!”

“এ কথা কেন বলছেন?”

“ভদ্রলোকের ঝি-বৌরা কি গান বাজনা করে?”

“আগে হয় তো করত না, এখন করে। আপনি তো এক যুগ এ দেশে ছিলেন না— এর মধ্যে সমাজের হালচাল অনেক বদলে গেছে।”

“তা যেন হল, কোন্‌ ভদ্রঘরে মুসলমান বাইজির ভেড়ুয়া সারঙ্গীওয়ালাকে মেয়েদের মাস্টার করে?”

“যারা দস্তুরমত সংগীত শিক্ষা দিতে চায়, তারা করে। ওস্তাদমাত্রই তো মুসলমান। রমজানকে তো মা আনেন নি, আমি এনেছি।”

“সারঙ্গীওয়ালার কাছে বুঝি বেহালা শেখ?”

“কিছু কিছু শিখি বটে।”

“তুমি বুঝি কীর্তনওয়ালীদের বেহালাদার হবে?”

“যদি কপালে থাকে তো তাই হব।”

“মরুক গে ছুঁড়ি দুটো! এখন জিজ্ঞেস করি, তোমার বন্ধু ছোকরা দুটি কে?”

“দুজনেই ভদ্রসন্তান। একজন গান-বাজনার চর্চা করে— অপরটি কলেজে পড়ে।”

“বুঝেছি— তোমার মা ওঁদের ফাঁদে ফেলতে চান, মেয়েদের রূপ দেখিয়ে ও গান শুনিয়ে ঘাড়ে গছাতে চান। ওদের তো কেউ বিয়ে করবে না— তাই এই-সব জোটাচ্ছেন।”

“না, সে দুরভিসন্ধি তাঁর নেই। যেটি আমার সঙ্গী ও সংগীতচর্চা করে, সেটি সুবর্ণবণিক, উপরন্তু বিবাহিত। অপরটি ব্রাহ্মণ বটে— কিন্তু আমাদের সম্প্রদায় নয়, বারেন্দ্র।”

“তোমার মা কি জাত-টাত মানেন?”

"তিনি না মানলে ছোকরা তো মানে।"

" 'যার সঙ্গে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম'। ছোকরাটি দেখতে কেমন ?"

"দেখতে বাঙাল। রঙ মেটে, নাক চাপা, চোখ তেরচা।"

এ কথা শুনে পাশের ঘরে দরজার কাছ থেকে কে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখি, দরজার পাশে দুটি ছবি দাঁড়িয়ে আছে। সে ছবি যে কত সুন্দর, কত অপূর্ব, তা বলতে পারি নে।

এ হাসি শুনে চেয়ারস্থ ভদ্রলোক চিৎকার করে বললেন, "ও হাসে কে ?"

ছমু বললে, "আপনার মেয়ে শ্যামু ও রামু।"

"ওরা তো আমার মেয়ে নয়, তোমার মার মেয়ে। আমার মেয়ে হলে কি অত নির্লজ্জ, অত বেহায়া হত ! ও দুটোকে ওখান থেকে দূর করে দাও।"

ছমু বললে, "আমরাও যাচ্ছি। যেরকম চিৎকার করছেন, এর পর কাউকে না কাউকে গালিগালাজ শুরু করবেন।" এই বলে সে আমাদের পাশের ঘরে যেতে ইঙ্গিত করলে।

ছমুর বাবা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "প্রবাসে যাবার সময় আমার প্রধান দুঃখ ছিল— তোমার মাকে ছেড়ে যেতে হবে। আর প্রবাসে থেকে সেকালে কী ভালোবাসতুম ওকে! ফিরে এসে আমার প্রধান দুঃখ এই যে, তোমার মার আশ্রয়ে আমাকে থাকতে হচ্ছে ও তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে হচ্ছে। নরকযন্ত্রণা লোকে ভোগ করে, দেহে নয়— অন্তরে। আমি এখন দিবারাত্র নরক ভোগ করছি। তুমি আছ বলে আমি বেঁচে আছি, নইলে আত্মহত্যা করতুম— যদি করতে পারতুম। মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন, মরাও সোজা নয়।"

তাঁর এই শেষ কথাটি শুনে আমরা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গেলুম। সে ঘরে বসবার আসন ছিল, আমরা গিয়ে তাতেই বসে পড়লুম। ছমু বললে, "আমি ভারি দুঃখিত। তোমাদের ডেকে নিয়ে এলুম বেহালা শোনাতে— আর শোনালুম শুধু বিকট চিৎকার। উনি হচ্ছেন আমার পিতা, গিয়েছিলেন আন্দামানে— বারো বৎসর পরে ফিরেছেন সম্প্রতি। চোখ দুটি হারিয়েছেন— আর শিখে এসেছেন শুধু চিৎকার করতে ও গালি-গালাজ দিতে। বাবা ছিলেন একটা বড়ো ব্যাঙ্কের বড়ো কর্মচারী। শেষটায় ধরা পড়ল যে ব্যাঙ্কের

পাঁচ-ছয় লাখ টাকা তহবিল তছরুপ করা হয়েছে। বাবা নিজের অপকর্ম স্বীকার করলেন না, কিন্তু বারো বছরের জন্ম সাহেবরা তাঁকে আন্দামান পাঠালেন। আমাদের যা-কিছু সম্পত্তি ছিল ব্যাঙ্ক সব বেচে কিনে নিল। মা একটি ছেলে আর দুটি পাঁচ-ছ বৎসরের মেয়ে নিয়ে একরকম রাস্তায় দাঁড়ালেন। এমন সময় বুলাকির মুখে মা শুনলেন, বাবা তাঁর একটি অন্তরঙ্গ ধনী বন্ধুর নামে লাখ টাকার কোম্পানির কাগজ বেনামী করে রেখে গিয়েছেন। মা গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলেন, আর তিনিও অনুগ্রহ করে সেই অর্জিত বা অপহৃত টাকা দিয়ে আমাদের ভরণপোষণ করছেন। বাবা যে চুরি করেছেন, এ কথা কখনো স্বীকার করেন নি; সুতরাং এই বেনামী ব্যাপারটাও স্বীকার করেন না। অতএব আমরা গ্রাসাচ্ছাদনের টাকা কোথা থেকে পেলুম— এই প্রশ্ন তাঁর মনে জাগছে। আর সেইজন্যই মার উপর তাঁর এত রাগ। বাবার সঙ্গে এক বাড়িতে এখন থাকা অসম্ভব, কিন্তু আমি তাঁকে ছাড়তে কিছুতেই রাজি হলুম না। এই তো ব্যাপার।"

এর পর আমরা দুই বন্ধুতে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে এলুম। আমার মন ভরে উঠল ছনুর মা'র প্রতি সন্দেহ-মিশ্রিত করুণায়— আর ছনুর প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধায়। আর মনে হল— আন্দামান-ফেরত বটে, কিন্তু কুলদাবাবুর তুলনায় তাঁর অবস্থা কত বেশি মর্মস্পর্শী!

তাঁর শেষ কয়টি কথা আজও ভুলি নি— "মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন, মরাও সোজা নয়।"

শ্রাবণ ১৩৪৭

পুতুলের বিবাহবিভ্রাট

"ও চাকরিতে তো ইস্তফা দিলি, তার পর কি করলি ঘোষাল ?"

"মাস্টারি।"

"বাহাদুর ছেলে! দুদিন আগে ছিলি যাত্রাদলের ছোকরা, আর তার পরেই হলি মাস্টার ?"

"হুজুর! আমি হয়েছিলুম music-master ; তার জন্ম ব্যাকরণ, অভিধান, হিস্টরি, জিওগ্রাফি কিছুই জানবার দরকার নেই।"

"গান শিখিয়ে লোকের কি পরবস্তি হয় ?"

"হুজুর! যাত্রাদলে যা মাইনে পেতুম, তার দশগুণ মাইনে পেলুম ; তার উপর থাকবার ঘর আর খাবার অন্ন, উপরন্তু বকশিশ।"

"যাত্রাদলের গান শিখিয়ে এত মাইনে! তার উপর খোরপোষ ফাউ! তোর ছাত্র ছিল পাগল।"

"তা নয় হুজুর। আমি তো গানের মাস্টার হই নি, হয়েছিলুম বাজনার—এসরাজের।"

"ও যন্ত্র তুই মন্দ বাজাস নে। কিন্তু তোর চাইতে ঢের বড়ো বড়ো খাঁ-সাহেবেরা আছেন, যাঁরা ওর সিকি মাইনেয় নোকৃরি পেলে বর্তে যেতেন।"

"কিন্তু তাঁরা যে ইংরেজি জানেন না। ছাত্র আমার বেশির ভাগ ইংরেজিতেই কথা কইত ; বিলেতি সংগীতে পারদর্শী ছিল—আর সে বিষয়ে সে বিলেতি ভাষায় বক্তৃতা করত।"

"যাক ও-সব কথা। যার টাকা সে জলে ফেলে দেবে, আমি বলবার কে ? এদের বুঝি টাকার লেখাজোখা ছিল না ?"

"হুজুর! খাজাঞ্চির কাছে শুনেছি তাদের আয়ের অঙ্কের চাইতে ব্যয়ের অঙ্ক ছিল ঢের বেশি।"

"বনেদি ঘর বটে! আচ্ছা, ছেলেটি বাজনা শিখলে কেমন ?"

"হুজুর! শিখেছিল মামুলি ঢঙের বাজনা ; কিন্তু বাজাত নিজের ঢঙে। সে চাইত সব জিনিসেরই সংস্কার করতে। কিন্তু সে সংস্কার ও বিকারের প্রভেদ বুঝত না। ফলে সংগীতে শিব গড়তে সে বাঁদর গড়ত।"

"আর তুই এ-সব গোঁয়াতুর্মির প্রশ্রয় দিয়েছিস ?"

"দিয়েছি। কেননা তর্কে তাকে পরাস্ত করতে পারি নি। সে তর্ক ঘোর দার্শনিক, উপরন্তু ইংরেজি ভাষায়। আর স্বাধীনতাভক্ত বলে সে রাগরাগিণীর অসবর্ণ বিবাহের ছিল একনিষ্ঠ ঘটক।"

"তুই মাস্টার হয়ে ছাত্রের কাছে তর্কে হেরে গেলি ?"

"হুজুর! আমি তো কোন্ ছার! ইংরেজরাজ যদি তার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন তা হলে হেরে এ দেশ থেকে নিশ্চয়ই পালাতেন— আর পিঠপিঠ ভারত স্বাধীন হয়ে উঠত। সে কোনো কিছুরই ভেদাভেদ মানত না। তার কাছে গানমাত্রেই খেয়াল।"

"আচ্ছা, তা হলে খেয়াল তো সে গ্রাহ্য করত ?"

"না হুজুর; আমরা যাকে খেয়াল বলি, তা শুনলে সে কানে হাত দিত। ও ঢঙের গানের নাকি গা নেই, আছে শুধু গহনা। খেয়াল মানে নাকি খামখেয়াল— তার নিজের খেয়াল!"

"এ বুদ্ধি তার হল কোত্থেকে ?"

"তার মার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। গিন্নি ছিলেন মূর্তি-মতী খেয়াল। তাঁর নিত্যনতুন খেয়ালের ধাক্কায় ও-পরিবার ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। আর আমাদের মতো পাঁচজন আশ্রিত লোকদের কপালে জুটত, 'ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'।"

"তোর কপালে কি জুটেছিল ?"

"হুজুর, চাঁদ!"

"বাড়ির কর্তা কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমতেন!"

"করবেন কি ? গিন্নির খেয়াল মেটাতে টাকা চাই, দিতে হবে। 'আসবে কোত্থেকে ? ধার কর-না! শুধবে কে ? লবডঙ্কা!' এই ছিল সে পরিবারের নিয়ম।"

"তুই যত অদ্ভুত কথা বানিয়ে বলছিস।"

"হুজুর! তা হলে গিন্নির একটা আজগুবি খেয়ালের কথা শুনুন। খোকাবাবু অনেক দিন বিয়ে করেন নি। কারণ বিয়েতে তাঁর আপত্তি ছিল। বিয়ে করা মানে নাকি একটি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা!"

"আ মর! বলিস কি ? বিয়ে করলে তো পুরুষেরই স্বাধীনতা চলে যায়।"

—শেষটায় তার বয়েস যখন তিরিশ পেরোল, তখন তার মায়ের খেয়াল

হল পুত্রবধূর মুখ দেখতেই হবে। মায়ের খেয়ালের সঙ্গে ছেলের খেয়ালের বাধল ঝগড়া। মায়ের খেয়ালই থাকল বজায়; খোকাবাবু বিয়ে করলে। তার পর গিন্নির নিত্যনতুন বিয়ে দেবার নেশা লাগল। বিয়ে মানে তিনি বুঝতেন বাজনাবাদ্য, চোখঝল্সানো আলো, অলংকার ও পানভোজন। তাঁর খেয়াল হল, পুত্রবধূর পুতুলের সঙ্গে ওঁদের বন্ধু বোসজার পুত্রবধূর পুতুলের বিয়ে দেবেন। খোকাবাবু এ কথা শুনে প্রথমে মহা চটে গেলেন; শেষটায় রাজি হলেন, এ ক্ষেত্রে পুতুলের অসবর্ণ বিবাহ হবে, তাই জেনে! কর্তাও এতে মহা আপত্তি করলেন, কিন্তু গিন্নি যখন বললেন যে এ বিয়ের খরচ তিনি দেবেন, তখন আর তাঁর আপত্তি টিঁকলো না। বোসজা গিন্নির গহনা বন্ধক রেখে টাকাটা জোগাড় করে দেবেন বললেন। গিন্নির বারোমেসে মহাজন ছিলেন বোসজা। তাতেও বোসজার দু পয়সা লাভ ছিল।

তার পর মাসখানেক গিন্নি বিয়ের জল্পনা-কল্পনায় মত্ত হয়ে রইলেন। মেয়ে তাঁদের, ও ছেলে বোসপরিবারের। বিয়ের সময় কোন্ কোন্ ক্রিয়াকর্ম অবশ্যকর্তব্য, সে বিষয়ে গিন্নির সঙ্গে বোসগিন্নির ঘোর মতভেদ হল। কেউ কারো মত ছাড়বেন না। বোসগিন্নি বলেন, ধর্মকর্মের বিষয়, আমরা কারো কথায় তার একচুলও এদিক-ওদিক করতে পারব না। আর খোকাবাবুর মা বলেন, বনেদি ঘরের চাল আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারব না। শেষটায় দাঁড়াল এই যে, এ সম্বন্ধ প্রায় ফেঁসে যাবার জো হল। তার পর গিন্নির আদেশে দু পক্ষের মধ্যস্থতা করতে আমি নিযুক্ত হলুম। আমি গিয়ে বোসগিন্নিকে বললুম যে, আপনাদের বাড়িতে আপনাদের কর্তব্য আপনারা করবেন, আর মেয়ের বাড়িতে কন্যাপক্ষের কর্তব্য আমরা করব। শুধু দেখবেন যেন বরের কপাল জুড়ে চন্দন মাখাবেন না। আর বর যেন জাঁতি হাতে করে বিয়ে করতে না আসে; আসে যেন একটা নখকাটা কাঁচি হাতে করে। আপনি চান যেন অমঙ্গল না হয়; আমাদের গিন্নি চান দেখতে যেন অসুন্দর না হয়। আর পিঁড়ের আলপনা— সে আর্ট স্কুলে ফরমায়েস দেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন, এ হচ্ছে আসলে বড়োমানুষের ছেলেখেলা। এই বলে প্রথম ধাক্কা আমি সামলে নিলুম।

তার পর বরের শোভাযাত্রা কিরকম হবে, তা নিয়ে গোল বাধল। গিন্নি চান গোরার বাদ্যি, বোসজা তাতে রাজি নন। তিনি বলেন, পুতুলের

বিয়েতে ও হবে কেলেঙ্কারি। আমি খেটে-খাওয়া মানুষ, আমি এত সোরগোল করে পুতুলের বিয়ে দিলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না। আমার ওকালতি ব্যাবসা সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। কিন্তু গিন্নি নাছোড়বান্দা। তাঁর কথা হচ্ছে— হয় বিয়ে ভেঙে দাও, নয় গোরার বাদ্যি বাজাও। এ কথা শুনে খোকাবাবু ফোঁস করে উঠলেন, তিনি বললেন— গোরার বাদ্যি সংগীতই নয়। আমি তা হতেই দেব না। ইংরেজরা আমাদের অধীন করেছে কি করে? পলাশীর যুদ্ধের সময় গোরার বাদ্যি বাজিয়ে। ভারত স্বাধীন করতে হবে একতারা বাজিয়ে। শেষটায় ঠিক হল, বর আসবেন মোটর চড়ে, আর গাড়িতে বিজলী বাতি জ্বালিয়ে। তার পর যত-কিছু ধুমধাম এখানে করা যাবে। বরযাত্রীদের জন্য খানা পেলিটির দোকান থেকে আনতে হবে, কিন্তু খেতে হবে কলার পাতায় হাত দিয়ে এবং মাটিতে কুশাসনে বসে। আর বিলেতি পানীয় দেওয়া হবে মাটির ভাঁড়ে। কর্তাবাবু সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ঘরে দুয়োর দিয়ে বেদান্ত পড়তে লাগলেন, আর 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

এর পর রায়মশায় বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, "থাম্, ঘোষাল। ও-সব কেলেঙ্কারির কথা আমি শুনতে চাই নে। ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়ের ভোজ, আর খানা আসবে পেলিটির বাড়ি থেকে! তোর গল্প সবই হচ্ছে যা অসম্ভব তাই সম্ভব বলে চালিয়ে দেওয়া। নিজে তো চিরকুমার, বিয়ের ক্রিয়াকর্মের তুই বেটা জানবি কি? এখন যা, ঐ মাটির ভাঁড়ে বিলেতি পানীয় খা গিয়ে। তোর তো পাত্রাপাত্রের বিচার নেই, পানীয় পেলেই হল!"

"হুজুর! এ তো আমার ছেলে মেয়ের বিয়ে নয়— এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল তারই বর্ণনা করছি। আর হলপ করে বলছি আমার একটি কথাও বানানো নয়। দুনিয়ার বড়োমানুষমাত্রই কি হুজুরের তুল্য? এদের অনেকেই কি কাণ্ডজ্ঞানহীন নন? আর বিয়ে কি বললেই হয়? লাখ কথার পর তবে একটা বিয়ে স্থির হয়। আর যার যত টাকা, তার তত কথা। আপনি শেষ পর্যন্ত শুনলে খুশি হবেন।"

"আচ্ছা, তবে বলে যা। শোনা যাক কেলেঙ্কারি কতদূর গড়াল!"

"হুজুর! তবে ধৈর্য ধরে শুনুন।"

—বিয়ের শুভদিন শুভক্ষণ সব পাঁজি দেখে ঠিক করা হল। কিন্তু তার

পরও একটু গোল হল। বিয়ের পথ কাঁটায় ভরা। আর সেই কাঁটা তোলা হল আমার কাজ।

প্রথম মতভেদ হল পত্র নিয়ে। গিন্নি পত্রে কিছুতেই রাজি হলেন না। পত্র করলে নাকি বিয়ের আগে বর মারা গেলে কনে বাগদত্তা হয়ে থাকে ; তখন তার আবার বিয়ে দেওয়া কঠিন। প্রায়শ্চিত্ত না করলে আর হয় না। আর যে ক্ষেত্রে মেয়ের কোনো দোষ নেই, সেখানে মেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবে কেন ?

আমি বোসগিন্নির কাছে গিয়ে এ পক্ষের কথা নিবেদন করলুম। বোসগিন্নি বললেন— বর হচ্ছে পুতুল ; তার আবার বাঁচা-মরা কি ?

আমি বললুম— পুতুলটি ভেঙে যেতে কতক্ষণ ?

এ কথা তিনি বুঝলেন।

তার পর গোল উঠল— পাকা-দেখা নিয়ে। গিন্নি তাতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন— আমাদের ঘরের মেয়ে কাউকেও দেখাই নে ; সে কাঁচা-দেখাই হোক, আর পাকা-দেখাই হোক। আর বর আমরা বিয়ের আগে দেখতে চাই নে।

এতে বোসগিন্নি অপমানিত বোধ করলেন, বললেন এ হচ্ছে উকিলের উপর জমিদারের অবজ্ঞার চোখে-আঙুল দেওয়া চাল।

আমি বোসগিন্নিকে গিয়ে বললুম— ও বাড়ির মেয়ে আগে দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই জানে, তাদের চাঁপাফুলের মতো রঙ, তিলফুলের মতো নাক, পদ্মফুলের মতো চোখ, গোলাপফুলের মতো গাল, দাড়িমফুলের মতো ঠোঁট, কুন্দফুলের মতো দাঁত। এতে রাগ করবার কিছু নেই।— বলতে ভুলে গিয়েছি, বোস-পরিবার যেমন কালো তেমনি নিরাকার।

গিন্নিমা যে কনে দেখাতে কিছুতেই রাজি হন নি, তার কারণ শুনলুম— তিনি নাকি তাকে সাজাচ্ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর তুল্য অপূর্বরকম কনে-সাজাতে আর কেউ পারে না। কনের সাজ হবে পুরো স্বদেশী, অথচ চমৎকার।

কনে আমি অবশ্য দেখি নি। কিন্তু শুনেছি পুতুলটি ছিল কাশীর গুড়িয়া পুতুল। তাকে পরানো হয়েছিল তাসের কাপড়ের ঘাঘরা, কিংখাপের চোলী, দিল্লির ওড়না, পায়ে দেওয়া হয়েছিল পাঞ্জাবের জরীর নাগরা। আর তার গহনা ছিল আগাগোড়া স্বদেশী ও সেকেলে। অবশ্য গহনার বিষয় আমি বেশি

কিছু জানি নে। তবে শুনেছি— কঙ্কণ রুলি মরদানা মুড়কিমাদুলি বাজু তাবিজ বাজুবন্ধ চন্দ্রহার রতনচক্র বাঁকমল পাঁয়জোড় চুট্‌কি কান কানবালা নথ নোলক নাকচাবি বেসর— তার শোভা বৃদ্ধি করছিল। অবশ্য চিক গোপহার সরস্বতীহার সাতনরীও তার গলায় ওতপ্রোতভাবে দেওয়া হয়েছিল।

এই সালংকারা কন্যার গা ছিল না, ছিল শুধু গহনা। খোকাবাবুর খেয়ালের মতো।

শুভদিনে, শুভক্ষণের আধ ঘণ্টা আগে বোসজা বরকে সঙ্গে করে মোটর-গাড়িতে এলেন। বাজনার ভিতর গ্রামোফোনে বাজছিল, 'তুমি কাদের কুলের বউ ?' আর বাড়ির ভিতর মেয়েরা হুলুধ্বনি করতে লাগল।

গিন্নিমা এসে বললেন— দেখি, বর স্বদেশী কি না। দেখে কিছু খুঁত ধরতে পারলেন না। একটা এক-হাত প্রমাণ জাপানি পুতুল, যা জাপান থেকে এসেছিল নেংটা ; তাকে পরানো হয়েছে খদ্দরের গান্ধী-টুপি। গিন্নিমা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, বরের গলায় পৈতে নেই। অমনি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন— আমাদের বাড়ির মেয়েকে পৈতেহীন বরে সম্প্রদান করতে দেব না। হুকুম হল, ডাকো পুরুতকে। আমি অবশ্য পুরুত সেজেছিলুম। আমি হাজির হয়ে তাঁর মত শুনে বললুম— পুতুলের আবার জাত কি ? গিন্নি বললেন— ওদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তবে তো বিয়ে দিতে হবে ? আমি বললুম— অবশ্য তাই। গিন্নি বললেন— প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ওর জাত কি হবে ? বোসজা বললেন— ঘোষাল, দাও তোমার পৈতেগাছি ওটাকে পরিয়ে। গিন্নি বললেন, তা যেন হল ; কিন্তু পুরুতের গলায় পৈতে নেই, সে বিয়ে দেবে ? এ কথা শুনে আমি বললুম— চেনা বামুনের আর পৈতের দরকার কি ?

এই সময় খোকাবাবু এসে উপস্থিত হলেন— আর-এক নতুন ফেঁকড়া তুললেন।

খোকাবাবু ঘরে ঢুকেই বোসমশায়কে বললেন— ওস্তাদজির পৈতে ওঁকে ফিরিয়ে দিন। বোসমশায় খোকাবাবুর মুখ-চোখের চেহারা দেখেই বুঝেছিলেন যে, তিনিও অগ্নিশর্মা হয়েছেন ; তাই তিনি দ্বিরুক্তি না করে আমার পৈতে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। খোকাবাবু তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন— জাতিভেদ তবে তুমি মান ?

খাওয়া-দাওয়ায় মানি নে, বিয়ে পৈতেয় অবশ্য মানি।

তার পর গিন্নিমা প্রশ্ন করলেন— এ বিয়ে কি তা হলে হবে না?

না হয় তো তার জন্ম আমি দুঃখিত নই।

তুমি তো এ বিয়েতে প্রথম থেকে আপত্তি কর নি?

আমার এ ছেলেখেলায় মত ছিল না। তবে অমত যে করি নি, তার একমাত্র কারণ এ হচ্ছে অসবর্ণ বিবাহ।

পুতুলের আবার জাত কি?

আমাদের সঙ্গে পুতুলের প্রভেদ কি? আমরা রক্তমাংসের পুতুল, আর ওরা মাটির কিংবা নেকড়ার পুতুল। এই তো?

তুমি তো ব্রাহ্মণকন্যা বিয়ে করতে আপত্তি কর নি?

সে তোমার খাতিরে। আমরা যে স্বাধীনতার জন্ম প্রাণপাত করছি, তার প্রথম experiment করতে হবে পুতুল নিয়ে। পুতুলের রাজ্যে এ প্রথা চলিত হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে পরে তা প্রচলিত হবে। কি বলেন ওস্তাদজি?

পুতুলের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নই। আজীবন পুতুলরাই আমাকে নিয়ে খেলা করেছে, আমি কখনো পুতুল নিয়ে খেলা করি নি; সুতরাং তাদের মতিগতি আমার অবিদিত।

গিন্নিমা বললেন, ঘোষাল ঠিক বলেছ। আমার ছেলেকে নিয়ে একটি পুতুল খেলা করছে। আমার ছেলে এখন হয়েছে পুতুল, সেই পুতুল হয়েছে মানুষ।

খোকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন— কে সেই পুতুল— যে আমাকে নিয়ে পুতুল নাচাচ্ছে?

বউমা। আবার কে?

তোমার তাই বিশ্বাস?

হাঁ। তোমার বিয়ে হয়ে অবধি দেখছি, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ। তুমি যে পুতুলের বিয়েতে মত করেছিলে, সেও বউমার শখ মেটাতে; আর এখন যে এসে গোলমাল করছ, সেও বউমার কথা শুনে। পাছে বিয়ে ভেঙে যায়, এই ভয়ে বউমা তোমাকে চর পাঠিয়েছেন।

তাই যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তবে যা খুশি তাই করো, আমি আর কিছু বলব না।

তাই তো করব। একবার ছেলের বিয়ে দিয়ে হয়েছি বউমার দাসী, আবার

কাউকে বিয়ে দিতে আমার শখ নেই। নেড়া ভুবার বেলতলায় যায় না। এই দেখো বরের আমি ঘাড় মট্‌কে দিচ্ছি— আর কনেকে ছিঁড়ে টুক্‌রো করে দিচ্ছি।

তিনি মুখে যা বললেন, কাজে তাই করলেন।

খোকাবাবু বললেন, কোনো বিষয়ের শেষ রক্ষা করা তো তোমার ধাতে নেই।

গিন্নিমা উত্তর করলেন, কিন্তু বউমা যখন বিয়ে ভেঙে গেল শুনে চোখের জল ছাড়বেন তখন আর তোমার বুদ্ধির হালে পানি পাবে না। তোমার স্বাধীনতা হচ্ছে এই একরত্তি মেয়ের সম্পূর্ণ অধীনতা। যাও ঘোষাল, বরযাত্রীদের গিয়ে বলে এসো একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই এ বিয়ে আজ হবে না।

আমি বিবাহের সভায় উপস্থিত হয়ে বললুম— একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাই আজ বিয়ে বন্ধ। বর ও কনে দুইজনেই sudden heart-failureএ মারা গেছে। এদের দুজনেরই যে বেরিবেরি ছিল তা আমরা জানতুম না। কিন্তু বিয়ে বন্ধ হয়েছে বলে, আপনাদের পানভোজন বন্ধ হবে না। খাবার সব প্রস্তুত, এখন উঠুন, সব খেতে চলুন। তাঁরা সকলেই উঠলেন এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাড়ি সাফ দেখে মাদ্রাজি ব্যাণ্ডের দল 'God save the King' বাজাতে শুরু করলে। বাড়ির ভিতর থেকে বউমার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। খোকাবাবু অমনি কি একটা ওষুধের শিশি হাতে করে অন্দরমহলে চলে গেলেন। গিন্নি আর রা কাড়লেন না।

রায়মশায় সব শুনে বললেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

তার পর জিজ্ঞেস করলেন, "পেলিটির বাড়ির খানার কি হল?"

"গিন্নির হুকুমে তা দিয়ে কাঙালী বিদেয় করা হয়। তিনি বললেন— এ তো বিয়ে নয়, শ্রাদ্ধ।"

"আর বিলেতি পানীয়?"

"গিন্নি তাও কাঙালীদের দিতে হুকুম করেছিলেন; কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এই বলে আপত্তি করলেন যে, কাঙালীরা ও-পানীয় গলাধঃকরণ করলে riot করবে; তার পর বেপরোয়া হয়ে বাড়িঘরদোর লুট করবে।

গিন্নি তাতে বললেন যে— তা হলে তোমরাই এর সদ্‌ব্যবহার করো। তার পর তাঁর অনুগত দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা শেষ করলেন।”

“আর তুই বেটা কি করলি ?”

“আমি সেই রাত্তিরেই বিদায় নিলুম। গিন্নি বললেন, এসো। এ বাড়ি আগে ছিল সংগীতের আলয়, কিন্তু বউমা এখানে অধিষ্ঠান হবার পর হয়েছে হট্টগোলের আখড়া।

“আমি মনে মনে ভাবলুম— যত দোষ বেচারা বউমার। গিন্নির ন-ভূত-ন-ভবিষ্যতি খেয়ালের নয় !”

আশ্বিন ১৩৪৭

চাহার দরবেশ

বি. এন. আর. যখন প্রথম খোলে, তার কিছু দিন পরেই আমি উক্তপথে C. P.র কোনো শহরে যাত্রা করি।

রেলগাড়ি আমি প্রথম দেখি ও তাতে চড়ি পাঁচ বৎসর বয়েসে। যে গাড়ি গোরুতে টানে না, ঘোড়ায় টানে না, আপনি চলে— সে গাড়ি দেখে আমি আনন্দে অধীর হই নি।

তার পর রেলগাড়িতে অসংখ্য বার যাতায়াত করেছি। কিন্তু এই C. P. যাত্রার পথে একটু নতুনত্ব ছিল। সেই কথাই আজ বলব।

কলকাতা থেকে আসানসোল যাই— আর বোধ হয় সেখানেই ই. আই. আর.এর গাড়ি ছেড়ে বি. এন. আর.এর গাড়িতে চড়ি।

রাত্তিরে কোনো হোটেলে এসে ডিনার খেতে পাব— আশা করি। আমি ভোজনবিলাসী নই। চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস করলেও আমার নাড়ী ছেড়ে যায় না— এমন-কি, পিত্তিও পড়ে না। তা হলেও রাত্তিরে কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। সেইজন্যই ডিনারের আশায় গাড়িতে বসেছিলুম।

পুরুলিয়া ছাড়বার ঘণ্টা-দুয়েক পর আমি গাড়ির চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেলুম। গোরুর গাড়ির চাইতে সে গাড়ির চলন কিছু দ্রুত নয়। মধ্যে মধ্যে গাড়িটা পা টিপে টিপে হেঁটে যেতে আরম্ভ করলে। আমি ছিলুম সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী— আর আমার সহযাত্রী ছিলেন একটি রেল-কর্মচারী। রেলের এই বিলম্বিত চাল সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন— এ দেশের মাটি Black Cotton soil বলে রেলের রাস্তা আজও consolidated হয় নি, তাই সাবধানে যেতে হয়।

গোরুর গাড়ি যদি রেলগাড়ির মতো দৌড়ায়, তা হলে তার আরোহীদের ভয় হওয়া স্বাভাবিক। অপর পক্ষে রেলগাড়ি যদি গোরুর গাড়ির মন্দগতিতে চলে, তা হলে সে গাড়ির আরোহীদেরও মন প্রসন্ন হয় না। আমি এই অচল ট্রেনে বসে বসে ঈষৎ কাতর হয়ে পড়লুম। আমার সহযাত্রীটি ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ইংরেজ, কিন্তু কথায়বার্তায় ভদ্র। তিনিও একটি ছোটো স্টেশনে নেমে গেলেন, যেখানে তাঁর বাসস্থানে তাঁর মেম ছিল ও খানাপিনা ছিল।

তার পর সারা রাত্তির গাড়ি খোঁড়াতে খোঁড়াতে, হাঁপাতে হাঁপাতে,

ফোঁপাতে ফোঁপাতে অগ্রসর হতে লাগল। প্রতি স্টেশনে এঞ্জিনের দম জিরোতে ও একপেট জল খেতে অন্তত আধঘণ্টা লাগল।

পথিমধ্যে খোঁজ করে জানলুম যে, চক্রধরপুরে অন্তত এক পেয়ালা চা পাব।

তার পরদিন সকালে অর্থাৎ বেলা বারোটায় চক্রধরপুর পৌছলুম। কিন্তু সেখানেও এক পেয়ালা চা মিলল না। আমি চা-খোর নই, কিন্তু সকালে এক পেয়ালা চা না পেলে ভীষণ অসোয়াস্তি অনুভব করি।

সে যাই হোক, চক্রধরপুরে দুটি ভদ্রলোক এসে আমার গাড়িতে চড়লেন; তার ভিতর একজন যেমন বেঁটে, অন্যটি তেমনি লম্বা। বেঁটে ভদ্রলোকের গায়ে আলপাকার কোট ও জিনের পেণ্টলুন, মাথায়একটি বনাতের গোলটুপি, হাতে একটি ছোটো ব্যাগ। লম্বা ভদ্রলোকের পরনে লংক্লথের চুড়িদার পায়জামা, আজানুলম্বিত গরম কোট আর মাথায় স্বরচিত পাগড়ি। লম্বা লোকটিকে দেখে প্রথমে নজরে পড়ল— তাঁর চোখ। এমন প্রকাণ্ড, এমন হাঁ-করা চোখ মানুষের মুখে ইতিপূর্বে দেখি নি। তার পর মনে হল সে-চোখ আলাপী চোখ— অর্থাৎ কথা কয়। তার পরেই প্রমাণ পেলুম ভদ্রলোক চোখেমুখে কথা কন— আর সে কথার স্রোত আমাদের রেলগাড়ির চাইতে দ্রুত। তিনি কামরাতে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"কলকাতা।"

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে?"

"রায়পুর।"

"মশায়ের নাম?"

আমি আমার নাম বললুম। তিনি তা শুনে বললেন, "'চৌধুরী' যে কোন্ জাত তা জানা যায় না।"

আমি বললুম, "ব্রাহ্মণ।"

"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।"

তার পর বেঁটে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করলেন, "মশায়ের নাম?"

"পতিরাম পাণ্ডা।"

"কি বললেন?"

"পাণ্ডা।"

“আমি শুনেছিলুম পাঞ্জাবী। আপনার পাঞ্জাবীর মতো চেহারাও নয়, বেশও নয়। মশায় ব্রাহ্মণ?”

“না।”

“বাঁচালেন। তিন ব্রাহ্মণে একত্র যাত্রা করা নিরাপদ নয়। মশায়ের বাড়ি কোথায়?”

“বাঁকুড়া জেলায়।”

“কি করা হয়?”

“ডাক্তারি।”

“এম. বি.?”

“না, আমি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।”

“এই বুনোর দেশে ডাক্তারি ব্যাবসা চলে?”

“চলে তো যাচ্ছে।”

“ওষুধ তো আপনাদের হয় এক ফোঁটা জল, নয় তিলপ্রমাণ বড়ি!”

“ওষুধের গুণ কি তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে?”

“অবশ্য নয়। সব গুণী লোক তো তালগাছের মতো লম্বা হয় না।”

“সে যাই হোক, মশায়ের নাম কি, জিজ্ঞেস করতে পারি?”

“সরদার শরকেল।”

“বাংলা তো আপনি আমাদের মতোই বলেন।”

“তার কারণ, আমিও বাঙালি।”

“আমি ভেবেছিলুম বুঝি পাঞ্জাবী, আপনার চেহারা দেখে ও বেশভূষা দেখে, তার পর আপনার নাম শুনে—।”

“আমার নাম শ্রীধর সরখেল। খোট্টাদের মুখ থেকে শ্রীধর বেরোয় না, তাই ওরা সরদার বলে, আর সরখেলকে বলে শরকেল।”

“আপনার বাড়ি কোথায়?”

“বর্ধমান জেলায়, কুলীনগ্রামে।”

“মশায় ব্রাহ্মণ?”

“শুধু ব্রাহ্মণ নয়, একেবারে নৈকষ্য কুলীন। ইচ্ছে করলে ৩৬৫টি বিয়ে করতে পারতুম, আর পুরো বছর ৩৬৫টি শ্বশুরবাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটাতে পারতুম।”

“বিয়ে কটি করেছেন?”

"একটিও না। বাঁশবনে ডোম কানা।"

"কি করা হয়?"

"কিছুই নয়। আমি এখন ভবঘুরে।"

"আগে কি করতেন?"

"জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। তার অর্থ, কি যে করি নি বলা শক্ত।"

"আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"বুঝতে পারবেনও না। আমি ছিলুম পল্টনে।"

"সেপাই?"

"না। Camp-follower।"

"তাদের কাজ কি?"

"তার কোনো লেখাজোখা নেই। ক্ষেত্রে কার্যো বিধীয়তে। কখনো পাচকব্রাহ্মণ, সেপাইদের বিয়ে-শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য, কখনো রসদ কেনা, কখনো খাতা লেখা— ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি শিখ পল্টন আমাদের গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমার বয়স চোদ্দ বৎসর। তাদের সঙ্গেই আমি জুটে যাই। আর কুচ করতে করতে লাহোর যাই। তার পর চল্লিশ বৎসর তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। পল্টনের একটা নেশা আছে, সেই নেশাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। এতদিনে সে নেশা ছুটেছে।"

"আপনি নেহাৎ ছোকরা বয়সেই পল্টনে ভর্তি হলেন?"

"আমি তো ছোকরা, camp-followerদের মধ্যে দেদার স্ত্রীলোক পর্যন্ত থাকে। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি সুন্দরী, তারা কর্নেল সাহেবদের প্রিয়পাত্রী হয়।"

"আপনি এখন বুঝি পেনসন নিয়েছেন?"

"আমার চাকরির পেনসন নেই। চাকরি থাকতে যা রোজগার করতে পার। আর মাইনে যদিচ নামমাত্র, উপরি-পাওনা বেহিসেবী।"

"কিরকম?"

"যুদ্ধের সময় লুট, আর শান্তির সময় চুরি। হিন্দুস্থানীতে একটি কথা আছে— সরকারকে মাল, দরিয়ামে ঢাল। এ দরিয়া হচ্ছে army, আর আমরা camp-followerরা সেই বেহিসেবী খরচের ভাগ পাই। আমি এই

খাতে দেদার রোজগার করেছি।”

“তাই আপনারা পেনসনের তোয়াক্কা রাখেন না।”

“এই ছুটো চাকরির আয়ও যেমন, ব্যয়ও তেমনি। আমরা মরণের যাত্রী, সব বেপরোয়া। ফলে, এখন আমার বিশেষ কিছু নেই। তাই এ জঙ্গলে এসেছি বুনো রাজাদের ঘাড় ভেঙে কিছু আদায় করতে পারি কি না দেখতে।”

“কি কাজ খুঁজছেন?”

“এক ডাক্তারি ছাড়া যে কাজ জোটে তাই করতে পারি। এমন-কি, গুরুগিরি পর্যন্ত। হিমালয়ে যোগ অভ্যাস করেছি।”

চক্রধরপুরেও এক পেয়ালা চা পেলুম না, কিন্তু শ্রীধরবাবুর সত্য-মিথ্যা গল্প শুনে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিলুম। শেষটায় তিনি বললেন, “আর তিন-চার ঘণ্টা বসে আঙুল চুষুন— ঝাড়সুগড়ায় গিয়ে চা, রুটি, মাখন সব জোগাড় করে দেব। স্টেশনমাস্টার আমাদের রেজিমেণ্টে soldier ছিলেন— আমরা এক সানখির ইয়ার। লোকটা যেমন অসম্ভব লড়িয়ে, তেমনি অসম্ভব ভালো-লোক।”

বেলা চারটেয় আমার চব্বিশ ঘণ্টার নির্জলা উপবাস শেষ হবে শুনে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

শ্রীধরবাবু বকেই চললেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে; আর তাঁর কাছে এ দেশের রাজাদের বিষয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ডাক্তারবাবুর নাকি এই রাজারাজড়াদের মধ্যেই প্র্যাকটিস বেশি। কারণ তাঁরা দিনে এক বোতল ব্রাণ্ডি খান, কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ তাঁদের সহ্য হয় না— বেশি কড়া বলে। আর তাঁরা নাকি সব গোরু গাধা ও বোকা পাঁঠা— আর শিকার করেন গেরস্তের ঝি-বউ। আর তাঁদের সহায় রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিত।

বেলা চারটেয় গাড়ি ঝাড়সুগড়া স্টেশনে পৌঁছল, আর শ্রীধরবাবুর আদেশে তাঁর সঙ্গে আমি প্ল্যাটফরমে নামলুম। তিনি বললেন, “আপনি খানাকামরায় ঢুকুন, আমি স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে একটা কথা কয়ে আসছি।”

খানাকামরায় ঢুকে আমি তার মাদ্রাজি ম্যানেজারকে চা ও রুটি-মাখনের অর্ডার দিলুম।

সে বললে— কিছুই নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে।

আমি অগত্যা, শ্রীধরবাবু গোরা স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে যেখানে কথোপকথন

করছিলেন, সেইখানে গেলুম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চা পেলেন ?"

আমি বললুম, "না।"

শ্রীধরবাবু স্টেশনমাস্টারকে পণ্টনী ইংরেজিতে আমার দুরবস্থার কথা বললেন। তিনি তখনই শ্রীধরবাবুকে হুকুম দিলেন, "শালা মাদ্রাজিকো কান পাকড়কে লে আও।"

শ্রীধরবাবু অমনি খানাকামরায় ঢুকে ম্যানেজারের কান ধরে নিয়ে এলেন। সাহেব হুকুম দিলেন যে, "চা বানাও, আর রুটি-মাখন বাবুকে দাও।"

মাদ্রাজি বললে, "নেই হ্যায়।"

"সরদারজি! উস্‌কো এক থাপ্পড় লাগাও, আওর আলমারি খোলো। শালা চোর হ্যায়।"

শেষে সবই পেলুম ও খেলুম।

গাড়িতে ফেরবার পথে শ্রীধরবাবু বললেন, "স্টেশনমাস্টারকে জানালুম যে সঙ্গে টিকিট নেই— গার্ডকে বলে দেবেন, রাস্তায় কেউ যেন উৎপাত না করে। তিনি বললেন, all right। আর ঐ মাদ্রাজিটা এক টাকার জিনিস আপনার কাছে দু টাকা নেবার ফন্দী করেছিল, এক থাপ্পড়ে বিনা পয়সায় হয়ে গেল। এরই নাম পণ্টনী কায়দা।"

গাড়িতে ঢুকেই দেখি, দুটি নতুন ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনেরই পরনে ইংরেজি পোশাক; একজনের চাঁদনির তৈরি, আর-এক জনের ব্রিচেস-পরা আর হাঁটু পর্যন্ত পটি জড়ানো।

শ্রীধরবাবু গাড়িতে উঠেই জেরা শুরু করলেন। তার ফলে আমরা জানলুম একজনের নাম তারক তলাপাত্র— Timber merchant। আর যাঁর বেশ ঘোড়সোয়ারের মতো, তিনি হচ্ছেন Forest officer, নাম সুষেণ সেন। তাঁর পৈতৃক উপাধি ছিল দাস, তিনি অনুপ্রাসের খাতিরে 'সেন' অঙ্গীকার করেছেন।

তার পর ঘণ্টা তিন-চার ধরে শ্রীধরবাবু মজলিস জমিয়ে রাখলেন। এমন অনর্গল বকতে আমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কখনো দেখি নি। তিনি জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করেছেন, তাই তিনি নতুন যাত্রীদের ব্যাবসার বিষয় সব জানেন। তিনিও কিছুদিন কাঠের ব্যাবসা করেছিলেন— যেখানে হিমালয়ের গায়ে প্রকাণ্ড শালবন আছে, আর তার মধ্যে মধ্যে ছোটোখাটো

নদী— যার বর্ষাকালে হয় অসম্ভব তোড়। বড়ো বড়ো শালগাছ কেটে সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়, যেখানে গিয়ে সেই গুঁড়িগুলো ঠেকে, সেখানে সেগুলি জল থেকে তুলে বেচতে হয়। এ ব্যাবসায় লাভ খুব বেশি। কিন্তু কোন্‌টা কার গুঁড়ি, এই নিয়ে ঝগড়া হয়— আর এই ঝগড়াঝাঁটিতে লাভ সব খেয়ে যায়। শ্রীধরবাবু বললেন, "তা যদি না হত, তা হলে আমি আজ লক্ষপতি হতুম। একা মানুষ, তাই আমি পয়সার জন্য কেয়ার করতুম না। হিমালয়ের ট্যাকে-গোঁজা ছোটো-ছোটো রাজ্যের রাজারা সব রাজপুত, আর সকলেই আফিংখোর। এদের আদালত আছে, কিন্তু আইন-কানুন নেই। এদের বিচারপ্রার্থী হওয়া ঝকমারি।"

তারকবাবু বললেন, "লোকে কাজ কি শুধু স্ত্রীপুত্রের জন্য করে? আমার স্ত্রীপুত্র নেই।" ডাক্তারবাবু বললেন, তাঁরও নেই। ফরেস্ট-অফিসার বললেন, তাঁরও নেই।

সহযাত্রীদের কারো স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই শুনে শ্রীধরবাবু সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট হলেন তা তাঁর বক্তৃতায় বোঝা গেল না। তিনি শুধু বললেন, "আপনারা সকলেই দেখছি চিনির বলদ। টাকার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছেন।" তিনিও অবিবাহিত, কিন্তু তাঁর যেমন কামিনী নেই, তেমনি কাঞ্চনও নেই। ভূতের ব্যাগার খাটা তাঁর ধাতে নেই। তার পর তিনি গেরস্ত লোকের যে বিবাহ করা উচিত, সে বিষয়ে নানা যুক্তি দেখালেন। তাঁর কথায় কেউ বিশেষ আপত্তি করলেন না। কিন্তু সকলেই আলোচনায় যোগ দিলেন। বিবাহ জিনিসটা এ দেশে জন্ম-মৃত্যুর মতো নিত্য হয়, এ বিষয়ে যে এত মতভেদ আছে তা জানতুম না। আমি একমনে এই-সব তর্ক-বিতর্ক শুনছি, এমন সময় বাঁ দিকে একটি বেজায় ফাঁপা ও ফুলো নদী দেখতে পেলুম— তার নাম বোধ হয় মহানদী। বর্ষায় তার এই চেহারা, গ্রীষ্মে কিন্তু এ নদীতে কোমর-জল থাকে না। ডাক্তারবাবু বললেন যে, রাতভর হয়তো তীরে বসে ঢেউ গুনতে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কেন?" তিনি উত্তর করলেন, "এ রেলগাড়ি গোরুর গাড়ি হতে পারে, কিন্তু জাহাজ নয়। আর ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারা সিন্ধু-ঘোটক নয়।"

ডাক্তারবাবু যা বলেছিলেন, তাই ঘটল। রাত্তির প্রায় সাড়ে আটটায় রায়গড় স্টেশনে পৌঁছে শুনলুম যে, সে রাত্তির আর গাড়ি এগোবে না।

এর পরের রাস্তা বানের জলে ডুবেছে ও সম্ভবত বিপর্যস্ত হয়েছে। রাস্তা যদি কোথাও বেমেরামত হয়ে থাকে, আজ রাত্তিরেই তা মেরামত হয়ে যাবে। অগত্যা আমরা কি করে রাত কাটাব, সেই ভাবনাতে অস্থির হয়ে পড়লুম।

স্টেশনমাস্টার ত্রিলোচন চক্রবর্তী বললেন, "আমি দু-একখানা বেঞ্চি জোগাড় করে দিচ্ছি, তাতেই পালা করে রাত কাটাতে পারবেন। অবশ্য আপনাদের কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় নেই।"

শ্রীধরবাবু বললেন যে, "যাত্রা শুনেও তো সারারাত জেগে কাটানো যায়। এ যাত্রা আমরা বকে ও গল্প করে রাত কাবার করে দেব। কি বলেন বনবিহারীবাবু?"

ফরেস্ট-অফিসার বললেন, "তার আর সন্দেহ কি?"

তার পর শ্রীধরবাবু স্টেশনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "খাবার কিছু পাওয়া যায়?"

স্টেশনবাবু বললেন, "দেদার ভুট্টা।"

"তাই আনিয়ে দিন।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "পোড়াবে কে?"

ফরেস্টবাবু বললেন, "আমার চাকর গোপাল।"

ভুট্টা এল। পোড়ানো হল। শ্রীধরবাবু বললেন, "এক বোতল 'রম্' থাকলে ভুট্টার চাটের সঙ্গে খাওয়া যেত।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করলেন, "আপনি 'রম্' খান নাকি?"

"আমি পল্টনে চাকরি করতুম, মদ-মাংস খেয়েই মানুষ। পল্টনে কেউ হবিষ্যি করে না। বিলিতি সভ্যতা পঞ্চ-'ম'কারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।"

"তা যেন হল। কিন্তু 'রম্' তো অতি খারাপ জিনিস?"

ফরেস্টবাবু বললেন, "গোপালের কাছে দু-এক বোতল হুইস্‌কি আছে।"

শ্রীধরবাবু বললেন, "ব্যোম ভোলানাথ!"

গোপাল এক বোতল হুইস্‌কির ছিপি খুললে।

ফরেস্টবাবু বললেন, "থাকি একা বন-জঙ্গলে, বাঘভালুকের মধ্যে। বিদ্যের মধ্যে শিখেছি এই হুইস্‌কি খাওয়া।"

ডাক্তারবাবু বললেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক নিয়মে, অর্থাৎ dilute

করে, খেতে পারেন।

তারকবাবু বললেন, তিনি dilute না করেই গলাধঃকরণ করবেন। কেননা মদ সকলের হাতে খাওয়া যায়, কিন্তু জল নয়।

আমি একা নির্জলা উপবাস করলুম।

অতঃপর আমার সহযাত্রীরা ধীরে সুস্থে হুইস্‌কি পান করতে আর মধ্যে মধ্যে ভুট্টা চিবোতে লাগলেন।

শ্রীধরবাবু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারেন না। তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে, "আমরা সকলেই অবিবাহিত, অবশ্য বিভিন্ন কারণে। কেন আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করি নি, তারই ইতিহাস বলা যাক। আমার নিজের কথাই প্রথমে বলছি—

"আমি যে বিবাহ করি নি তাতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই। চল্লিশ বৎসর নানা পল্টনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ পয়সাও রোজগার করি। কিন্তু সে রোজগার অনিশ্চিত। তাই বহু স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু তাদের কাউকেও বিয়ে করবার কথা কখনো মনে হয় নি। পল্টনে অবশ্য বিয়ে হয়, কিন্তু সে বিয়ে নিকে ও ঠিকে মাত্র। ও একরকম গান্ধর্ব বিবাহ যার ভিতর জাতবিচার নেই, দেনা-পাওনা নেই। এমন-কি, সৈনিকের দৈনিক বিবাহও চলে।

"আমি কুলীনের ছেলে, বহুবিবাহে আমার আপত্তি নেই। আমরা বিবাহ করি কুলীন-কন্যাদের কুল রক্ষা করবার জন্য, কিন্তু তাতে তাদের শীল রক্ষা হয় না। আমরা বিবাহ করেই খালাস— তারাও তাই। আমাদের ঐ শ্রেণীর স্ত্রীদের বিশেষরূপে বহন করতে হয় না। তারা luggage নয়। আর luggage ঘাড়ে করে পল্টনের camp-follower হওয়া যায় না। এখন বুঝলেন, আমি কিসের জন্য চিরকুমার। বয়স যখন পঞ্চাশ পেরোল, তখন আমি পল্টন থেকে আলগা হলুম। কিছু টাকা হাতে করে দেশে ফিরি নি, হিমালয়েই থেকে গেলুম— কখনো ডালহৌসী ও কখনো সিমলায়।

"এই সময় আমার এক ভাইপো আমার এক বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠালেন। আমি উত্তরে তাঁকে লিখলুম— গতা বহুতরা কান্তা, স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী। এই তো শুনলেন আমার ইতিহাস! চৌধুরীমশায়, আপনি অবশ্য এখনো বিয়ে করেন নি। আপনি কলেজের ছোকরা। আমার পরামর্শ শোনেন তো বাড়ি

ফিরেই বিয়ে করুন।”

এর পর ডাক্তারবাবু তাঁর আত্মজীবনচরিত বলতে শুরু করলেন—

“আমার বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। আমি ব্রাহ্মণ নই ; যদি হতুম তো পাচক ব্রাহ্মণ হতুম। আমাদের পারিবারিক ব্যাবসা ডাক্তারি। অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথি নয়— হাতুড়েপ্যাথি। আজকাল হাতুড়েপ্যাথির ব্যাবসা চলে না। তাই কাকার পরামর্শে হোমিওপ্যাথির একখানা বাংলা বই মুখস্থ করে ডাক্তারি শুরু করলুম। প্রথমে গাঁয়ে। আমাদের একটা বদনাম আছে, আমরা নাকি হামবড়ামি করি। Baileyর ভাই Kelly যে-রোগ সারাতে পারে না, আমরা নাকি এক ফোঁটা ওষুধে তা সারাই। কিন্তু আমরা নিজের বিদ্যের বড়াই করি নে, আমাদের ওষুধের গুণগান করি।

“আমি ব্যাবসা শুরু করলুম। আমারি কাকা আমার বিয়ে স্থির করলেন একজন মোক্তারের মেয়ের সঙ্গে। মেয়ে দেখে আমি ভড়কে গেলুম। কাকা কিন্তু নাছোড়বান্দা— টাকাটা-সিকেটার লোভে। মেয়ের হল ওলাউঠো— আমি বললুম, আমি এক বড়িতে সারিয়ে দেব। আমিও বড়ি খাওয়ালুম, সেও মারা গেল।

“মোক্তারবাবু বললেন যে, আমি বিষবড়ি খাইয়ে তাকে মেরেছি। এর পর গাঁয়ের লোক রটালে যে, আমি খুনে ডাক্তার। বেগতিক দেখে আমি দেশ থেকে পলায়ন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করলুম। সেই অবধি এই বুনো দেশে আমাদের ছোটো ছোটো সাদা বড়ি দিয়ে চিকিৎসা করছি, আর তাতেই খোরপোষ চলে যাচ্ছে। যে যাই বলুন, ঐ নিরীহ বড়ির তুল্য ওষুধ আর নেই।”

এক গুলি হোমিওপ্যাথিক ওষুধে যে লোক মারা যায়— এ কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। একমাত্র শ্রীধরবাবু বললেন যে, তিনি এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ওষুধ গিলতে প্রস্তুত।

তার পর তারকবাবু বললেন—

“এখন আমার কথা শুনুন। আমার দাদা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী। তিনি একদিন হঠাৎ heart failureএ মারা গেলেন— কিন্তু দাদাকে ছেড়ে গেলেন না। যখন-তখন দাদার সুমুখে এসে উপস্থিত হতেন, কিন্তু কোনো কথা কইতেন না। দাদা তাঁর স্ত্রীর প্রেতাত্মার উৎপাতে প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন, আর আমাদের সকলকেই প্রায় পাগল

করে তুললেন। আমরা গয়ায় প্রেতশিলায় বৌদিদির শ্রাদ্ধ করলুম। কিন্তু পারলৌকিক বৌদিদি দাদাকে ছাড়লেন না। এমন-কি, দাদা ট্রেনে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর স্ত্রী এসে তাঁর কাছে আবির্ভূত হলেন। তিনি অমনি ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করলেন। শেষটায় তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন, এবং দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুদিন পরে তিনিও মারা গেলেন। আমি তাঁর সঙ্গেই ঘুরতুম, কিন্তু কখনো তাঁর স্ত্রীর ছায়া দেখি নি। দেখেছি শুধু দাদার অসাধারণ কষ্ট। ডাক্তাররা বললে যে, দাদার যা হয়েছে তা mental disease। যদি তাই হয় তো mental disease যে কি ভয়ংকর বস্তু, তা বলা যায় না। এই ব্যাপারে আমার মনে যে ধাক্কা লেগেছিল, তাতে বিয়ের নাম শুনলে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সেই ধাক্কায় আমি চিরকুমার।"

শ্রীধরবাবু বললেন, "monogamyতে এই বিপদ ; বহুবিবাহের বিপদ নেই। আপনারা বুঝি কুলীন নন, তাতেই আপনার দাদা এই ঘোর বিপদে পড়েছিলেন।" অন্য কেউ রা কাড়লেন না।

শেষটায় বনবিহারীবাবু বললেন—

"আমার বিয়ে না করবার কারণ আরো অদ্ভুত। আমার বাবা ছিলেন একজন বড়ো ফরেস্ট-অফিসার। তিনিই সাহেবদের বলে-কয়ে আমাকে এ চাকরিতে বাহাল করেন। আমি ছিলুম Rangaroon ফরেস্টের অফিসার। ঐ প্রকাণ্ড বনের ভিতর একটা ছোট্ট ইনস্পেকশন বাংলো আছে। মধ্যে মধ্যে আমাকে সেখানে গিয়ে দু তিন রাত কাটাতে হত। সে বাংলোর খবরদারি করত একটি বৃদ্ধ নেপালী, আর তার সঙ্গে থাকত তার একটি নাতনী। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। রঙ ফরসা, আর নাক চোখ বাঙালির মতো। আমার তখন যাকে বলে প্রথম যৌবন। তাই আমি সেই মেয়েটিকে বিবাহ করব স্থির করলুম। তার পর শুনলুম যে, সে পূর্ব অফিসার দাস-সাহেবের মেয়ে। দাস-সাহেব হচ্ছেন আমার পিতা। এ কথা শুনে আমি গভর্নমেণ্টের চাকরি ইস্তফা দিয়ে চলে আসি। তার পর এ অঞ্চলের একটি রাজার ফরেস্ট-অফিসার হয়েছি। এর পর থেকে বিয়ের নাম শুনলে আমার গা পাক দিয়ে ওঠে।"

চার চিরকুমারের চারটি গল্প শুনে শ্রীধরবাবু বললেন, "এখানে যদি কোনো লেখক থাকত তো এই চারটি গল্প লিখলে একখানি নতুন চাহার দরবেশ হত।"

ডাক্তারবাবু বললেন যে, "আমরা তো দরবেশ নই।"

শ্রীধরবাবু উত্তর করলেন, "যে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে সেই দরবেশ। আমার ও দুই নেই। আপনারা অবশ্য এখনো কাঞ্চন ছাড়েন নি। ও শুধু ভূতের ব্যাগার খাটা! শুনতে পাই যে শাস্ত্রে বলে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। যার গৃহিণী নেই, তার গৃহও নেই। আর যে গৃহহীন, সেই তো দরবেশ।"

অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৪৭

সারদাদাদার সন্ন্যাস

ফার্স্ট ক্লাস ভূতের গল্প শোনবার দু-চারদিন পরে সারদাদাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি ভূতের গল্প ছাড়া আর-কোনো গল্প কি জানেন না? ভূতের গল্প নিত্য শুনলে তা আর অদ্ভুত ঠেকে না।"

আমার এ প্রশ্নের কারণ— আমার ছোট্দা ছিলেন বিজ্ঞ প্রকৃতির লোক। যে গল্পের ভিতর কোনো শিক্ষা নেই, সে গল্প তাঁর মতে বাজে গল্প। ছোট্দা পড়তেন শুধু Smilesএর '*Self-help*'। ঐ বইটিই ছিল তাঁর বিলেতি হিতোপদেশ।

সারদাদাদা উত্তর করলেন, "আমি তো আর বঙ্কিম চাটুজ্যে নই যে, দেখে নি, শুনি নি, এমন গল্প মন থেকে বানিয়ে বলব আর হিজিবিজি জগৎসিংহ লিখব? আমি যা নিজে দেখেছি, তাই তোমাদের শোনাতে পারি। থাকি পাড়াগাঁয়ে, বাঁশ ও বেতের বনে আর জমিদারদের দলে— সেখানে ভূত ছাড়া আর কি দেখব? তবে জেল থেকে বেরিয়ে আর-একটা বিপদে পড়েছিলুম, তারই গল্প বলতে পারি।"

আমি বললুম, "তাই বলুন। মানুষের গল্পমাত্রেই তো বিপদের গল্প আর প্রেমের গল্প। আর মাস্টারমশায় আমাদের বলেছেন, কারো যেন প্রেমে পোড়ো না; কেননা প্রেমে পড়ার মানেই বিপদে পড়া।"

ছোট্দা বললেন— বিপদের গল্প তিনিও শুনতে চান, কারণ বিপদ কাটাবার একমাত্র উপায় self-help!

২

ছোট্দা অভয় দেবার পর, সারদাদাদা তাঁর বিপদের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন— শ্রবণ করো। আমার অপূর্ব কারাবাসের কথা আর কিছু বলব না। অপূর্ব বলছি এই কারণে যে, কারাবাস ইতিপূর্বে আর কখনো ভোগ করি নি।

সে যাই হোক, আমার বেরোবার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই ভয় হতে লাগল— জেল থেকে বেরোব কি পরে, এই কথা ভেবে। বর্ধমানে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনুগ্রহ করে যে পাছাপেড়ে শাড়িখানা দিয়েছিলেন— যেখানি পরে জেলে আসি— সেখানি জেলেই চুরি গিয়েছিল। আর জেলের উর্দি তো

জেলেই রেখে আসতে হবে। একবার বিবস্ত্র হয়ে রেল থেকে নেবে জেলে গিয়েছিলুম, আবার বিবস্ত্র হয়ে রাজপথে বেরোলে পাগলা গারদে যেতে হবে —এই ভয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেল। ভেবেচিন্তে কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে শেষটা 'জেলদার'বাবুর কাছে গিয়ে আমার বস্ত্রের অভাব জানালুম। জেলারবাবুর পিতৃদত্ত নাম জলধর; কয়েদীরা তাঁকে জেলদারবাবু বলেই জানে। জেলদারবাবু অতি সহৃদয় লোক। তিনি আমার কথা শুনে বললেন, "এর জন্য আর ভাবনা কি? বাড়ি থেকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আনান, আমার স্ত্রী সব কিনে-কেটে দেবেন। কয়েদীদের টাকা আনবার নিয়ম নেই— তাই লুকিয়ে আনতে হবে। আমার স্ত্রী যে-সে স্ত্রী নয়, শিক্ষিতা মহিলা ও হিসেবে পাকা। শুভংকরী তাঁর মুখস্থ; আর তা ছাড়া তাঁর রুচিও পয়লা নম্বরের। সাহেবসুবোরাও তাঁর রুচির তারিফ করেন। আমার ধর্মপত্নী আদরিণী আগুরানীর নামে যেন মনিঅর্ডার আসে।" আমি এ প্রস্তাব শুনে আশ্বস্ত হলুম। কেননা কয়েদীদের মধ্যে আমি জেল-গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলুম; এতদূর প্রিয়পাত্র যে, আমি ভয় পেয়েছিলুম হয়তো তিনি কবে বলে বসবেন— 'আবার বলি জেলদার! এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!'— ভয় পাবার কারণ এই যে, আদরিণী ছিল রূপে বাঁদরিণী।

সুখদাকে চিঠি লিখলুম, টাকা এল। তার পর জেলদারবাবু আমাকে রেলির লাট্টুমার্কা আট-হেতো কোরা ধুতি, জেলেবোনা ঝাড়নের একটি কুর্তা, আর পাঁচহাতি একখানি গামছা এনে দিলেন; সেইসঙ্গে কাশীর একখানি থার্ডক্লাসের টিকিট এবং খোরাকির জন্য চার আনা দিলেন। শিক্ষিতা মহিলার রুচি দেখেই আমার চক্ষুস্থির। তবে বুঝলুম যে, শিক্ষিতা মহিলা স্বয়ং শুভংকরী। আর তখন আমার মনে পড়ে গেল যে, আমার সেই ভিক্ষালব্ধ শাড়িখানি উক্ত শিক্ষালব্ধ মহিলার শ্রী-অঙ্গের শোভাবর্ধন করছে দেখেছি। শুধু নীলবড়ির রঙে ছুপিয়ে তাকে নীলাম্বরী করা হয়েছে।

তার পরদিন ভোরবেলায় কোরা ধুতিখানা লুঙ্গির মতো পরে, জেলের ঝাড়নের কুর্তি গায়ে দিয়ে, গামছাখানি কোমরে বেঁধে, পয়সা চার আনা ট্যাঁকে গুঁজে, খালি পায়ে স্টেশনে গিয়ে উঠলুম। ভাগ্যিস রাস্তায় কোনো লোকজন ছিল না। কারণ সেজেছিলুম নীচে মুসলমান, উপরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

স্টেশনে গিয়ে যে গাড়ি সুমুখে পেলুম তাতেই চড়ে বসলুম। শুনলুম এ

গাড়ি কাশী যাত্রা করবে। দেখলুম থার্ডক্লাস কামরা লোকে ভর্তি; সব সাঁওতাল ও বাউরি মেয়ে ও পুরুষ। সবই কয়লার খনির মজুর ও মজুরনী। মেয়েরা আদরিণী আগুরানীর তুল্য কয়লার মতো কালো; আর পুরুষরা জলধরবাবুর মতো কদাকার। কি ময়লা তাদের কাপড়, আর কি দুর্গন্ধ তাদের গায়ে! সে যাই হোক, কতক নেবে গেল রানীগঞ্জে, বাদবাকি আসানসোলে। গাড়িতে রইলুম শুধু আমি আর অস্থিচর্মসার একটি সাধু-বাবাজি— পরনে গেরুয়া ও মাথায় জটা।

তিনি আমাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "মশায় বাঙালি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নাম কি?"

"সারদা সান্যাল।"

"বাড়ি কোথায়?"

"নানা স্থানে। যেখানে যখন থাকি, সেখানেই আমার বাড়ি।"

"কি করেন?"

"কিছুই না।"

"তা হলে আপনি ভবঘুরে?"

"হ্যাঁ তাই।"

"কোথায় যাচ্ছেন?"

"কাশী।"

"আসছেন কোথা হতে?"

"জেল থেকে।"

"জেলে গিয়েছিলেন কি অপরাধে?"

"গাঁজা খাই বলে। যদিচ গাঁজা আমি কস্মিন্‌কালেই খাই নি।"

"খেলে যেতেন না।"

"কেন?"

"ত্বরিতানন্দ সেবন করলে সাধু হতেন। জেলে খুব কষ্ট হয়েছিল?"

"সে আর বলতে।"

"আপনি ভবঘুরে নিষ্কর্মা গৃহহীন— আপনার পক্ষে সাধু হওয়াই কর্তব্য।"

"তাতেও তো বহু কষ্ট।"

"মোটেই না।"

"কিরকম ?"

"সাধুর 'ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'।"

"সে ভোজন কীদৃশ ?"

"কোনোদিন আটা ও ঘি, কোনোদিন লঙ্কা ও ছাতু, আর দুধ না চাইতেই পাওয়া যায় মেয়েদের কাছে। আর হট্টমন্দির শ্বশুরমন্দিরের চাইতে ঢের ভালো আর শ্রীঘরের তুলনায় তো স্বর্গ।"

"আপনি কখনো জেলে গিয়েছিলেন ?"

"পূর্বাশ্রমের কথা বলা আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে গৃহস্থাশ্রম মাত্রেই তো জেল, সন্ন্যাসেই মুক্তি।"

"পরিবারের মায়া কাটান কি করে ?"

"'তুমি কার কে তোমার' এই মন্ত্র জপ করে।"

"মহারাজের নাম কি ?"

"গুরুদত্ত নাম ভূমানন্দ, কিন্তু লোকে বলে ধূমানন্দ। এই লৌকিক নামেই আমি পরিচিত এবং ঐ নামই আমি পছন্দ করি।"

"কেন ?"

"ধূম্রলোকই তো আনন্দলোক।"

"মহারাজের যাওয়া হচ্ছে কোথায় ?"

"কেদারনাথ। যেখানে 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'।"

এর পর তিনি ঝুলি থেকে একটি গাঁজার কল্কে বার করে তাতে বড়ো তামাক সেজে এক টান ধূম পান করে 'ব্যোম ভোলানাথ' বলে চোখ বুজলেন। সে চোখ আর কাশী পর্যন্ত খুললেন না। আমি ভাবলুম— আমি গাঁজা না খেয়ে নরকে গেলুম, আর ভূমানন্দ স্বামী বোধ হয় খেয়ে সশরীরে স্বর্গে গেলেন! কাশী স্টেশনে পৌঁছেই দেখি সুখদার পুরাতন ভৃত্য কাশীমোহন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে আছে। কাশীমোহন একটি এক্কা করে আমাকে বাঙালিটোলায় সুখদার বাড়িতে নিয়ে গেল। আমাকে দেখেই সুখদা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং বললে, "এ কি চেহারা, এ কি সাজ!"

জেলে আমার মাথা নেড়া করে দিয়েছিল এবং রেখে দিয়েছিল একটি আধ হাত লম্বা টিকি। মাসাবধি দাড়িগোঁফ কামানো হয় নি, তাই ঠোঁটে আর

থুতনিতে শুয়োরের কুচির মতো চুলগুলো খাড়া হয়েছিল। আর বেশ? পয়লা নম্বরের রুচিওয়ালী শিক্ষিতা মহিলার রুচির সঙ্গে একটি পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা ব্রাহ্মণকন্যার রুচির মিল হল না। সুখদা বললেন, "হয় তুমি জেলে ফিরে যাও, নয়তো ও বেশভূষা ত্যাগ করো।"

আমি বললুম, "ছাড়তে রাজি আছি, কিন্তু পরি কি?"

সুখদা কাশীমোহনকে হুকুম দিল, "সান্যাল মশায়ের ও-জামা ছিঁড়ে ফেলো, আর কেদারঘাটে গিয়ে দাড়িগোঁফ কামিয়ে গঙ্গাস্নান করিয়ে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে ভদ্রলোক সাজিয়ে নিয়ে এসো। আর মাথার একটা টুপি কিনে দিয়ো।"

আমি আর কোনো প্রতিবাদ করলুম না, কেননা সুখদার তখন রাগে হিস্টিরিয়া হয়েছে। কাশীমোহন সুখদার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে। আমি ভদ্রলোক সেজে ফিরে এসে দেখি সুখদার হিস্টিরিয়া কেটে গিয়েছে। অনেক দিন পরে সুখদার ওখানে ভূরি-ভোজন করে অবশ্য তৃপ্তিলাভ করলুম। কিন্তু মাসাবধিকাল জেলে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে তার পর রেলগাড়িতে ধূমানন্দ স্বামীর পরামর্শ শুনে আমার মনে ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। তাই সন্ন্যাস অবলম্বন করবার মনস্থ করলুম।

বিকেলে আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় কাশীবাসী প্যারীমোহনদাদার ওখানে গেলুম তাঁর মত নিতে। তিনি ছিলেন একজন মস্ত বড়ো ফিলজফার।

প্যারীমোহনদাদা বললেন যে, "এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আমিও সন্ন্যাস অবলম্বন করতুম, যদি-না অমি ঘোর নাস্তিক হতুম। ভগবান দর্শন করবার যার লোভ নেই, তার পক্ষে সন্ন্যাস বিড়ম্বনা। আমি তোমাকে একটি বিশিষ্ট চতুর ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাব, যাঁর সঙ্গে সাধুদের দহরম-মহরম আছে। তিনিই তোমার দীক্ষার বন্দোবস্ত করে দেবেন। লোকটি নিজে গৃহস্থ হলেও সাধুদের মুরুব্বি। লোকটির নাম রতিলাল মোতিলাল, কুলীন ব্রাহ্মণ ও কান্তিলাল কাঞ্জিলালের মাসতুতো ভাই। ছিলেন পুলিসের বড়ো কর্মচারী, এখন পেনসন নিয়ে কাশীতে ধর্মকর্মে মন দিয়েছেন। কাঞ্জিলালও পুলিসের একটি লোক— কাশী এসেছেন তদন্তে।"

প্যারীমোহনদাদার সঙ্গে সন্ধ্যার পর রতিলাল মোতিলালজির ওখানে গেলুম। তাঁর ঘর সুসজ্জিত ইংরেজি কায়দায়, সাহেবসুবো প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে বলে। প্যারীমোহনদাদার কাছে আমাদের আগমনের

কারণ জেনে তিনি আমাকে একনজর ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, "একে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করা চলবে, কারণ এঁর দেখছি ধর্মে মতি আছে।" প্যারীমোহনদাদা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে জানলেন?" তিনি উত্তর করলেন, "ওঁর মুণ্ডিত মস্তক ও দীর্ঘ শিখাই তার প্রমাণ।" তার পর মোতিলালজি ও প্যারীমোহনদাদা উভয়ে ব্রাণ্ডি পান করতে শুরু করলেন। প্যারীমোহনদাদা মদ কিনে খান না, কিন্তু অন্যে দিলে ছাড়েন না। আমাকে একপাত্র গলাধঃকরণ করতে মোতিলালজি অনুরোধ করায় আমি অস্বীকৃত হলুম। তিনি বললেন, "সন্ন্যাসীর একটা-না-একটা নেশা চাই—হয় গাঁজা, নয় আফিং, নয় সুরা। তা না হলে সন্ন্যাসের নেশা ছুটে যায়। সাদা চোখে ভগবানের দর্শন মেলে না।"

প্যারীদাদা বললেন, "লাল চোখে যদি মিলত, তা হলে আপনি আর আমি একদিন-না-একদিন নিরাকার ভগবানের দর্শন পেতুম।"

মোতিলালজি বললেন, "তোমার ও আমার পান তামসিক পান। মন্ত্রপূত সাত্ত্বিক পান নয়।"

"তবে আপনি সারদাকে পানানন্দ স্বামীর চেলা করে দিন।"

মোতিলালজি উত্তরে বললেন, "প্যারীমোহন, তুমি ঘোর নাস্তিক। সিদ্ধযোগী প্রাণানন্দ স্বামীকে কিনা পানানন্দ বললে!"

"লোকসমাজে তো তিনি পানানন্দ বলেই পরিচিত।"

"সে তোমার মতো নাস্তিকদের দলেই।"

অতঃপর স্থির হল, আমি প্রাণানন্দ স্বামীর কাছেই দীক্ষিত হব।

রতিলাল মোতিলালজি অসাধারণ করিৎকর্মা লোক। তার পরের দিনই প্রাণানন্দ স্বামী ওরফে পানানন্দ স্বামী আমাকে দীক্ষা দিলেন। গুরুজি আমার নাম দিলেন, পঞ্চানন্দ ব্রহ্মচারী। কেননা মানুষের ভিতরে আছে পঞ্চপ্রাণ, বাইরে পঞ্চ ভূত, আর পঞ্চভূতের সঙ্গে পঞ্চপ্রাণের যোগসাধন করতে হয় পঞ্চমকার দিয়ে। তার পর গুরুজি বললেন, "আমাকে কিছুদিনের জন্য মানসসরোবরে যেতে হবে। ফিরে এসে তোমাকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দেব। তখন তুমি লোটাকম্বলের অধিকারী হবে। যে কদিন আমি মানসসরোবরে থাকব, সেই কদিন তুমি আমার স্থানাভিষিক্ত থাকবে। তোমাকে প্রতি সন্ধ্যায় ঘণ্টাখানেক শিবনেত্র হয়ে থাকতে হবে, অর্থাৎ চোখের পাতা উল্টে।

তার পর আমার ভক্তদের ধর্মোপদেশ দিতে হবে।”

আমি জিজ্ঞেস করলুম, “কি উপদেশ দেব?”

তিনি বললেন, “বর্ণপরিচয় তো পড়েছ, যে-সব গুণে গোপাল সুবোধ বালক হয়েছিল সেই-সব গুণের চর্চা করতে উপদেশ দিয়ো। ঐ উপদেশ সদুপদেশের প্রথম ও শেষ কথা।”

আমি রাজি হলুম। সেই রাত্তিরেই গুরুজি অন্তর্ধান হলেন।

তার পরদিন আমি বর্ণপরিচয় মুখস্থ করে প্রাণানন্দ স্বামীর আশ্রমে শিবনেত্র হয়ে আসন গ্রহণ করলুম। এমন সময় রতিলাল মোতিলালের মাসতুতো ভাই কান্তিলাল কাঞ্জিলাল জনকতক লাল পাগড়িধারী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে আমাকে না-বলা-কওয়া গ্রেপ্তার করলেন; হাতে দিলেন হাত-কড়া আর পায়ে বেড়ি।

আমার নাম নাকি ঝড়ু তালুকদার ও আমি নাকি লাল খাঁকে হাড়কাঠে ফেলে বলিদান দিয়েছি। তার পর ফেরার হয়ে স্বামীজি হয়ে বসেছি। সেখানে মুন্সিবাবুদের সঙ্গে আর-একটি জমিদারের মহা কাজিয়া হয়েছিল। এই কাজিয়াতে ঝড়ু তালুকদার খুন করে।

আমি কিছু বলবার আগেই মোতিলালজি বললেন, “বেটা তো আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।” তার পর বললেন, “তোমার কিছু ভয় নেই, আমি তোমাকে জামিনে খালাস করব আর বড়ো উকিল ভোজপুরী গিরিধারিলালকে দিয়ে defend করাব।”

সেই রাত্তিরেই তিনি খোট্টা হাকিমের বাড়ি গিয়ে আমাকে জামিনে খালাস করলেন ও জামিন হলেন প্যারীমোহনদাদা। তার পর আমরা হাকিমের বাড়ি থেকে উকিলের বাড়ি গেলুম ও তাকে সঙ্গে নিয়ে সুখদার বাড়ি চললুম। উকিলবাবুর বিশাল বপু, গলার আওয়াজও তদ্রূপ। মামলার বিবরণ শুনে তিনি বললেন যে আমাকে খালাস করা কঠিন, এর জন্য ঢের তক্‌লিফ করতে হবে। তবে ফি ৫০০ ও হাকিমের বক্‌শিশ আর ৫০০ টাকা। এ টাকা না দিলে আমার নিশ্চয়ই ডবল ফাঁসি হবে।

প্যারীমোহনদাদা জিজ্ঞেস করলেন, “ডবল ফাঁসির মানে কি?”

উকিলবাবু চটে জবাব দিলেন, “আইনের কথা তোমরা কি বুঝবে?”

সুখদা পর্দার আড়াল থেকে সব শুনছিল। সে বললে, “আমি এক টাকাও

দেব না। তুমি নিজে মামলা চালাও। তুমি তো জমিদারদের তরফ থেকে চিরকালই মামলার তদ্‌বির করেছ। ঐ ছাতুখোর নির্বুদ্ধি উকিলের চাইতে তুমি মামলা ঢের ভালো চালাতে পারবে।"

প্যারীমোহনদাদাও সুখদার সঙ্গে সায় দিলেন ও বললেন, "বেটা বলে কিনা ডবল ফাঁসি! ওকে মারতে হলে অবশ্য ডবল ফাঁসি দিতে হত। একবার ফাঁসি ছিঁড়ে পড়বে তার পর ওকে তুলে আর-একবার ঝোলানো হবে।"

অগত্যা আমাকে self-helpই অবলম্বন করতে হল। গিরধারি মহা রেগে চলে গেলেন এই বলে যে— বাঙালি লোক "বহুত বেওকুফ আওর বখিল হ্যায়"।

পরদিন এগারোটায় আদালতে হাজির হলুম— আমি, মোতিলালজি ও প্যারীমোহনদাদা। গিয়ে দেখি গিরধারি উকিল সেখানে বসে আছেন। কান্তিলাল কাঞ্জিলাল আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী তিনজন খাড়া করেছিলেন— ভাগ্নে ও চুলপাকা দুজন লেঠেল। ভাগ্নে যে-বাড়ির দৌহিত্র, আমি সেই বাড়িরই দৌহিত্রের দৌহিত্র। আর লেঠেল দুজনেই আন্দামানফেরত। একজন লাল খাঁর মামাতো ভাই, অপরটি তাঁর সাকরেদ। প্রমাণ হল, উক্ত কাজিয়ায় লাল খাঁর গলা কাটা গিয়েছিল। কিন্তু কে কেটেছে কেউ তো তা স্বচক্ষে দেখেন নি। ভাগ্নে শুধু পরের মুখে শুনেছেন। আর লেঠেল দুটি বললে, তারা লাল খাঁর কাটা মুণ্ডু দেখেছে, কিন্তু সে কাটা মুণ্ডু কোনো কথা কয় নি।

আর প্রমাণ হল তখন আমি সবে জন্মেছি, আর আমি ঝড়ু তালুকদার ওরফে প্রাণানন্দ স্বামীও নই। হাকিম বললেন যে, facts সবই আমি যে নির্দোষ তাই প্রমাণ করে।

গিরধারি লাফিয়ে উঠে বললেন যে, আপনার কথায় একটিও law-point নেই।

হাকিম এতয়ারী তেওয়ারী বললেন, "কেঁও নেহি হ্যায়? এ মামলা তামাদি হো গিয়া।"

ভোজপুরী গিরধারি বললে, "তামাদি হো নেহি সকতা। ইস্‌কো ফাঁসিকা হুকুম দিজিয়ে।"

তার পর উকিলে ও হাকিমে তামাদির আইনের মহাতর্ক বাধল।

সে তর্কের কথা আর বলব না। কেননা তার কোনো মাথামুণ্ডু ছিল না। তার পর প্যারীদাদার পরামর্শে আমি বললুম, "হুজুর, ভোজপুরী গিদ্ধর চিল্লাতা

কেঁউ ?”

উকিল বললেন, “হাম গিদ্ধর নেই, সিংহ হ্যায়।”

আমি বললুম, “হো সক্‌তা, মগর সরকারকো ওকিল তো নেহি হ্যায়।”

হাকিম বললেন, “এ বাৎ ঠিক।” এবং আমাকে বেকসুর খালাস দিলেন।

এ গল্প শুনে ছোট্‌দা খুশি হলেন, কারণ এর ভিতর বিপদও আছে ; self-help'ও আছে।

মা বললেন, “এ গল্প আগাগোড়া মিথ্যে।”

১৩৪৮

ধ্বংসপুরী

দিন পনেরো আগে একটি পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বছরখানেক আগে কোনো কাজে বিলেত গিয়েছিলেন দিন দশ-বারোর জন্য। কিন্তু এক বছর সেখানে ছিলেন ফেরবার জাহাজ পান নি বলে।

আমি পুরানো বিলেত-ফেরত, তাই তিনি বললেন, "আপনি আবার গেলে সে দেশ চিনতে পারবেন না। যে শহরেই যান— চোখে পড়বে শুধু ধ্বংসপুরী। বড়ো বড়ো ইমারত সব ভূমিসাৎ হয়েছে, না হয় তো ভাঙাচুরো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে; কারো ছাদ নেই, কারো আধখানা আছে— বাকি আধখানা মাটিতে মিশিয়ে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, ইংরেজজাত আজও দাঁড়িয়ে আছে। যদিচ লোক মরেছে অসংখ্য। লণ্ডন শহরে নাকি হতাহতের দৃশ্য ভীষণ। বিশেষত গরিব লোকদের পাড়ায়। শ'য়ে শ'য়ে আবালবৃদ্ধবনিতার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। অবশ্য শব সরিয়ে নেবার বন্দোবস্তও আছে। ইংরাজরা যে বাহাদুর জাত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

এ কথা শুনে আমার মনে পড়ে গেল যে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে বিলেতে আমি একটি ধ্বংসপুরী দেখে চমকে উঠি। তার মর্মস্পর্শী স্মৃতি আমার মনে আজও টাটকা রয়েছে। সে বাড়ি যেন একটি ইঁট-কাঠের tragedy।

আমি তখন ছিলুম পোর্‌লক্ নামে একটি ছোটো গ্রামে। তার এক পাশে ছিল সমুদ্র আর-এক পাশে পাহাড়— অর্থাৎ কিছু উঁচু জমি। মধ্যে যেটুকু সংকীর্ণ জমি, তার উপরে ছিল কতকগুলি ছোটো ছোটো cottage। বিলেতে cottageও দিব্যি বাসযোগ্য। যে cottageএ আমি ছিলুম, তার গৃহকর্ত্রী ছিলেন অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী এবং ব্যবহারে মোলায়েম। আর খেতে দিতেন সকালে রুটিমাখন, চাকভাঙা মধু ও গৃহজাত cream ও strawberry। সে তো খাদ্য নয়— অমৃত। উপরন্তু গ্রামটি ছিল নির্জন ও শান্ত। কোনো কারণে তখন আমার মনে অশান্তি ছিল, তাই শান্তশিষ্ট গ্রামটি আমার বড্ড ভালো লাগল। যে দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকরাও ভদ্র, সেই দেশই সভ্য।

পোর্‌লক্ থেকে দুবার অন্যত্র গিয়েছিলুম, একবার fox-hunting দেখতে— আর-এক বার একটি পাড়াগেঁয়ে মেলা দেখতে।

উক্ত গ্রামে একটি ভদ্র পরিবার বাস করতেন, যাঁদের সঙ্গে আমাদের

বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মেছিল। তাঁদের সঙ্গেই আমরা fox-hunting দেখতে যাই।

ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দেখি, অনেক স্ত্রী পুরুষ বড়ো বড়ো ঘোড়ায় চড়ে শিকারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। দেখলুম স্ত্রীলোকরাও পুরুষদের মতো ঘোড়ার দু পাশে পা ঝুলিয়ে অশ্বারূঢ় রয়েছে আর তাদের গায়ে লম্বা লম্বা কোট। এঁরা সকলেই বিলেতের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। এঁদের ভিতর আমার একটি মহিলার মুখ চেনা ছিল। দু বৎসর আগে এই অঞ্চলের একটি হোটেলে তাঁকে দেখি ও শুনি যে তিনি একটি Lordএর স্ত্রী। মহিলাটি যেমন লম্বা তেমনি চওড়া আর ঘোড়ার মতো তাঁর মুখ। আর তাঁর মুখের রঙও লাল। তিনি যথেষ্ট whiskey পান করতেন।

এ শিকার ছেলেমানুষী। কুকুরে খুঁজে খ্যাঁকশেয়ালী বার করে, আর সকলে মিলে তাকে তাড়া করে— পগার ডিঙিয়ে, বেড়া টপ্‌কে। আর কুকুরেই সেই খ্যাঁকশেয়ালী মারে। এ শিকার ইংরাজ জাতির আদিম বর্বরতার পরিচায়ক। আমি এই শিকার দেখে বিরক্ত হয়েছিলুম। হাসিও পেয়েছিল এই আবিষ্কার করে যে, জাতির সভ্যতা একটি মিশ্র সভ্যতা; অর্থাৎ আদিম প্রাকৃত বর্বরতার উপরে সংস্কৃত সভ্যতা আরোপিত হয়েছে।

আর-এক বার পূর্বোক্ত ইংরাজ বন্ধুদের অনুরোধে একটি পাড়াগেঁয়ে মেলা দেখতে যাই। এ দেশের পাড়াগেঁয়ে মেলার সঙ্গে বিলেতের গ্রাম্য মেলার বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। সেখানেও দেখলুম নাগরদোলা আছে আর ঘোড়ার দোলা। বহু স্ত্রীপুরুষ সেই-সব কাঠের ঘোড়ার উপর আসোয়ার হয়ে চক্রাকারে ভ্রমণ করছে। আর বিক্রি হচ্ছে টিনের ভেঁপু, চীনে মাটির খেলনা। আর চার পাশে খাটানো হয়েছে কতকগুলি ছোটো ছোটো তাঁবু, যার ভিতর বোধ হয় জুয়াখেলা চলছে আর সস্তা মদ বিক্রি হচ্ছে— যে মদ লোকের পেট ভরে কিন্তু হঠাৎ মাথায় চড়ে না।

নতুনের মধ্যে দেখলুম স্ত্রীস্বাধীনতার দেশে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা— অর্থাৎ ছুটোছুটি করবার, চিৎকার করবার, চেঁচিয়ে হাসবার বে-পরোয়া স্বাধীনতা। ছেলেদের আনন্দ ও মেয়েদের আমোদের ঝড় যেন ঐ মেলায় বয়ে যাচ্ছে। আমরা এ দেশে স্ফূর্তি করে আমোদ করতেও ভুলে গিয়েছি। জনগণের এই উদ্দাম আমোদ দূর থেকে দেখতে আমার ভালো লাগে, যদিচ

এ আমোদে আমি যোগ দিতে পারি নে।

আমাদের দেশে সেকালে এই ধরনের উৎসব ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় হর্ষবর্ধনের রত্নাবলী নাটকে। সেকালে যা বসন্তোৎসব ছিল, তার অপভ্রংশ হচ্ছে একালের 'হোরী'। আর বাঙলার বাইরে 'হোরী' খেলা জনগণের একটি শিকল-ছেঁড়া উৎসব।

সে যাই হোক, বেশিক্ষণ এ নাটকের দর্শক হওয়া যায় না। পুরুষের মত্ততা ও স্ত্রীলোকের তাণ্ডবনৃত্য সভ্যতার নিদর্শন নয়, মানবপ্রকৃতির আদিমতার লক্ষণ। জনগণের বারোমেসে জীবন নিরানন্দ, তাই খাটুনি থেকে ছুটি পেলে তারা এইরকম স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ করে থাকে।

আমি বেহারে মহরম দেখেছি। সেখানে আমার বাল্যকালে হিন্দু-মুসলমান নির্বিচারে সকলে একত্র মিলে এই জাতীয় আমোদ করত। এখন হয়তো করে না ; কেননা ইতিমধ্যে আমরা সভ্য হয়েছি, আর এ-হেন ব্যাপার সভ্যতার একটি অঙ্গ নয়।

অতঃপর ইংরাজ বন্ধুদের অনুরোধে মাইল-দুয়েক দূরে একটি ধ্বংসপুরী দেখতে গেলুম। সে বাড়িটা প্রায় সমুদ্রের ধারে— আর সমুদ্রের গায়ে এক সার willow গাছ আছে। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হলুম, তখন সমুদ্র থেকে জোর হাওয়া বইছে আর তার সোঁ সোঁ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, যেমন এ দেশের ঝাউ গাছের মধ্যে দিয়ে বাতাস এলে শোনা যায়। এই নির্জন পুরী দেখে ও এই আওয়াজ শুনে মন উদাস হয়ে গেল।

বাড়িটি প্রকাণ্ড ও পাথরে গড়া। ঐ পুরী জীর্ণ নয়, কিন্তু কতক অংশ ভাঙাচোরা। বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখি যে তার ঘরগুলো মস্ত মস্ত— আজও তার দেয়াল ওক-কাঠে মোড়া। একটি ঘর দেখলুম যার ছাদ ভেঙে পড়েছে, উপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। এ কালে হলে বলতুম যে জার্মানরা বোমা মেরে ভেঙে দিয়েছে। শুনলুম এইটিই ছিল বাড়ির মালিকের Banqueting Hall। যাঁর এ বাড়ি ছিল, তাঁর কোনো ওয়ারিশ নেই। এই পরিত্যক্ত বাড়ি কেন আজও যে দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারলুম না অর্থাৎ কেন যে ভূমিসাৎ করা হয় নি। বাড়িটির পাথর সব যেখানে যে ভাবে ছিল, সেখানে সেই ভাবেই আছে ; বড়ো বড়ো চৌকোষ থাম সেকালের স্মৃতি বহন করছে। কিন্তু দোর-জানালায় কবাট কমই। ঝড়বৃষ্টির সে বাড়িতে অবাধ প্রবেশ।

বাড়িটি তো আগাগোড়া হাঁ হাঁ করছে, আর তার অন্তরে সমুদ্রের বাতাস হু হু করছে। বাড়িটি যেন অভিশপ্ত আর এখন সেখানে ভূতপ্রেত বাস করছে। শুনলুম রাত্তিরে সে বাড়ির ভিতরে শোনা যায় শুধু চিৎকার আর কান্নার আওয়াজ। তাই এ বাড়িতে ভয়ে কেউ আসে না।

এই কিছুক্ষণ পূর্বে দেখে এসেছি জনগণের এই উদ্দাম আমোদ— তাই এই ধ্বংসপুরীর ইতিহাস শোনবার জন্য কৌতূহল হল। মেলা থেকে দু-চার জন এই ভুতুড়ে বাড়ি দেখতে এসেছিল। তাদের মুখে শুনলুম এ বাড়ি এককালে ছিল সবরকম পাপের আড্ডা— তাই ভগবানের শাপে তার এই দুর্দশা।

বাঙলাদেশে— বিশেষত এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে দুটি একটি আকারে-বিরাট পুরী দেখেছি। সে-সব বাড়ি তৈরি হয়েছিল ইংরাজ আমলের প্রথম দিকে— যে সময় জন কতক লোক অনেক জমির মালিক হন ও প্রকাণ্ড ধনী হয়ে ওঠেন। এ-সব বাড়ি মনোরম নয়, আর তাদের কোনো কারুকার্য নেই— আর পাথরে নয়, ইঁটে তৈরি বলে বহুদিন টিঁকে থাকবারও কথা নয়। কিন্তু এ-সব বাড়ি বিধ্বস্ত নয়— জীর্ণ। জরাজীর্ণ স্ত্রীপুরুষ দেখলে দুঃখ হয়— ভয় হয় না। কিন্তু যুদ্ধে আহত পুরুষ দেখলে ভয় হয়; তাদের হাত-পা ভাঙা ও বিকট চেহারা; অর্ধেক শরীরে যৌবন আছে— বাকি অর্ধেক খণ্ডিত; এমন-কি, মুখের আধখানা আছে, বাকি আধখানা বিনষ্ট। যারা এককালে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়েছিল তারা যে এখন অন্নের জন্য ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে— এ কথা মনে করে আতঙ্ক হয়। বিলেতে বোধহয় এখন এরকম বিকলাঙ্গ ও অপ্রিয়দর্শন বহু লোক আছে। যুদ্ধরূপ পাপ করে দেশের প্রভুরা, আর তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেশের দাসসম্প্রদায়।

সে যাই হোক— এই মর্মন্তুদ ধ্বংসপুরীর ইতিহাস কেউ জানে না। স্থানীয় লোক যাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তারা বললে তারা গ্রামবৃদ্ধদের কাছে এর ইতিহাস শুনেছে; আর সেই গ্রামবৃদ্ধরা যখন ছোকরা ছিল, তারাও তাদের গ্রামবৃদ্ধদের কাছে শুনেছে। অতএব এ পুরীর ধ্বংসের একটি কিম্বদন্তি আছে। সে কিম্বদন্তি এই—

এ পুরী ছিল সেই সম্প্রদায়ের একটি বড়োলোকের— যে সম্প্রদায় এখন fox-hunting করেন। সেকালে তাঁরা রাজার হয়ে যুদ্ধ করতেন। ফলে

তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠুর, নির্মম এবং যথেচ্ছাচারী।

এখন শৃগাল বধ করা যে-সম্প্রদায়ের হয়েছে নেশা ও পেশা, সেকালে মানুষ বধ করা ছিল তাদের ধর্ম ও কর্ম।

এ বাড়ির মালিক ছিলেন একটি নামজাদা যোদ্ধা ; তিনি বছর দু-তিন অন্য কোনো দেশে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। আর তাঁর পরমাসুন্দরী স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু একটি Lordএর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি একদিন না-বলাকওয়া হঠাৎ রাত দুপুরে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর বন্ধুটি শয়নমন্দিরেও তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

পরস্বাপহরণ যাঁদের ধর্ম, পরস্ত্রীহরণও তাঁদের নিত্যকর্ম। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির তাঁরা অবাধ চর্চা করতেন।

ফলে দুই বন্ধুতে সেই রাত্রিতে Banqueting Hallএ duel হল। দুজনের কাছেই তরবারি ছিল— লর্ডের স্ত্রী তাঁদের এ যুদ্ধ থেকে বিরত করতে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি এ মারামারি কাটাকাটি ঠেকাতে পারলেন না।

বাড়ির মালিক তাঁর বন্ধুটিকে বধ করলেন ও নিজে আহত হয়ে ভূমিশায়ী হলেন। তখন তাঁর স্ত্রী একটি বল্লম নিয়ে তাঁর স্বামীর বুকে বসিয়ে দিলেন।

যে বিকট চিৎকার ও কান্না আজও শোনা যায় সে ঐ লাটপত্নীর প্রেতাত্মার চিৎকার ও কান্না।

তার পর নাকি এই ভ্রষ্টা ও পতিহন্ত্রী মহিলাটি ঘোর ধার্মিক হলেন। আর দিনরাত ধ্যানধারণা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর একটি খঞ্জ ও কুব্জ গুরু জুটল। লোকটি যেমন কুৎসিত তেমনি গুণী— আর মদ্যপান করত প্রচুর। তিনি নাকি মন্ত্রবলে ভূত নামাতে পারতেন। আর ঐ Banqueting Hallএই নানারূপ ক্রিয়াকর্ম হত।

কিন্তু যাকে তিনি পরলোক থেকে টেনে নামাতেন সে হচ্ছে মাহিলাটির পতি— উপপতি নয়। মহিলাটি কিন্তু তাঁর উপপতিকেই দেখতে চাইতেন। তাঁর মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা দেখে তিনি চিৎকার করতেন ও উপপতিকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতেন। তিনিই ও-ঘরের ছাদ উপড়ে ফেলেছিলেন মাথায় একটি চূড়া বসিয়ে দিয়ে ঘরটিকে গির্জায় পরিণত করতে।

শেষটা তিনি পাগল হয়ে গেলেন এবং অতঃপর আত্মহত্যা করলেন।

সুতরাং বাড়িটিকে যিশুখৃস্টের নয়, ভূতপ্রেতের মন্দির আর করা হল না। অমনি পড়ে রয়েছে। আর তার গায়ে জড়িয়ে রয়েছে হত্যা ও পাগলামির স্মৃতি।

এ গল্প শুনে আমার মন আরো খারাপ হয়ে গেল। যদি প্রকৃতির কোনো উপদ্রবের— যথা ঝড় কিম্বা ভূমিকম্পের ফলে ও-পুরী ধ্বংস হত তা হলে আমার মন অত খারাপ হত না। কিন্তু মানুষের পাপের শাস্তির নিদর্শন বলেই আমার মন এত আহত হয়েছিল।

জনগণের মুখে শোনা এ গল্প ইতিহাস নয়— কিম্বদন্তি মাত্র। আর এ কিম্বদন্তির স্রষ্টা হচ্ছে জনগণের কল্পনা। সেই জনগণের— যারা মেলায় মদ্য পান করে, নৃত্য করে আর অবাধে স্ত্রীলোকদের চুম্বন ও আলিঙ্গন করে।

আর এ জাতীয় কল্পনা মানুষের যত বুক চেপে ধরে, কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ততদূর করে না।

উপরে যা লিখলুম তা গল্প হল কি না বলতে পারি নে, কিন্তু realityর এক টুকরো চিত্র। বলা বাহুল্য যাকে আমরা reality বলি, তা আছে একমাত্র মানুষের কল্পনায় অর্থাৎ মনে— তার বাইরে নেই। বাইরে যা আছে, তা realityর কঙ্কাল মাত্র। এ ধ্বংসপুরী আমি আজও ভুলতে পারি নি, তার স্মৃতি মধ্যে মধ্যেই আমার মনকে পীড়িত করে। বিশেষত আজকের দিনে।

১৩৪৮

সারদাদাদার সত্য গল্প

'যুগান্তর' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মুখপত্র

আপনাদের কাগজের পুজোর সংখ্যার অঙ্গ পুষ্ট করবার জন্য আমাকে একটি গল্প লিখতে অনুরোধ করেছেন।

গল্প লেখা অন্তত আমার পক্ষে কোনো কালে সহজ ছিল না; এখন তো কষ্টকরই হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মতো নবনব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধিতে আমি বঞ্চিত। উপরন্তু আমি এখন যুগপৎ জরাগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত। তার পর একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

এ অবস্থায় এমন গল্প লেখা সম্ভব নয় যে কথা লোকের মনোরঞ্জন করবে। স্ফূর্তি যখন অন্তরে নেই তখন তা বাইরে প্রকাশ করব কি করে?

ধরুন যদি আমার বয়েস তেয়াত্তর না হত, আর আমার মন যদি আত্মবশ থাকত— তা হলেও এ যুদ্ধের দিনে কোন্ বিষয়ে গল্প উদ্ভাবন করা যেত? ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ ছোটো গল্প লেখক গী দ্য মোপাসাঁর গল্পের পটভূমিকা হচ্ছে ফ্রান্স ও জার্মানীর যুদ্ধ। কিন্তু তখন ফ্রান্সে সত্যি যুদ্ধ হচ্ছিল। আর ভারতবর্ষে যুদ্ধ আজও আসে নি; এসেছে যুদ্ধের ভয়।

এ অবস্থায় লিখতে পারি সারদাদাদার মুখে শোনা একটি গল্প। তিনি কখন কোন্ বিপদে পড়েছিলেন এবং কি উপায়ে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন তারই গল্প তিনি বলতেন।

এখন দু কথায় সারদাদাদার পরিচয় দিই। তিনি আমার আত্মীয় কিন্তু কি সম্পর্কে আমিও জানি নে, অপর কেউও জানে না। তবে তিনি আমার মামার শালা বা পিসের ভাই নন। সে যাই হোক, তিনি গল্প বলতে পারতেন ও আমাদের তা শোনাতে পারতেন। তাঁর মুখে শোনা দুটি গল্প আমি ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেছি।

একবার তিনি ভুলক্রমে থার্ডকেলাসের বদলে ফার্স্ট কেলাসের গাড়িতে উঠেছিলেন— আর সে কামরায় ফার্স্টক্লাস ভূতের হাতে পড়ে নাস্তানাবুদ

হয়েছিলেন ও গাড়ি থেকে নেমে জেলে গিয়েছিলেন। তার পর জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর বৈরাগ্য জন্মায় আর তিনি কাশীতে গিয়ে ধূমানন্দ স্বামীর পরামর্শে পানানন্দ স্বামীর কাছে সন্ন্যাসীর দীক্ষা নেন। ফলে তিনি জন্মের পূর্বে যে খুন করেছিলেন, সেই খুনের আসামী হন। কিন্তু খুন হয় অসিদ্ধ— প্রমাণাভাবে ; তাই তিনি বেকসুর খালাস পেলেন।

আজ যে গল্পটি বলতে যাচ্ছি সেটি যখন শুনি তখন আমার বয়েস চোদ্দ। গল্পটি যে ভালো লেগেছিল, তার প্রমাণ আজও সেটি মনে আছে।

সেকালে সাহিত্যিকরা ছোটোগল্প লিখতেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছ লিখেছেন এর বহু পরে।

আমার কাঁচা বয়েসে গল্পটি যখন ভালো লেগেছিল, তখন আশা করছি একালের ছেলেমেয়েদেরও তা ভালো লাগতে পারে। পুজোর সময় সকলেই তো নাবালক হয়।

কথারম্ভ

এখন গল্পটি শুনুন। সারদাদাদা বললেন— আমার বয়েস যখন ষোলো, তখন আমি চণ্ডীপুরের জমিদারের বাড়ি থাকতুম। চণ্ডীপুরের জমিদারদের ছোটো তরফের বড়োবাবু আমার ভগ্নীপতির ভগ্নীপতি। অভদ্র ভাষায় বলতে হলে, আমি ছিলুম তাঁর শালার শালা। সে সময়ে ছোটো তরফের ভগ্নদশা ; তালুকমুলুক সব গিয়েছে, বাকি আছে শুধু কর্তাবাবুর বুকের পাটা।

বাবুর চেহারা ছিল যথার্থ পুরুষের মতো। তাঁর বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম, নাক ছুরির মতো, ঠোঁট কাঁচির মতো, চোখ তেজালো আর দেহ বলিষ্ঠ।

তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল ক্রিংকারি। কিন্তু লোকে তাঁকে খুনকারীবাবু বলত। তাঁর পিতা ছিলেন পঞ্চমকার সাধক— ঘোর তান্ত্রিক— তিনি নাকি একটি কাজিয়ায় একজন লেঠেলকে খুন করেছিলেন বলে। করেছিলেন কি না জানি নে কিন্তু করা সম্ভব। কারণ তিনি চমৎকার লাঠি খেলতেন, তলওয়ার খেলতেন, সড়কি খেলতেন, আর তীরন্দাজ ছিলেন পয়লা নম্বরের।

তিনি খুনের আসামী হয়েছিলেন এবং তাঁকে দায়রা সোপর্দ করা হয়েছিল। জুরিরা তাঁর রাজপুত্রের মতো চেহারা দেখেই তাঁকে বেকসুর খালাস দেয়।

এর পর তিনি ঘর থেকে বড়ো একটা বেরোতেন না— ঘরে বসেই যোগ

অভ্যাস করতেন। তাতে তাঁর দেহ আরো সুন্দর, আরো বলিষ্ঠ হয়।

তিনি কাউকেও ভয় করতেন না, ফলে তাঁকে সকলেই ভয় করত— আর তাঁর পাওনাদারেরা তাঁকে বাঘের মতো ডরাত।

চণ্ডীপুর একটি নদীর ধারে অবস্থিত। সে নদী ছোটোও নয়, বড়োও নয়— মাঝারি গোছের। বর্ষাকালে নদীতে অগাধ জল থাকত আর গ্রীষ্মকালে থাকত শুধু বালির চড়া; তখন এপার ওপার হেঁটে যাতায়াত করা যেত।

চণ্ডীপুরের বগলে মামুদপুর নামে ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম। সেখানে বাস করত একদল দুর্ধর্ষ মুসলমান; তারা সব যেমন জোয়ান, তেমনি লড়াক্কে।

তার গায়ে নদীর ধারে ছাতিমতলায় ছিল সরকারের থানা, আর অপর পারে ছিল সাপুর। এই সাপুরে নকুড় সা নামে একজন প্রকাণ্ড ধনী ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলের জমিদারদের টাকা ধার দিতেন চড়া সুদে।

ক্রিংকারিবাবু নকুড় সার কাছে মবলক টাকা ধার নিয়েছিলেন, কিন্তু সে ধার শুধতে পারেন নি।

নকুড় সা তাঁর কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে পারেন নি খুনকারী-বাবুর ভয়ে; কিন্তু হামেসা হাত জোড় করে তাগাদা করতেন। নকুড় সা ছিলেন ঘোর বৈষ্ণব, আর তাঁর গো-ব্রাহ্মণে ছিল অগাধ ভক্তি। তিনি ধনী হলেও ব্যবহারে ছিলেন অতি গরিব।

ক্রিংকারিবাবুর দুটি প্রভুভক্ত অনুচর ছিল, মবু ও আস্‌গারী। দুজনেই মামুদপুরের বাসিন্দা।

মবু আন্দামানফেরত। আস্‌গারী ছিল ছোকরা। এখনো তার জেলে যাবার বয়েস হয় নি। দুজনেরই নকুড় সার উপর ভয়ংকর রাগ ছিল— ক্রিংকারিবাবুকে টাকার জন্য উৎপাত করে বলে।

আস্‌গারী আমাকে একদিন বললে যে, মবু ও সে নকুড় সার বাড়িতে রাত্তিরে যাবে, তার কত টাকা আছে দেখবার জন্য। মবু নাকি জেল থেকে মন্ত্র শিখে এসেছে— যে মন্ত্রের বলে তালা খোলা যায়। আমার তখন বয়েস অল্প, ষোলোর বেশি নয়; তাই তাদের সঙ্গে যাবার লোভ হল। নকুড় সার টাকা দেখবার জন্য ততটা নয়, যতটা মবুর মন্ত্রশক্তি দেখবার জন্য।

তার পর একদিন অমাবস্যার রাত্তিরে আমরা তিনজন মাইলখানেক পায়ে

হেঁটে নকুড় সার বাড়িতে গেলুম রাত দুপুরে। দেখলুম এ বাড়ির অন্ধি-সন্ধি মবুর মুখস্থ। তার তোষাখানার তালা খুললে মবু— মন্ত্রবলে কি যন্ত্রবলে বুঝতে পারলুম না। ঘরে ঢুকে দেখি দেদার দশমণী চালের বস্তা দিয়ে চাপা লোহার সিন্দুক। সেই-সব সিন্দুকের ভিতর নাকি নকুড় সার সোনারুপোর টাকা আছে।

মবুর কাছে কিসের গুঁড়ো ছিল। সে সেই গুঁড়ো মেঝেতে ছড়িয়ে দিলে আর দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে দিলে— ঘর আলো হয়ে উঠল। মবু আস্‌গারিকে হুকুম দিলে— চালের বস্তার পেট ফাঁসিয়ে দেও। আস্‌গারি কোত্থেকে একখানি ছোরা বার করে সে হুকুম তামিল করলে। চাল চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল আর গুঁড়োর আগুন নিবে গেল।

এমন সময় কি যেন আমার পায়ে কামড়ালো, আমি অমনি চিৎকার করে উঠলুম। মবু আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, "সাপে নয়, তোমাকে কোনো যন্ত্রে কামড়েছে। আমরা চললুম। বাবুকে গিয়ে বলি যে, নকুড় সা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করেছে। তিনি এখনি এসে তোমাকে খালাস করবেন।" এই বলেই তারা অন্তর্ধান হল— বোধ হয় নজরবন্দীর কোনো মন্ত্র পড়ে।

আমি যন্ত্রণায় বেজায় চিৎকার করতে লাগলুম। মিনিটখানেকের মধ্যে নকুড় সা লণ্ঠন হাতে করে তোষাখানায় ঢুকেই বললেন— এ ভূত! আর ভূতের ভয়ে একা ঘরে থাকতে পারবেন না বলে বাড়ির মেয়েছেলেদের ডাকলেন। তার পরেই নকুড় সার বাড়ির কালো কালো মোটা মোটা বেঁটে বেঁটে বউ-ঝিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তারা ঘরে ঢুকেই আমাকে এক নজর দেখে বললে, "এতো ভূত নয়, দেবতা— স্বয়ং কার্তিক!"

সেকালে আমার বর্ণ ছিল গৌর, মাথায় ছিল একরাশ কোঁকড়া চুল, তার উপর আমি ছিলুম দীর্ঘাকৃতি; আর আমার নাকচোখ ব্রাহ্মণের যেমন হওয়া উচিত তেমনি। তার পর তারা আবিষ্কার করলে যে, ইঁদুর-মারা জাঁতিকলে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল আটকে গিয়েছে।

আমার গলায় অবশ্য ছিল ধবধবে পৈতে। নকুড়গিন্নি তাই দেখে বললেন যে, ভূতও নয়, দেবতাও নয়, ব্রাহ্মণ-সন্তান। অমনি মেয়েরা সব আমাকে মাটিতে

পড়ে প্রণাম করলে।

নকুড় সা জিজ্ঞেস করলে, “আপনি এখানে এলেন কি করে?”

গিন্নি বললেন, “আগে ওর পা থেকে জাঁতিকল খোলো। তার পর সে-সব কথা হবে।”

নকুড় সা বললেন, “ওটি খোলা হবে না, কেননা ঐটিই হচ্ছে এ ডাকাত-ধরার প্রধান প্রমাণ।”

গিন্নি বললেন, “জাঁতিকলে ইঁদুর নয়, ডাকাত ধরা পড়েছে— এ কথা শুনলে লোকে যে হাসবে।”

এর পর মেয়েরা আমার পা ধরে টানাটানি করতে লাগল, শেষটা একজন দাসী এসে একবার টিপতেই জাঁতিকলটা খুলে গেল।

কিন্তু আমাকে তারা বাড়ির ভিতরেই বন্ধ করে রাখল নকুড় সার হুকুমে।

সীতা যেমন লঙ্কার চেড়ীর দ্বারা পরিবৃত ছিলেন, আমিও তেমনি নকুড়-সা'র বউ-ঝির দ্বারা পরিবৃত হলুম। কিন্তু এরা সে জাতের মেয়ে নয়— অতিশয় শান্তশিষ্ট। দাসীটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি জাঁতিকল থেকে খালাস করে যখন জল দিয়ে ধুয়ে দিল, তখন তারা সে জল আমার পাদোদক বলে পান করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

দাসীটি বললে, “ও পা-ধোওয়া জল তো শুধু জল নয়, ওর ভিতর রয়েছে মরা ইঁদুরের জমাট রক্ত। ইঁদুরের রক্ত কেউ খায় না।”

আঙুলটি কাটে নি, থেঁৎলে গিয়েছিল, তাই দাসীটি নারকেলের তেলে চোবানো ন্যাকড়া দিয়ে সেটি বেঁধে দিলে।

নকুড় সা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, “এখানে এলেন কি করে?”

গিন্নি বললেন, “ব্যথা একটু কমতে দেও, তার পর ওর কুষ্ঠি কেটো। দেখছ-না এখনো ব্রাহ্মণসন্তান কেঁপে কেঁপে উঠছে? জাঁতিতে আঙুল কাটলে কি কষ্ট হয় তা আমরা তো জানি। তোমরা শুধু ছুরি দিয়ে কলম কাটো আর কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটো; জাঁতি দিয়ে সুপারি আর বঁটি দিয়ে তরকারি কাটতে তো জান না। সুতরাং আঙুল কাটার সুখও জান না।”

তবু নকুড় সা আমাকে জেরা করতে লাগলেন। আমি প্রথমে চুপ করে রইলুম। শেষটা বললুম, “আমি চণ্ডীপুরের ক্রিংকারিবাবুর আত্মীয়। তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিন, তিনি এসে আপনার সকল জেরার উত্তর দেবেন।”

ক্রিংকারিবাবুর নাম শুনেই নকুড় সা'র মুখ শুকিয়ে গেল ও তিনি জ্বরের রোগীর মতো কাঁপতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আমি বাঘের বাসায় লোক পাঠাতে পারব না, তার চেয়ে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।"

আমি বললুম, "আঙুল-কাটা পা নিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারব না— আপনি পাল্কি-বেহারার বন্দোবস্ত করুন।"

তিনি বললেন, "এত রাত্তিরে বেহারা পাব কোথায়? কাল সকালে আপনাকে বিয়ের বরের মতো পাল্কিতে করে পাঠিয়ে দেব। আপনার কোনোই কষ্ট হবে না। আমার দাসী আপনাকে সমস্ত রাত বাতাস করবে, আর আমার মেয়েরা আপনার পায়ে তেল দেবে।"

আমি শুতে রাজি হলুম না, বসে বসেই রাত কাটাব স্থির করলুম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্বয়ং ক্রিংকারিবাবু তাঁর টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে নকুড় সা'র বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বাঁ কোমরে তলওয়ার ঝোলানো, আর ডান হাতে ঘোড়ার চাবুক। আর তার সঙ্গে এলেন ছাতিমতলার থানার দারোগা তারণ হালদার, মবু ও আস্গারি আর দুজন ভোজপুরী কন্স্টেবল। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "সারদা কোথায়?"

নকুড় সা তাঁকে প্রণাম করে যে ঘরে আমি কয়েদ ছিলুম সেই ঘরে কাঁপতে কাঁপতে নিয়ে এল— আর তার সঙ্গে এল নকুড় সা'র কর্মচারী রামকানাই সরকার।

দারোগা বললেন, "এই চোরাই মালের খদ্দের নকুড় সা শেষটা ছেলে চুরি করতেও শুরু করেছে?— এবার বেটাকে দশ বৎসরের জন্য শ্রীঘরে পাঠাব।"

তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন— "আপনাকে ধরলে কি করে?"

আমি বললুম, "আমার ঘুমের ঘোরে হেঁটে বেড়ানোর রোগ আছে। আমি ঘুমচ্ছি ও বেড়াচ্ছি— এমন সময় এরা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে, আর আমার বুড়ো আঙুল জাঁতিকলে পুরে দিয়েছে। যন্ত্রণায় আমি জেগে উঠলুম। উঠে দেখলুম— রামকানাই সরকার আমার পায়ে জাঁতিকল এঁটে বসিয়ে দিচ্ছে।"

রামকানাই সরকার বললে, ছোকরা পাকা চোর, তার উপর পাকা মিথ্যেবাদী। তোষাখানায় ঢুকে সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় ইঁদুর-মারা জাঁতিকলে ওর পা ঢুকে যায়। ও অমনি চিৎকার করতে শুরু করলে, আর বাড়ির মেয়েরা ওকে ধরে নিয়ে এল। আমি বাড়ির ভিতর

যাই-ই নি।”

ক্রিংকারিবাবু এ কথা শুনে সপাৎ করে তাকে এক ঘা চাবুক মারলেন আর বললেন, “ফের যদি কথা কও তো তলওয়ারের এক চোটে তোমাকে দু টুকরো করে ফেলব।”

রামকানাই অমনি ভূঁয়ে লুটিয়ে কাঁপতে শুরু করল। দারোগাবাবুর হুকুমে নকুড় সা'র হাতে হাতকড়া দেওয়া হল; পায়ে বেড়ি দেওয়া হল না। দারোগাবাবু বললেন, “ওর পায়ের বুড়ো আঙুলও জাঁতিকলে ঢুকিয়ে দেও।”

তার পর শুরু হল ওদের কান্নাকাটির পালা। শেষটা দারোগাবাবুকে নগদ হাজার টাকা দিয়ে নকুড় সা উদ্ধার পেলে। আর আমি ক্রিংকারিবাবুর টাট্টুতে চড়ে বাড়ি ফিরে এলুম।

এই ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের মায়ামমতা আর সুদখোরদের ভীরুতার পরিচয় পেলুম। আর সেই সঙ্গে সারদাদাদা যে পাকা মিথ্যেবাদী তাও জানতে পেলুম।

১৩৪৮

সরু মোটা

আমি যখন আমার আত্মীয় শ্রীকণ্ঠবাবুর পুত্র নীলকণ্ঠের ফকিরহাট কাছারির আদায়কারী ছিলাম তখন একদিন শুনলুম যে, নীলকণ্ঠবাবুর দুজন বন্ধু পাড়াগাঁ দেখতে আসছেন। আমরা যেমন কলকাতায় যাই চিড়িয়াখানা দেখতে, তাঁরাও তেমনি কলকাতা থেকে মফস্বল নামক চিড়িয়াখানা দেখতে আসছেন এবং আমাদের কাছারিতে দিনকতক থাকবেন।

নীলকণ্ঠবাবুর কলকাতার বন্ধুরা স্টেশন থেকে তিন মাইল পথ এলেন একজন গোরুর গাড়িতে, আর একজন রামছাগলে টানা ছেলেদের ঠেলাগাড়িতে। এর কারণ, এক বন্ধু ছিলেন রোগা এবং দ্বিতীয় বন্ধু নবনীমোহন ছিলেন মোটা। এত মোটা যে তাঁকে চর্বির গোলা বললেও হয়। তিনি সুন্দর কি অসুন্দর তা বলতে পারি নে। কারণ, তাঁর নাক চোখ সব মাংস আর চর্বিতে ডুবে গেছে।

শুনলুম তাঁরা নাকি খুব কম খান। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে খানকতক বাসি লুচি ও গুড়, আর কাঁচা ছোলা ও কাঁচা মুগের ডাল। দুপুরবেলা ভাত খেতেন না, খেতেন চালের পায়েস আর তার সঙ্গে পান্তোয়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন, বিকেলে এক বাটি ক্ষীর, ও তার সঙ্গে আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলফুলুরি। রাত্রে খেতেন পরোটা, মাছের কোপ্তা ও মাংসের কাবাব, তার উপর এক বাটি ক্ষীর।

নবনীমোহন লোকটি অতিশয় নির্বিবাদী। যা দেখতেন, তাতেই আশ্চর্য হয়ে যেতেন— যথা খড়ের চাল, দরমার বেড়া, আর আমাদের মতো জানোয়ারদের আচার-ব্যবহার। তাঁর ছোটো ছোটো চোখে যা পড়ত, তাই নাকি অতি নূতন আর অতি সুন্দর।

এ দিকে ধনপতিবাবু অর্থাৎ রোগা লোকটি ছিলেন সব বিষয়ে উদাসীন। এমন-কি, তাঁর কোনো কথায় কিংবা ব্যবহারে টাকার গরমাইয়ের পরিচয় পর্যন্ত কোনোদিন পাই নি। আমাদের তিনি জানোয়ার হিসেবে দেখতেন না, দেখতেন শুধু অসভ্য মানুষ হিসেবে।

ধনপতিবাবু সভ্যতার নানা রকম মাল-মশলার অভাবে সর্বদাই অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করতেন। তিনি ঘড়ি ঘড়ি সিগারেট খেতেন, অথচ সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই যথেষ্ট সঙ্গে আনেন নি, ফকিরহাটের কাছারিতে দেশলাই

পাবেন এই ভরসায়। কিন্তু আমাদের কাছারিতে দেশলাই ছিল না। আমরা তামাক খেতুম, আর কলকের টিকে ধরাতাম চকমকি ঠুকে।

এ কথা আমাদের মুখে শুনে ধনপতিবাবু তাঁর বন্ধুকে বলেন। তিনি তা শুনে মহা উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং বন্ধুকে বলেন, "তুমি চকমকি ঠুকে সিগারেট ধরাও-না কেন, যস্মিন দেশে যদাচারং।"

তিনি উত্তর করেন, "আমি চকমকি ঠুকতে পারি নে, আর তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সিগারেটের মুখে ফেলতেও পারি নে।"

তাতে নবনীমোহন বলেন, "তুমি তো হাতের কাজ কিছুই করতে পার না। কি করে চকমকি ঠুকতে হয় এঁরা আমাকে দেখিয়ে দিন, আমিই তোমার কাজ করে দেব।"

আমার ডাক পড়ল, এবং ধনপতিবাবুর আদেশে আমি তাঁদের সমুখেই, চকমকি কি করে ঠুকতে হয় ও পাথর থেকে আগুন বার করতে হয় তা দেখিয়ে দিলুম।

এক নজরেই নবনীমোহন এ বিদ্যা শিখে নিলেন, এবং আমাকে বললেন, "ও পাথর আর লোহা আমার কাছে রেখে যান, আমি যা করবার তা করব।"

খানিক পরে আমি পাশের ঘর থেকে ঠুং ঠুং শব্দ শুনলুম। তার পরেই ধনপতিবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "কে আছ, নবনীবাবুকে এসে রক্ষা করো। সে পুড়ে মরছে।"

আমি তাদের শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে দেখি, নবনীমোহন কাঠের চৌকিতে বসে আছেন, আর তাঁর পাশে মেঝের উপর ইন্দ্রধনুর সব রকম রঙের পশমে তৈরি একটি গলাবন্ধ পড়ে আছে। চকমকি একবার সজোরে ঠুকতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে গিয়ে সেই গলাবন্ধের উপর পড়েছে। পশমে আগুন লেগে গেছে, আর তা থেকে শুধু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নবনীমোহন তাঁর স্থূলদেহ নিয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সেখান থেকে নড়তে পারছেন না।

আমি তার উপর এক ঘটি জল ঢেলে দিতেই সব নিভে গেল।

এর পর ধনপতিবাবু তার বন্ধুকে কড়া হুকুম দিলেন— "আর যেন আগুন নিয়ে খেলা করা না হয়। আমরা এখানে হাওয়া খেতে এসেছি, আগুনে পুড়ে মরতে নয়।"

নবনীমোহনের শখ হল— একদিন ডিঙি চড়ে জলবিহার করবেন।

ধনপতিবাবু তাঁর বন্ধুর সকল শখ মেটাতে দিবারাত্র প্রস্তুত ছিলেন। তাই

ঠিক হল, নবনীমোহনকে একদিন ডিঙিতে চড়িয়ে বিলের ভিতর একচক্র ঘুরিয়ে আনা হবে।

আমি একটি খুব ভালো আর টঙ্ক ডিঙি দেখে, সেই ডিঙিতে নবনীমোহনকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলুম। তার পর সে ডিঙি একেবারে পাড়ের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হল, যাতে তাঁর চড়তে কোনো কষ্ট না হয়।

তিনি এক পা লাফিয়ে ডিঙির মধ্যিখানে গিয়ে বসলেন। অমনি তাঁর গুরুভারে ডিঙির মাঝখানটা ফেঁসে গেল, আর তিনি একটা কুণ্ডলী আকার ধারণ করলেন। পা-দুটো উঁচু হয়ে উঠলো, মাথাও তাই। বাদবাকি দেহ এক হাত জলে ডুবে গেল।

ধনপতিবাবু অমনি "নবনীমোহন জলে ডুবে মল" বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

আমরা ছুটে গিয়ে দেখলুম তাঁর জলে ডোববার কোনো ভয় নেই, কিন্তু তাঁকে ঐ ডিঙির ভাঙা খোল থেকে উদ্ধার করাই কঠিন। টেনে বার করা যায় না, নিজেরও বেরিয়ে আসবার শক্তি নেই।

তখন করাত দিয়ে আর কুড়ুল দিয়ে ডিঙিটাকে দুখণ্ড করা হল, আর নবনীমোহনের কোমরে কাছি দিয়ে বাঁধা হল। একটি চাকর সেই একহাত জলে নেমে তাঁকে ঠেলতে লাগল, আর দুজন সর্দার সেই কাছি টানতে লাগল। ডিঙির আধখানা এধারে আধখানা ওধারে চলে গেল— সহজে নয়, জেলেরা লগি মেরে সরিয়ে দিল। তার পরে নবনীমোহনকে ডাঙায় তোলা হল। তিনি ডিঙির তলার পাঁকে গেঁথে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ঢাকাই ধুতি। তাঁকে দেখে মনে হল— তিনি একটি একমেঠে ঠাকুরের প্রতিমা।

তখনই স্থির হল যে, তাঁরা পরদিন সকালেই কলকাতা ফিরে যাবেন।

হলও তাই। তাঁরা যে ভাবে এসেছিলেন, সেই ভাবেই স্টেশনে গেলেন।

এ গল্প তোমাদের বলছি এই শিক্ষা দেবার জন্য যে, কখনো মোটা হোয়ো না। অবশ্য কি করে যে মোটাকে রোগা করা যায়, তা আমি জানি নে— স্বয়ং ধন্বন্তরিও জানেন না, তবে বেশি মোটা না হবার হয়তো দু-চারটি সোজা উপায় আছে, যথা : অতিভোজন না করা, ও চলে-ফিরে বেড়ানো।

আশ্বিন ১৩৪৯

সোনার গাছ হীরের ফুল

নব রূপকথা

অচিনপুরের রাজকুমারের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পূর্বরাত্রে ঘুম হয় নি। অবশেষে শেষরাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে তো নিদ্রা নয়, সুষুপ্তি। এই সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁর সুমুখে একটি জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে দেশ কখনো দেখেছ, যে দেশে সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে?"

রাজকুমার বললেন, "না।"

"দেখতে চাও?"

"হাঁ।"

"আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।"

"কত দূরে সে দেশ?"

"সহস্র যোজন।"

"যেতে কতদিন লাগবে?"

"চোখের পলক না পড়তে। তুমি যদি এখনই পাত্র-মিত্র নিয়ে যাত্রারম্ভ কর, তা হলে এ দীর্ঘ পথ আমি তোমাকে নিয়ে ভোর হতে না হতে উৎরে যাব।"

"কি উপায়ে?"

"তুমি আর তোমার বন্ধুরা জামাজোড়া পরে হাতিয়ার নিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হও; আমি সে-সব ঘোড়াকে পক্ষিরাজ করে দেব; অর্থাৎ তাদের পাখা বেরোবে, আর তারা উড়ে চলে যাবে।"

রাজকুমার দৌবারিককে ডেকে বললেন, "এখনই যাও, মন্ত্রীপুত্র সওদাগরের পুত্র ও কোটালের পুত্রকে নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে, জামাজোড়া পরে, হাতিয়ার নিয়ে এখানে চলে আসতে বলো। আমিও রণবেশ ধারণ করছি।"

অল্পক্ষণ পরেই রাজকুমার নীচে নেমে এলেন। এসে দেখেন যে মন্ত্রীপুত্র সওদাগরপুত্র আর কোটালের পুত্র সব সাজসজ্জা করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপুত্রের কানে হীরের কুণ্ডল, মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ, গলায় হীরের কণ্ঠী, পরনে কিংখাবের বেশ, পায়ে রত্নখচিত নাগরা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ পিঙ্গল। মন্ত্রীপুত্রের কানে মুক্তোর কুণ্ডল, মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ি, গলায়

মোতির মালা, পরনে শ্বেতাম্বর, পায়ে শ্বেত মৃগচর্মের পাদুকা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ রুপোর মতো। সওদাগরের পুত্রের কানে সোনার কুণ্ডল, মাথায় জরির পাগড়ি, গলায় সোনার কণ্ঠী, পরনে পীতাম্বর, পায়ে সেই রঙের বিনামা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ তামার মতো। কোটালের পুত্রের কানে পলার কুণ্ডল, মাথায় লাল পাগড়ি, গলায় পলার কণ্ঠী, পরনে রক্তাম্বর, পায়ে গণ্ডারের চামড়ার জুতা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ লোহার মতো।

যাত্রারম্ভ

রাজপুত্র আসবামাত্র একটি দৈববাণী হল— "এখন তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা আরম্ভ করো।"

রাজপুত্র তাঁর ঘোড়ার সোনার রেকাবে পা দিয়ে, মন্ত্রীপুত্র রুপোর রেকাবে, সওদাগরের পুত্র তামার রেকাবে আর কোটালের পুত্র লোহার রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। অমনি ঘোড়া চারটি আকাশদেশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেশকে আমরা কাল দিয়ে মাপি। যেখানে কাল বলে কোনো জিনিস নেই, সেখানে কত পথ অতিক্রম তাঁরা করলেন তা বলতে পারি নে। বোধ হয় সাত-সমুদ্র তেরো-নদী, নানা মরুকান্তার ও পর্বত ডিঙিয়ে তাঁরা প্রত্যূষে একটি রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময় আর-একটি দৈববাণী হল— "এইখানেই তোমরা আজকের দিনটা বিশ্রাম করো। তোমাদের মধ্যে যিনি এখানে সোনার গাছ ও হীরের ফুলের সাক্ষাৎ পাবেন, তিনি এখানে থেকে যাবেন। বাদবাকি সকলে শেষরাত্রে নিজের নিজের ঘোড়াকে স্মরণ করলে তারা তখনই আবির্ভূত হবে, ও নিজের নিজের সওয়ার নিয়ে দেশান্তরে চলে যাবে।"

এই আকাশবাণী শুনে তাঁরা সব ঘোড়া থেকে নেবে পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঘোড়াও অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর চার দিকে মালঞ্চে ঘেরা। সে মালঞ্চের কি বাহার! অসংখ্য ফুল কাতারে কাতারে ফুটে রয়েছে। সে-সব ফুলের রঙ হয় সোনার, নয় পিতলের মতো, যথা— চাঁপা সূর্যমুখী স্বর্ণবর্ণ বড়ো বড়ো গ্যাঁদা হলদে গোলাপ কল্কে ফুল— আর কত ফুলের নাম করব! মধ্যে মধ্যে ফলের গাছও আছে— কলা কমলালেবু স্বর্ণবর্ণ আম; সব সাজানো আর গোছানো। বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে

তাঁরা দেখলেন, রাস্তাগুলি প্রকাণ্ড চওড়া এবং তাতে একটুকুও ধুলো নেই। রাস্তায় অসংখ্য লোক ; সকলের পরনে পীতাম্বর। লোকের রঙ পীতাভ, নাক-চোখ অতি সুন্দর, কপালে একটি করে হলদে চন্দনের ফোঁটা, আর স্ত্রীলোকের নাকে রসকলি। স্ত্রী-পুরুষের বেশ একই ধরনের ; শুধু স্ত্রীলোকের শাড়িতে জরির পাড়।

রাস্তার দু-ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভোজনালয়। বিষ্ণুপুরের লোকের বাড়িতে রন্ধনের কোনো ব্যবস্থা নেই ; সকলেই এই-সব ভোজনালয়েই আহার করেন। বিষ্ণুপুরের লোক অতি অতিথিবৎসল ; এই চারটি নতুন আগন্তুককে দেখে তারা তাদের একটি ভোজনালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। সেখানে স্ত্রী-পুরুষ সব একত্রে আহার করছে। খাদ্যদ্রব্য সব নিরামিষ এবং অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্ফটিকের পাত্রে রয়েছে পানীয়। এ পানীয় জল নয়, সুরা— স্ত্রীলোকের জন্য হল্‌দে এবং পুরুষের জন্য সবুজ রঙের। এ পোখরাজ-গলানো পান্না-গলানো সুরা পান করে সকলেরই গোলাপী নেশা হয়। পীত সুরায় নেশা কম হয়, এবং হরিত সুরায় বেশি। এর ফলে সকলেই ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, মেয়েদের রূপের লজ্জৎ বাড়ে, এবং পুরুষরা হয় বাচাল।

বিষ্ণুপুরে পর্দা নেই। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান স্বাধীন ও সমান শিক্ষিত। দু-দলেরই প্রবৃত্তিমার্গ সমান উন্মুক্ত। ভোজনালয়ে সওদাগরের পুত্রের পাশে উপবিষ্ট একটি তরুণীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন শুরু হল। সওদাগরপুত্র এ দেশের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এত ধন তোমরা সংগ্রহ করলে কোথেকে?"

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।"

"আমিও বণিকপুত্র।"

"তুমি ইচ্ছা করলেই এই বণিক-সমাজের অন্তর্ভূত হতে পারো।"

"কি করে?"

"আমাকে বিবাহ করে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ এ দেশে সকলেই সমান ধনী।"

"বিবাহ কি করে করতে হয়?"

"অতি সহজে, শুধু মালা বদল ক'রে।"

"অমি বিষ্ণুপুর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় তোমার প্রস্তাবের উত্তর দেব।"

আহারান্তে সওদাগরপুত্র সেই মেয়েটির গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণ করতে

বেরোলেন। সে গাড়ি মানুষে কি ঘোড়ায় টানে না, কলে চলে। তার পর তাঁরা দুজনে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখলেন, সেখানে অসংখ্য অর্ণবপোত রয়েছে ; কোনোটি থেকে মাল নামাচ্ছে, কোনোটিতে তুলছে। রমণী বললেন, "এই আমদানি-রপ্তানিই হচ্ছে আমাদের ঐশ্বর্যের মূল।"

তার পর সূর্য অস্তে যাবার পূর্বেই তাঁরা বিষ্ণুমন্দিরে গেলেন। সে মন্দির অপূর্ব সুন্দর ও বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত। সেখানে গিয়ে সওদাগরপুত্র দেখলেন যে, মেয়েরা সব কীর্তন গাইছেন। এবং মধ্যে মধ্যে একটু সুরাপান করে নৃত্য করছেন। সওদাগরপুত্রের সঙ্গিনীটি সব-চাইতে ভালো গাইয়ে ও ভালো নর্তকী। আর সকলেই ভক্তিরসে গদগদ। এই ভক্তিরসই নাকি তাদের সভ্যতার যথার্থ উৎস।

এই-সব দেখেশুনে সওদাগরপুত্র মনস্থির করলেন যে, তিনি এই রমণীটিকে বিবাহ করবেন এবং বিষ্ণুপুরে থেকে যাবেন। সূর্য অস্ত যাবার পরেই তিনি এই মেয়েটির সঙ্গে মালা-বদল করলেন। তার পর তাঁর বন্ধুদের গিয়ে বললেন যে, "আমি এইখানেই সোনার গাছ ও হীরের ফুল দেখেছি। আমি আর-কোথায়ও যাব না, এইখানেই থাকব।"

রাজপুত্র বললেন, "বেশ, তবে তুমি থাকো, আমরা চললুম।"

মন্ত্রীর পুত্রও বললেন তাই। কোটালের পুত্র বললেন, "আমি কিন্তু আর একদণ্ডও এখানে থাকতে চাই নে। কারণ এখানে সভ্যতার নানা উপকরণ থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র নেই এবং এদের ভাষাতেও অস্ত্রশস্ত্রের কোনো নাম নেই।"

সেইদিন শেষ রাত্রে রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র ও কোটালের পুত্র তাঁদের ঘোড়াদের স্মরণ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তারা এসে আবির্ভূত হল। তাঁরা তিনজন নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন, আর তৎক্ষণাৎ আকাশদেশে অদৃশ্য হলেন।

কালীপুর

ভোর হয় হয় এমন সময় তাঁরা একটি নূতন নগরের সাক্ষাৎ পেয়ে ভয় খেয়ে গেলেন। সেখানে উষার চেহারা রক্তসন্ধ্যার মতো। নগরটি দোতলার সমান উঁচু লাল পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। আর তার নীচে দিয়ে রক্তগঙ্গার মতো নদী বয়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র ও কোটালের পুত্র ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দেখেন, সেখানে সব ফুলই লালে লাল। কৃষ্ণচূড়া, বলরামচূড়া

এবং পলাশের গাছে যেন আগুন ধরেছে। আর অশোক, শিমুল ও রাঙাজবা অসংখ্য ফুটে রয়েছে। আম জাম প্রভৃতি ফলের গাছও অনেক আছে, কিন্তু তাতে ফল ধরে শুধু মাকাল— লাল মাটির গুণে কিম্বা দোষে।

রাস্তায় অসংখ্য লোক যাতায়াত করছে। সকলেরই পরনে মালকোঁচামারা রক্তাম্বর, গায়ে সেই রঙের একটি ফতুয়া, কোমরে লোহার শিকলের কোমরবন্ধ— তার এক পাশে একটি মদের বোতল ঝোলানো, অপর পাশে একটি একহাত-প্রমাণ ছোরা। মাথা সকলেরই ন্যাড়া। তাদের মুখের রঙ ইঁটের মতো, মাথারও তদ্রূপ। সকলেই প্রকাণ্ড পুরুষ, যেমন স্থূলকায় তেমনি বলিষ্ঠ। এরা নাকি সকলেই সৈনিক। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনটি সৈনিক এসে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্রকে গ্রেপ্তার করলে এবং বললে, "এ নগরে বিনা অনুমতিতে বিদেশী প্রবেশ করলে তার শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। চলো, তোমাদের সেনাপতির কাছে নিয়ে যাই।"

সেনাপতির কাছে তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কোন্ দেশ থেকে কি উপায়ে এখানে এলে?"

"আমরা আকাশ থেকে পড়েছি। এসেছি সব পক্ষিরাজ ঘোড়ায়।"

"সে ঘোড়া কোথায়?"

"আকাশে চরতে গেছে।"

"কখন আসবে?"

"আজ রাত্রে। যদি না আসে, তা হলে আমাদের প্রাণদণ্ড দেবেন।"

"আচ্ছা। আজকের দিন তোমরা নজরবন্দী থাকবে। এবং আমাদের সৈনিকরাই তোমাদের খাবার ও থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দেবে।"

তার পর সৈনিকরা তাঁদের ভোজনালয়ে নিয়ে গেল। সে-সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। দু পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, মধ্যে কাঠের টেবিল। কালীপুরে পর্দা আছে। কুলবধূরা সব পর্দানশীন। কিন্তু এ ভোজনালয়ে খিদমৎগার, খানসামা সবই স্ত্রীলোক। তারা নাকি সবই গণিকা। তারাও পুরুষদের মতোই দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। সকলেরই পরনে মালকোঁচামারা রক্তাম্বর। পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের বেশের প্রভেদ এই মাত্র যে, স্ত্রীলোকদের মাথায় বাব্‌রিকাটা চুল, আর কোমরে একখানি করে রাম-দা ঝোলানো।

দেওয়ালের পাশে সব বড়ো বড়ো মদের পিপের সারি। নীচের একটি

চাবি খুললেই সামনের নলমুখ দিয়ে সুরা পড়ে। বলা বাহুল্য, যারা ভোজন করছে তারা সকলেই পুরুষ। এবং বড়ো বড়ো গালার রঙ করা, পেট-মোটা গলা-সরু কাঠের ঘটিতে সেই মদ্য পান করছে। সে মদ্যের রঙ পাটকেলে, আর তার অর্ধেক ফেনা, অর্ধেক তরল। সেই ফেনাসুদ্ধ সুরা গলাধঃকরণ করতে হয়, ফেনা যায় মাথায়, এবং তরলাংশ যায় পেটে। আহার্যদ্রব্য পরিমাণে প্রচুর। মাছ মাংস নিরামিষ সবই আছে। মাছের কোপ্তা এক-একটি গোলার মতো। মাংসের দোলমা এক-একটি কাঁকুড়ের মতো। কালীপুরের লোক তা অনায়াসে গলাধঃকরণ করে। গলায় যদি আটকায় তো এক ঘটি সফেন সুরা দিয়ে তা নাবিয়ে দেয়। মন্ত্রীপুত্র খালি নিরামিষ আহার করলেন। রাজপুত্র ও কোটালের পুত্র মাছ মাংস কিঞ্চিৎ আহার করলেন।

তার পর তিন বন্ধুতে ব্যায়ামশালা দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, হঠযোগ ও ডনমুগুর কুস্তি সবরকমের ব্যায়াম একসঙ্গে করা হয়। তার পর তাঁরা এখানকার বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। সেখানে সব মুণ্ডিত মস্তক এবং শিখাধারী অধ্যাপক যুদ্ধবিদ্যার নানারকম কলকৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার সময় কোটালের পুত্র তাঁর বন্ধুদের বললেন, "আমি এইখানেই থেকে যাই। সোনার গাছ, হীরের ফুল দেখবার কোনো লোভ আমার নেই। হীরের ফুলের কোনো গন্ধ নেই। আমি এখানে কিছুদিন থাকবার অনুমতি সেনাপতির কাছে পেয়েছি। এই গণিকাদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করলেই বিদেশী স্বদেশী হিসাবে গণ্য হয়। বিবাহপ্রথাও অতি সহজ। মেয়ের লোহার কণ্ঠী, ভাষায় যাকে বলে হাঁসুলি, সেইটি বরের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। আর বর একটি হাঁসুলি এনে কনের গলায় পরিয়ে দেয়। সেই হাঁসুলি খুলে ফেললেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

কোটালের পুত্র এইরূপ বিবাহ করে সেখানেই রয়ে গেলেন।

শেষরাত্রে মন্ত্রীপুত্র ও রাজপুত্র তাঁদের পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করলেন এবং তাতে চড়ে আর-এক দেশে আকাশপথে চলে গেলেন।

ব্রহ্মপুর

পরদিন উষাকালে দুই বন্ধুতে এক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। সে স্থানে উষার রঙ ঈষৎ রক্তিমাভ। সে স্থান নগর নয়, পল্লী নয়, একটি অপূর্ব আশ্রম।

বাড়িঘরদোর যা দেখতে পেলেন, তা সবই পর্ণকুটির। স্ত্রী-পুরুষের রূপ অলৌকিক। স্ত্রী মাত্রেই তুষারগৌরী এবং পুরুষরা দীর্ঘকেশ ও গুম্ফশ্মশ্রুধারী। এ আশ্রমে ফল-ফুলের বৃক্ষসকল একরকম স্তিমিত। বাতাস যা বয় তা অতি মৃদু। এখানে গাছপালা লতাপাতা ফুলফলে কোনো বর্ণবিচার নেই। সব রঙেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সব রঙ নিতান্ত ফিকে ও সাদাঘেঁষা। শান্তি এখানে অটুট। কারো কোনোরকম কর্ম নেই। এঁরা সকলে আহার করেন ফল ও মূল, বিশেষত আঙুর; তাতে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দুইই দূর হয়। সকলেই সংস্কৃতভাষী।

এ আশ্রমে প্রকৃতি বোবা। চারি পাশে সবই নীরব ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে যে ক্ষীণ অস্ফুট নিনাদ শোনা যায় তার থেকে অনুমান করা যায় যে, গাছপাতার গায়ে অতি মৃদুমন্দ বাতাস স্পর্শ করছে। সে প্রকৃতি যেন সমাধিস্থ। পূর্বেই বলেছি যে, এখানকার স্ত্রী-পুরুষের কোনো কর্ম নেই— একমাত্র সকালসন্ধ্যা বেদমন্ত্র উচ্চারণ আর মধ্যে মধ্যে সামগান করা ছাড়া।

এখানে ইস্কুল আছে। সেখানে বালকবালিকাদের বেদমন্ত্র মুখস্থ করানো হয়। আর অবসর সময়ে বেদমন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়। এই বৈদিক ঋষিদের কারো সঙ্গে কারো মতে মেলে না। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা খুব দীর্ঘ হয়। তাই সেখানে কাজ নেই, কিন্তু কথা আছে।

মন্ত্রীপুত্র এ আশ্রমে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনিও কিছু বৈদিক শাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি এইখানেই থেকে বেদ অভ্যাস করবেন। এবং রাজপুত্রকে বললেন, "সোনার গাছ আর হীরের ফুল যদি কোথাও থাকে তো এখানেই আছে। আমি যখন বেদাভ্যাস করতে করতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করব, তখন তা দেখতে পাব। এই ফলমূলাহারী বল্কলধারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি।"

রাজপুত্র বললেন, "বেশ। আমি কিন্তু আজ শেষরাত্রেই এ আশ্রম ত্যাগ করব। আমি স্বকর্ণে দৈববাণী শুনেছি। দিব্যপুরুষ কখনোই মিথ্যা কথা বলেন না। সম্ভবত তোমরা তিনজনে আমার সঙ্গে ছিলে বলেই দিব্যপুরুষ আমাদের এ অলৌকিক তরু দেখান নি। আমার বিশ্বাস আমি একা গেলেই, যার সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি তার সাক্ষাৎ পাব।"

অনামপুর

রাজপুত্র সেইদিন শেষরাত্রে ব্রহ্মপুর ত্যাগ করে একাকী হয়মারুহ্য জগাম শূন্যং মার্গং। তাঁর কোনো সঙ্গী না থাকায়, অর্থাৎ কথা কইবার কোনো লোক না থাকায়, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শেষটা ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ জেগে উঠে যেখানে উপস্থিত হলেন সে স্থানের কোনো নাম নেই, কেননা তার কোনো রূপ নেই। সেখানে চার পাশে যা আছে, তা হচ্ছে নিরেট অন্ধকার। এ স্থানকে বলা যায় অনামপুর। কখন গিয়ে সেখানে তিনি পৌঁছলেন তা বলতে পারি নে। কারণ, সেখানে কাল নেই, কাল মাপবার কোনো যন্ত্রপাতিও নেই। কোনো জিনিসের কোনো গতিও নেই। অতএব, পক্ষিরাজ ঘোড়া সেখানে থেমে গেল।

এমন সময়, সেই জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ রাজপুত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "সে গাছ এখানে নেই; কোথায় আছে তা তোমাকে পরে বলব।" এই বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন।

ঘোড়া অমনি মুখ ফিরিয়ে উলটো দিকে চলতে আরম্ভ করলে। অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়ে রাজপুত্র যেখানে গেলেন সে কুয়াশার রাজ্য। সে কুয়াশা শুভ্র, হালকা ও মলমলের মতো পাতলা। রাজপুত্রের হঠাৎ চোখে পড়ল যে, মন্ত্রীর পুত্র এই কুয়াশার দেশ ভেদ করে আসছেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ ও বিষণ্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সোনার গাছ, হীরের ফুলের সাক্ষাৎ পেয়েছ?"

"না। কিন্তু কোথায় আছে তা দিব্যপুরুষ পরে জানাবেন বলেছেন।"

"আমি মনতান্ত্রিক ব্রহ্মপুরে থাকতে পারলুম না। সে পুরে সকলে প্রাণকে দমন ক'রে মনকে উর্ধ্বলোকে তোলবার চেষ্টা করছেন, একমাত্র মন্ত্রের সাহায্যে। ফলে, তাঁদের মনও সব প্রাণহীন হয়ে পড়ছে।"

তার পর তাঁরা দুজনে একটি দেশে এলেন, যেখানে আকাশে রক্তসন্ধ্যা হয়েছে। সেখানে রক্তাম্বরধারী কোটালের পুত্রের সাক্ষাৎ তাঁরা পেলেন। তিনি বললেন, "আমি রণতান্ত্রিক কালীপুরে আর থাকতে পারলুম না। সেখানে লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য নরহত্যা। তার ফলে রক্তপাত যে কি নিষ্ঠুর আর কি ভীষণ তা অবর্ণনীয়। কালীপুরের পুরদেবতা হচ্ছেন ছিন্নমস্তা।"

তার খানিকক্ষণ পর যেখানে আকাশ পাণ্ডু, সেখানে সওদাগরের পুত্র তাঁদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি বললেন, "বিষ্ণুপুরের ধনতান্ত্রিক রাজ্যে মোর‍্যালিটি নেই। প্রতি স্ত্রীলোক বহুবিবাহ করে এবং প্রতি পুরুষ দরিদ্রদের উপর চোরা অত্যাচার করে। অথচ তাদের শ্রমেই এঁরা ধনী হয়েছেন। তাই আমি চলে এলুম।"

রাজপুত্র সব শুনে বললেন, "এ-সব দেশের লোকের হৃদয় নেই। দিব্যপুরুষ বলেছেন যে, সোনার গাছ হীরের ফুলের মূল মানুষের হৃদয়ে। এবং যে-সব দেশে তোমরা মানবসমাজের বিকৃতরূপ দেখে এলে, সেই-সব বিকার থেকে মুক্ত হলেই তোমরা নিজ নিজ হৃদয় থেকেই সোনার গাছে হীরের ফুল গড়ে তুলতে পারবে। তখন এই অচিনপুর শিবপুরী হয়ে উঠবে।"

এই কথা বলবার পরে তাঁরা চারজনই অচিনপুরে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। ভোর হতে না হতেই রাজপুত্র তাকিয়ে দেখেন যে, উষার আলোকে গাছপালা সব স্বর্ণবর্ণ হয়েছে, এবং তাতে বেল জুঁই মল্লিকা প্রভৃতি সাদা ফুল জ্বলজ্বল করছে। তখন তিনি বুঝলেন যে, এতক্ষণ তিনি শুধু স্বপ্ন দেখছিলেন।

কার্তিক ১৩৪৯

সীতাপতি রায়

আমার জনৈক বন্ধু একমনে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ছিলেন দুনিয়ার কাগ্জী খবর জানবার জন্যে; এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে তা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। আমি বললুম, বাংলায় কে কে গ্রেপ্তার হল, তাদের নামগুলো পড়ো তো? তিনি পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ একটা নাম শুনে আমি বললুম, সীতাপতি রায় যে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাতে আমি আশ্চর্য হই নি।

সীতাপতি রায়কে তুমি চেন?

এককালে তাঁকে খুব ভালোই জানতুম, তবে বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

তিনি কে?

অজ্ঞাতকুলশীল। তাঁর বাড়ি কোথায়, আর তিনি কি জাত, তা জানি নে।

তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কোথায়?

গোলদিঘিতে। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তিনি পটোল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা গোলদিঘিতে বেড়াতে আসতেন।

পটোল বিশ্বাসটি কে?

পাটের দালাল অটল বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান। শুনেছি অটল বিশ্বাস মস্ত ধনী। আর সীতাপতি ছিলেন পটোলের friend, philosopher and guide। তিনি থাকতেন পটোলদের বাড়িতেই এবং পুলিসকোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি ছিলেন পটোলের সহপাঠী। আর শেষটা হয়েছিলেন তার private tutor। পটোল বি. এ. পাস করতে পারে নি, সীতাপতি খুব ভালো পাস করেছিলেন। অটল বিশ্বাসের বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না, কিন্তু ছেলে যাতে বি. এ পাস করে সে বিষয়ে তার খুব ঝোঁক ছিল। পটোল বাপকে বললে, "আমি একজনকে জানি, তাঁকে আমার private tutor নিযুক্ত করলে তিনি নিশ্চয় আমাকে বি. এ. পাস করাবেন।" অটল বিশ্বাস ছিলেন যেমন ধনী তেমনি কৃপণ। বাপে-ছেলেয় অনেক বকাবকির পর শেষটা স্থির হল, সীতাপতি রায় পটোলের private tutor হবেন, তাদের বাড়িতে থাকবেন এবং মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে পাবেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, সীতাপতি অতি সুপুরুষ, ইংরিজি খুব ভালো

জানে এবং গাইতে পারে চমৎকার।

পূর্বেই বলেছি সীতাপতি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। অনেকে সন্দেহ করত তিনি কোনো হিন্দুস্থানী বাইজির ছেলে। এ সন্দেহের অনেক কারণও ছিল। সীতাপতি নামটি বাঙালির ভিতর অতি দুর্লভ। আর তাঁর চেহারা ছিল কতকটা হিন্দুস্থানী ধরনের; নাক যেমন তোলা, চোখ তেমন বড়ো নয়। আর তিনি গান গাইতেন পেশাদার গায়কদের তুল্য। আর হিন্দি বলতেন মাতৃভাষার মতো। এককালে তাঁর অবস্থা যথেষ্ট ভালো ছিল, আর তিনি থাকতেন বড়োবাজারের কোনো গলিতে। হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

সে যাই হোক, তিনি ছিলেন অতি বেপরোয়া লোক। আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলুম যে, সামাজিক জীবনের সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারবেন না। কিন্তু যখন যে অবস্থায় পড়বেন তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

২

অটল বিশ্বাসের পরিবারে সীতাপতি দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এমনকি, স্বয়ং বিশ্বাস মহাশয়ের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে এক বিপদ ঘটল। অটল বিশ্বাস ছেলের জন্য একটি মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই সুরূপা ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা মেয়েকে নিজে বিয়ে ক'রে নিয়ে চলে এলেন। তাঁর ছেলে তাতে মহা অসন্তুষ্ট হল। ফলে বাপে-ছেলেতে ছাড়াছাড়ি হবার উপক্রম। পটোল বিশ্বাস নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে চলে যেত, যদি সীতাপতির পরামর্শে সে নীরব থেকে বিমাতাকে ওষুধ গেলার মতো গ্রাহ্য করে না নিত। পটোলের কথা ছিল এই যে, এই বয়সে বাবা আবার চতুর্থ পক্ষ করলেন! তার উত্তরে সীতাপতি বললেন,"এই চতুর্থ পক্ষই সেজন্য তোমার বাবাকে যথেষ্ট শাস্তি দেবে।"

বৃদ্ধের এই তরুণী ভার্যাটি প্রথম থেকেই তার স্বামীকে বললে, "আমি কোনো ঘরকন্নার কাজ করব না। আমি এ বাড়িতে দাসীগিরি করতে আসি নি।"

"তবে দিন কাটাবে কি করে?"

"নভেল পড়ে ও গান গেয়ে।"

অটল বিশ্বাস এ জবাব শুনে খুশি হলেন না। কিন্তু তাঁর চতুর্থ পক্ষের

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করলেন না।

মাসখানেক যেতে-না-যেতেই তাঁর চতুর্থ পক্ষ বললে, "আমি ভালো করে লেখাপড়া শিখতে চাই এবং সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করতে চাই। আমার জন্য একটি ইংরেজি শিক্ষক এবং একটি সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত করো।"

অটল বিশ্বাস তাঁর ছেলেকে গিয়ে বললেন, "সীতাপতি কি ওঁর ইংরিজি শিক্ষক হতে পারে না? কিন্তু সংগীতশিক্ষক পাই কোত্থেকে?"

পটোল বললে, "মাস্টারমশায় চমৎকার গাইয়ে। তিনি একাই এই দুই শিক্ষা দিতে পারেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

তার পরদিন পটোল বললে, "মাস্টারমশায় রাজি আছেন যদি তাঁকে এই নতুন শিক্ষকতার জন্যে মাসে উপরি একশো টাকা ক'রে মাইনে দেওয়া হয়।"

অটল বিশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাতেই রাজি হলেন, এবং সীতাপতি তার পরদিন থেকে গৃহিণীরও গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

পটোলের বিমাতার নাম ছিল কিশোরী। অল্পদিনের মধ্যেই সে মাস্টার-মশায়ের অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়ল। আর সীতাপতিরও প্রিয়শিষ্যা হয়ে উঠল। গানই তাঁদের পরস্পরকে মুগ্ধ করেছিল। মাসখানেক পরে উভয়ে একসঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। লোকে সন্দেহ করে এ পলায়নের সহায় ছিল পটোল বিশ্বাস।

৩

দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সীতাপতি কলকাতায় ফিরে এলেন। এবং পটোল বিশ্বাসের বাড়িতে অধিষ্ঠান হলেন। ইতিমধ্যে অটল বিশ্বাস গত হয়েছিলেন, আর পটোল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল এবং বিয়েও করেছিল। তার পৈতৃক ছোটোবাড়ির পাশে পটোল একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল আর বাপের দালালি ব্যাবসা ভালোরকমই চালাতে শিখেছিল।

সীতাপতির ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি নিজেই আমাকে বললেন। সেই কথাই এখন তোমাকে বলছি।

সীতাপতি ও কিশোরী প্রথমে পশ্চিমের একটি নামজাদা শহরে গিয়ে বছর দু-তিন বাস করেন। সেখানে নাকি একটি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন, তাঁরই কাছে কিশোরীকে আরো ভালো করে গান শেখাবার জন্য। সে শহরে তাঁরা

গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। সীতাপতি নিজে সেখানে একটি মিশনারি ইস্কুলে ইংরিজি পড়াবার চাকরি নেন ; এবং বছরখানেকের মধ্যেই সেই ইস্কুলের হেডমাস্টার হন।

সীতাপতি অবশ্য পশ্চিমে গিয়ে নাম বদলে নিয়েছিলেন। সে দেশে তাঁর নাম হল রামচন্দ্র রাও। এবং বেশও হল হিন্দুস্থানীদের বেশ। কিশোরী হয়ে উঠল অপূর্ব ঠুংরি গাইয়ে। তার গলা ছিল যেমন মিষ্টি, তেমনি স্থিতিস্থাপক।

সীতাপতি মিশনারি সাহেবের উপর চটে গিয়েছিলেন। কারণ, সাহেব কালা আদমীদের বিশেষ অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। তিনি I. C. S. হলে দুর্দান্ত হাকিম হতেন।

তার উপর সীতাপতি শুনলেন যে, রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি থাকে সেটি তাঁর স্ত্রী কি না মিশনারি সাহেব সে খোঁজ করছেন। সন্দেহের কারণ, কিশোরী বাই পেশাদার বাইজির মতো গান করেন।

এই-সব কারণে তিনি ইস্কুলের চাকরি ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। এমন সময় পটোলের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন যে, অটল বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে। পটোল একমাত্র লোক, যে সীতাপতির নতুন নাম-ঠিকানা জানত।

এ সংবাদ শুনে কিশোরী বললে যে, সে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বৃন্দাবনে যাবে। তার মজলিশী গান শেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে বৃন্দাবনে গিয়ে কীর্তন শিখবে। আসল কথা, সে অসামাজিক জীবন আর যাপন করবে না। এবং সেই জীবন অবলম্বন করবে, যাতে তার পূর্বজীবনের কালিমা ভক্তিরসে ধুয়ে মুছে যায়।

সীতাপতি কিশোরীকে কোনো বাধা দিলেন না। যদিচ কোনো ধর্মে তাঁর বিন্দুমাত্রও ভক্তি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইস্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

এর পর তাঁর জীবনের নতুন পর্যায় আরম্ভ হল। যদিচ সীতাপতি কিশোরীকে কখনো ভুলতে পারেন নি ; এবং কিশোরীও সীতাপতিকে কখনো ভুলতে পারে নি।

৪

সীতাপতি কিশোরীর কথাবার্তায় বুঝেছিলেন যে, তার নূতন সংকল্প থেকে তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব। অটল বিশ্বাসের মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত কিশোরী সীতাপতির অনুরক্ত ভক্ত ছিল। যার সে কস্মিন্‌কালেও স্ত্রী ছিল না, তার মৃত্যুতে কিশোরীর মন যে কি করে এমন বিপর্যস্ত হয়ে গেল তা সীতাপতিও বুঝতে পারলেন না। যে-সব মনস্তত্ত্ববিৎরা মগ্নচৈতন্যের খোঁজখবর রাখেন তাঁরা হয়তো বলবেন যে, নানারূপ সামাজিক অন্ধসংস্কার, যা কিশোরীর মনে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, এই মৃত্যুসংবাদের ধাক্কায় সে-সব জেগে উঠল। হিন্দু সধবার আচার সে অনায়াসে অগ্রাহ্য করেছিল, কিন্তু হিন্দু বিধবার আচার অবলম্বন করতে তার মন তাকে বাধ্য করলে। যাই হোক, আমার কাছে ব্যাপারটা একটা mystery থেকে গেল।

সীতাপতি কিশোরীকে বৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে গৌরদাস বাবাজির কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে দিলেন। এবং তাঁকে বললেন, "এ মেয়েটি চমৎকার গাইয়ে, একে যেন কীর্তন শেখবার সুযোগ দেওয়া হয়।"

বাবাজি বললেন, "তার জন্য ভাবনা কি? এখানে উঁচুদরের কীর্তনওয়ালী আছে যারা প্রথমজীবনে কীর্তন গেয়ে বাঙালিকে মুগ্ধ করেছিল। আমি এঁকে সেইরকম একজনের হাতে সমর্পণ্ করে দেব।"

সীতাপতি চলে আসবার পূর্বে কিশোরী তাঁকে বললে, "এর পর তুমি কোথায় থাকবে, তার ঠিকানা আমাকে দিয়ে যেয়ো।"

সীতাপতি বললেন, "সেটা অনিশ্চিত। তুমি পটোল বিশ্বাসকে লিখলেই আমার ঠিকানা জানতে পাবে। সে চিরদিনই আমার অত্যন্ত অনুগত বন্ধু। আমি যখন যেখানে থাকি, তাকে জানাই।"

কিশোরী বললে, "ভয় নেই, আমি তোমাকে চিঠি লিখে উৎপাত করব না। যদি কখনো মরণাপন্ন পীড়িত হই, তবেই তোমাকে আসতে লিখব। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে একবার শুধু দেখতে চাই।"—এই কথা বলে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠল।

তখন সীতাপতি বুঝলেন যে, তাঁর প্রতি কিশোরীর ভক্তি হচ্ছে শাস্ত্রে যাকে বলে পরাপ্রীতি যা অহৈতুকী এবং আমরণস্থায়ী।

সীতাপতি বললেন, "আমি প্রথমে কাশী যাব। এক তীর্থে তোমাকে

বিসর্জন দিলুম, আর-এক তীর্থে মাকে বিসর্জন দিয়েছিলুম। এ দুজনের স্মৃতি আমার জীবন পূর্ণ করে থাকবে।”

এর পর তিনি কাশী চলে গেলেন।

সীতাপতির প্রকৃতি অত্যন্ত অসামাজিক, তা পূর্বেই বলেছি; কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় সহৃদয়। এবং কিশোরী ও তাঁর নিজের মা, এই দুটি স্ত্রীলোক তাঁর হৃদয়ে শিকড় গেড়েছিল।

৫

সীতাপতি যখন কাশী গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর কাছে টাকাকড়ি কিছু ছিল না বললেই হয়। কিশোরীর গহনাবিক্রির টাকা সে তাঁকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সীতাপতি কিছুতেই সে দান গ্রহণে সম্মত হন নি। তিনি বলেছিলেন, “অটল বিশ্বাসের স্ত্রীকে হস্তান্তর করতে পারি, কিন্তু তাঁর টাকা-পয়সা নয়। সে টাকা আমি পটোল বিশ্বাসকে দেব। তোমার যদি কখনো টাকার দরকার হয়, পটোলকে টেলিগ্রাফ করলে সে তোমাকে তা পাঠিয়ে দেবে।”

কাশী সীতাপতির পূর্বপরিচিত স্থান। সেখানে বহুলোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, গাইয়ে-বাজিয়ে পুরুত-পাণ্ডা প্রভৃতি। তিনি একটি পরিচিত পাণ্ডার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। এবং নূতন কোনো চাকরিতে ভর্তি হবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এইভাবে মাসখানেক কেটে গেল। অবসর সময়ে সীতাপতি একমনে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন; বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপারটা কি তাই জানবার জন্যে। পটোল বিশ্বাসকে তিনি অবশ্য তাঁর নতুন ঠিকানা জানিয়ে-ছিলেন। পটোল গয়াতে তার বাবার পিণ্ডদান করে কাশীতে এসে উপস্থিত হল। সীতাপতি পটোলকে কিশোরীর সব টাকা বুঝিয়ে দিলেন। এবং এখন যে তিনি নিঃস্ব, তাও জানালেন। কিন্তু পটোলের কাছ থেকে কোনো অর্থসাহায্য নিতে রাজি হলেন না।

তার পর তিনি কাশীবাসী কোনো ধনী কায়স্থ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে পটোলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেন। উক্ত পরিবারের কি একটা কলঙ্ক ছিল, যার জন্য তাঁরা দেশত্যাগী হয়ে কাশীবাস করছিলেন। ফলে সে-ঘরের

মেয়ের বিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পটোল ছিল সীতাপতির শিষ্য। সে বিনা আপত্তিতে তার মাস্টারমশায়ের প্রস্তাবে সম্মত হল, বিশেষত মেয়েটি সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলে। উপরন্তু অটলরা যে কি জাত, তা কেউ জানত না।

বিবাহের ৩।৪ দিন পরে পটোল তাঁর মাস্টারমশায়কে বললে, "যদি চাও তো তোমাকে ১০০।১৫০ টাকা মাইনের একটি চাকরি করে দিতে পারি। এখানকার পুলিসের এক সাহেবের সঙ্গে আমাদের খুব বাধ্যবাধকতা আছে। তিনি জাতে ফিরিঙ্গি, কিন্তু চলেন পুরোদস্তুর ইংরেজের কায়দায়। তাঁর মাইনে খুব বেশি নয়, কিন্তু টাকার দরকার বেশি। সে টাকা তাঁকে যে-কোনো উপায়ে হোক সংগ্রহ করতে হয়। একবার তিনি পাঁচ হাজার টাকার জন্যে মহাবিপদে পড়েছিলেন। সে টাকা বাবা তাঁকে ধার দেন ; কারণ বাবাও সে সময় একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই পাঁচ হাজার টাকায় পুলিস সাহেব বেঁচে গেলেন, বাবাকেও বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। তুমি পুলিসের চাকরি করতে রাজি ?"

"হ্যাঁ, রাজি। এ চাকরিতে আমি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করব।"

"কি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে ? পুলিসের কারবার তো শুধু চোর আর জুয়োচ্চোর নিয়ে।"

"তাতে আপত্তি কি ? সব ব্যাবসারই তো ভিতরকার কথা ঐ চুরি আর জুয়োচ্চুরি। পৃথিবীতে যতদিন দরিদ্র আর ধনী থাকবে, ততদিন আইন-কানুন সবই থাকবে। এবং আইন-কানুনের রক্ষক পুলিসও থাকবে। সমাজ তো দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখতে চায়, আর ধনীকে ধনী। এই দুয়ের পার্থক্য বজায় রাখাই তো সকল আইন-কানুনের উদ্দেশ্য।"

"কেন, লোকের সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়া কি আইনের আর-কোনো উদ্দেশ্য নেই ?"

"তা ছাড়া আর কি আছে ?"

"কাঞ্চনের সঙ্গে কামিনীকেও রক্ষা করা আইনের অন্যতম বিধি। যা অমান্য করবার নাম offences against marriage।"

"সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকেও property হিসেবে গণ্য করা হয়।"

"তা হলে offences against marriage বলে কিছু নেই ?"

"অবশ্য আছে। যথা ধনী বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী চতুর্থ পক্ষ করা।"

এ কথা শোনবার পর পটোল সীতাপতিকে সেই পুলিসের চাকরি করিয়ে দিলে।

৬

সীতাপতি অল্পদিনেই বড়োসাহেবের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। রিপোর্ট লেখা এবং তদন্ত করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর লিখিত রিপোর্টের গুণে বড়োসাহেবের মাইনে বেড়ে গেল। তাঁর তদন্তের বিষয় ছিল পশ্চিম অঞ্চলের সব দেশি ছোকরাদের খুঁজে বার করা। তিনি অবশ্য সকলেরই খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু কাউকেই ধরিয়ে দেন নি। হয়তো অনেকের সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে, কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। সুতরাং অবৈধ উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতেন না। কিন্তু তাঁরও মাইনে বেড়েই চলল। ফলে বড়োসাহেবের তিনি প্রিয়পাত্রই রয়ে গেলেন কিন্তু নিম্ন পুলিস কর্মচারীদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হলেন। তাঁকে কি করে জব্দ করা যায়, তারা তার উপায় খুঁজতে লাগল।

বছর-তিনেক পুলিসের চাকরি করবার পর গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীরা তাঁকে একদিন গ্রেপ্তার করলে। রামচন্দ্র রাও বলে একটি ঘোর anarchist নাকি ফেরার হয়েছিল। কোথায়ও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগ আবিষ্কার করলে যে, সীতাপতি রায়ই সেই রামচন্দ্র রাও। আর সে পুলিসের চাকরি নিয়েছে নিজের দলবলকে যতদূর সাধ্য সতর্ক করবার জন্যে।

রামচন্দ্র রাওই যে সীতাপতি রায় সেজেছেন, তা প্রমাণ করলেন সেই মিশনারী ইস্কুলের সাহেব। আর তিনি সেইসঙ্গে বললেন, "রামচন্দ্র ওরফে সীতাপতি রায় ইংরিজি খুব ভালো লেখেন এবং বাংলা ও হিন্দি এমন চমৎকার বলেন যে, তিনি বাঙালি কি হিন্দুস্থানী বোঝা অসম্ভব।"

তাঁর গ্রেপ্তারে আপত্তি করলেন শুধু কাশীর পুলিসের সাহেব। কারণ সীতাপতিকে জেলে দিলে তাঁর ডান হাত কাটা যায়। সে যাই হোক, তিনি হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে আটক থাকলেন, এক-আধ মাসের জন্য নয়, তিন বৎসরের জন্য।

এ তিন বৎসর তাঁর বিষয় তদন্ত চলতে লাগল। সরকারের লাল ফিতে ভয়ংকর দীর্ঘসূত্র।

সীতাপতির মুরুব্বি পুলিস সাহেব জেলে তাঁর থাকবার ভালো বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি হকিম মেহেরালির সঙ্গে এক কামরায় আটক রইলেন। সেখানে অন্য কোনো আসামী ছিল না। ফলে দুজনের ঘোর বন্ধুত্ব হল। হকিমসাহেব বললেন, তিনি নির্দোষী, তাঁকে ভুল করে গ্রেপ্তার করেছে। সীতাপতি বললেন, তিনিও নির্দোষী, এবং তাঁকেও ভুল করে ধরেছে। তাঁরা দোষী কি না, তারই তদন্ত হচ্ছে। আর যতদিন সে তদন্ত শেষ না হয় ততদিন তাঁরা এখানে আটক থাকবেন। সে তিন মাসও হতে পারে, তিন বৎসরও হতে পারে।

হকিমসাহেব বললেন, "এই জেলে কাজ নেই, কর্ম নেই, এতদিন বসে বসে কি করা যায় ?"

"আপনি নমাজ পড়ুন, আর আমি গায়ত্রী জপি।"

"নমাজ তো পাঁচ বখ্‌ত করতে হয়।"

"আর গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা জপতে হয়।"

বাদ বাকি সময় নিয়ে কি করা যায়, সেই হল সমস্যা। শেষটা অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হল, সীতাপতি হকিমসাহেবের কাছে হকিমিবিদ্যা শিখবেন, আর হকিমসাহেবকে কবিরাজীর টোটকা শাস্ত্র শেখাবেন।

তিন বৎসর কাল পরস্পরের এই অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় কেটে গেল, তার পর তাঁরা মুক্তি পেলেন। হকিমসাহেব চলে গেলেন মক্কায়, আর সীতাপতি কাশীতে। কিছুদিন পরে তিনি ত্রিহুতে গেলেন ডাক্তারি করতে। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, হকিমি ব্যাবসা সে দেশে চলবে না। কারণ মুসলমানরা হিন্দুর হাতে ওষুধ খাবে না, আর হিন্দুরা আমালতোষ জামালগোটা ফির্‌খিস প্রভৃতি ওষুধের ম্লেচ্ছনাম শুনেই ভড়কে যায়। তা খেলে নাকি তাদের জাত যাবে। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা তিনি শেখেন নি ; কিন্তু এটুকু জানতেন যে, অ্যালোপ্যাথির অস্ত্রোপচারই প্রধান অঙ্গ, আর তার ওষুধ-মাত্রা ভুল হলে মারাত্মক হতে পারে। তিনি জেলে বসে বসে ইংরিজি বাংলা হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়েছিলেন। তার থেকে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা নির্ভয়ে করা যায়। ও চিকিৎসায় উপকার থাক্ বা না থাক্, অপকার

নেই। হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসক না হতে পারেন, কিন্তু জল্লাদ নন। তাই তিনি হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তারের ব্যাবসা ধরলেন। আর ক্রমে দেদার পয়সা রোজকার করতে লাগলেন।

তার পর সীতাপতি কলকাতায় এসে একজন নামজাদা হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসক হয়ে উঠলেন। তিনি আস্তানা গেড়েছিলেন পটোল বিশ্বাসের পৈতৃক ছোটো বাড়িতে। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার মধ্যে মধ্যে দেখা হত। এবং অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস সেইখানেই তাঁর মুখে শুনি। দেখলুম, তাঁর চেহারা সমানই আছে; আর তিনি আগের চাইতে ঢের বেশি চালাক-চতুর হয়েছেন। উপরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়ে পড়ে সংস্কৃত ভাষা খুব ভালো শিখেছেন। কিশোরীকে সীতাপতি একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেন নি। তাই কিশোরী যে ধর্ম অবলম্বন করেছিল, সে ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করা তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে উঠেছিল। তিনি মতামতে আরো বেশি অসামাজিক হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন সীতাপতির ডাক্তারখানায় গিয়ে শুনি যে, পটোল বিশ্বাসের কোনো আত্মীয়া ভারী ব্যারামে পড়েছেন। এবং পটোল বিশ্বাস ডাক্তার-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে গেছেন। আর বলে গেছেন দিন-সাতেকের মধ্যে তাঁরা ফিরে আসবেন। তিনি কোথায় এবং কাকে দেখতে গেছেন, সে বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। সাত দিন পর আবার গিয়ে শুনলুম পটোল ফিরে এসেছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু ফেরেন নি। আমি পটোলের সঙ্গে দেখা করে জানলুম যে, পটোল ও ডাক্তারবাবু বৃন্দাবন গিয়েছিলেন মরণাপন্ন কিশোরীকে দেখতে। কিশোরী একটি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মনের কোনো বিকার ঘটে নি। তাঁদের দুজনের কি কথাবার্তা হল তা পটোল শোনে নি, জানেও না। সেইদিনই সীতাপতি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেন। তার পর দিন কিশোরী মারা গেল। কিশোরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাকে বললেন, “আমি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছি।” কিশোরী শেষ কথা বললে, “তুমি শ্রীকৃষ্ণের অবতার।”

তার পর সীতাপতি বৈরাগী হয়ে কোথায় যে চলে গেলেন, তা আমি জানি নে। কিন্তু খবরের কাগজে যার নাম পড়লে, সে নিশ্চিত এই সীতাপতি রায়।

বন্ধুবর বিরক্তির সঙ্গে বললেন, "এরকম লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে লোকের জেলে থাকাই কর্তব্য।"

"তোমার এ শুভকামনা শুনলে সীতাপতি বলতেন সে কথা ঠিক। আমরা সকলে বর্তমান সভ্যতার বিরাট জেলের মধ্যেই বাস করছি।"

"তার অর্থ কি?"

"সে বিষয় কি আজও তোমার চোখ খোলে নি? বর্তমান সভ্যতার চরম রূপ কি দেখতে পাচ্ছ না? সীতাপতি এই বড়ো জেল থেকে মুক্তির উপায় চিরদিনই খুঁজেছেন। সে মুক্তি হচ্ছে মনের মুক্তি।"

"তিনি কি সে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন?"

"পান আর না পান, আজীবন খুঁজেছেন।"

"বোধ হয় সেকেলে ধর্মে পেয়েছেন?"

"একেলে অধর্মে তো নয়ই।"

পৌষ ১৩৪৯

সত্য কি স্বপ্ন ?

"কি বললি ? বড়োবাবু ডাকছেন ?"

"না, তিনি ডেকেছেন।"

"তুই দেখছি হেঁয়ালিতে কথা বলছিস। ডাকছেন আর ডেকেছেন, এ দুয়ের ভিতর তফাতটা কি ?"

"বড়োবাবু বাড়িতে নেই, তিনি ডাকবেন কি করে ? তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন আপনাকে একবার ডেকে দিতে।"

"বড়োবাবু আজ আফিসে যান নি ?"

"আজ আফিসের ছুটি।"

"কিসের ছুটি ?"

"ইদ্-উল্-ফিতরের।"

"তবে আমি এখন গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করব, কার সঙ্গে কথা বলব ?"

"বড়োবাবু একটি নতুন চীজ নিয়ে এসেছেন, আপনাকে তার হেফাজত করতে হবে।"

"এই মাসখানেক আগেই বড়োবাবু একটি বনমানুষ নিয়ে এসেছিলেন, তারও হেফাজত আমাকে করতে হয়েছিল। আমি তাকে দেদার দুধ ও কলা খাওয়ালুম। তার ফলে সে আমাশা হয়ে মারা গেল। মেজোবাবু বললেন, 'বনমানুষটি তার স্ত্রীর অভাবে বিরহে প্রাণত্যাগ করলে।' ছোটোবাবু বললেন, 'এই হচ্ছে তোমাদের পূর্বপুরুষ।' আমি তাকে দেখে কিন্তু কিছুতেই আমার প্রপিতামহ বলে চিনতে পারি নি। ছোটোবাবু বললেন, 'ডারুইন পড় নি তো চিনবে কি করে ?' ছোটোবাবু সে বনমানুষের প্রকাণ্ড চওড়া মুখ নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে মাপতে আরম্ভ করেছিলেন। সে মারা গেলে তিনি কেঁদেই ফেললেন। এবার আবার বড়োবাবু কি নিয়ে এলেন— মৎস্যনারী ? তা যদি হয় তো একটা প্রকাণ্ড জালায় জল ভরে তাকে ডুবিয়ে রাখলেই হবে।"

"না, না, মৎস্যনারী নয়।"

"তবে কি বৈদ্যনাথের পাঁচ-পেয়ে গোরু ? তা হলে গোয়ালে তাকে বেঁধে খোল-বিচালি দিয়ে একটা জাব দিলেই হবে।"

"তাও নয়। আপনি কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবেন না। একবার

এসেই দেখুন-না।"

একটু পরে হল-ঘরে গিয়ে দেখি একটি পরম সুন্দর সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ছ ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বিশাল চোখ, খাঁড়ার মতো নাক, আর শরীর অতি বলিষ্ঠ। আমি ঘরে ঢুকেই বললুম, "গোড় লাগি মহারাজ।"

"আমি বাঙালি। বাঙলাতেই কথা বলুন।"

"আমাকে হুকুম করুন এখন কি করতে হবে।"

"এ ঘরের প্রতি দেওয়ালে একটা করে বিরাট আয়না টাঙানো আছে। এ ঘর লোককে দেখাবার জন্যে, বাস করবার জন্যে নয়। যদি কোনো ছোটো ঘর থাকে তো সেখানে আমার আস্তানা গাড়ো।"

আমি তাঁকে পাশের এক ছোটো ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি গালচের উপর বসতে দিলুম। তার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কতদিন সন্ন্যাস অবলম্বন করেছেন?"

"পূর্বাশ্রমের কথা আমাদের বলতে নেই। যেদিন বিরজা হোম করে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হয়েছি, সেইদিনই পূর্বজীবন পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি। কবে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছি সে কথা বললেই আপনি জিজ্ঞাসা করবেন, তার পূর্বে আমি কি ছিলুম, কি করতুম। আপনার দেখছি আমার গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশি। একটা সিগারেট দিন।"

"আপনি সিগারেট খান?"

"গাঁজা আমি খাই নে। গাঁজার কল্কে অবশ্য সঙ্গে আছে। সিগারেটটি ধরিয়ে গাঁজার কল্কের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে টানি।"

"মহারাজের সেবার কি ব্যবস্থা করব?"

"আমরা একাহারী। সূর্যাস্তের পর খানকতক আটার রুটি আর কিঞ্চিৎ অড়হরের ডাল হলেই আমার আহার হয়ে যাবে।"

"আর ঘি?"

"সে ঐ ডালের মধ্যেই দেবে। আর তা নইলে সেরখানেক দুধ। দিনের বেলা হয় আমি ঘরে বসে পূজাপাঠ করব, নাহয় তো কলকাতা শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখব।"

"আপনার শহর দেখবার শখ আছে?"

"মানুষে তার কাম ক্রোধ লোভ ও মোহ চরিতার্থ করবার জন্যে যে-সব

বিরাট শহর তৈরি করেছে তা অবশ্য দ্রষ্টব্য।"

"দেশময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ঘুরে বেড়ানোই আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে।"

"আপনি কি চান যে আমি আসনসিদ্ধ যোগী হই ? এক হিমালয়ের গুহা ছাড়া আর কোথাও আমরা আসনসিদ্ধ হই নে।"

"ইচ্ছে করলেই তো ভারতবর্ষের সমভূমিতেও তা হতে পারেন।"

"কি করে ?"

"একটি আশ্রম করে।"

"আপনার দেখছি গৃহ এবং গার্হস্থ্য জীবন ছাড়া আর কিছুই পছন্দ হয় না।"

"কিরকম ?"

"আশ্রম তো এক রকম গার্হস্থ্য জীবন। আর আমি আশ্রম করলে সেখানে আমার ভক্ত জুটবে কারা ? আমি তো মানুষকে অতিমানুষ করবার কোনো উপায় জানি নে। এবং রাম-শ্যাম-যদুকে মুনিঋষি বানাবার বৃথা চেষ্টাও করি নে।"

"আমি বলছি আপনি আশ্রম করলে সেখানে শিষ্য ঢের জুটবে।"

"শিষ্যা যে জুটবে তা জানি। আর শিষ্য যে-কজন জুটবে সে ঐ শিষ্যাদের টানেই। আশ্রম নামক গার্হস্থ্য জীবনে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর মিলন কড়া বিধি-নিষেধের দ্বারা শাসিত নয়। আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছি। আশ্রমের আবশ্যকীয় কাঞ্চনের জন্য কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু কামিনী-পরিবৃত হয়ে আমি থাকতে চাই নে।"

এমন সময় সেজোবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন। লম্বা ছিপছিপে ছোকরা, ছেলেবেলা থেকে স্পোর্টসের চর্চা করে শরীরের চামড়া সব দড়ি পাকিয়ে গেছে। দেখতে মোটেই সুদৃশ্য নয়। তিনি এসেই বললেন, "মহারাজ, আপনার শরীর এরকম চমৎকার হল কি করে ?"

"যোগ অভ্যাস করে। এর জন্যে হঠযোগেরও চর্চা করা চাই।"

"আমাকে সে-সব শিখিয়ে দিতে পারেন ?"

"মোটামুটি ভাবে পারি। ইংরিজিতে যাকে বলে ground exercise—যথা ডন, বৈঠক, কুচিমোড়া ভাঙা, শরীরকে আকাশে তুলে দুহাত মাটিতে রেখে হাঁটা, ইত্যাদি। এ-সব আপনি অবশ্য করেছেন। এর আসল ব্যাপার

হচ্ছে প্রাণায়াম করা, ইংরিজিতে যাকে বলে breathing exercise।"

"আপনি আমাকে প্রাণায়াম শেখাতে পারেন?"

"তার জন্যে একটু সময় লাগবে। আমি এ বাড়িতে কদিন থাকব তা জানি নে। যদি কিছুদিন থাকি তো শেষরাত্তিরে আমার কাছে আসবেন, আমি ইড়া-পিঙ্গলাকে আত্মবশ করতে আপনাকে শেখাব, যদি না আপনি দু-চার দিনের মধ্যেই রক্তবমি করতে আরম্ভ করেন। যৌগিক প্রাণায়াম সকলের সহ্য হয় না। বিশেষত যারা মদ্যপান করে তাদের তো নয়ই। আশা করি আপনি করেন না।"

"আমি করি কালেভদ্রে, কোনো ম্যাচ জেতবার পর।"

"তা হলে দেখছি আপনাকে নিয়ে খাটতে হবে। প্রথমত, পেটের নাড়ি ধোয়াবার কায়দা আপনাকে শেখাতে হবে।"

সন্ন্যাসীঠাকুরের এই-সব প্রক্রিয়ার কথা শুনে সেজোবাবুর মুখ চুন হয়ে গেল। তিনি বললেন, "একটু ভেবে পরে বলব।"

সেজোবাবু চলে যাবার পরেই একটি অতি খর্বাকৃতি যুবক ঘরে এলেন। তাঁর মাথাটা প্রকাণ্ড, চোখ দুটিও তাই এবং নাকটি খাঁদা। আমি বললুম, "ঠাকুরমশায়, ইনি হচ্ছেন হিদেরাম মাস্টার। লোকে ভুল করে একে হাঁদারাম বলে, তাই আমরা এঁর নাম দিয়েছি খুদিরাম। ইনি ছোটোবাবুর মাস্টার।"

"উপাধি কি?"

"জানি নে।"

"ব্রাহ্মণ?"

"ব্রাহ্মণ না হলেও ইনি বামন।"

সন্ন্যাসীঠাকুর এ কথা শুনে ঈষৎ হাস্য কারলেন। কারণ মাস্টারমশায় উঁচুতে বোধ হয় তাঁর কোমর পর্যন্ত হবেন। তার পর বললেন, "ছোটোবাবুকে ইনি কী পড়ান?"

"কি করে ভারত-উদ্ধার করতে হবে তারই সব উপদেশ দেন।— যাকে কালিদাস বলেছেন, 'প্রাংশুলভ্য ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ'।"

"এঁর শিক্ষকতায় ছোটোবাবু বোধ হয় ভারত-উদ্ধারের পথে অনেকটা এগিয়েছেন।"

"সে-সব কথা এঁর মুখেই শুনতে পাবেন।"

এর পর খুদিরাম মাস্টার বললেন, "আপনি তো অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন।"

"গেরস্তের চাইতে কিছু বেশি নয়। জীবনধারণ করাটাই কৃচ্ছ্রসাধন। এই দেখো-না, এ বাড়ির বাবুদের অতুল ঐশ্বর্য। তা হলেও বড়োবাবু আজ ছুটির দিনেও পাট কিনতে বেরিয়েছেন। আর হপ্তার বাকি কটা দিন তিনি একটা উঁচু টুলে বসে, একটা উঁচু ডেস্কের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে দশটা-পাঁচটা হিসেব লেখেন। শরীরের আরামভক্ত হলে এ কাজ কি করা যায় ?"

"আপনি তো সংসার ত্যাগ করেছেন, আপনার স্ত্রীপুত্র কেউ নেই। তা হলেও বৃথা ঘুরে বেড়িয়ে জীবন কাটান কেন ?"

"আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?"

"আপনারাই হচ্ছেন ভারত-উদ্ধার করবার উপযুক্ত লোক।"

"ভারত-উদ্ধারের অর্থ কি ?"

"বর্তমান শাসনপদ্ধতি ধ্বংস করে দেশে নতুন রাজ্য স্থাপন করা।"

"আমরা যারা সংসার ত্যাগ করেছি, আমরা কে রাজা, কে প্রজা তা জানিও নে, জানতে চাইও নে। আমরা কারো প্রজা নই, সুতরাং, রাজা-রাজড়ার ধার ধারি নে। আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

"আমরাও তো স্বাধীন হবার জন্যই চেষ্টা করছি।"

"আপনারা যা পাবার চেষ্টা করছেন সে হচ্ছে বিলিতি স্বাধীনতা। এ দেশে আমরা স্বাধীনতা বলতে অন্য জিনিস বুঝি। দেখুন মশায়, মনে ভাববেন না যে আমি ভয়ে আপনার চেলা হতে অস্বীকৃত হচ্ছি। জেলকে আমরা ডরাই নে। আহার তো আমরা করি শুধু প্রাণধারণের জন্যে। সেরকম আহার জেলেও মেলে। একখানা ইঁট মাথায় দিয়ে শোওয়া, তাতেও আমরা অভ্যস্ত। আর গলায় ফাঁসি তো আমরা সকলে পরেই রয়েছি ; কখন ফাঁসিটা কষে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। মৃত্যু একটা accident। আপনাদের স্বাধীনতার ব্রত নিলে আমাকে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। আমি আপনার শিষ্য হবার উপযুক্ত লোক নই।"

এর পর মাস্টারমশায় সন্ন্যাসীঠাকুরকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাঁচ মিনিট পর স্বয়ং ছোটোবাবু এসে হাজির হলেন। এসেই সন্ন্যাসীঠাকুরকে বললেন, "আপনি আছেন কিরকম ? চেহারা দেখে তো

মনে হচ্ছে কিছুই বদল হয় নি।”

“আপনি আমাকে চেনেন নাকি?”

“অবশ্য। আপনি তো আমাদের দলের একজন চাঁই।”

“আপনি ভুল করেছেন। আপনি যাকে দেখেছেন সে আমি নই, আমার দাদা।”

“আমি তো অন্ধ হই নি। আপনি আমাদের গুরুর ভাই হতে পারেন, কিন্তু দু ভাই তো দেখতে ঠিক এক রকম হয় না।”

“আমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা। আমাদের দু জনকে একই ব্যক্তি বলে বহুলোকে ভুল করে, এবং তার জন্যে আমাকে বার বার বিপদে পড়তে হয়। দাদাও সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনি হচ্ছেন পোলিটিকাল সন্ন্যাসী। এবং তাঁর কর্মের জন্যে আমাকে মধ্যে মধ্যে জেলে যেতে হয়।”

“এখান থেকেও হয়তো আবার আপনাকে জেলে যেতে হবে। পুলিসের গোয়েন্দারা এ বাড়ির উপর বারোমাস নজর রাখে মাস্টারমশায়ের কোন্ শিষ্য এখানে আসে যায় তাই দেখবার জন্যে।”

“আমি তো মাস্টারমশায়ের শিষ্য নই।”

“আপনি মাস্টারমশায়ের গুরু, অর্থাৎ আপনার দাদা।”

“পুলিস ধরে নিয়ে যায় তো তাদের সঙ্গে যাব। আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন আপনার এ মাস্টারমশায়। কারণ উনি হচ্ছেন পুলিসের বর্ণচোরা গোয়েন্দা। ওঁর সঙ্গে পুলিসের খুব দহরম-মহরম। উনি ধরিয়ে দিতেও যেমন ওস্তাদ, ছাড়িয়ে নিতেও তেমনি।”

“আপনি ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন?”

“না।”

“তা হলে চটপট একটা করে ফেলুন। কারণ পুলিস জানে যে বিয়ে করলে অধিকাংশ লোকের বিপ্লবের নেশা ছুটে যায়।”

“আমি রাজি আছি। কিন্তু কোন্ বাপ-মা সন্ন্যাসীকে মেয়ে দেবে? আর কোন্ মেয়েই-বা আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?”

“মেয়ে মাত্রই। কারণ আপনার মতো সুন্দর পুরুষ লাখে একটি মেলে না।”

“তা যেন হল। কিন্তু আমি তো আমার সন্ন্যাস ত্যাগ করব না। আমাকে বিয়ে করলে তাকেও সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনী হতে হবে। অর্থাৎ

তাকে আমার ভৈরবী হতে হবে।”

“দেখি এরকম একটি মেয়ে আমি জোগাড় করতে পারি কি না।”

ইতিমধ্যে ছোটোবাবু সন্ন্যাসীঠাকুরের কানে কানে কি বললেন তা আমি শুনতে পাই নি। তার পর ছোটোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কটা বেজেছে ?”

“সাড়ে নটা হবে।”

“তবে এখন আমি যাই, দশটায় ফের আসব।”

“আমিও এই আধঘণ্টা ব্যাপারটা কিরকম হবে ভেবে দেখি।” পরে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন, “আর-একটা সিগারেট দিন তো।” আমি একটি সিগারেট দিলে তিনি সেটি ধরিয়ে বললেন, “ভাবনা হচ্ছে এই কারণে যে, আমার ভাই আবার আমার স্ত্রীকে কেড়ে না নেন। ও মেয়েটি তো আমাদের তুজনের প্রভেদ বুঝতে পারবে না। তিনি তাঁর দলের একটি কৃষ্ণবিষ্ণু হতে পারেন, যদি কৃষ্ণগিরিতে মত্ত হয়ে না থাকতেন।”

এর পরে সন্ন্যাসীঠাকুর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন।

ঠিক দশটার সময় ছোটোবাবু মেজোবাবুকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হলেন। মেজোবাবু বললেন, “আমি একটি বাইজিকে জানি, সে চমৎকার গান করে, আর অপূর্ব কথকী নাচ নাচে। কিন্তু সে মনস্থির করেছে যে সে আর মা-বোনের ব্যাবসা করবে না; সন্ন্যাসিনী হবার দিকে তার ঝোঁক। আপনি চান তো আমি আপনাকে বিয়ে করতে তাকে রাজি করতে পারি।”

“আমার কোনো আপত্তি নেই, যদি সে স্বেচ্ছায় আমাকে বরণ করে। সে শুনছি চমৎকার গান করে। বোধ হয় টপ্পা ও ঠুংরি। আমার হাতে পড়লে তাকে ধ্রুপদ গাইতে শেখাব। আর সে যদি সত্যিই সন্ন্যাসিনী হয়, তা হলে তাকে প্রথমে এই ধ্রুপদটি শেখাব : বাওরে কি সঙ্গ সাথ, বাওরে সি ভই মৈ।”

“সন্ন্যাসীঠাকুর, আপনি কি গাইতেও পারেন ?”

“আমি গাই আপনাদের স্বমুখে নয়, স্বসম্প্রদায়ের কাছে। আর-একটি কথা। আপনি আমাকে বরপণ কি দেবেন ?”

“আপনি বরপণও নেবেন ?”

“যখন কামিনী নিচ্ছি, তখন কাঞ্চনই-বা ছাড়ব কেন ?”

এ কথায় মেজোবাবু একটু ইতস্তত করছেন দেখে ছোটোবাবু বললেন,

"এঁকে অন্তত হাজার টাকা দিতে হবে।"

তার পর তিনি চাকরকে বললেন, "যা, মতিবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

মতি এ বাড়ির খাজাঞ্চি। তিনি ডাকবামাত্র এসে উপস্থিত হলেন। চোখ দেখেই বোঝা যায় যে লোকটি অতিশয় ধূর্ত, কিন্তু কথাবার্তায় তিনি অতিশয় বিনয়ী, খোসামুদে বললেও অত্যুক্তি হয় না। মতিবাবু আসতেই ছোটোবাবু তাঁকে বললেন, "যাও, মেজোবাবুর নামে হাজার টাকা খরচ লিখে আমার নামে জমা করো। পাঁচ টাকার নোটে হাজার টাকা তাড়া বেঁধে রাখো, আমি চাইলেই যেন পাই।" তার পর ছোটোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি এখন দেখবেন?"

"যদি এখানে এসে থাকে তো এখনি দেখিয়ে দিন।"

ছোটোবাবু মেজোবাবুকে বললেন, "তুমি নীচে গিয়ে রতনকে ডেকে নিয়ে এসো।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রতন এল। মেয়েটি দেখতে পরমাসুন্দরী। সন্ন্যাসী-ঠাকুর তার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কি কথাবার্তা কইলেন; তার পর মেজো-বাবুকে বললেন, "ও আমাকে বিবাহ করতে রাজি। এমন স্ত্রী তো হঠাৎ পাওয়া যায় না। কথকী নাচে ওস্তাদ—সে তো ছোকরার নাচ, আধা-জিমন্যাস্টিক্। আমার সঙ্গে দেশ-পর্যটন করতে হলে আমার সহধর্মিণীর কখনো কখনো কসরৎও করতে হবে। বেলা পাঁচটায় আমি বিবাহ করব, সে কথা স্থির হয়েছে।"

মেজোবাবু বললেন, "পাঁচটার সময় কি লগ্ন আছে?"

"আমাদের বিয়েতে আবার লগ্ন কি? আপনাদের কোনো পুরুতও ডাকতে হবে না। আমি বিবাহ করব, আমিই পৌরোহিত্য করব। রতন, ঠিক পাঁচটার সময় এখানে এসে হাজির হোয়ো। আমি এই ঘণ্টা তিন-চার শরীরের শুশ্রূষা করব।"

বড়োবাবু বেলা বারোটার সময় বাড়ি ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায়?"

"তিনি এখন ঘরে দুয়োর দিয়ে হঠযোগ অভ্যাস করছেন।"

তার পর আমরা তাঁকে বেলা পাঁচটার সময় সন্ন্যাসীঠাকুরের অদ্ভুত বিবাহের আদ্যোপান্ত সব কথা বললুম। তিনি একটু হেসে বললেন, "উনি যে একটি

চীজ তা আমি দেখেই বুঝেছিলুম। সেইজন্তেই তো তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলুম।”

“যা হোক, এটি বনমানুষ নয়!”

“এই মানুষ বনে গেলেই বনমানুষ হয়।” বলে বড়োবাবু স্নানাহার করতে গেলেন। বলে গেলেন, তিনি এই বিবাহে যথাসময়ে উপস্থিত থাকবেন।

ঠিক পাঁচটার সময় বিবাহ-সভায় আমরা সকলেই উপস্থিত হলুম।—মায় রতন, মতিবাবু ও খুদিরাম মাস্টার। সন্ন্যাসীঠাকুর এসে রতনের কানে কি মন্ত্র দিলেন। তার পর বললেন, “আমাদের বিবাহ তো হয়ে গেল।” রতন বললে, “গুরুজি মেরা বেয়াদপি মাপ কিজিয়ে। মৈ একঠো গীত বাৎলায়গা। মেজলাবাবু, আপ তানপুরা ছোড়িয়ে।”

মেজবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “হরিদা, হারমোনিয়ামে সংগত কীজিয়ে। রতন কোমল রেখাব স্থর করে একটি গান গাইবে।” রতন বললে, “একঠো তবলচি হোনেসে আচ্ছা হোতা।”

ছোটোবাবু বললেন, “মাস্টারমশায় চমৎকার তবলা বাজান।” খুদিরাম মাস্টার একটি তাঁবার বাঁয়া কোলে করে তবলাতে চাঁটি মারলেন। তার পরে রতন এই গানটি ধরলে: মোরি নয়ি লগন লাগি রে পিয়া তুম সন মোরা স্থন্দর সনেহ লাগি ঘড়ি পল ছন দিন। কি চমৎকার তার গলা— যেমন ভরাট, তেমনি মিষ্টি! আমি হারমোনিয়ম মন্দ বাজাই নে। আর খুদিরাম মাস্টার বাঁয়াতবলায় ওস্তাদ। তুহাতেই বোল সমান ওঠে। যখন গান-বাজনা খুব জমেছে তখন দরওয়ান এসে বড়োবাবুকে বললে যে, নীচে পুলিসের সব লোক এসেছে। ছোটোবাবু বললেন, “ও লোককো উপ্পর আনে দেও।”

একটু পরে একটি C. I. D. ইন্‌স্পেক্টরবাবু তুটি ফিরিঙ্গি সার্জেণ্ট সঙ্গে করে পিস্তল হাতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু বললেন, “আমাকে মাপ করবেন, এই সন্ন্যাসীটিকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।”

সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন, “তথাস্তু।”

রতন বললে, “আমি সঙ্গে যাব। আমি জেলও ভয় করি নে, ফাঁসিও ভয় করি নে।”

সন্ন্যাসীঠাকুর বললেন, “রতন, তোমাকে যেতে হবে না। আমি ঘণ্টা তুয়ের ভিতর না ফিরি তো তোমাকে যোগসূত্রে সব জানাব। যোগসূত্র এক রকম spiritual wireless। আমার সেই যমজ ভ্রাতা হয়তো আবার কিছু

দুষ্কর্ম করেছে, তাই পুলিস ভুল করে আমাকে নিয়ে টানাটানি করছে। এই প্রথম নয়, আমাকে আগেও তারা বহুবার এইরকম গ্রেপ্তার করেছে।”

মাস্টারমশায় বললেন, “আপনার কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসব।”

ছোটোবাবু বললেন, “আপনার বরপণের টাকাটা কি হল?”

“সে টাকাটা মাস্টারমশায়কে দিয়ে দেবেন, তার চমৎকার বাজানোর পুরস্কার স্বরূপ।”

তার পর সন্ন্যাসীঠাকুর আস্তে আস্তে পুলিসের সঙ্গে চলে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, “আমার হাতে আপনারা হাতকড়া পরান, যাতে আমি ফিরিঙ্গি সার্জেণ্টের হাতের পিস্তল কেড়ে নিয়ে আপনাদের উপর গুলি না চালাই। প্রাণভয়ে লোকে সবই করতে পারে।”

যখন সাতটা বাজল তখন রতন বললে, “তিনি তো ফিরে এলেন না। তবে এখন আমি যাই।”

আর পাঁচ মিনিট পর খুদিরাম মাস্টার টেলিফোন করে বললে, “সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে আমি খালাস করেছি। তার পর তিনি অদৃশ্য হয়েছেন তাঁর ভাইটিকে খুঁজে বার করতে। আমি তাঁকে বললুম যে, ‘আপনি তো পালালেন, এখন রতনের কি হবে?’ তিনি বললেন, ‘সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না’।”

এতক্ষণ আপনাদের যে গল্প বললুম, তা সত্যিই ঘটেছিল, না, আমি দিবা-স্বপ্ন দেখেছিলুম তা হলপ করে বলতে পারি নে। এক-একবার মনে হয় এই যুদ্ধের দিনে এরকম ওলোট-পালোট ব্যাপার সবই ঘটতে পারে। সন্ন্যাসী-ঠাকুরও বিয়ে করতে পারেন, খুদিরাম মাস্টারও দাগী সন্ন্যাসীকে পুলিসের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারেন, রতনও রাস্তায় কোনো জায়গায় তার সঙ্গে গিয়ে জুটতে পারে। আর এও হতে পারে যে, কিছুই ঘটে নি, আমার মাথার ভিতরে সব গোলমাল হয়ে গেছে বলে ছুটির দিন বাড়ি বসেই দিবাস্বপ্ন দেখেছি।

চৈত্র ১৩৫০

অ্যাডভেঞ্চার : স্থলে

ইংরেজরা রকমারি গল্প লেখে, তার মধ্যে এক ধরনের গল্পকে বলে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। আর এই ধরনের গল্পই মানুষের পছন্দসই। যে-সব ঘটনার ভিতর বাধা আছে, বিপত্তি আছে— সেই-সব ঘটনা নিয়েই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখা হয়; যথা আফ্রিকা দেশে সিংহ-শিকার, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কোনো নতুন দ্বীপে গিয়ে ওঠা, যেখানকার মানুষগুলো সব মানুষখেকো ইত্যাদি।

আমরা বাঙালিরা অতি নিরীহ জাত; শিকার আমরা করি না, যদিও করি তো ঘুঘু-শিকার। এ শিকারে কোনো বিপদ নেই; কেননা ঘুঘু ও সিংহ এক জাত নয়। সমুদ্র তো বেজায় ব্যাপার; আমরা গঙ্গাও পার হই পুলে চড়ে, নৌকায় চড়ে নয়। কি জানি গঙ্গায় কখন ঝড় উঠবে অথবা জোর জোয়ার আসবে, আর নৌকো তখনই কাত হয়ে মা-গঙ্গার পেটের ভিতর সেঁদবে। কাজেই অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। জীবনে যা ঘটে না, সাহিত্যে তা ঘটানো সোজা কথা নয়। এ সত্ত্বেও ছোটোখাটো বিপদ আমাদের ভাগ্যেও ঘটে। আমরা বলি যে 'সাবধানের মার নেই'— এর উত্তরে আমার একজন বন্ধু বলতেন যে 'মারের সাবধান নেই'। কথাটা সত্য।

আমার মতো সাবধানী লোকের জীবনেও মধ্যে মধ্যে এমন দু-একটি বেয়াড়া ঘটনা ঘটেছে যা মহাবিপদ হয়ে উঠতে পারত। আজ তারই একটা ঘটনার কথা তোমাদের বলব। তা শুনলেই বুঝতে পারবে যে, সামান্য ঘটনা কিরকম অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠতে পারে— যে-অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, আছে শুধু ভীরুত্ব। আর ভয়ই হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের প্রাণ।

২

সে বৎসর আমি দার্জিলিঙে ছিলুম। কোন্ বৎসর ঠিক নেই, বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগে হবে। স্কুল ছেড়ে অবধি দার্জিলিঙে বহুবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু সে যাতায়াতের হিসেব লিখে রাখি নি; সেইজন্যই আন্দাজে বলছি, বছর

পঁচিশ-ত্রিশ আগে হবে।

আমরা অবশ্য পুজোর ছুটিতে হিমালয়ে হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলুম, যেমন আর পাঁচজন যায়। তফাতের ভিতর এই যে, অপরে যায় দশ-পনেরো দিনের মেয়াদে, কিন্তু আমরা মাস-দুয়েকের জন্য সেখানে ঘরকর্না পেতে বসি।

এর কারণ আমি যাঁদের সঙ্গে যাই তাঁদের বারোমাসই ছুটি। আপিস-আদালত খুললে, তাঁদের কলকাতা ফেরবার গরজ ছিল না। আর নতুন ঘরকর্না পাতাও যেমন হাঙ্গাম, তোলাও তেমনি। ফলে তাঁরা একবার কোথায়ও গুছিয়ে বসলে সহজে সেখান থেকে নড়তে চাইতেন না। আর আমাদের বন্ধুবান্ধব সব জুটে গেছল যত ভুটিয়া ও পাহাড়ী।

হাতে কাজ নেই, তাই বসে বসে ভুটিয়াদের মুখে যত গুণজ্ঞানের কথা শুনতুম। মন্ত্রবলে নাকি লামারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে আমি একজন ছোটোখাটো পণ্ডিত ; কিন্তু আমি প্রথমে শিখি ভোটতন্ত্র, তাও আবার চাকরবাকরের মুখে শুনে। আমি তাদের পরামর্শমত মানুষের হাতের হাড়ের বাঁশি, আর মাথার খুলির ডমরু সংগ্রহ করি ; কিন্তু সে বাঁশি বাজিয়ে কাউকে ঘর-ছাড়া করতে পারি নি, বা সে ডমরু বাজিয়ে কোনো নন্দীভৃঙ্গীকে কৈলাস থেকে টেনে আনতে পারি নি।

৩

এমনি করে শীতের দেশে বাজে কাজে সময় কাটাচ্ছি, এমন সময় কলকাতা থেকে চারটি বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের আমি দেখেই অবাক— অর্থাৎ তাঁদের বেশভূষা দেখে। চারজনই পুরোদস্তুর ইংরেজি পোশাক পরেছেন— কিন্তু তাঁদের কোটপেণ্টলুনের কাপড় অসম্ভব রকম মোটা। বিলেতি কাপড় যে এত মোটা হয় তা আগে লক্ষ্য করি নি। অবশ্য এ কাপড় শীত ঠেকানোর জন্য নয়— শীতের ভয় তাড়াবার জন্য। জিনিস যে ভারী হলেই গরম হয়, এ হচ্ছে চোখের লজিক, চামড়ার নয়। আর মানুষে চোখের লজিকের উপর নির্ভর ক'রে নানারকম বিপদে পড়ে ; চোখের ন্যায়— ঘোর অন্যায়।

সে যাই হোক, এই চারটি বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে আমি মহা খুশি হলুম, কারণ এ চারজনই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বেজায়, গল্পেও সুরসিক। চার জনেরই কাজ আছে বটে, কিন্তু কেউ তা মন দিয়ে করে না। আপিস-আদালতের

চাইতে আড্ডার মোহ তাদের ঢের বেশি। এর থেকে বুঝতে পারছেন যে, তারা আমারই দলের লোক ; অর্থাৎ বাজে কথাই তাদের মতে কাজের কথা।

যাঁদের সঙ্গে আমি ছিলুম, তাঁরাও এদের আগমনে মহা খুশি হলেন। এঁরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমাদের বাড়িতে আড্ডা দিতে আসতেন, আর বেলা পাঁচটা পর্যন্ত নানা সত্যমিথ্যা গল্প করতেন, আর তার ভিতর থেকে রসিকতার স্ফুলিঙ্গ বেরোত। এঁরা হাসতেও পারতেন, হাসাতেও পারতেন। বিকেলে চা-খাবার পর আমরা বেড়াতে বেরোতুম, এবং অন্ধকার হলে যে যার স্বস্থানে ফিরে যেতেন— আমিও ঘরে ফিরতুম।

৪

খালি রাস্তায় টো টো করে ঘুরে আমরা পায়ে-হাঁটার উপর বিরক্ত হয়ে গেলুম। তার পরে একদিন ঘোড়ায় চড়ে একটা লম্বা চক্কর দেব স্থির করলুম।

অবশ্য আমরা কেউ যথার্থ ঘোড়সোয়ার ছিলুম না। ঘোড়ায় চড়বার অভ্যাস আমারই শুধু একটু-আধটু ছিল। কিন্তু আমার বন্ধুরা কোনো বিষয়েই পিছপাও নন। সুতরাং এ প্রস্তাবে সকলেই মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। আমাদের সকলেরই তখন পূর্ণযৌবন— শরীর শক্ত, মন বে-পরোয়া। সুতরাং বন্ধুরা ঘোড়ায় চড়তে জানুন আর না জানুন, সকলেই ঘোড়ায় চড়তে রাজি হলেন। পাঁচটি ঘোড়া সংগ্রহ হল। অবশ্য সবগুলিই ভুটিয়া টাট্টু। ভুটিয়া টাট্টু কিন্তু সব পগেয়া টাট্টু নয়, ও-জাতের ভিতর অনেক মোটা তাজা টাট্টু আছে— তারা বেদম ছুটতে পারে, আর কখনো কখনো লিবঙের ঘোড়দৌড়ে বাজি জেতে। আমরা আমাদের সাহেবী পোশাকের সঙ্গে যাতে খাপ খায়, সেইজন্যে সব পয়লা-নম্বরের ঘোড়া জোগাড় করেছিলুম। নইলে লোকে দেখলে বলবে কি! তাড়াতাড়ি চা পান করে আমরা পাঁচ বন্ধু পাঁচটি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

কালিম্পঙের রাস্তা ধরে যত দূরে সন্ধের আগে যাওয়া যায়, তত দূর যাব স্থির করলুম। আমি অবশ্য এ দলের পথপ্রদর্শক। আমরা প্রথমে 'ঘুম' হয়ে, সিঞ্চল পাহাড়কে ডাইনে ফেলে, কালিম্পঙের পথে অগ্রসর হতে লাগলুম।

রাস্তায় কত ভুটিয়া সুন্দরী এক কপাল খয়ের মেখে, দুধের চোঙা ঘাড়ে করে নিজেদের বস্তিতে ফিরছে। সহিসগুলো শিস্ দিতে দিতে ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল।

৫

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম বিকেল চারটেয়; যখন ছটা বাজল তখন ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিলুম দার্জিলিঙের দিকে। একে শীতের দেশ তার উপর আবার শীতকাল, তাই যখন দিনের আলো পড়ে এল, তখন বাড়ি ফেরাই সুযুক্তির কাজ মনে করলুম। আমি পূর্বেই বলেছি, আমরা মুখে রাজা-উজীর মারতে প্রস্তুত থাকলেও আসলে ছিলুম অতি সাবধানী লোক; সুতরাং পাহাড়ের দেশে অচেনা পথে ঘোড়া দাবড়ে বেড়াতে আমাদের উৎসাহ দু ঘণ্টার মধ্যেই কমে এসেছিল।

কালিম্পঙের দিকে বোধ হয় বেশি দূর অগ্রসর হই নি, কারণ পথটা উৎরাই পথ, তাই ঘোড়াগুলোকে সিধে দুলকির চালেই চালিয়েছিলুম; নইলে সেগুলো হোঁচট খেয়ে পড়তে পারত। ঘোড়া তো ঘোড়া, ঢালু উৎরাই পথে মোটর গাড়িরও বেগ সম্বরণ করতে হয়।

ফেরার পথে আমরা চাল একটু বাড়িয়ে দিলুম, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই সিঞ্চল পাহাড়ের পাদদেশে এসে পড়লুম। মনে হল, ঘরে এসে পৌছলুম। জানা জায়গাকে বিদেশ কিম্বা দূরদেশ বলে কখনো মনে হয় না। হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল যে, এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে লেখা আছে 'This way to Sinchal'। আমাদের মধ্যে বীরপুরুষটি বলে উঠলেন, "চলো এই পথে, এধার দিয়ে সিঞ্চলের মাথায় উঠে ওধার দিয়ে নেমে যাব।" বলতে ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমাদের মধ্যে একটি বীরপুরুষ ছিল, অবশ্য মুখে। আমি একটু আপত্তি করেছিলুম, কারণ সিঞ্চলশিখর আমার জানা ছিল; আর ওধার দিয়ে নামবার মুখে অন্ধকারে বিপদ ঘটতে পারে, এই ভয়।

আমার বন্ধুদের তখন ঘোড়ার ঝাঁকুনিতে মাথায় খুন চড়ে গেছে, সুতরাং তাঁদের ফুর্তি আবার ফিরে এল। সুতরাং আমার আপত্তি তাঁদের কাছে গ্রাহ্য হল না। অবশেষে সেই নতুন পথই আমরা অবলম্বন করলুম। আমি অবশ্য এ পথ না চিনলেও হলুম এ দেশের পথপ্রদর্শক। আমার বীরবন্ধুটিও

'আগে চল্' বলে গান ধরলেন। সে গানের না আছে সুর, না আছে তাল।

৬

ঘণ্টাখানেক চলেছি তো চলেইছি, সিঞ্চলশীর্ষের আর দেখাই নেই। আমার বীরবন্ধুটির গান থেমে এল, তিনি ফেরবার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজি হলুম না, কেননা আমি বুঝলুম যে আমরা ভুলপথে এসেছি, ফিরতে গেলে কোথায় যাব তার ঠিক নেই। যতক্ষণ একটা লোকের সঙ্গে দেখা না হয় ততক্ষণ আগে চলাই ভালো। আগেই চলি আর পিছু হঠি, কোন্ দিকে যাচ্ছি তা জানা ভালো। আগেই চলতে লাগলুম, কিন্তু ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল, কারণ আমরা একটা ঘোর বনের মধ্যে এসে পড়েছিলুম। চার দিকে গায়ে গায়ে বড়ো বড়ো গাছ, আর মাথার উপর ঘোর অন্ধকার! চোরডাকাতের ভয়, বাঘভালুকের ভয়; ভূতের ভয় অবশ্য আমরা পাই নি। ভয়টা প্রধানত অন্ধকারের ভয়, আর সমস্ত রাত ঘোর শীতের ভিতর বনে বনে ঘুরপাক খাবার ভয়। অনির্দিষ্ট ভয়ই হচ্ছে সব চাইতে সেরা ভয়।

রাত যখন আটটা বাজল, তখন দূরে একটা আলো দেখা গেল। আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে সেই আলোর দিকে এগোতে লাগলুম। গিয়ে দেখি একটি ছোটো বাঙলো, আর তার বারান্দায় এক ভোজপুরী দারোয়ান একটি হারিকেন লণ্ঠন সুমুখে করে বসে আছে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে— "আপনারা পথ ভুলে রঙ্গারুণ পথে ঢুকেছেন, আর প্রায় সোনাদহের কাছাকাছি এসেছেন। আজ রাত্তিরে যদি দার্জিলিং ফিরতে চান তা হলে আমি যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি সোজা সেই পথে চলে যাবেন; ডাইনেও বেঁকবেন না, বাঁয়েও বেঁকবেন না।"

এ কথা শুনে আমাদের ধড়ে প্রাণ এল।

এর পরে আমরা মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলুম। ভয়ে মানুষ যে কি-রকম সাহসী হয় তার প্রমাণ আমাদের সে রাত্রের ঘোড়-দৌড়। প্রায় অর্ধেক পথ এসেছি, এমন সময় আমাদের মধ্যে একজন ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, আর খাদের ভিতর গড়াতে গড়াতে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেলেন। তাঁর ঘোড়াটা কিন্তু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বন্ধুবর অতঃপর কোনোরকমে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উপরে উঠে ফের ঘোড়ায় চড়লেন; বললেন, তাঁর

কোথাও কিছু লাগে নি।

রাত যখন নটা বাজল, তখন আমরা যেখানে 'This way to Sinchal' লেখা ছিল, সেইখানে পৌঁছলুম; তার পর বড়ো রাস্তা ধরে রাত দশটায় বাড়ি পৌঁছলুম।

এ গল্প হচ্ছে, যে বিপদ হতে পারত কিন্তু হয় নি— তারই গল্প।

আমাদের বাঙালির পক্ষে এই অ্যাডভেঞ্চারই জুতসই। এ গল্প আমার বন্ধুরা এত ফুলপাতা দিয়ে সাজিয়ে আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেছিলেন যে, তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে এই ছোটো গল্প একটি উপন্যাস হয়ে উঠবে। আর সে লম্বা গল্প শুনে তোমরা খুশি হবে কি না জানি নে, যদিচ আমার গুরুজনেরা শুনে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি বাদে বাকি চার জন কি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, সে তারই দেড়শো পাতা কাহিনী।

এ গল্পের নৈতিক উপদেশের একটা লেজ আছে। সে উপদেশ হচ্ছে এই— কখনো ভুল পথে যেয়ো না। আর বুড়োরা যে পথে যায় না, সেইটেই ভুল পথ।

প্রগতিরহস্য

আজ যা পাঁচজনকে শোনাতে বসেছি তা একটা উড়ো গল্প নয়— আমাদের বর্তমান প্রগতির আংশিক ইতিহাস, অথবা দুটি ভদ্রলোকের আংশিক জীবনচরিত। এ দুই ব্যক্তির কেউ অবশ্য চিরস্মরণীয় নন। আমার স্মৃতিপটে এঁদের যে রূপ অঙ্কিত আছে, সেই ছবি ঈষৎ enlarge করে আপনাদের সুমুখে খাড়া করতে চাই; যদিচ তাঁরা কেউ সুদৃশ্য ছিলেন না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সার্থকতা কি।— আমার উত্তর হচ্ছে, আমাদের ভিতর কজন চিরস্মরণীয় হবেন? দু এক জনের বেশি নয়। তাই বলে আমরা যারা আছি, আমাদের মতামতের ও বিদ্যাবুদ্ধির কি কোনো মূল্য নেই? আমাদের মতো সাধারণ লোকের সঙ্গে অসাধারণ লোকের প্রধান তফাত এই যে, আমরা আছি, আর তাঁরা ছিলেন। যখন তাঁরা ছিলেন, তখন তাঁরা আমাদেরই মতো কাউকে হাসিয়েছেন, কাউকে কাঁদিয়েছেন, কাউকে ঘুঁসো দেখিয়েছেন, কারো কাছে জোড়হাত করেছেন। অর্থাৎ আমরা আজ যা করি, বছর পঞ্চাশ আগে তাঁরাও তাই করেছেন। আমরা কেউ কেউ সেকালের কথা শুনতে যে ভালোবাসি তার কারণ, একাল সেকালেরই পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের প্রতিব্যক্তির যেমন একটু-আধটু বিশেষত্ব আছে, তাঁদেরও তেমনি ছিল। সেই বিশেষত্বই আমার মনে আছে, আর সেই কথা আপনাদের নিবেদন করতে চাই। কি সূত্রে এঁদের কথা আজ মনে পড়ে গেল, তা বলছি।

২

প্রগতি যে আমাদের হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রগতির মানে কি? কোনো বড়ো জিনিসের কোনোছোটো অর্থ নেই— যা দু কথায় বোঝানো যায়; আর অনেক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, লোকে সে কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রগতির প্রমাণ এই যে, আমি যদি বলি প্রগতি হয় নি, তবে লোকে বলবে— তুমি অন্ধ, আর নাহয় তো তুমি সেকেলে কূপমণ্ডুক। দেখতে পাচ্ছ না যে, আমাদের কাব্যে ও চিত্রে, নৃত্যে ও গীতে কি পর্যন্ত প্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে? তুমি, প্রমথ চৌধুরী, দেখছ যে আমরা আজও পরাধীন ও পরবশ—

কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে আমাদের পরাধীনতাই আমাদের সকল প্রগতির মূল, আর তুমিও ঐ প্রগতির জোয়ারে খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছ।

আমি বলি— তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাসা করি, দেশে প্রগতি আনলে কে? যদি বল ইংরেজ, তা হলে কথাটা ঠিক হবে না। ইংরেজ তো আমাদের প্রগতির পথ বন্ধ করে দিয়েছে ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের বেড়া তুলে। এর পর আমাদের প্রগতির উল্টোরথ টানতে হবে।

তবে কি রামমোহন রায় এই প্রগতির রথ নূতন পথে চালিয়েছেন? অবশ্য এ পথ রামমোহন প্রথম আবিষ্কার করেন। তার পর বহু লোক এই রথের দড়ি টেনেছেন। এই শ্রেণীর দুটি লোকের কথা তোমাদের শোনাব; তার মধ্যে একজন ছিলেন প্রগতির নীরব কর্মী, আর-এক জন নীরব ভাবুক।

৩

আমি ছেলেবেলায় একটা মফস্বলের শহরে বাস করতুম লেখাপড়া করবার জন্য। সেকালে উক্ত শহরে দুজন গণ্যমান্য মুখুজ্যে মশায় ছিলেন। একজনের ছিল অগাধ টাকা, আর-এক জনের ছিল অগাধ বিদ্যে— দুইই স্বোপার্জিত; কেননা উভয়েই ছিলেন দরিদ্র সন্তান, কিন্তু উভয়েই self-helpএর মন্ত্র সাধন করে একজন হয়েছিলেন ধনী, অপরটি বিদ্বান।

কেনারাম মুখুজ্যে কোনো জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে তাঁর শ্বশুরকুলের দত্ত মাসহারার টাকা বাঁচিয়ে, সে উদ্‌বৃত্ত টাকা সুদে খাটাতেন। আমি এ কথা জানতুম এই সূত্রে যে, আমাদের মতো লোকের অর্থাৎ যাদের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি তাদের, দরকার হলেই তিনি তিন চার হাজার টাকা অপব্যয় করবার জন্য ধার দিতেন শতকরা বারো টাকা সুদে।

সে শহরে আর-একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি জাতে সুবর্ণবণিক ও ধর্মে খ্রীস্টান। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘর আলো করে থাকত, আর তার নাম ছিল— 'মাই ডিয়ার'। তাঁর কোনো ostensible means of livelihood ছিল না; অথচ টাকার কোনো অভাব ছিল না। ছোটো ছেলের কৌতূহলের অন্ত নেই— তাই আমি মাই ডিয়ারের স্বামীকে একদিন জিজ্ঞেস করি যে, শ্রীযুক্ত কেনারাম মুখুজ্যে এত টাকা করলেন কি করে?— তিনি বললেন যে, টাকা করা একটা আলাদা বিদ্যে। যে জানে, সে বিনে পয়সায় দেদার পয়সা করতে পারে। পরে

শুনেছি, তিনি আগে গভর্নমেণ্টের চাকরি করতেন, কিন্তু অফিসে self-helpএর বিদ্যের এতটা বেপরোয়াভাবে চর্চা করেছিলেন যে সরকার তাঁকে কর্মচ্যুত করতে বাধ্য হন ; জেলে দেন নি পাদরি সাহেবের খাতিরে। তিনি ছিলেন প্রগতির একটি উপসর্গ। কি হিসেবে, তা পরে বলব।

৪

কেনারামবাবু বোধ হয় কখনো ইস্কুলে পড়েন নি। তিনি ইংরেজি জানতেন কি না, বলতে পারি নে। যদিও জানতেন তো সে নামমাত্র। এ ধারণা আমার কোত্থেকে হল তা বলছি।

মুখুজ্যে-গৃহিণীর একটি ছোটোখাটো operation হবার কথা ছিল। ছুরি চালাবেন একটি লালমুখো গোরা ডাক্তার। Operationএর ফলাফল জানতে আমরা তাঁর বাড়ি উপস্থিত হয়ে দেখি মুখুজ্যে মশায় বারান্দায় পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন ও বলছেন 'হরিবোল' 'হরিবোল'। আমরা এ কথা শুনে বুঝলুম যে, মুখুজ্যে-গিন্নির কর্ম সাবাড় হয়েছে।

তার পর তাঁর একটি আশ্রিত আত্মীয় বললেন যে, operation খুব ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছে। আমরা সেই কথা শুনে জিজ্ঞেস করলুম যে, মুখুজ্যে মশায় তবে 'হরিবোল' 'হরিবোল' এই মারাত্মক ধ্বনি করছেন কেন? তিনি হেসে বললেন, ইংরেজি বলছেন। কাটাকুটি ব্যাপারটা যে 'horribe'— তাই বলতে চেষ্টা করছেন।

এর থেকেই তাঁর ইংরেজি বিদ্যের বহর বুঝতে পারবেন। তিনি যে আমাদের প্রগতিকে মনে মনে গ্রাহ্য করেছিলেন, সে ইংরেজি পড়ে নয়, লোকচরিত্র দেখে-শুনে। তাঁর মতামত এখন উল্লেখ করছি।

আমার যখন বয়েস বছর বারো তখন কেনারামবাবু আমাকে একদিন বলেন যে, "আমাদের এ দেশে উন্নতি কোন্ জিনিসে এনেছে জান?"

আমি বললুম, "না।"

তিনি বললেন, "ব্রাণ্ডি। ব্রাণ্ডি না খেলে মুরগি খাওয়া যায় না, আর মুরগির পিঠপিঠ আসে আর-সব প্রগতি। ব্রাণ্ডি পান করলে নেশা হয়, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন মুরগি নির্ভয়ে খাওয়া যায়। আর সেইসঙ্গে

হিন্দু-মুসলমানের জাতিভেদ থাকে না। মুরগি খেতে হলেই মুসলমানের হাতে খেতে হয়। তার পরেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কেননা অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ওরূপ পান-ভোজনে মহা আপত্তি করে ; শিক্ষিত হলে করে না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পিঠপিঠ আসে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তারা লেখাপড়া শিখবে অথচ অন্দরমহলে আটক থাকবে— এ হতেই পারে না। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ, প্রগতির মূল হচ্ছে ব্রাণ্ডি, ইংরেজি শিক্ষা নয়। ইংরেজি শেখা শক্ত, কিন্তু ব্রাণ্ডি গেলা খুব সহজ। এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুত্ব কি লোকের দেখ নি ?— এই কারণে আমি ব্রাণ্ডি-খোরদের উৎসাহ দিই। ঐ নেশার পথই হচ্ছে যথার্থ প্রগতির পথ ; যদিও আমি নিজে মদও খাই নে, মাংসও খাই নে।"

খ্রীস্টান ভদ্রলোকটি এঁর সাহায্য করতেন, কারণ তাঁর ওখানে গেলেই তিনি চায়ের সঙ্গে মুরগির ডিম অর্থাৎ প্রগতির ডিম সকলকেই খাওয়াতেন।

৫

পূর্বে বলেছি, মুখুজ্যে মহাশয়দ্বয়ের ছবি আঁকবার যোগ্য নয়। এঁদের কেউই রূপে শ্রীকৃষ্ণ বা মহাদেব ছিলেন না। দুজনেই রঙ ও রূপে ছিলেন আমাদের মতোই সাধারণ বাঙালি। শুধু বাঞ্ছারামবাবুর কোনো অঙ্গ ছিল অসাধারণ সংকুচিত, কোনো অঙ্গ আবার তেমনি প্রসারিত। তাঁর চোখ দুটি ছিল অযথা সংকুচিত, আর নাসিকা বেজায় প্রসারিত। আর তাঁর চুল ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সে চুলের ভিতর চিরুনি-ব্রুসের প্রবেশ নিষেধ, আর গুম্ফ ঐ একই উপাদানে গঠিত। আর তাঁর উদরের আয়তন ছিল অসাধারণ প্রবৃদ্ধ। লোকে বলত তাঁর পেটের ভিতর একখানা গোটা Webster's Dictionary বাসা বেঁধেছে। এ রসিকতার অর্থ— তিনি নাকি A থেকে Z পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজি শব্দ উদরস্থ করেছেন। এক কথায়, তাঁর চেহারা ছিল ঈষৎ ভীতিপ্রদ।

কিন্তু আমরা ছেলের দল তাঁকে ভয় করতুম না, করতেন আমাদের মাস্টারমশায়রা। কেননা তিনি ছিলেন সেকালের একজন জবরদস্ত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার। তিনি পরীক্ষা করতেন আমাদের, কিন্তু আমাদের ভুলভ্রান্তির জন্য শাস্তি দিতেন মাস্টারমশায়দের। কাউকে করতেন বরখাস্ত, কাউকে করতেন জরিমানা। কারণ তাঁর কথা ছিল— ছেলেরা যদি ভুল ইংরেজি লেখে তো জাতির প্রগতি হবে কোত্থেকে ?— প্রগতি অর্থে তিনি বুঝতেন—

ইংরেজি ভাষার ষত্ব-ণত্বের জ্ঞান। তাঁর তুল্য ইংরেজি যে ইংরেজরাও জানে না, এই ছিল লোকমত।

৬

তাঁর ইংরেজি-জ্ঞানের একটা নমুনা দিই। আমাদের শহরের গভর্নমেণ্টের একটি বৃত্তিভোগী স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদের তিনি মুখে মুখে পরীক্ষা করছিলেন। সে সময়ে পড়ানো হচ্ছিল Psalm of Life নামক একটি কবিতা। ছেলেদের মুখে psalm, pasalamaয় রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন— এ উচ্চারণ তোমাদের কে শিখিয়েছে? ছেলেরা উত্তর করলে— মাস্টারমশায়। বহু ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি থাকলে উহ্য স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জুড়ে দিতে হবে। সেইজন্য আমরা তিনটি অলিখিত a ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়েছি। বাঙ্গারামবাবু বললেন, তিনটি vowel না জুড়ে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ ছেঁটে দিতে পারতে, তা হলেই তো উচ্চারণ ঠিক হত। এটি মনে রেখো যে, ইংরেজরা লেখে এক, বলে আলাদা, এবং করেও আলাদা। এই হচ্ছে তাদের অভ্যুদয়ের কারণ।

এর পর সেকেণ্ড-মাস্টারকে তিনি থার্ড-মাস্টার করে দিলেন। লোকে বলে, সেকেণ্ড-মাস্টার ব্রাহ্ম বলে তাঁর এই শাস্তি হল। মাস্টারমশায় যে ঘোর ব্রাহ্ম ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই— কেননা তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে শালগ্রামের বদলে একটি তামাকের ডেলা সাক্ষী রেখে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। অপরপক্ষে বাঙ্গারামবাবু ছিলেন একাধারে ঘোর নাস্তিক এবং হিন্দু। ব্রাহ্মদের তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না; কেননা তাঁরা হিন্দুয়ানীর বিরোধী ও ভগবানে বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মধর্ম হচ্ছে ইংরেজি না জানার ফল। তাঁর মতে এ ধর্ম হচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের মাসতুতো ভাই।

৭

যাঁরা মনে করেন যে, ইংরেজি না জানলে লোকে সভ্য হয় না, তাঁদের বলি যে, এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে বাঙ্গারামবাবু ছিলেন আমাদের প্রগতির একটি অগ্রদূত।

তিনি মরবার সময়ও ইংরেজি বলতে বলতে মরছেন। ইংরেজি শিক্ষার

ফলে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা বললে যে, রোগের একমাত্র ঔষধ ব্রাণ্ডি, ও পথ্য মুরগির মাংস। নিরামিষাশী বাঞ্ছারামবাবু এ ওষুধপথ্য সেবনে কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "To be, or not to be, that is the question"। শেক্সপিয়ারের এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে— "We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep।"

তার পর তাঁর যখন আসন্নকাল উপস্থিত হল, তখন তাঁর ইংরেজিনবিশ উকিল ডাক্তার বন্ধুরা সব বাড়িতে উপস্থিত হন। বড়ো ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন, সকলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তিনি রোগীর নাড়ী টিপে বললেন, "My eyeballs burn and throb, but have no tears"; এ কথা শুনে মুমূর্ষু রোগী বললেন, "Long live Byron"।

এর পরেই তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

এখন আমরা যখন প্রগতির উল্টোরথ টানতে বাধ্য হব, তখন পূর্বপ্রগতির কোন্ ধারা বজায় থাকবে? কেনারামবাবুর অনুমত পানভোজন? না, বাঞ্ছারামবাবুর অভিমত ইংরেজি ভাষা?— যে ভাষার লেখার সঙ্গে বলা মেলে না, আর বলার সঙ্গে করা মেলে না।

প্রসঙ্গকথা

চার-ইয়ারি কথা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী

আমি বিলেত থেকে এ দেশে ফিরে আসবার বছর-দশেক পরে 'চার-ইয়ারি কথা' বলে একখানা গল্পের বই লিখি। সে গল্প ক'টি পড়ে সেকালে যুবক-সম্প্রদায়ের চটক লাগে। এবং সমালোচক-দলের কাছে নতুন বলে গ্রাহ্য হয়। দু-চার জন সমালোচক লেখেন যে, গল্প ক'টি ফরাসি থেকে চুরি। যদিচ তাঁরা ফরাসি ভাষা ও ফরাসি সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কেউ কেউ লেখেন যে, আনাটোল ফ্রান্সের গল্প থেকে চুরি। যদি আনাটোল ফ্রান্সের গল্পের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় থাকত তা হলে তাঁরা আমাকে এই চুরির দায়ে দোষী করতেন না। অনেকে মুখে আমাকে বলেছেন যে, এই গল্প-চারটির নায়িকাদের সঙ্গে বিলেতে আমার পরিচয় ছিল। প্রথম নায়িকা হচ্ছে পাগল, দ্বিতীয়টি চোর, তৃতীয়টি জুয়াচ্চোর, আর চতুর্থটি ভূত। বলা বাহুল্য, একরকম চারটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের নায়িকার একটির পর একটির সঙ্গে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। এই চারটিই আমার মনগড়া। তবে, এর ভিতর তৃতীয় গল্পের নায়িকার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, যাকে আমি রিণী নামে গড়ে তুলেছি।

এ গল্পের ঘটনা ও কথোপকথন সবই আমার স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু আমি এমন-একটি যুবতীকে জানতুম, যাকে রিণীর রূপ দেওয়া যায়। তার যথার্থ নাম ছিল কাতি, ইংরেজি Katieর ফরাসি উচ্চারণ। এই নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, সে আধা-ফরাসি আধা-ইংরেজ। তার মুখে শুনেছি যে, সে অল্পবয়সে ব্রাসেল্‌সে থাকত, সেখানকার conservatorieএ ভালো করে গানবাজনা শেখবার জন্যে। আমি তাকে কখনো গান গাইতে কিম্বা বাজাতে শুনি নি; কিন্তু সে যে ফরাসি বলতে পারত, তার পরিচয় আমি পেয়েছি। সে ছিল অভিজাতবংশীয়া। যদি তার কথা বিশ্বাস করতে হয়, তা হলে তার ঠাকুরদা ছিলেন ভারতবর্ষে একটি জেনারেল। তার বাবাও ছিলেন একটি মিলিটারি অফিসার। তার পর তিনি কোনো দুষ্কর্ম করায় দেশত্যাগী হয়েছিলেন। কাতির মা দিদি ও কাতিকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় ফেলে তিনি পলাতক হন। এবং তখন পর্যন্ত তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। এই সময়ে জেনারেল ফ্রেঞ্চ কাতিদের কিছু কিছু মাসহারা দিয়ে ভরণপোষণ করতেন। এবং সম্ভবত তিনিই তাদের ব্রাসেল্‌সে থাকতে পাঠান।

আমি এই ব্রাসেল্‌সের কথা তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি। আমি কাতির মাকে কখনো দেখি নি। তার দিদিকে দেখেছিলুম; সে দেখতে মোটেই সুন্দরী নয়, এবং অত্যন্ত ভালোমানুষ। সে যে কাতির দিদি, তা বিশ্বাস করা কঠিন। কাতি ছিল অতিশয় সুন্দরী এবং অতিশয় চালাক-চতুর। কাতির মুখ ছিল লম্বা ধরনের, নাক লম্বা, চোখও লম্বার দিকে বড়ো; এবং সমস্ত মুখ চোখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব ছিল। আমার আর্টিস্ট বন্ধু রোলান্‌ড্‌ হল্‌ তার ফোটো দেখে চমকে ওঠেন, এবং তিনি বলেন যে, এই মেয়েটির চোখের তারার রঙ নীল নয়, ভায়লেট। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি ফোটো থেকে কি করে চোখের তারার রঙ বুঝলে?— তিনি উত্তরে বলেন যে, এর পরে তুমি লক্ষ্য করে দেখো তোমার এই বন্ধুটির চোখ ভায়লেট কি না। আমি পরে লক্ষ্য করে দেখি যে, রোলান্‌ড্‌ হল্‌এর কথাই ঠিক।

আমি সম্প্রতি একখানি বই পড়ছি, যার নাম *Bernard Shaw, His Life and Personality*। তাতে উইলিয়ম মরিস্‌ নামক একটি প্রসিদ্ধ আর্টিস্ট এবং সাহিত্যিকের কনিষ্ঠা কন্যা মে মরিস্‌এর একখানি ছবি আছে। আমি ছবিখানি যখনই দেখি, তখনই আমার কাতির কথা মনে পড়ে। এমন-কি, সময়ে সময়ে ভুল হয় যে ওটা তারই ছবি। আমি এই একটি সত্যিকারের মেয়েকে ভেঙে 'চার-ইয়ারি কথা'র চারটি নায়িকাকে তৈরি করেছি। আমি তার নাম-ধাম কিছুই জানতুম না, যা তার মুখে শুনেছি তা ছাড়া। এবং বেশি জানবার কোনো কৌতূহলও আমার ছিল না। প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল যে, সে একটি mystery girl। এবং তার জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা আমি সংগত মনে করতুম না, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে। উপরন্তু তার ব্যবহার এত অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিত যে, তার থেকে আমার মনে হত তার ভিতর একটু পাগলামির ছিট আছে। দ্বিতীয় গল্পের নায়িকাকে আমি বইয়ের দোকানে প্রথম দেখি, কাতিকেও তাই। তার পর যা-সব লিখেছি, সে-সব হচ্ছে সীতেশকে ফোটাবার জন্যে। আর শেষটা সে নায়িকা যে সীতেশের পাঁচ পাউণ্ড চুরি করে নিয়ে গেল, এ ঘটনা আমার সম্পূর্ণ বানানো। কাতি ক্রিমিনালের মেয়ে, তার পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল না; তাই আমি তাকে শেষ কাণ্ডে চোর বানিয়েছি। এ কাতি কিন্তু যথার্থ কাতি ছিল না।

'চার-ইয়ারি'র তৃতীয় গল্পে আমি যাকে রিণী বানিয়েছি, তার সঙ্গে যথার্থ কাতির কিছু সাদৃশ্য আছে। যখন 'চার-ইয়ারি' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাকে বহুলোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, এ গল্পটি real কি না। উত্তরে আমি বলি, তা হলে গল্পটি উত্‌রেছে। কেননা, যা আগাগোড়া কল্পনার জিনিস, অনেক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়েছে। কাতির সঙ্গে আমি ভালোবাসায় পড়ি আর না-পড়ি, সেকালে যুবক-পাঠকের দল অনেকে রিণীর প্রেমে পড়েছিল। আমার একটি ভক্ত বন্ধু কোনো মাসিক পত্রিকায় 'চার-ইয়ারি'র দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তাতে তিনি মুখ ফুটে বলেন যে, রিণীর মতো মেয়ের হাতে পড়ে নাকানি-চোবানি খাওয়াতেও সুখ আছে। আমি তাঁকে বলি, এটা কি লক্ষ্য কর নি যে, রিণীর পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ? আমার বন্ধু উত্তরে বলেন, রিণী যে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্টতুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে— এ কার চোখ এড়িয়ে যায়? কিন্তু সে জীবন্ত মানুষ, জড় পদার্থ নয়, এইখানেই তার বিশেষত্ব। কাতির সঙ্গে রিণীর প্রধান তফাত এই যে, আমি কাতিকে অনেক রঙ চড়িয়ে রিণী বানিয়েছি। রিণী ও তৃতীয় গল্পের নায়ক সোমনাথের কথাবার্তা প্রায় সবই আমার স্বকপোলকল্পিত। তবে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের রক্তমাংসের মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। ফলে, এটি গল্প হয়েছে, অথচ পাঠকের কাছে সত্য ঘটনা বলে ভ্রম হয়।

'চার-ইয়ারি কথা'র চতুর্থ গল্পের নায়িকা হচ্ছে প্রেতাত্মা। সে দেশি কি বিলেতি, এ প্রশ্ন যে কোনো পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

'বৈশাখী' ১৩৫২

প্রমথ চৌধুরীর গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

মৌলিক গল্প রচনার পূর্বে প্রমথ চৌধুরী কোনো কোনো বিদেশী গল্প অনুবাদ করেছিলেন। সাধনা পত্রে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য়[১] রবীন্দ্রনাথ তার একটির প্রসঙ্গে অনুকূল মন্তব্য করেন নি; নিম্নে তা মুদ্রিত হল—

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন [১২৯৮]। এই সংখ্যায় "ফুলদানী" নামক একটি ছোট উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাঙ্গলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়— ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরী এ প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মকথা'য় (১৩৫৩) লিখেছেন—

· · সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় Prosper Meriméeর 'Etruscan Vase' নামক একটি গল্প তর্জ্জমা করে' 'ফুলদানি' নাম দিয়ে প্রকাশ করি। সেটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় আমাকে আক্রমণ করেন। দুটি কারণে, প্রথমত, 'ফুলদানি'র মত গল্প বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্ভূত করা অনুচিত বলে; দ্বিতীয়ত, পাকা ফরাসী লেখকের লেখা কাঁচা বাঙ্গলা লেখকের অনুবাদে শ্রীভ্রষ্ট করা হয়েছে বলে'। আমি শেষোক্ত আপত্তি গ্রাহ্য করি। কিন্তু এ জাতীয় গল্প যে বঙ্গসাহিত্যে চলতে পারে না, সে কথা মানি নি। আমি অবশ্য সে সমালোচনা পড়ে' একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এরকম সমালোচনা আশা করি নি। তার পরেই আমি মেরিমে'র 'কার্মেন' তর্জ্জমা করি। কিন্তু সেটি শেষ করতে পারি নি বলে প্রকাশ করি নি। কার্মেন অনুবাদ করবার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চেয়ে ঢের বেশি অসামাজিক। · ·

---

১ সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

প্রধানত, সবুজ পত্র প্রকাশ হবার পর থেকেই প্রমথ চৌধুরীর মৌলিক গল্প রচনার সূচনা। সবুজ পত্রের প্রথম গল্পটি[1] লিখিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন— তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবেনা— এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চল্‌ল। [ফেব্রুয়ারি ১৯১৬]

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর জীবনে। অতঃপর জীবনের প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত তিনি গল্প রচনায় নিরত ছিলেন। সেগুলির কোনো-কোনোটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠিপত্রে যে মন্তব্য করেছেন নিম্নে তা সংকলিত হল।—

চার-ইয়ারি কথা

এখন মনে হচ্চে তোমার গল্পগুলো উল্টো দিক দিয়ে সুরু হলে ভালো হত। তোমার শেষ গল্পটা সব চেয়ে human। গল্পের প্রথম পরিচয়ে সেইটে সহজে লোকের হৃদয়কে টান্‌ত— তার পরে অন্য গল্পে মনস্তত্ত্ব এবং আর্টের বৈচিত্র্য তারা মেনে নিত। এবারকার দুটি নায়িকাই ফাঁকি— একটি পাগল, আর একটি চোর। কিন্তু নায়িকার প্রতি, অন্তত পুরুষ পাঠকের যে একটা স্বাভাবিক মনের টান আছে, সেটাকে এমনতর বিদ্রূপ করলে নিষ্ঠুরতা করা হয়। সব পাঠকের সঙ্গেই ত তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়— এইজন্যে তারা চটে ওঠে। তাদের পেট ভরাবার মত কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেও ইতরে জনাঃ খুসি থাকত। তুমি করালে কি না "ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনং"— কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়— বস্তুত, ঘ্রাণেন দ্বিগুণ উপবাস। মানুষ যখন ঠকে তখন সহজে এ কথা বল্‌তে পারেনা যে, ঠকেচি বটে কিন্তু চমৎকার! [মার্চ ১৯১৬]

ছোটো গল্প

গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ— ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক গল্প বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে— সুকুমারমতি

১ চার-ইয়ারি কথা

পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌বে, আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়— কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি। ১ ভাদ্র ১৩২৫

রাম ও শ্যাম

তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ— ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই। [২১ ডিসেম্বর, ১৯১৮]

নীল-লোহিতের আদিপ্রেম গ্রন্থের গল্প

তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্ব্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত— পালিশ করা, ঝক্‌ঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না। [২৫ অগস্ট, ১৯৩৪]

ঘোষালের হেঁয়ালি

আজকাল যেন আলো কমে এসেছে তাই পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি, হঠাৎ বিচিত্রায় তোমার নাম দেখে তোমার লেখা গল্পটি পড়লেম। পড়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে যাচ্ছিলুম। এ লেখায় তোমার সবুজপত্রী যুগের উজ্জ্বলতা দেখে খুব খুসি হয়েছি। আজকাল যে সব লেখা বেরোয় তার মাঝখানে এই আকস্মিক আগন্তুকটির চেহারা দেখে চমক লাগে, এর জাতই আলাদা। অনেকদিন চুপচাপ ছিলে, ভয় হয়েছিল তোমার আলো-ওয়ালা কলমের দীপ্তি পাছে কমে গিয়ে থাকে, দেখচি তার আশঙ্কা নেই। ১৩ ভাদ্র, ১৩৪২

বীণাবাই

পেয়েছি ভারতবর্ষ। সাবাস্‌। খুব ভালো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার শিলমোহরের ছাপ পড়েছে অতএব এর দাম কম নয়। এ ধরণের লেখা আর কারো কলমে ফুটতে পারে না। সাহিত্যে যারা জালিয়াতি করে দিন চালায় তারা হতাশ হবে। ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪

অণুকথা সপ্তক গ্রন্থের গল্প

তোমার ছোটো গল্প পড়ে চেকভের ছোট গল্প মনে পড়ল। যা মুখে এসেছে তাই বলে গেছ হাল্‌কা চালে। এতে আলবোলার ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। এ রকম কিছুই না লিখতে সাহসের দরকার করে। দেশের লোক সাহিত্যে ভুরিভোজন ভালোবাসে—তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছ— কিম্বা ভাববে ঠাট্টা। [১১ জুন, ১৯৩৯]

জুড়ি দৃশ্য

এবার পরিচয়ে তোমার গল্পটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি, না লিখে থাকতে পারলুম না। বয়স হলে কলমকে বাতে ধরে, কিন্তু তোমার কলম এখনো যে রকম খাড়া চলতে পারে এমন তো আর কারো দেখিনি। এ একেবারে তোমার খাষ দখলের লেখা, আর কারো হাত দিয়ে বেরবার জো নেই।…খাঁটি জিনিষ একটা আধটাই যথেষ্ট, সেই কথাটা আমাদের দেশের বদরসিকদের বোঝানো শক্ত,— কালকেতুর ব্যাধের মতো তাদের গ্রাস— মাসে মাসে মুঠো মুঠো অপথ্যর জোগান দিতে না পারলে তাদের বাহবা মিইয়ে আসে। ৬ শ্রাবণ ১৩৪৭

এই পত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্গত।

সাময়িকপত্রে প্রকাশনির্দেশ

প্রবাসস্মৃতি	ভারতী ১৩০৫
চার-ইয়ারি কথা	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২২ - জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩
আহুতি	সবুজ পত্র। আষাঢ় ১৩২৩
বড়োবাবুর বড়োদিন	সবুজ পত্র। ভাদ্র ১৩২৩
একটি সাদা গল্প	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৩
ফরমায়েশি গল্প	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩২৪
ছোটো গল্প	সবুজ পত্র। শ্রাবণ ১৩২৫
রাম ও শ্যাম	সবুজ পত্র। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৫
অদৃষ্ট	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩২৬
নীল-লোহিত	মাসিক বসুমতী। আশ্বিন ১৩২৯
নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা	মাসিক বসুমতী। আশ্বিন ১৩৩০
প্রিন্স	কল্লোল। বৈশাখ ১৩৩১
বীরপুরুষের লাঞ্ছনা	কল্লোল। কার্তিক ১৩৩১
গল্পলেখা	সবুজ পত্র। অগ্রহায়ণ ১৩৩২
ভাববার কথা	বিচিত্রা। শ্রাবণ ১৩৩৪
সম্পাদক ও বন্ধু	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৩৪
পূজার বলি	বার্ষিক বসুমতী। আশ্বিন ১৩৩৪
সহযাত্রী	মাসিক বসুমতী। আশ্বিন ১৩৩৬
ঝাঁপান খেলা	মাসিক বসুমতী। চৈত্র ১৩৩৭
নীল-লোহিতের স্বয়ম্বর	পরিচয়। কার্তিক ১৩৩৮
ভূতের গল্প	মাসিক বসুমতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯
দিদিমার গল্প (সেকালের গল্প)	ছোটগল্প। ১ আষাঢ় ১৩৩৯
অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি	বিচিত্রা। ফাল্গুন ১৩৩৯
নীল-লোহিতের আদিপ্রেম	ছোটগল্প। ৬ ফাল্গুন ১৩৩৯
অ্যাডভেঞ্চার : জলে	ছোটদের বার্ষিকী। ১৩৪০
ট্রাজেডির সূত্রপাত	ছোটগল্প। ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

মন্ত্রশক্তি	ছোটদের বার্ষিকী। আশ্বিন ১৩৪১
যখ	বিচিত্রা। কার্তিক ১৩৪১
ঘোষালের হেঁয়ালি	বিচিত্রা। ভাদ্র ১৩৪২
বীণাবাই	ভারতবর্ষ। আষাঢ় ১৩৪৪
ঝোট্টন ও লোট্টন	পরিচয়। শ্রাবণ ১৩৪৪
মেরি ক্রিসমাস	পরিচয়। আশ্বিন ১৩৪৪
ফার্স্ট ক্লাস ভূত	সোনার কাঠি। আশ্বিন ১৩৪৪
স্বল্পগল্প	ভারতবর্ষ। আষাঢ় ১৩৪৫
জুড়ি দৃশ্য	পরিচয়। শ্রাবণ ১৩৪৭
পুতুলের বিবাহবিভ্রাট	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৪৭
চাহার দরবেশ	পত্রিকা। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৪৭
সারদাদাদার সন্ন্যাস	বৈশাখী। ১৩৪৮
ধ্বংসপুরী	শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৪৮
সারদাদাদার সত্য গল্প	শারদীয়া যুগান্তর। ১৩৪৮
সরু ও মোটা	মধুমেলা। আশ্বিন ১৩৪৯
সোনার গাছ, হীরের ফুল	বিশ্বভারতী পত্রিকা। কার্তিক ১৩৪৯
সীতাপতি রায়	বিশ্বভারতী পত্রিকা। পৌষ ১৩৪৯
সত্য কি স্বপ্ন	সংকেত। চৈত্র ১৩৫০

গ্রন্থশেষে মুদ্রিত অ্যাডভেঞ্চার : স্থলে ও প্রগতিরহস্য গল্প দুটির সাময়িক পত্রে প্রকাশের বিবরণ সংগৃহীত হয় নি; এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে নীললোহিতের আদিপ্রেম [২২ অগস্ট ১৯৩৪] ও অণুকথা সপ্তক (১৩৪৬) গ্রন্থে। বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থসূচীতে দ্রষ্টব্য।

প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী

জন্ম ৭ অগস্ট ১৮৬৮। মৃত্যু ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬

তেল নুন লকড়ি। ১৯০৬ ?। পৃ ৪৮

১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ। পরে 'নানা-কথা' পুস্তকের অন্তর্গত।

সনেট-পঞ্চাশৎ। ফাল্গুন ১৯১৩। [২৫ মার্চ ১৯১৩]। পৃ ৫০

চার-ইয়ারি কথা। জানুয়ারি ১৯১৬। [১১ অগস্ট ১৯১৬]। পৃ ৯৭। গল্প।

The Story of Bengalee Literature (Paper read at the Summer Meeting at Darjeeling on the 14th of June 1917). 1917. [15 August 1917]. Pp 17.

বীরবলের হালখাতা। [৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৭]। পৃ ২৭৮। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ হালখাতা; কথার কথা; আমরা ও তোমরা; খেয়াল খাতা; মলাট-সমালোচনা; সাহিত্যে চাবুক; তর্জ্জমা; বইয়ের ব্যবসা; বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ; নোবেল প্রাইজ; সবুজ পত্র; বীরবলের চিঠি; "যৌবনে দাও রাজটীকা"; ইতিমধ্যে; বর্ষার কথা; পত্র; কৈফিয়ৎ; নারীর পত্র; নারীর পত্রের উত্তর; চুটকি; সাহিত্যে খেলা; শিক্ষার নব আদর্শ; কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল; পত্র; প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য উপন্যাস; টীকা ও টিপ্পনী; শিশু-সাহিত্য; সুরের কথা; রূপের কথা; ফাল্গুন।

এই গ্রন্থের প্রথম চোদ্দটি প্রবন্ধযোগে বীরবলের হালখাতার দ্বিতীয় সংস্করণ ("প্রথম পর্ব্ব") ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়।

নানা-কথা। [১৩ মে ১৯১৯]। পৃ ৩৬২। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ তেল নুন লকড়ি; বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙলা ওরফে সাধুভাষা; সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা; বাঙলা ব্যাকরণ; সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী ?; ব্রাহ্মণ মহাসভা; সবুজ পত্রের মুখপত্র; সাহিত্য-সম্মিলন; ভারতবর্ষের ঐক্য; ইউরোপের কুরুক্ষেত্র; বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ; নূতন ও পুরাতন; বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?; অভিভাষণ; বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য; অলঙ্কারের সূত্রপাত। আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ; আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ; ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়; সালতামামি; প্রাণের কথা।

পদ-চারণ। ১৯১৯। [১২ জুলাই ১৯২০]। পৃ ৮৪। কাব্যগ্রন্থ।

আহুতি। ১৯১৯। পৃ ১৯৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী ॥ আহুতি ; বড়বাবুর বড়দিন ; একটি সাদা গল্প ; ফরমায়েসি গল্প ; রাম ও শ্যাম।

আমাদের শিক্ষা। [২৫ অগস্ট ১৯২০]। পৃ ১০৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ আমাদের শিক্ষা ; বাংলার ভবিষ্যৎ ; বই পড়া ; আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবন-সমস্যা ; নব-বিদ্যালয় ১-৩।

দু-ইয়ারকি। ২৯ জুলাই ১৯২০। [১৯ মার্চ ১৯২১]। পৃ ১৭৫। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ দু-ইয়ারকি ; দেশের কথা ১-২ ; রায়তের কথা ; নবযুগ।

বীরবলের টিপ্পনী। ১৩২৮। [২ অগস্ট ১৯২১]। পৃ ১২৪। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ কংগ্রেসের দলাদলি, "এত্তো বড়" কিংবা "কিছু নয়" ; সাহিত্য বনাম পলিটিক্স ; টীকা ও টিপ্পনী ; পত্র ; গত কংগ্রেস। পরিশিষ্ট ॥ গুলিখোরের আবেদনপত্র ; গর্জ্জন-সরস্বতী সংবাদ।

রায়তের কথা। [১০ অগস্ট ১৯২৬]। পৃ ১।৶+৮০। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; টীকা, প্রমথ চৌধুরী ; রায়তের কথা ('দু-ইয়ারকি' হইতে) ; রঙ্গপুরে উত্তর-বঙ্গ রায়ত কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণ ; পত্র ('বীরবলের টিপ্পনী' হইতে)।

"অভিভাষণ" ও "পত্র"-বর্জিত এই পুস্তিকার একটি সংশোধিত সংস্করণ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় ১৩৫১ সালের বৈশাখ সংখ্যা-রূপে [১৬ মে ১৯৪৪] প্রকাশিত।

প্রমথনাথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলী। [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০]। পৃ ৩১১

সূচী ॥ কাব্য— সনেট পঞ্চাশৎ ; পদ-চারণ। গল্প— চার-ইয়ারি-কথা, আহুতি (সম্পূর্ণ) ; আরও আটটি গল্প ('নীললোহিত' ও 'নীললোহিতের আদিকথা'য় সংকলিত)। প্রবন্ধ—'দু-ইয়ারকি' (সম্পূর্ণ) ; 'বীরবলের হালখাতা,' 'নানা-কথা' ও 'বীরবলের টিপ্পনী', প্রত্যেকটি আংশিক ; কথা-সাহিত্য নামে একটি প্রবন্ধ।

নানা-চর্চ্চা। ১ মার্চ ১৯৩২। [১ জুন ১৯৩২]। পৃ ২৭৬। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি ; অম্বু-হিন্দুস্থান ; মহাভারত ও গীতা ; বৌদ্ধধর্ম ; হর্ষচরিত ; পাঠান-বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ ; বীরবল ;

ভারতচন্দ্র ; রামমোহন রায় ; বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্ ; পূর্ব্ব ও পশ্চিম ; য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ? ; ভারতবর্ষ সভ্য কি না ? ; গোল-টেবিলের বৈঠক।

নীললোহিত। পৃ ১৩১। গল্পসংগ্রহ। ১৩৩৯ মাঘ সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী ॥ নীললোহিত ; নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা ; নীললোহিতের স্বয়ম্বর ; অদৃষ্ট ; সম্পাদক ও বন্ধু ; গল্প লেখা ; পূজার বলি ; সহযাত্রী ; ঝাঁপান খেলা ; দিদিমার গল্প ; ভূতের গল্প।

নীললোহিতের আদিপ্রেম। [২২ অগস্ট ১৯৩৪]। পৃ ১০৫। গল্পসংগ্রহ। ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যা পরিচয়ে সমালোচিত।

সূচী ॥ নীললোহিতের আদিপ্রেম ; ট্রাজেডির সূত্রপাত ; অবনীভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি ; অ্যাডভেঞ্চার—স্থলে ; অ্যাডভেঞ্চার— জলে ; ভাববার কথা।

ঘরে বাইরে। [২৪ নভেম্বর ১৯৩৬]। পৃ ১২৭। প্রবন্ধসংগ্রহ। নয়টি "প্রস্তাব" আছে।

অভিভাষণ। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, চন্দননগর, ৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

সাহিত্যশাখার সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ ব্যতীত ইতিহাস ও দর্শন -শাখার সভাপতিদের অভিভাষণও এই পুস্তিকায় মুদ্রিত।

ঘোষালের ত্রিকথা। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭। পৃ ৯৩। গল্পসংগ্রহ।

সূচী ॥ ফরমায়েসি গল্প ('আহুতি' থেকে) ; ঘোষালের হেঁয়ালি ; বীণাবাই।

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণ, একবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন, কৃষ্ণনগর, ২৯ মাঘ ১৩৪৪। পৃ ১৫

অণুকথা সপ্তক। ১৩৪৬। [১ জুলাই ১৯৩৯]। পৃ ৫৯। গল্পসংগ্রহ।

সূচী ॥ মন্ত্রশক্তি ; যথ ; ঝোট্টন ও লোট্টন ; মেরি ক্রিস্‌মাস ; ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত ; স্বল্প-গল্প ; প্রগতি রহস্য।

প্রাচীন হিন্দুস্থান। অগ্রহায়ণ ১৩৪৬। [৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০]। পৃ ১১৭। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী ॥ ভূবৃত্তান্ত ('নানা-চর্চ্চা' থেকে। ভারতবর্ষের জিয়োগ্রাফি ও অন্থ-হিন্দুস্থান প্রবন্ধদ্বয়ের সংশোধিত রূপ) ; ইতিবৃত্তান্ত।

গল্পসংগ্রহ। ২০ ভাদ্র ১৩৪৮। [৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১]। পৃ ৫০৭

গ্রন্থাকারে বা সাময়িক পত্রে এ যাবৎকাল প্রকাশিত লেখকের সমস্ত

গল্পের সংগ্রহ। প্রমথ চৌধুরী -সংবর্ধনা সমিতির পক্ষে প্রিয়রঞ্জন সেন -কর্তৃক প্রকাশিত। এই সংগ্রহ প্রকাশিত হবার পরও চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পগুলি ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

Tales of Four Friends. June 1944. Pp 119.

চার-ইয়ারি কথার ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী কৃত ইংরেজি অনুবাদ।

বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ডিসেম্বর ১৯৪৪। [২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪]। পৃ ১৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা।

হিন্দু সংগীত। বৈশাখ ১৩৫২। [১৪ জুন ১৯৪৫]। প্রবন্ধসংগ্রহ।

সূচী॥ হিন্দু সংগীত; সুরের কথা ('বীরবলের হালখাতা' থেকে) ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী লিখিত সংগীতপরিচয়।

আত্মকথা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩। [২৮ জুন ১৯৪৬]। পৃ ১১৪

১৮৯৩ সালে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত স্মৃতিকথা। পরবর্তী কালের আত্মকথা অধিকাংশ বৈশাখী (১৩৫২) ও পূর্বাশা (১৩৬০) পত্রে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রবন্ধসংগ্রহ। প্রথম খণ্ড। ৭ অগস্ট ১৯৫২। পৃ ৩৩৩

'সাহিত্য' ও 'ভাষার কথা' সম্বন্ধে ছাব্বিশটি প্রবন্ধ। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত। সাময়িক পত্র হইতেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত -কর্তৃক সম্পাদিত এবং তাঁর লিখিত ভূমিকা সংবলিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান। ফাল্গুন ১৩৬০। পৃ ৩২

প্রবন্ধ-সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। মার্চ ১৯৫৪। পৃ ২৭৭

'ভারতবর্ষ' 'সমাজ' ও 'বিচিত্র' প্রসঙ্গে চব্বিশটি প্রবন্ধ। সাময়িক পত্র হইতে এই খণ্ডেও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত -কর্তৃক সম্পাদিত।

সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা। ৭ আশ্বিন ১৮৮৩ শকাব্দ। পৃ [১৬]+১৭১

এই সংকলনগ্রন্থে সনেট-পঞ্চাশৎ ও পদচারণ ব্যতীত দশটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা নাটিকা ও গান সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থপরিচয়ে প্রমথ চৌধুরীর কয়েকখানি পত্র ও অন্যান্য উপকরণ মুদ্রিত। শ্রীপুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সম্পাদিত। পরিবর্ধিত সংস্করণের (পৌষ ১৩৭৮) গ্রন্থপরিচয়ে অন্যান্য নূতন তথ্যের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (ভারতী। শ্রাবণ ১৩২০), প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (সাহিত্য। শ্রাবণ ১৩২০) এবং প্রমথ চৌধুরী

লিখিত 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' (ভারতী। ভাদ্র ১৩২০)— প্রবন্ধ তিনটি সংযোজিত।

পত্রাবলী। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। ১ অক্টোবর ১৯৩১

ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে বীরবল, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীদিলীপকুমার রায় -লিখিত কয়েকটি পত্রালোচনা প্রমথ চৌধুরী এই গ্রন্থে স্বীয় 'মুখ-পত্র' সহ একত্র প্রকাশ করেন। উক্ত ভূমিকা ব্যতীত চৌধুরী মহাশয়ের তিনটি রচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে— বীরবলের পত্র ১-২ ; ফ্রান্সের নব মনোভাব।

বারোয়ারি। ১৯২১। [২ মে ১৯২১]

এই উপন্যাস বারোজন সাহিত্যিকের রচনা—'ভারতী মাসিক পত্রিকার উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি'। প্রমথ চৌধুরী ৩৩-৩৬ পরিচ্ছেদ লিখে গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদিত 'ছোটগল্প' প্রতি সংখ্যায় সাধারণত একটি গল্প (অন্যান্য সংবাদ ও মন্তব্যসহ) পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হত। উহার নিম্নোক্ত তিনটি সংখ্যা প্রমথ চৌধুরীর পুস্তকতালিকায় স্থান পেতে পারে—

সেকালের গল্প। ১ আষাঢ় ১৩৩৯

নীললোহিতের আদি প্রেম। ৬ ফাল্গুন ১৩৩৯

ট্রাজেডির সূত্রপাত। ৩১ ভাদ্র ১৩৪০

দুই না এক। বৈশাখ ১৩৫১। শ্রীপ্রতিভা বসু -সম্পাদিত ছোটগল্প গ্রন্থমালার পঞ্চম সংখ্যা, থিয়োফিল গোতিয়ের গল্পের অনুবাদ, ভারতী থেকে পুনর্মুদ্রিত ; এটিও প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প-পুস্তিকা-পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর 'গল্পসংগ্রহে' এটি স্থান পায় নি, এই পুস্তিকার প্রকাশক সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু অনুবাদ-গল্প 'গল্পসংগ্রহে'র পরিধিভুক্ত নয় ; প্রমথ চৌধুরী আরো কয়েকটি দেশী ও বিদেশী গল্পের অনুবাদ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রকাশ-কাল মুদ্রিত নেই। ভূমিকার তারিখ, প্রেসের নির্দেশচিহ্ন ও বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের তারিখ ধরে সাজানো হয়েছে।— বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখগুলি (বন্ধনীমধ্যে মুদ্রিত) শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন